প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

সপ্তম ভাগ।

১৩১৫

এলাহাবাদ।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র।

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনার সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

চিত্রসূচী

বজ্রধর বুদ্ধ।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩১৫। | ১ম সংখ্যা।

গোরা।

২১

মহিম সেদিন গোরাকে কিছু না বলিয়া তাহার পরের দিন তাহার ঘরে গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন গোরাকে পুনর্ব্বার রাজি করাইতে বিস্তর লড়ালড়ি করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যেই আসিয়া বলিলেন যে বিনয় কাল বিকালে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা দিয়া গেছে ও পানপত্র সম্বন্ধে গোরার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে, গোরা তখনি নিজের সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল—"বেশত। পানপত্র হয়ে যাক্ না!"

মহিম আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"এখন ত বলচ বেশত। এর পরে আবার বাগড়া দেবে না ত।"

গোরা কহিল, "আমি ত বাধা দিয়ে বাগ্ড়া দিইনি, অনুরোধ করেই বাগ্ড়া দিয়েছি।"

মহিম। অতএব তোমার কাছে আমার মিনতি এই যে তুমি বাধাও দিয়ো না অনুরোধও কোরো না। কুরু পক্ষে নারায়ণী সেনাতেও আমার কাজ নেই আর পাণ্ডব পক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখিনে। আমি একলা যা পারি সেই ভাল—ভুল করেছিলুম—তোমার সহায়তাও যে এমন বিপরীত তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। যা হোক্ কাজটা হয় এটাতে তোমার ইচ্ছা আছে ত?

গোরা। হাঁ, ইচ্ছা আছে।

মহিম। তা হলে ইচ্ছাই থাক কিন্তু চেষ্টায় কাজ নেই।

গোরা রাগ করে বটে এবং রাগের মুখে সবই করিতে পারে সেটাও সত্য—কিন্তু সেই রাগকে পোষণ করিয়া নিজের সঙ্কল্প নষ্ট করা তাহার স্বভাব নহে। বিনয়কে যেমন করিয়া হোক্ সে বাঁধিতে চায়, এখন অভিমানের সময় নহে। গত কল্যকার ঝগড়ার প্রতিক্রিয়া দ্বারাতেই যে বিবাহের কথাটা পাকা হইল, বিনয়ের বিদ্রোহই যে বিনয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করিল সে কথা মনে করিয়া গোরা কালিকার ঘটনায় মনে মনে খুসি হইল। বিনয়ের সঙ্গে তাহাদের চিরন্তন স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গোরা কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। কিন্তু তবু এবার দুজনকার মাঝখানে তাহাদের একান্ত সহজ ভাবের একটুখানি ব্যতিক্রম ঘটিল।

গোরা এবার বুঝিয়াছে দূর হইতে বিনয়কে টানিয়া রাখা শক্ত হইবে—বিপদের ক্ষেত্র যেখানে সেইখানেই পাহারা দেওয়া চাই। গোরা মনে ভাবিল আমি যদি পরেশ বাবুদের বাড়িতে সর্ব্বদা যাতায়াত রাখি তাহা হইলে বিনয়কে ঠিক গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিব।

সেই দিনই অর্থাৎ ঝগড়ার পরদিনই অপরাহ্নে গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজই গোরা আসিবে বিনয় কোনো মতেই এমন আশা করে নাই। সেই জন্য সে মনে মনে যেমন খুসি তেমনি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় গোরা পরেশবাবুদের মেয়েদের কথাই পাড়িল অথচ তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বিরূপতা ছিলনা। এই আলোচনায় বিনয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে বেশী চেষ্টার প্রয়োজন করে না।

সুচরিতার সঙ্গে বিনয় যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছে তাহা আজ সে বিস্তারিত করিয়া গোরাকে বলিতে লাগিল। সুচরিতা যে বিশেষ আগ্রহের সহিত এ সকল প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপিত করে এবং যতই তর্ক করুক না কেন মনের অলক্ষ্য দেশে সে যে ক্রমশই অল্প অল্প করিয়া সায় দিতেছে এ কথা জানাইয়া গোরাকে বিনয় উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিল।

বিনয় গল্প করিতে করিতে কহিল—"নন্দর মা ভূতের ওঝা এনে নন্দকে কি করে মেরে ফেলেছে এবং তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তাই যখন বল্‌ছিলুম তখন তিনি বল্লেন—'আপনারা মনে করেন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের রাঁধতে বাড়তে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের সমস্ত কর্ত্তব্য হয়ে গেল। একদিকে এমনি করে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত খাটো করে রেখে দেবেন তার পরে যখন তারা ভূতের ওঝা ডাকে তখনো আপনারা রাগ করতে ছাড়বেন না, যাদের পক্ষে ছুটি একটি পরিবারের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তারা কখনই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না—এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড় কাজকে নষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নীচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলবেই। নন্দর মাকে আপনারা এমন করে গড়েচেন এবং এমন জায়গায় ঘিরে রেখেছেন— যে আজ প্রাণের দায়েও আপনারা যদি তাকে সুবুদ্ধি দিতে চান ত সেখানে গিয়ে পৌঁছবেই না।'—আমি এ নিয়ে তর্ক করবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সত্য বল্‌চি গোরা মনে মনে তাঁর সঙ্গে মতের মিল হওয়াতে আমি জোরের সঙ্গে তর্ক করতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে তবু তর্ক চলে কিন্তু ললিতার সঙ্গে তর্ক করতে আমার সাহস হয় না। ললিতা যখন ভ্রূ তুলে বল্লেন 'আপনারা মনে করেন, জগতের কাজ আপনারা করবেন, আর আপনাদের কাজ আমরা করব! সেটি হবার জো নেই! জগতের কাজ, হয় আমরাও চালাব নয় আমরা বোঝা হয়ে থাকব ; আমরা যদি বোঝা হই তখন রাগ করে বলবেন পথে নারী বিবর্জ্জিতা। কিন্তু নারীকেও যদি চল্‌তে দেন তাহলে পথেই হোক ঘরেই হোক্ নারীকে বিবর্জ্জন করবার দরকার হয় না।' তখন আমি আর কোনো উত্তর না করে চুপ করে রইলুম। ললিতা সহজে কথা কন না, কিন্তু যখন কন্ তখন খুব্ সাবধানে উত্তর দিতে হয়। যাই বল গোরা আমারো মনে খুব বিশ্বাস হয়েচে যে আমাদের মেয়েরা যদি চীন-রমনীদের পায়ের মত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কোনো কাজই এগোবে না।"

গোরা। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে না এমন কথা আমি ত কোনো দিন বলি নে।

বিনয়। চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ পড়ালেই বুঝি শিক্ষা দেওয়া হয়।

গোরা। আচ্ছা, এবার থেকে বিনয়বোধ প্রথম ভাগ ধরানো যাবে।

সেদিন দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি পরেশ বাবুর মেয়েদের কথা হইতে হইতে রাত হইয়া গেল।

গোরা একলা বাড়ি ফিরিবার পথে ঐ সকল কথাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল পরেশ বাবুর মেয়েদের কথা মন হইতে তাড়াইতে পাড়িল না। গোরার জীবনে এ উপসর্গ কোনো কালেই ছিল না, মেয়েদের কথা সে কোনোদিন চিন্তা মাত্রই করে নাই। জগদ্ব্যাপারে এটাও যে একটা কথার মধ্যে এবার বিনয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিল। ইহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহার সঙ্গে হয় আপোষ নয় লড়াই করিতে হইবে।

পরদিন বিনয় যখন গোরাকে কহিল—"পরেশ বাবুর বাড়িতে একবার চলই না—অনেক দিন যাওনি,—তিনি তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—" তখন গোরা বিনা আপত্তিতে রাজি হইল। শুধু রাজি হওয়া নহে, তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বের মত নিরুৎসুক ভাব ছিল না। প্রথমে

সুচরিতা ও পরেশ বাবুর কন্যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তাহার পরে মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল; এখন তাহার মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে। বিনয়ের চিত্তকে কিসে যে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তাহার মনে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

উভয়ে যখন পরেশবাবুর বাড়ি গিয়া পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতলার ঘরে একটা তেলের সেজ জ্বালাইয়া হারান তাঁহার একটা ইংরেজি লেখা পরেশবাবুকে শুনাইতেছিলেন। এ স্থলে পরেশবাবু বস্তুত উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন—সুচরিতাকে শোনানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুচরিতা টেবিলের দূরপ্রান্তে চোখের উপর হইতে আলো আড়াল করিবার জন্য মুখের সাম্‌নে একটা তালপাতার পাখা তুলিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে আপন স্বাভাবিক বাধ্যতাবশত প্রবন্ধটি শুনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কেবলি অন্য দিকে যাইতেছিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া যখন গোরা ও বিনয়ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন সুচরিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে চৌকি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই পরেশবাবু কহিলেন—"রাধে, যাচ্চ কোথায়? আর কেউ নয় আমাদের বিনয় আর গৌর এসেচে।"

সুচরিতা সঙ্কুচিত হইয়া আবার বসিল। হারানের সুদীর্ঘ ইংরেজি রচনা পাঠে ভঙ্গ ঘটাতে তাহার আরাম বোধ হইল; গোরা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মনে যে একটা উত্তেজনা হয় নাই তাহাও নহে কিন্তু হারানবাবুর সম্মুখে গোরার আগমনে তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। দুজনে পাছে বিরোধ বাধে এই মনে করিয়া অথবা কি যে তাহার কারণ তাহা বলা শক্ত।

গৌরের নাম শুনিয়াই হারানবাবুর মনের ভিতরটা একেবারে বিমুখ হইয়া উঠিল। গৌরের নমস্কারে কোনোমতে প্রতিনমস্কার করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। হারানকে দেখিবা মাত্র গৌরার সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি সশস্ত্রে উদ্যত হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী তাঁহার তিন মেয়েকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু গিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। পরেশবাবুর যাইবার সময় হইয়াছে। এমন সময় গোরা ও বিনয় আসিয়া পড়াতে তাঁহার বাধা পড়িল। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না জানিয়া তিনি হারান ও সুচরিতাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন "তোমরা এঁদের নিয়ে একটু বোস, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌চি।"

দেখিতে দেখিতে গোরা এবং হারানবাবুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। যে প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক তাহা এই:—কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন্‌লো সাহেবের সহিত ঢাকায় থাকিতে পরেশবাবুদের আলাপ হইয়াছিল। পরেশবাবুর স্ত্রী কন্যারা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন বলিয়া সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী ইঁহাদিগকে বিশেষ খাতির করিতেন। সাহেব তাঁহার জন্মদিনে প্রতিবৎসরে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা করিয়া থাকেন। এবারে বরদাসুন্দরী ব্রাউন্‌লো সাহেবের স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার সময় ইংরেজি কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে নিজের কন্যাদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা উত্থাপন করাতে মেম সাহেব সহসা কহিলেন, এবার মেলায় লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর সস্ত্রীক আসিবেন। আপনার মেয়েরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে একটা ছোট খাট ইংরেজি কাব্য নাট্য অভিনয় করেন ত বড় ভাল হয়।—এই প্রস্তাবে বরদাসুন্দরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ তিনি মেয়েদের রিহার্সাল্ দেওয়াইবার জন্যই কোনো বন্ধুর বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন! এই মেলায় গোরার উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় গোরা কিছু অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিয়াছিল—"না।" এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইংরেজ বাঙালীর সম্বন্ধ ও পরস্পর সামাজিক সম্মিলনের বাধা লইয়া দুই তরফে রীতিমত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

হারান কহিলেন—"বাঙালীরই দোষ। আমাদের এত কুসংস্কার ও কুপ্রথা, যে, আমরা ইংরেজের সঙ্গে মেলবার যোগ্যই নই।"

গোরা কহিল, "যদি তাই সত্য হয় তবে সেই অযোগ্যতা সত্বেও ইংরেজের সঙ্গে মেলবার জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে লজ্জাকর।"

হারান কহিলেন—"কিন্তু যাঁরা যোগ্য হয়েচেন তাঁরা ইংরেজের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে থাকেন—যেমন এঁরা সকলে।"

গোরা। একজনের সমাদরের দ্বারা অন্য সকলের অনাদরটা যেখানে বেশি করে ফুটে ওঠে সেখানে এরকম সমাদরকে আমি অপমান বলে গণ্য করি।

দেখিতে দেখিতে হারান বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং গোরা তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া বাক্যশেলবিদ্ধ করিতে লাগিল।

দুই পক্ষে এইরূপে যখন তর্ক চলিতেছে সুচরিতা টেবিলের প্রান্তে বসিয়া পাখার আড়াল হইতে গোরাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। কি কথা হইতেছে তাহা তাহার কানে আসিতেছিল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার মন ছিল না। সুচরিতা যে গোরাকে অনিমেষনেত্রে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত কিন্তু সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে; তাহার মুখে কখনো অবজ্ঞার হাস্য কখনো বা ঘৃণার ভ্রূকুটি তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে; তাহার মুখের প্রত্যেক ভাবলীলায় একটা আত্মমর্য্যাদার গৌরব লক্ষিত হইতেছে; সে যাহা বলিতেছে তাহা যে কেবলমাত্র সাময়িক বিতর্ক বা আক্ষেপের কথা নহে, প্রত্যেক কথা যে তাহার অনেক দিনের চিন্তা এবং ব্যবহারের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে কোনো প্রকার দ্বিধা দুর্ব্বলতা বা আকস্মিকতা নাই তাহা কেবল তাহার কণ্ঠস্বরে নহে, তাহার মুখে এবং তাহার সমস্ত শরীরেই যেন সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সুচরিতা তাহাকে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। সুচরিতা তাহার জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। তাহাকে আর দশজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না। এই গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হারান বাবু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের এবং মুখের আকৃতি, তাঁহার হাব ভাব ভঙ্গী, এমন কি, তাঁহার জামা এবং তাঁহার চাদরখানা পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এতদিন বারম্বার বিনয়ের সঙ্গে গোরার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সুচরিতা গোরাকে একটা বিশেষ দলের একটা বিশেষ মতের অসামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার দ্বারা দেশের একটা কোনো বিশেষ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এইমাত্র সে কল্পনা করিয়াছিল—আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্ করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কি, মানুষের আত্মা কি, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

হারান বাবু সুচরিতার এই তদ্গত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তর্কের যুক্তিগুলি জোর পাইতেছিল না। অবশেষে একসময় নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সুচরিতাকে নিতান্ত আত্মীয়ের মত ডাকিয়া কহিলেন—"সুচরিতা, একবার এঘরে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

সুচরিতা একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহাকে কে যেন মারিল। হারান বাবুর সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে তিনি যে কখনো তাহাকে এরূপ আহ্বান করিতে পারেন না তাহা নহে, অন্য সময় হইলে সে কিছু মনেই করিত না কিন্তু আজ গোরাও বিনয়ের সম্মুখে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। বিশেষতঃ গোরা তাহার মুখের দিকে এমন একরকম করিয়া চাহিল যে সে হারান বাবুকে ক্ষমা করিতে পারিল না। প্রথমটা, সে যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই অমনিভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হারান বাবু তখন কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"শুনচ সুচরিতা, আমার একটা কথা আছে, একবার এঘরে আসতে হবে।"

সুচরিতা তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়াই কহিল—“এখন থাক্—বাবা আসুন, তার পরে হবে।”

বিনয় উঠিয়া কহিল—“আমরা না হয় যাচ্চি।”

সুচরিতা তাড়াতাড়ি কহিল—“না বিনয় বাবু, উঠবেন না। বাবা আপনাদের থাকতে বলেচেন। তিনি এলেন বলে!”—তাহার কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুল অনুনয়ের ভাব প্রকাশ পাইল। হরিণীকে যেন ব্যাধের হাতে ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

“আমি আর থাকতে পারচিনে, আমি তবে চল্লুম” বলিয়া হারান বাবু দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। রাগের মাথায় বাহির হইয়া আসিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল কিন্তু তখন ফিরিবার আর কোনো উপলক্ষ্য খুঁজিয়া পাইলেন না।

হারান বাবু চলিয়া গেলে সুচরিতা একটা কোন্ সুগভীর লজ্জায় মুখ যখন রক্তিম ও নত করিয়া বসিয়াছিল, কি করিবে কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না—সেই সময়ে গোরা তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখের ডৌলটি কি সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ! ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে! নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্ব্বে কোনো দিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্কার ভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরণের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভাল লাগিল;—সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মত বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পরিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল। তাহা যে গৃহ, তাহা যে সেবাকুশলা নারীর যত্নে স্নেহে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত, তাহা যে দেয়াল ও কড়ি বরগা ছাদের চেয়ে অনেক বেশি—ইহা আজ গোরার কাছে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। গোরা আপনার চতুর্দ্দিকের আকাশের মধ্যে একটা সজীব সত্তা অনুভব করিল তাহার হৃদয়কে চারিদিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল; একটা কিসের নিবিড়তা তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিল। এরূপ অপূর্ব্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনো দিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের স্পষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্য্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একইকালে সমগ্রভাবে সুচরিতা, এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিতে না পারিয়া সকলেই একপ্রকার কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন বিনয় সুচরিতার দিকে চাহিয়া কহিল—“সেদিন আমাদের কথা হচ্ছিল” বলিয়া একটা কথা উত্থাপন করিয়া দিল।

সে কহিল—“আপনাকে ত বলেইচি আমার এমন একদিন ছিল যখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের জন্যে সমাজের জন্যে আমাদের কিছুই আশা করবার নেই—চিরদিনই আমরা নাবালকের মত কাটাব এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে—যেখানে যা যেমন আছে সেই রকমই থেকে যাবে—ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের প্রবল জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও কোনো উপায়মাত্র নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই এই রকম মনের ভাব। এমন অবস্থায় মানুষ, হয় নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে, নয় উদাসীনভাবে কাটায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা এই কারণেই চাকরির উন্নতি ছাড়া আর কোনো কথা ভাবে না, ধনী-লোকেরা গবর্মেণ্টের খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বোধ করে—আমাদের জীবনের যাত্রাপথটা অল্প একটু দূরে

গিয়েই বাস্ ঠেকে যায়—সুতরাং সুদূর উদ্দেশ্যের কল্পনাও আমাদের মাথায় আসে না, আর তার পাথেয় সংগ্রহও অনাবশ্যক বলে মনে করি। আমিও এক সময়ে ঠিক করেছিলুম গোরার বাবাকে মুরুব্বি ধরে একটা চাকরির জোগাড় করে নেব। এমন সময় গোরা আমাকে বল্লে—না গবর্মেণ্টের চাকরি তুমি কোনো মতেই করতে পারবে না।"

গোরা এই কথায় সুচরিতার মুখে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস দেখিয়া কহিল, "আপনি মনে করবেন না গবর্মেণ্টের উপর রাগ করে আমি এমন কথা বলচি। গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যত দিন যাচ্চে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠ্‌চে। আমি জানি আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন—এখন তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবু তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সাহেব তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর বিড়াল মাত্র আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়।—এতবড় কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং শুন্‌তে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্চে চাক্‌রির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয় উঠ্‌চে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে তাঁর দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্চে; এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেবলি অধোগতি হচ্চে একথার অনুভূতি পর্য্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্চে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নীচু করে দেখ্‌ব এবং নীচু করে দেখবা মাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হব, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।" বলিয়া গোরা টেবিলে একটা মুষ্টি আঘাত করিল; তেলের সেজটা কাঁপিয়া উঠিল।

বিনয় কহিল "গোরা, এ টেবিলটা গবর্মেণ্টের নয়, আর এই সেজটা পরেশবাবুদের।"

শুনিয়া গোরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যের প্রবল ধ্বনিতে সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঠাট্টা শুনিয়া গোরা যে ছেলেমানুষের মত এমন প্রচুরভাবে হাসিয়া উঠিতে পারে ইহাতে সুচরিতা আশ্চর্য্য বোধ করিল এবং তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দ হইল। যাহারা বড় কথার চিন্তা করে তাহারা যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে একথা তাহার জানা ছিল না।

গোরা সেদিন অনেক কথাই বলিল। সুচরিতা যদিও চুপ করিয়াছিল কিন্তু তাহার মুখের ভাবে গোরা এমন একটা সায় পাইল যে উৎসাহে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষকালে সুচরিতাকেই যেন বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল—"দেখুন একটি কথা মনে রাখবেন;—যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে, ইংরেজেরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমারও ঠিক ইংরেজটি না হলে কোনো মতে প্রবল হতে পারব না তা হলে সে অসম্ভব কোনো দিন সম্ভব হবে না এবং কেবলি নকল করতে করতে আমরা দুয়েরবা'র হয়ে যাব। একথা নিশ্চয় জান্‌বেন ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে—ভারত রক্ষা পাবে। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে এইটে যদি আমরা না শিখে থাকি তবে সমস্তই ভুল শিখেছি। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভাল মন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান্, এর সঙ্গে এক হোন্, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খৃষ্টানী সংস্কারে বাল্যকাল থেকে অস্থি মজ্জায় দীক্ষিত হয়ে এ'কে আপনি বুঝতেই পারবেন না, এ'কে কেবলি আঘাত করতেই থাক্‌বেন, এর কোনো কাজেই লাগ্‌বেন না।"

গোরা বলিল বটে—"আমার অনুরোধ"—কিন্তু এ ত অনুরোধ নয়, এ যেন আদেশ। কথার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড জোর যে, তাহা অন্যের সম্মতির অপেক্ষাই করে না। সুচরিতা মুখ নত করিয়াই সমস্ত শুনিল। এমন একটা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে গোরা যে তাহাকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া এই কথা কয়টি কহিল তাহাতে সুচরিতার

মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল। সে আন্দোলন যে কিসের তখন তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। ভারতবর্ষ বলিয়া যে একটা বৃহৎ প্রাচীন সত্তা আছে সুচরিতা সেকথা কোনো দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই। এই সত্তা যে দূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যৎকে অধিকার পূর্ব্বক নিভৃতে থাকিয়া মানবের বিরাট্ ভাগ্যজালে একটা বিশেষ রঙের সূতা একটা বিশেষভাবে বুনিয়া চলিয়াছে; সেই সূতা যে কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র এবং কত সুদূর সার্থকতার সহিত তাহার কত নিগূঢ় সম্বন্ধ—সুচরিতা আজ তাহা গোরার প্রবল কণ্ঠের কথা শুনিয়া যেন হঠাৎ এক রকম করিয়া উপলব্ধি করিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন যে এত বড় একটা সত্তার দ্বারা বেষ্টিত অধিকৃত তাহা সচেতনভাবে অনুভব না করিলে আমরা যে কতই ছোট হইয়া এবং চারিদিক্ সম্বন্ধে কতই অন্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাই নিমেষের মধ্যেই তাহা যেন সুচরিতার কাছে প্রকাশ পাইল। সেই অকস্মাৎ চিত্তস্ফূর্ত্তির আবেগে সুচরিতা তাহার সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ বিনয়ের সহিত কহিল—"আমি দেশের কথা কখনো এমন করে বড় করে সত্য করে ভাবিনি। কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি—ধর্ম্মের সঙ্গে দেশের যোগ কি? ধর্ম্ম কি দেশের অতীত নয়?"

গোরার কাণে সুচরিতার মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন বড় মধুর লাগিল। সুচরিতার বড় বড় দুইটি চোখের মধ্যে এই প্রশ্নটি আরো মধুর করিয়া দেখা দিল। গোরা কহিল—"দেশের অতীত যা', দেশের চেয়ে যা' অনেক বড় তাই দেশের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর এম্নি করিয়া বিচিত্র ভাবে আপনার অনন্ত স্বরূপকেই ব্যক্ত করচেন। যাঁরা বলেন সত্য এক, অতএব কেবলি একটি ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মের একটিমাত্র রূপই সত্য—তাঁরা, সত্য যে এক, কেবল এই সত্যটিই মানেন, আর সত্য যে অন্তহীন সে সত্যটা মান্‌তে চান না। অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করেন—জগতে সেই লীলাই ত দেখ্‌চি। সেই জন্যেই ধর্ম্মমত বিচিত্র হয়ে সেই ধর্ম্মরাজকে নানা দিক্ দিয়ে উপলব্ধি করাচ্চে। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলচি ভারতবর্ষের খোলা জান্‌লা দিয়ে আপনি সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাবেন—সে জন্যে সমুদ্রপারে গিয়ে খৃষ্টান গির্জ্জার জান্‌লায় বসবার কোনো দরকার হবে না।"

সুচরিতা কহিল—"আপনি বল্‌তে চান ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সেই বিশেষত্বটি কি?"

গোরা কহিল—"কথাটা খুব মস্ত—ক্রমে ক্রমে আমি আপনাকে বলবার চেষ্টা করব। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে সেটা হচ্চে এই, ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়ে এবং ঐক্যের দিক্ দিয়ে দুই দিক্ থেকেই ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা করেচে। ঋগ্বেদের কাল থেকেই সেইটে চলে আস্‌চে। ঋগ্বেদে ঋষিরা অগ্নি বায়ু বরুণ ইন্দ্র নামে জগতের বিচিত্র প্রকাশকে যখন বিচিত্র দেবতা রূপে স্তব করচেন তখন সেই একই কালে এই বহুর মধ্যে এককেও তাঁদের চিত্ত উপলব্ধি করছিল। ঈশ্বরকে প্রকাশের দিকে বহুরূপে দেখেচেন এবং প্রকাশকে কারণের দিকে একরূপেই জেনেচেন। এই বহুত্ব এবং একত্ব নানা স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্রে প্রকাশলাভ করবার চেষ্টা করচে বলেই ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্র এত বৃহৎ।"

সুচরিতা কহিল—"তবে আপনি কি বলেন ভারতবর্ষে আমরা প্রচলিত ধর্ম্মের যে নানা আকার দেখ্‌তে পাই তা সমস্তই ভাল এবং সত্য?"

গোরা কহিল—"পৃথিবীতে এমন কোনো দেশই নেই যেখানে প্রচলিত ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই ভালো এবং সত্য। আপনি ত ইতিহাস পড়েচেন আপনি ত জানেন খৃষ্টধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত নিদারুণ উৎপীড়ন অত্যাচার হয়েছে এমন কোনো ধর্ম্মের নামে হয়েচে কিনা সন্দেহ। তাই বলে খৃষ্টধর্ম্মের আসল কথাটা অসত্য এবং অমঙ্গল তা আমি বলতে পারিনে। খৃষ্টধর্ম্মের সেই আসল কথাটা ক্রমশই তার বাধা তার মলিন আবরণ পরিত্যাগ করে শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মধ্যেও আবর্জ্জনার অভাব নেই কিন্তু আমরা যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গটির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে তাকে পোষণ করে তুলি তা হলে আগুনই এই আবর্জ্জনাকে পোড়াতে থাকে।"

সুচরিতা কহিল—"সেই আগুনটি কি আমি এখনো ভাল করে বুঝতে পারিনি।"

গোরা কহিল—"সেটা হচ্চে এই যে, ব্রহ্ম, যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু তাঁর বিশেষের শেষ নেই। জল তাঁর বিশেষ, স্থল তাঁর বিশেষ, বায়ু তাঁর বিশেষ, অগ্নি তাঁর বিশেষ, প্রাণ তাঁর বিশেষ, বুদ্ধি, প্রেম, সমস্তই তাঁর বিশেষ—গণনা করে কোথাও তার অন্ত পাওয়া যায় না—বিজ্ঞান তাই নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে মরচে। যিনি নিরাকার তাঁর আকারের অন্ত নেই—হ্রস্ব দীর্ঘ স্থূল সূক্ষ্মের অনন্ত প্রবাহই তাঁর।—যিনি অনন্ত বিশেষ তিনিই নির্ব্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ তিনিই অরূপ। অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেচে—ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন একথা ভারতবর্ষের কোনো ভক্ত কোনোদিন অস্বীকার করেন না।"

সুচরিতা কহিল—"জ্ঞানী করেন না কিন্তু অজ্ঞানী?"

গোরা কহিল "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি অজ্ঞানী সকল দেশেই সকল সত্যকেই বিকৃত করবে।"

সুচরিতা কহিল—"কিন্তু আমাদের দেশে সেই বিকার কি বেশী দূর পর্য্যন্ত পৌঁছয়নি?"

গোরা কহিল—"তা হতে পারে। কিন্তু তার কারণ, ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থূলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধ্যে নানা অদ্ভুত বিকার ঘটতে থাকে। কিন্তু যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থূলেও সত্য, সূক্ষ্মেও সত্য, ধ্যানেও সত্য, প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে দেহে মনে কর্ম্মে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য্য, বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেচে তাকে আমরা মূঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায় আস্তিকতায় মিশ্রিত একটা সঙ্কীর্ণ নীরস অঙ্গহীন ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্মবলে গ্রহণ করব এ হতেই পারে না। আমি যা বলচি তা আপনাদের আশৈশবের সংস্কার বশত ভাল করে বুঝ্‌তেই পার্ব্বেন না, মনে করবেন এলোকটার ইংরেজি শিখেও শিক্ষার কোনো ফল হয়নি; কিন্তু ভারতবর্ষের সত্য-প্রকৃতি ও সত্য-সাধনার প্রতি যদি আপনার কোনো দিন শ্রদ্ধা জন্মে, যদি ভারতবর্ষ নিজেকে সহস্র বাধা ও বিকৃতির ভিতর দিয়েও যে রকম করে প্রকাশ করচে সেই প্রকাশের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পাবেন তাহলে—তাহলে, কি আর বল্‌ব, আপনার ভারতবর্ষীয় স্বভাবকে শক্তিকে ফিরে পেয়ে আপনি মুক্তিলাভ করবেন।"

সুচরিতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গোরা কহিল—"আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষতঃ যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে, এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখ্‌তে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই আমি আমার এই ভারতবর্ষের জন্যে প্রাণ দেব বলে ঠিক করেছি। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউবা বোঝে কেউবা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক—তারা আমার সকলেই আপন—তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করচে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।"

গোরার প্রবলকণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে টেবিলে, সমস্ত আস্‌বাব পত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল।

এ সমস্ত কথা সুচরিতার পক্ষে খুব স্পষ্ট বুঝিবার কথা নহে—কিন্তু অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট সঞ্চারেরও বেগ অত্যন্ত প্রবল। জীবনটা যে নিতান্তই চারটে দেয়ালের মধ্যে বা একটা দলের মধ্যে বদ্ধ নহে এই উপলব্ধিটা সুচরিতাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে মেয়েদের উচ্চহাস্যমিশ্রিত দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। পরেশ বাবু, বরদাসুন্দরী ও মেয়েদের লইয়া ফিরিয়াছেন। সুধীর সিঁড়ি দিয়া উঠিবার

দময় মেয়েদের উপর কি একটা উৎপাত করিতেছে, তাহাই লইয়া এই হাস্যধ্বনির সৃষ্টি।

লাবণ্য, ললিতা ও সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই গোরাকে দেখিয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সতীশ বিনয়ের চৌকির পাশে দাঁড়াইয়া কানে কানে তাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ সুরু করিয়া দিল। ললিতা সুচরিতার পশ্চাতে চৌকি টানিয়া তাহার আড়ালে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া বসিল।

পরেশ আসিয়া কহিলেন—"আমার ফিরতে বড় দেরি হয়ে গেল। পানু বাবু বুঝি চলে গেছেন?"

সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর দিল না—বিনয় কহিল—"হাঁ, তিনি থাকতে পারলেন না।"

গোরা উঠিয়া কহিল—"আজ আমরাও আসি" বলিয়া পরেশ বাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল।

পরেশ বাবু কহিল—"আজ আর তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় পেলুম না। বাবা, যখন তোমার অবকাশ হবে মাঝে মাঝে এস।"

গোরা ও বিনয় ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি কহিলেন "আপনারা এখনি যাচ্চেন না কি?"

গোরা কহিল "হাঁ।"

বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন—"কিন্তু বিনয় বাবু আপনি যেতে পারচেন না—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।"

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিল এবং কহিল—"হাঁ, মা, বিনয় বাবুকে যেতে দিয়ো না, উনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবেন।"

বিনয় কিছু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিতে পারিতেছিল না দেখিয়া বরদাসুন্দরী গোরাকে কহিলেন—"বিনয় বাবুকে কি আপনি নিয়ে যেতে চান? ওঁকে আপনার দরকার আছে?"

গোরা কহিল "কিছু না। বিনয় তুমি থাক না—আমি আসচি।" বলিয়া গোরা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিনয়ের থাকা সম্বন্ধে বরদাসুন্দরী যখনি গোরার সম্মতি লইলেন সেই মুহূর্ত্তেই বিনয় ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ললিতার এই ছোট খাট হাসি বিদ্রূপের সঙ্গে বিনয় ঝগড়া করিতেও পারে না—অথচ ইহা তাহাকে কাঁটার মত বেঁধে। বিনয় ঘরে আসিয়া বসিতেই ললিতা কহিল—"বিনয় বাবু, আজ আপনি পালালেই ভাল করতেন।"

বিনয় কহিল—"কেন?"

ললিতা। মা আপনাকে বিপদে ফেলবার মৎলব করচেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মেলায় যে অভিনয় হবে তাতে একজন লোক কম পড়চে—মা আপনাকে ঠিক করেচেন।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কি সর্ব্বনাশ! একাজ আমার দ্বারা হবে না।"

ললিতা হাসিয়া কহিল—"সে আমি মাকে আগেই বলেচি। এ অভিনয়ে আপনার বন্ধু কখনই আপনাকে যোগ দিতে দেবেন না।"

বিনয় খোঁচা খাইয়া কহিল—"বন্ধুর কথা রেখে দিন্। আমি সাত জন্মে কখনো অভিনয় করিনি—আমাকে কেন?"

ললিতা কহিল—"আমরাই বুঝি জন্মজন্মান্তর অভিনয় করে আস্‌চি?"

এই সময় বরদাসুন্দরী ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ললিতা কহিল—"মা, তুমি অভিনয়ে বিনয় বাবুকে মিথ্যা ডাকচ। আগে ওঁর বন্ধুকে যদি রাজি করাতে পার তাহলে—"

বিনয় কাতর হইয়া কহিল—"বন্ধুর রাজি হওয়া নিয়ে কথাই হচ্চে না। অভিনয় ত করলেই হয় না—আমার যে ক্ষমতাই নেই।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"সে জন্যে ভাববেন না—আমরা আপনাকে শিখিয়ে ঠিক করে নিতে পারব। ছোট ছোট মেয়েরা পারবে আর আপনি পারবেন না?"

বিনয়ের উদ্ধারের কোনো উপায় রহিল না।

ক্রমশঃ।

ভূগোল শিক্ষা।

ভারতবর্ষে অধুনা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চ্চার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা সুলক্ষণ বটে। কিন্তু সম্যকরূপে ইতিহাসচর্চ্চা করিতে হইলে ভূগোল পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যক। যদিচ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস জাতির বা লোক-সমষ্টির, তথাপি জাতির বা লোকসমষ্টির সহিত তাহাদের বাসস্থান বা দেশের এত নিকট সম্বন্ধ যে চলিত কথায় অমুক জাতির ইতিহাস না বলিয়া অমুক দেশের (যথা ভারত-বর্ষের বা জাপানের) ইতিহাস বলিয়া থাকি। ফলতঃ জাতির নাম দেশের নাম হইতে সাধারণতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই নিকট সম্বন্ধ চলিত কথায় স্বীকৃত হইলেও কার্য্যতঃ শিক্ষাকালে আমরা তত লক্ষ্য রাখি না। ইতিহাস চর্চ্চার সময় দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে ইতিহাস চর্চ্চার প্রকৃষ্ট ফল বা শিক্ষা লাভ হয় না। প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা মানুষের দৈনিক কার্য্যকলাপ অনেকটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থার তারতম্যে দৈনিক কার্য্যকলাপের তারতম্য এবং সেই সঙ্গে মানসিক ধর্ম্মেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও রুষিয়ার প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত জানিলে তদ্দেশীয়দিগের নৌবল এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রভেদ থাকার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের যথার্থ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

কেবল ইতিহাস চর্চ্চার জন্য নহে, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা প্রভৃতি নানারূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চার পক্ষেও ভূবৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ প্রয়োজনীয় বিদ্যা, বাঙ্গালায় এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য স্থানের বিদ্যালয় সমূহে, যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অতিশয় নীরস ও নিষ্ফল। পাঠ্যপুস্তক হইতে দেশ, নদী, পাহাড়, অধিত্যকা, উপত্যকা, প্রভৃতি নানা পদার্থের নাম কণ্ঠস্থ করান হয়। সেই সকল পদার্থের জ্ঞান জন্মাইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে জ্ঞান লাভ করা দূরে থাকুক ইহার উপর এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মায় যে ভবিষ্যতে জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্তও উন্মূলিত হয়। ভূগোল পাঠ শিক্ষা-প্রণালীর গুণে যে করা যাইতে পারে তাহা প্রমাণের চেষ্টা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে জর্ম্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়ে কিরূপ ভাবে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে।

জর্ম্মানি দেশের পাঠশালায় ভূগোল শিক্ষার জন্য মানচিত্র ব্যতিরেকে অপর কোনও পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় না। তদ্দেশের রাজধানী বার্লিন মহানগরীর পাঠশালায় প্রচলিত প্রথম শিক্ষার্থীর মানচিত্রের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে যে কিরূপ পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষা বিধান হয়।

মানচিত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃশ্য এবং নকসা (views এবং map-plans) লইয়া ছয় খানি চিত্র আছে। প্রথম চিত্র পাঠগৃহের (class room) দৃশ্য বা perspective view। ইহার পার্শ্বেই দ্বিতীয় চিত্রে ঐ গৃহের নকসা বা map-plan (মান বা scale ১: ১০০)। তৃতীয় এবং চতুর্থ চিত্রে সমুদায় বিদ্যামন্দিরের দৃশ্য এবং নকসা (মান ১: ৩০০)। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্রে বিদ্যামন্দির এবং তন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গৃহ প্রভৃতি লইয়া বার্লিন সহরের একাংশের দৃশ্য এবং নকসা (মান ১: ১৫০০)।

২য় পৃষ্ঠায় তদপেক্ষা বৃহৎ স্থানের দৃশ্য এবং নকসা আছে। ইহাতে বিদ্যামন্দিরটীও দৃষ্ট হয়। ৩য় পৃষ্ঠায় বৃহত্তর স্থানের দৃশ্য এবং নকসা। ৪র্থ পৃষ্ঠায় সমুদায় বার্লিন সহরের নকসা (মান ১: ৩৬০০০)। ৫ম পৃষ্ঠায় বার্লিন নগরী ও নিকটবর্ত্তী চারিদিকের কতকগুলি স্থানের নকসা (scale ১: ১০০০০০)। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় সমস্ত বার্লিন জেলার মানচিত্র বা নকসা (মান ১: ১০০০০০০)।

৭ম পৃষ্ঠায় সমুদায় প্রদেশের প্রাকৃতিক ভূ-চিত্র। এই চিত্রে বার্লিন সহরে যতগুলি রেলের রাস্তা গিয়াছে তৎসমুদায় অঙ্কিত আছে। (মান ১: ১,২৫০,০০০)। ৮ম পৃষ্ঠায় ঐ প্রদেশের শাসনবিভাগসমূহ প্রদর্শিত আছে।

৯ম পৃষ্ঠায় জর্ম্মানি দেশের প্রাকৃতিক চিত্র। ১০ম পৃষ্ঠায় ঐ দেশের শাসনবিভাগের চিত্র।

১১শ পৃষ্ঠা—য়ুরোপ মহাদেশের প্রাকৃতিক চিত্র (physical map)। ১২শ পৃষ্ঠা য়ুরোপ মহাদেশের রাজ্য বিভাগ।

১৩শ পৃষ্ঠা—আসিয়া মহাদেশের চিত্র (মান ১:

১৪শ পৃষ্ঠা—আফ্রিকার মানচিত্র।

১৫শ „ —উত্তর আমেরিকার মানচিত্র।

১৬শ „ —দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র।

১৭শ „ —অষ্ট্রেলিয়া, ওশ্যানিয়া ও ভিক্টোরিয়া-ল্যাণ্ডের আংশিক চিত্র। ইহাতে Coral reef বা প্রবাল শৈলমালার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত আছে।

১৮শ পৃষ্ঠা—প্যালেষ্টাইনের মানচিত্র। ইহার সাহায্যে খৃষ্টীয় ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯শ পৃষ্ঠা—পূর্ব্ব ভূগোলার্দ্ধ।

২০শ „ —পশ্চিম ভূগোলার্দ্ধ।

২১শ „ —প্রধান নক্ষত্র মণ্ডলী সম্বলিত উত্তর দিকের আকাশের চিত্র।

২২শ পৃষ্ঠা—সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, পৃথিবীর বার্ষিক গতি, সৌর জগৎ, চন্দ্রের কলা প্রভৃতি চিত্রের দ্বারা প্রদর্শিত আছে।

এইরূপ মানচিত্রে অনেক শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ১ম—প্রাকৃতিক দৃশ্যমান পদার্থ চিত্রে প্রতিফলিত করিবার প্রণালী এবং ভূগোল ও মানচিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ শিশুদিগের শীঘ্র ও সম্যক প্রকারে বোধগম্য হয়। ২য়—সাধারণ মানচিত্রে সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, রাজধানী, নগর প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদার্থের বিষয় একত্র থাকাতে শিশুদিগের শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোনিবেশের বাধা হয়; এবং যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও পরিস্ফুট ভাবে আয়ত্ত করা আরও দুরূহ হইয়া পড়ে। ৩য়—আমাদের পাঠশালায় ভূগোল শিক্ষার আরম্ভে অপরিচিত পদার্থের সংজ্ঞা, তৎপরে অপরিচিত স্থান, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ করান হয়। ভাগ্যক্রমে যদি কোন বালক কোন রাজধানীতে বা প্রধান নগরে বা বৃহৎ নদীর তীরে বাস করে তবে তাহাদের নাম পুস্তকে দেখিতে পায়। নূতন প্রণালীতে ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদিগকে পরিচিত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত পদার্থের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় ধূমাকৃত না হইয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ৪র্থ—নূতন প্রণালীর আর এক বিশেষত্বের উল্লেখ না করিলে ইহার গুণ ভাল বুঝিতে পারা যাইবে না। মুদ্রিত মানচিত্রের উপর (পাঠ্য পুস্তকের মত) সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয় না, কেবল ইহার সাহায্য লওয়া হয়। শিক্ষার প্রধান অঙ্গ কাল কাষ্ঠফলক (Black board)। বিদ্যামন্দির, নিকটবর্ত্তী ঘর, বাড়ী, রাস্তা, বাগান, ঝিল, প্রভৃতি আঁকিয়া লওয়া হয়। বিদ্যালয় গৃহ এবং বাগান আঁকিবার কালে শিশুরা ফিতা ধরিয়া মাপ জোপ করিয়া Scale বা মান তৈয়ার করিয়া লয়। এই উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয় বালকের মনে গভীর এবং স্থায়ী ভাবে খোদিত হইয়া যায়, এবং মানচিত্র অঙ্কনের শিক্ষার ভিত্তিও স্থাপিত হয়। নিম্নে কয়েকটি পাঠের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া গেল।

প্রথমে শিক্ষক মহাশয় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই চারিদিকের বিষয় বালকদিগকে বলিয়া দিবেন। তৎপরে একটি বালককে কাষ্ঠফলকের (কাষ্ঠফলক খানি পাঠগৃহের উত্তর দিকে বা দক্ষিণাভিমুখে থাকা উচিত) মধ্যস্থলে (বা শিক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশ্যানুসারে অন্য কোন স্থলে) বিদ্যালয় গৃহ সন্নিবেশিত করিতে বলিবেন। শিক্ষক মহাশয় ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রশ্ন করিবেন। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে কি আছে? বাঃ—প্যারীচরণ সরকারের ষ্ট্রীট। (যেমন যেমন উত্তর পাওয়া যাইবে তেমনি কাষ্ঠফলকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে)। শি—তাহার দক্ষিণে কি? বাঃ—য়ুনিভার্সিটি হল। শিঃ—কলেজ ষ্ট্রীট বিদ্যালয়ের কোন দিকে? বাঃ—পূর্ব্ব দিকে। শিঃ—গোলদিঘি হেয়ার স্কুল ও য়ুনিভার্সিটি হলের কোন দিকে? গোলদিঘির দক্ষিণের রাস্তা যথা স্থানে সন্নিবেশিত কর। বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে কি? সিয়ালদহ ষ্টেশন বিদ্যালয়ের কোন দিকে? সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বিদ্যালয়ের উত্তর দিক পর্য্যন্ত হ্যারিসন্ রোড্ সন্নিবেশিত কর। এইরূপে বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকের প্রধান প্রধান রাস্তা, বাড়ী, দিঘি, প্রভৃতির সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিবেন এবং প্রশ্নের উত্তর কাষ্ঠফলকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে বলিবেন। একজন বালক কাষ্ঠফলকের উপর এবং অপর সকলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রস্তরফলকের (শ্লেটের) উপর ঐ রূপ আঁকিবে।

এইরূপ নকসা হইয়া গেলে শিক্ষক মহাশয় সহজ সহজ "ঐতিহাসিক" প্রশ্ন করিবেন। যথা—(১) হেয়ার স্কুল

কাহার? (২) হেয়ার স্কুল নাম করণ হইল কেন? (৩) হিন্দু স্কুল কাহাদের দ্বারা স্থাপিত? (৪) কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি কত দিন পূর্ব্বে স্থাপিত? (৫) য়ুনিভার্সিটি হল কাহার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত উন্নত ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। হুগলী নগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গা নদী কাষ্ঠ ফলকের উপর সন্নিবেশিত কর। কলিকাতা ও পর পারে হাবড়া শিবপুর যথা স্থানে দেখাও। বালী, বারাকপুর, ইচ্ছাপুর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, হুগলী, ভাটপাড়া, মুলাজোড় প্রভৃতি সন্নিবেশিত কর। মহারাট্টা খাল ও আদিগঙ্গা যথা স্থানে আঁক।

এইরূপে শিক্ষক মহাশয় ভূগোলের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। উপরি উক্ত পাঠগুলি কলিকাতাস্থিত বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই প্রণালীতে যে কোন স্থানের বালককে নিজ গ্রাম বা সহরের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক, প্রভৃতি ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত বিষয়ের প্রতিরূপ বালী অথবা কাগজের মণ্ড (কাগজ কুটিয়া তাহাতে সামান্য জল দিয়া মণ্ড তৈয়ার করা যাইতে পাবে) দিয়া গড়িয়া বালকদিগকে দেখান যাইতে পারে। এইরূপ ভাবের শিক্ষা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ না করাইয়া নানা বিষয় ও তাহাদের নাম বালকদিগকে সহজে ও পরিস্ফুট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করান যায়। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিতেছি। ঘরের মেজে কিম্বা অপর কোন সমতল স্থানে চতুষ্কোণ করিয়া কাগজের মণ্ডে আল দেওয়া হউক। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিয়া ঐ আলের মধ্যে মণ্ডের ভারতবর্ষ গড়ুক। তাহার পরে প্রধান প্রধান পর্ব্বতের স্থানে উচ্চ করিয়া পর্ব্বতের মত করা হউক। অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া প্রধান প্রধান নদী উৎপত্তি হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত দেখান হউক। এইরূপ হ্রদ দ্বীপ প্রভৃতির প্রতিরূপ করা যাইতে পারে। ঐ গঠন একদিন শুকাইয়া পরদিন নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে একটু একটু জল ঢালিয়া নদীর স্রোত দেখান যাইতে পারে। সমুদ্র ও হ্রদের স্থানে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দেওয়া হউক। এই সমস্ত গড়ন বালকেরা নিজে নিজে যতটা পারে মানচিত্র দেখিয়া করিবে, শিক্ষক মহাশয় আবশ্যক মত সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক বালক স্বতন্ত্র ভাবে, অথবা এক শ্রেণীতে অনেক বালক থাকিলে দুই তিন জন মিলিয়া এক এক দল, এইরূপ গড়িতে চেষ্টা করিলে প্রত্যেক বালক বা প্রত্যেক দল নিজ নিজ গঠন অপরাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

ভূগোল শিক্ষায় কি উপায়ে বিদ্যার্থীদিগকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা য়ুরোপীয় কোন বিদ্যালয়ের একটি পাঠের (ক্লেম সাহেব কৃত) বিবরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। যাহাদিগকে পাঠ দেওয়া হইতেছিল তাহাদিগের বয়স ১৩, ১৪ বৎসর মাত্র। শিক্ষক মহাশয় একটি বড় গোলক আনিলেন, এবং প্রথমেই বলিলেন যে তাপ বিষুবরেখা (heat Equator) প্রাকৃত বিষুবরেখা (mathematical equator) হইতে ভিন্ন, ইহা একটি বক্র রেখা, প্রাকৃত বিষুবরেখার সাধারণতঃ দশ অংশ উত্তরে স্থিত। শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকে সূর্য্যরশ্মি কি এক পরিমাণে পতিত হয় না? বৃহৎ গোলকের সাহায্যে বালকেরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে উত্তর গোলার্দ্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্দ্ধ অধিক পরিমাণে জল দ্বারা আবৃত, অতএব অধিক পরিমাণে জল ধূমে পরিণত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানে তাহারা শিখিয়াছিল যে ধূমে পরিণত হইবার কালে তাপের শোষণ (absorption of heat) হইয়া থাকে। এবং ভূমি যে তাপ গ্রহণ করে তাহা বিকিরণ (radiation) করার দরুণ তন্নিকটবর্ত্তী বায়ুকে অধিক উত্তপ্ত রাখে। এখন প্রমাণ স্থল অন্বেষণ করিতে করিতে বালকগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে গোবী এবং সাহারা (Gobi and Sahara) মরুভূমি বৃহৎ ভূমিখণ্ডের উপর সূর্য্যরশ্মিপাতের পরিণাম। য়ুরোপের সমুদ্রতীর বক্র থাকাতে ঐ খণ্ডে নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর প্রভাব ও মরুভূমির অভাবের কারণ প্রতিপন্ন হইল। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের জলবায়ুর বিষয় বাদানুবাদ করিয়া স্থির হইল যে (ক) বৃহৎ ভূমিখণ্ডের উপর শীত ও তাপ উভয়ই অধিক প্রবল হয়— যথা, উত্তর আমেরিকায় মধ্যস্থল, আসিয়ার মধ্য, অষ্ট্রেলিয়ার

মধ্য, এমন কি য়ুরোপের রুষিয়া পর্য্যন্ত। (খ) জলের অধিক প্রাদুর্ভাবে গ্রীষ্ম ও শীত উভয়ই মৃদু হয়—যথা পশ্চিম য়ুরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আসিয়ার দ্বীপপুঞ্জ ও উপদ্বীপ সমূহ। জানা আছে যে সাধারণতঃ অক্ষাংশ (latitude) অনুসারে শীত তাপের প্রভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতা এবং অবস্থান অনুসারেও শীতোষ্ণতার কতক পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক অক্ষে স্থিত অধিত্যকা নিম্ন সমতল ভূমি অপেক্ষা অধিক শীতল হয়। ইকোয়েডর অঞ্চলে কুইটো এবং ব্রাজিলে পারা উভয় স্থলই যদিচ বিষুবরেখার নিকট অবস্থিত, কিন্তু একটি সমুদ্রতলের ১০,০০০ ফুট উচ্চে এবং অপরটি প্রায় সমুদ্রতলের সমান থাকায় উষ্ণতা ও শীত সম্বন্ধে বিশেষ ভিন্ন। বায়ু ও মেঘের স্রোত বাধা পায় বলিয়া উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতমালা নিকটস্থ দেশের জলবায়ুর তারতম্য সাধন করিয়া থাকে। আণ্ডিজের উর্ব্বর পূর্ব্বধার ও বৃষ্টিহীন পশ্চিম ধার এবং রকিজের দুইধারের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ করা হইল। কিন্তু কেবল শীতোষ্ণতার মৃদুতা কোন দেশকে মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত করে না। ইহাকে উর্ব্বরা করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক; নচেৎ অষ্ট্রেলিয়া জীবে পরিপূর্ণ হইত কিন্তু এখানে মানুষের বাস অতি অল্প। জলসরবরাহ অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন পশ্চিম এবং মধ্য য়ুরোপ, যুক্তরাজ্য সমূহ;—এই সকল প্রদেশে জল আগমন ও নির্গমনের উত্তম পথ আছে। যুক্ত সাম্রাজ্যের মিসিসিপি উপত্যকাতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলসরবরাহ হইয়া থাকে বলিয়া ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। উত্তম জলসরবরাহই ফ্রান্স, জর্ম্মানি, ইটালী, তুর্কিস্থান এবং স্পেনের উর্ব্বরতার কারণ। মাটিও উত্তম না হইলে উপযুক্ত জলবায়ু এবং উচ্চতা জীবন ধারণের পক্ষে যে যথেষ্ট নহে, শেষোক্ত প্রদেশই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। স্পেনের অরণ্য সমূহ নির্ম্মূল করাতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ সকল অনাবৃত হইয়াছে এবং অনাবৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে উর্ব্বরা মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়াছে। সেই জন্য নদী সকল গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায় এবং বসন্তকালে তুষার গলিয়া নদীর গর্ভ পূর্ণ করে ও জলপ্লাবনে জীব ও দেশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। অতএব উপযুক্ত ভূমি জীবরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। এক্ষণে বুঝা গেল যে জলবায়ু দেশের অক্ষ, আকৃতি এবং উচ্চতা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উপযুক্ত জলবায়ু, জলসরবরাহ ও উত্তম ভূমি অধিক শস্য উৎপাদনের কারণ। শস্য জীব জগতের একান্ত আবশ্যকীয় বটে; কিন্তু যেমন জীবপালন শস্যের উপর নির্ভর করে, সেই রূপ আবার উদ্ভিদ্ জীব পদার্থ (animal matter) হইতে নিজ পোষণের সামগ্রী আহরণ করে। এই খানে পুনরায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম। দৃষ্টান্ত একদিকে যুক্তরাজ্য এবং অপর দিকে কানাডা ও মেক্সিকো।

ক্রেম সাহেব বলেন এই পাঠের সময় ছাত্রগণ একাগ্রচিত্ত ছিল, এবং জিজ্ঞাসিত হইলে প্রমাণস্থল উদ্ধৃত করিতেছিল। এই পাঠটি পূর্ব্বপাঠের পুনরালোচনা (review lesson)। পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে আগামী পাঠের দিনে "অদ্য যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইল তাহার প্রমাণ" লিখিয়া আনিতে বলা হইল। ছাত্রগণ নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না জিজ্ঞাসিত হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন "আমার বিশ্বাস যে তাহারা পারিবে। যতক্ষণ না প্রমাণ পায় ততক্ষণ তাহাদের পিতা, মাতা, পিতৃব্য প্রভৃতিকে প্রমাণের জন্য ত্যক্ত করে; পুস্তকাগার এবং অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করে। অদ্যকার মত উপায়ে লব্ধ সত্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং প্রবল করে। এবং এই সকল প্রমাণ পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন হয়। কারণ স্বকীয় চিন্তা প্রস্তরের উপর ইস্পাত দ্বারা খোদিত করার ন্যায় হয়, এবং পরকীয় বা ঋণকৃত চিন্তা (যাহা মুদ্রিত পুস্তক হইতে পাওয়া যায়) শুষ্ক বালির উপর দাগের ন্যায় কেবল বৃষ্টিপতন বা পদসঞ্চালন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।"

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম-সাধন বা চরিত্রের উন্নতি-সম্পাদন।

ধর্ম্মশব্দের বিবিধ অর্থ।

ধর্ম্ম শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। কয়েকটী অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২শ সূক্তের ঋষি মেধাতিথি বলিতেছেন:—

ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বিষ্ণু রক্ষক, কেহ তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম-সমূহ ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

এস্থলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ঋষি ধর্ম্মশব্দ দ্বারা বিশ্বের সনাতন নিয়মসমূহ (the eternal laws of the universe) ব্যক্ত করিতেছেন।

(২) জৈমিনি বলেন, চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। অর্থাৎ আচার্য্যপ্রেরিত হইয়া যাগাদির অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্ম বলিতে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বুঝাইতেছে।

(৩) মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রারম্ভে ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই—

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

এই সূত্র দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(ক) যাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভের হেতু, তাহাই ধর্ম্ম। অথবা (খ) যাহা সুখ ও মোক্ষের সাধন, তাহাই ধর্ম্ম। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যায় সুখ শব্দ লৌকিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দের অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয় ব্যাখ্যা হইতেই দেখা যাইতেছে, এখানে ধর্ম্ম বলিতে এমন কিছু বুঝাইতেছে যাহা কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র।

(৪) গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। [সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহানি সহ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ]। এখানে 'ধর্ম্ম' শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অহিংসাদি, ইত্যাদি।

(৫) বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহেও ধর্ম্মশব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, ধর্ম্মপদের প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধদেব বলিতেছেন।

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া।

(ধর্ম্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন, মনই শ্রেষ্ঠ, তাহারা মনোময়)। কিন্তু বৌদ্ধ লেখকগণ ধর্ম্মশব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ল্যাটিন অনুবাদে Fausboll ধর্ম্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন, nature, স্বভাব বা প্রকৃতি Max Mullerএর মতে উহার অর্থ "আমরা যাহা" (All that we are). Rhys Davids (Buddhist India p. 292) বলেন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে যাহা করণীয়, তাহাই ধর্ম্ম (What it behoves a man of right feeling to do;—or on the other hand, what a man of sense will naturally hold)। পালিভাষাবিৎ কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ধর্ম্ম বলিতে বিধি বা নিয়ম (Laws) বুঝায়।

(৬) ধর্ম্ম শব্দের কতকগুলি লৌকিক ব্যবহার আছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। যথা, কর্ত্তব্য (পুত্রধর্ম্ম), গুণ (জলধর্ম্ম), মনোবৃত্তি (দয়াধর্ম্ম), আচার (বিধর্ম্মী= অনাচারী বা শাস্ত্রবিহিত আচার বর্জ্জিত) ইত্যাদি।

(৭) মনু ধর্ম্মের দশ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥ ৬। ৯২।

সন্তোষ, ক্ষমা, মনঃসংযম (অথবা মনের অবিক্রিয়তা), অচৌর্য্য, শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ বা স্বরূপ।*

অর্থাৎ মনুর মতে ধার্ম্মিক কে?—যাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা সন্তোষ বিরাজমান; অপরে অপকার করিলেও যিনি প্রত্যপকার করেন না; বিকারহেতু বিষয় নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও যাঁহার মনোবিকার উপস্থিত হয় না; যিনি অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করেন না; যাঁহার দেহ শুদ্ধ; যিনি ইচ্ছামাত্র বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহার করিতে পারেন; যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যবাদী ও

---

* সন্তোষো ধৃতিঃ। পরেণাপকারেকৃতে তস্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা। বিকারহেতুবিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসো দমঃ। মনসো দমনং দম ইতি সনন্দবচনাৎ। শীতাতপাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ইতি গোবিন্দ রাজঃ। (দমঃ অনৌদ্ধত্যম্ বিদ্যামদাদিত্যাগঃ—মেধাতিথিঃ)। অন্যায়েন পরধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং তদ্ভিন্নমস্তেয়ম্। যথাশাস্ত্রং মৃজ্জলাভ্যাং দেহ-শোধনং শৌচম্ (আহারাদিশুদ্ধিঃ—মেধাতিথিঃ)। বিষয়েভ্যশ্চক্ষুরাদি বারণমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (অপ্রতিষিদ্ধেষ্বপি বিষয়েষপ্রসঙ্গঃ—মেধাতিথিঃ) শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞান ধীঃ আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। (কর্ম্মাধ্যাত্মজ্ঞানভেদেন ধীবিদ্যয়োর্ভেদঃ—মেধাতিথিঃ)। যথার্থাভিধানং সত্যম্। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিরক্রোধঃ। এতদ্দশবিধং ধর্ম্মস্বরূপম্।—কুল্লূকঃ।

ক্রোধশূন্য—তিনিই ধার্ম্মিক। পক্ষান্তরে এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা "চরিত্রবান" বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকি। সুতরাং মনুক্ত ধর্ম্ম সাধন, এবং চরিত্রের উন্নতি সম্পাদনে প্রযত্ন একই কথা। অথবা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সমগ্রীভূত চরিত্র-লাভের প্রয়াসী তাঁহাকে মনু প্রদর্শিত গুণ সকলের অধিকারী হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। উপরে উল্লিখিত দশটী গুণের দুই একটী পরিত্যক্ত বা তাহাদের সহিত নূতন দুই একটী সংযোজিত হইতে পাবে, কিন্তু মোটামুটী বলিতে গেলে, মনুবর্ণিত ধর্ম্মের সাধন, এবং চরিত্রের উন্নতির জন্য অধ্যবসায়, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। অতএব দেখা যাক, চরিত্রের ভিত্তি কি।

চরিত্রের ভিত্তি—(ক) দৈহিক সংগঠন (Physical organization)

দেহ ও আত্মা লইয়া মানব। প্রাণহীন দেহ বা বিদেহী আত্মাকে আমরা মানুষ বলি না। আত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ বা প্রকাশ। কিন্তু তাঁহাকে দেহের সাহায্যে ধরাতে যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হয়। এজন্য তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে পদে পদে দেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মূল কথা এই। এখন, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডে অবশ্য এক নহে। আমরা প্রথমে পাশ্চাত্য মত আলোচনা করিয়া পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, এদেশীয় মতের সহিত তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই।

দৈহিক অবস্থার উপর নানা প্রকার সদ্গুণ নির্ভর করে। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী, রক্ত, স্নায়ু, মাংসপেশী প্রভৃতির ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন চরিত্র ব্যক্ত হয়। সুস্থ, স্বাভাবিক দেহধারী ব্যক্তির চরিত্র, অসুস্থ অস্বাভাবিক (abnormal) দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে পৃথক্ হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু সচরাচর যাঁহারা সুস্থ বা স্বস্থ বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের একের চরিত্র দৈহিকসংগঠনানুসারে অপরের চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র, ইহা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। এজন্য এ বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

যিনি সুস্থ—অর্থাৎ যাঁহার শোণিত বিশুদ্ধ, পরিপাক শক্তি প্রখর, মস্তিষ্ক শীতল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া অব্যাহত, তিনি স্বভাবতঃই প্রফুল্ল, উৎসাহী, আশাশীল, অনলস, পরোপকারী, এবং ক্রোধশূন্য। পক্ষান্তরে, যাঁহার পাকস্থলী দুর্ব্বল, যকৃতের ক্রিয়া নিস্তেজ, তাহার শোণিত দূষিত, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, সুতরাং, তিনি সুনিদ্রায় বঞ্চিত, এবং এজন্য রুক্ষ স্বভাব। এরূপ ব্যক্তি হয়ত অন্তর্নিহিত রোগযন্ত্রণায় নিয়ত ক্লেশ পাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার স্বভাবতঃই শরীর সঞ্চালনে অরুচি জন্মিয়াছে। হয়ত এইরূপে ক্রমে তিনি অপরের অপেক্ষা নিজের কথা ভাবিতেই অধিক অভ্যস্ত হইয়াছেন। অথচ আমরা ইহার কিছুই না জানিয়া বা জানিয়াও ভুলিয়া যাইয়া এরূপ ব্যক্তিকে অলস, অমুৎসাহী, স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকি। চরিত্রের উপর দেহের প্রভাব এত অধিক যে দুই সহোদর একই মাতৃস্তন্যে লালিত পালিত হইয়াও ক্রমে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির হইয়া দাঁড়ায়। আমরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু উভয়ের দেহ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলে এই বিস্ময় অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইতে পারে।

কতকগুলি গুণ বা দোষ বাল্যকাল হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে দৈহিক সংগঠন তাহার অন্যতম কারণ। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ইং ১৮৮৬ সনে বার্লিনে মেরী শ্নাইডার (Mari Schneider) নাম্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী ছাত্রীর বিচার হয়। তাহার আকৃতিতে অস্বাভাবিক কিছুই দেখা যায় নাই এবং সে দেখিতে সুশ্রী না হইলেও কুৎসিৎ ছিলনা। তাহাকে বিচারক যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করেন, সে ধীর, প্রশান্ত, অবিচলিত ভাবে সে সমস্তের উত্তর দেয়। তাহার কাহিনী এই—"আমার নাম মেরি শ্নাইডার। ১৮৭৪ সনের ১লা মে বার্লিনে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার কথা আমার কিছুই মনে নাই, অনেক দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার একটী ছোট ভাই আছে। গত বৎসর আমার ছোট বোনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম না, কারণ মা তাহাকে আমার চেয়ে বেশী আদর করিতেন। তিনি আমাকে দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনেক বার চাবুক মারিয়াছেন—আমি তাহা চুরী করিয়া ও তাঁহাকে

প্রহার করিয়া কিছুই অন্যায় করি নাই। আমি ছয় বৎসর বয়স হইতে বিদ্যালয়ে পড়িতেছি। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে দুই বৎসর আছি। আমি লিখন, পঠন, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এবং ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছি। আমি দশাজ্ঞা জানি, ষষ্ঠ আজ্ঞাও জানি—'কাহাকেও হত্যা করিও না'। আমার ক্রীড়া-সঙ্গী আছে। আমি যে গৃহে বাস করি সেই গৃহেই বিংশতি বর্ষীয়া একটী যুবতী আছে [—তাহার চরিত্র সন্দেহজনক] আমি তাহার নিকটে অনেক সময়ে যাই। আমি কিছু দিন হইল ক্রীড়াচ্ছলে একজন বালকের চক্ষু এমন জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিলাম যে সে যাতনায় চীৎকার করিয়াছিল এবং তাহার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে সে যাতনা পাইতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না জোর করিয়া আমার হাত টানিয়া লওয়া হইয়াছিল ততক্ষণ আমি ছাড়ি নাই। আমি যে ইহাতে বেশী আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা নহে- কিন্তু দুঃখিতও হই নাই। আমি বাল্যকালে খরগোসের চোখে কাঁটা ফুটাইতাম ও তাহাদের পেট চিরিয়া দিতাম—মা এইরূপ বলেন, আমার তাহা মনে নাই। কনবাড নামক একজন তাহার স্ত্রী ও সন্তান দিগকে খুন করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি। আমি মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ভালবাসি, সেজন্য অনেক বার মিথ্যাকথা বলিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছি। যে কাহাকেও হত্যা করে সে খুনী—আমি খুনী (murderess)। প্রাণ দণ্ড তাহার শাস্তি। আমার প্রাণদণ্ড হইবে না, কারণ আমার বয়স অল্প। ৭ই জুলাই মা আমাকে কোনও কাজে পাঠান। পথে মার্গারেট ডিএট্রিকের (Margarete Dietrich) সহিত দেখা হয়—তাহার বয়স সাড়ে তিন বৎসর। মার্চ্চ মাস হইতে আমি তাহাকে চিনিতাম। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে চল। আমি তাহার ইয়ারিং লইবার মানস করিয়াছিলাম—বিক্রয় করিয়া পিষ্টক খাইবার জন্য আমি তাহাকে সিড়ির উপর বসাইয়া রাখিয়া মার নিকট হইতে পয়সা ও চাবী লইয়া কাজে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সে সেখানেই বসিয়া আছে। আমি আঙ্গিনা হইতে দেখিলাম তেতালার ঘরে জানালা একটু খোলা আছে। তাহার কাণ হইতে ইয়ারিং খুলিয়া লইয়া তাহাকে জানালা হইতে ফেলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে লইয়া উপরে গেলাম। আমি তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, নতুবা সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিত। সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না, কিন্তু আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিত। তাহা হইলেই মা আমাকে মারিতেন। আমি উপরে যাইয়া জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া তাহাকে সেখানে বসাইলাম। এমন সময়ে পদশব্দে বুঝিলাম, কেহ আসিতেছে। আমি মেয়েটীকে তৎক্ষণাৎ নীচে নামাইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। লোকটী আমাদিগকে না দেখিয়া চলিয়া গেল। আমি আবার জানালা খুলিয়া আমার দিকে পিঠ করিয়া মেয়েটীকে জানালায় বসাইলাম, তাহার পা ঝুলিতে লাগিল। এরূপ করিয়া বসাইলাম এই জন্য যে আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইব না, এবং সহজে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিব। আমি ইয়ারিং টানিয়া লইলাম। সে ব্যথা পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি ধমক দিয়া বলিলাম, কাঁদিলে নীচে ফেলিয়া দিব। সে চুপ করিল। আমি ইয়ারিং পকেটে রাখিলাম। তখন আমি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলাম, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, সে প্রথমে আলোকস্তম্ভের উপর ও তৎপর পাকা আঙ্গিনার উপর পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া মার কাজে চলিয়া গেলাম। আমি জানিতাম যে আমি মেয়েটীকে হত্যা করিতে যাইতেছি। তাহার পিতা মাতা যে শোকার্ত্ত হইবেন, সে চিন্তা আমার মনে উদয় হয় নাই। আমি এজন্য দুঃখিত বা ক্লিষ্ট হই নাই। আমি জেলে আছি বলিয়া মুহূর্ত্তের তরেও দুঃখিত হই নাই। আমি প্রথমে পুলিসের নিকট সমস্ত অস্বীকার করিয়াছিলাম ও ইয়ারিং ফেলিয়া দিয়াছিলাম। পরে পুলিসের লোক আমাকে প্রহারের ভয় দেখাইলে সমস্ত স্বীকার করি। আমি বালিকাটীর মৃতদেহ দেখিয়া একটুকুও দুঃখ বোধ করি নাই। আমি জেলে চারিজন স্ত্রীলোকের সহিত ছিলাম—তাহাদিগকে সব বলিয়াছি। তাহাদের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া আমি আমার কাহিনী বলিবার সময় না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমি মাকে কিছু পয়সা পাঠাইতে লিখিয়াছি, কারণ জেলে শুষ্ক রুটী খাইতে দেয়—তাহা ভিজাইবার জন্য একটা কিছু চাই।"* এই বালিকার পূর্ব্ব-

* The Criminal (The Contemporary Science Series), pp. 7—11.

পুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। ইহার অন্তরে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধ মোটেই ছিল না। কেন ছিল না, তাহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহার রক্ত-মাংসের মধ্যে এমন কিছু ছিল—অর্থাৎ ইহার দৈহিক সংগঠন এমন বিচিত্র ছিল, যাহাতে ইহার প্রাণে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধরূপ বীজ উপ্ত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।

(খ) বংশ (Heredity)

চরিত্রের দ্বিতীয় ভিত্তি বংশ। সন্তান পিতামাতার দোষগুণের অধিকারী হয়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু চরিত্রের উপর বংশের বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রভাব কত প্রবল, বিস্তৃত ও গম্ভীর, সে সমস্যা সহজ নহে। অনেকে মনে করেন, কাহারও চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পিতামাতা বা পিতামহ মাতামহের মধ্যে দৃষ্ট না হইলেই বংশপ্রভাবের নিয়ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু যাঁহারা এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক একটী গুণ বা দোষের মূল অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া শাখা প্রশাখা ক্রমে অনেক দূরে যাইতে হয়। এমন কি, হয় তো উদ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষে উপস্থিত হইলে তবে একটী সমস্যার মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোনও পরিবারে বা গোত্রে বংশপ্রভাবের আশ্চর্য্য প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যেমন আমেরিকার জুক বংশ (The Jukes)। এই বংশের ৭০৯ জন লোকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কুড়িজনও নিপুণ শ্রমজীবী নাই—যে কয়জন আছে তাহাদের মধ্যে দশজন কারাগারে কর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে। ১৮০ জন সরকারী দাতব্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সকলের দাতব্য প্রাপ্তিকালের সমষ্টি ২৩০০ বৎসর, ৭৬ জন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী। এই বংশে ব্যভিচারিণী রমণীর সংখ্যা শতকরা ৫২র উপর। সাধারণতঃ এরূপ রমণীর সংখ্যা শতকরা মোটে ১·৬৬। *

অপরাধী (the criminal) শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অবসর হইলে এবিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু বলা যাইবে। আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে সাধারণ অবস্থাতেও চরিত্রের গুণাগুণ দৈহিক সংগঠন ও বংশ প্রভাবদ্বারা নিয়মিত হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে ধর্ম্মসাধনের সহিত এই দুইটীর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা।

ধর্ম্মসাধনের সহিত দৈহিকসংগঠন ও বংশ প্রভাবের সম্বন্ধ।

ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য যোগক্ষেম—অর্থাৎ যে গুণ নাই তাহা লাভ ও যে গুণ আছে তাহার উৎকর্ষ সাধন। মনু ধর্ম্মের যে দশটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পরিস্ফুট ভাবে বা অঙ্কুরাকারে রহিয়াছে। এই গুণ বা লক্ষণগুলি কাহার মধ্যে কি আকারে আছে তাহা যেমন দৈহিকসংগঠন ও বংশপ্রভাব দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে, তেমনি ইহাদিগের উৎকর্ষ সাধনে কৃতকার্য্যতাও এই দুইটীর উপর নির্ভর করিতেছে। যেমন ধৃতি বা সন্তোষ। কেহ কেহ জন্মাবধিই সন্তুষ্টচিত্ত। তাহারা এমন দেহ লাভ করিয়াছেন বা পিতামাতার নিকট হইতে এমন প্রকৃতি পাইয়াছেন যে অসন্তোষ, নিরাশা তাঁহাদের ত্রিসীমায় আসতে পারে না। পক্ষান্তরে যে বাল্যাবধি রোগক্লিষ্ট, যাহার রক্তমাংসের ক্রিয়া (animal spirits) দুর্ব্বল, যে সুনিদ্রা কাহাকে বলে জীবনে জানে না, তাহার চিত্তে সহজেই অসন্তোষ প্রবল হয়। তৎপর, অক্রোধ। ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে, ক্ষুধিতব্যক্তি ক্রোধী (A hungry man is an angry man)। কথাটী অতি ঠিক্। যে ক্ষুধাতুর তাহার যেমন সহজেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, তেমনি অজীর্ণরোগক্লিষ্ট ব্যক্তিও সহজে ক্রোধ জয় করিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমা করা সহজ। শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে একটু সময় লাগে। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা ক্ষমাশীল বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। ইহা আমাদিগের দৈহিক দুর্ব্বলতার না ধর্ম্মসাধনের ফল, বলা কঠিন। তারপর, অন্তরও বহিরিন্দ্রিয় দমনের কথা ধরা যাক্। কেনা জানে, সকলের সকল ইন্দ্রিয় সমান প্রবল থাকে না; দৈহিক-সংগঠন ও বংশানুসারে এবিষয়ে গুরুতর তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দেহ ও বংশের প্রভাব এত প্রবল যে অনেক ব্যাকুলচিত্ত, ভগবদ্‌ভক্ত সাধককেও এজন্য

* *The Criminal, pp. 101--2*

রক্তাক্তকলেবর হইতে হয়। অপরাধীদিগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের সংশোধনের জন্য ধর্ম্মোপদেশ প্রায়ই নিষ্ফল—শরীরের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এই দেহ ও বংশের প্রভাবকেই খৃষ্টীয় শাস্ত্রে 'আদিম পাপ' (the original sin) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রভাবের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াই ধর্ম্মবীর সেণ্ট পল অতি দুঃখে বলিয়াছেন—For the good that I would I do not; but the evil which I would not, that I do...O wretched man that I am! Who shall deliver me from this body of death?"

সেণ্ট পল যেন এদেশীয় সাধকের ভাষায় বলিতেছেন—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।—ধর্ম্ম জানিয়াও তাহার অনুসরণ করি না, অধর্ম্ম জানিয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না——হায়! কে এই হতভাগ্য আমাকে মৃত্যুময় দেহ হইতে উদ্ধার করিবে?"

ধী এবং বিদ্যা—শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা। উহারা যে পরিমাণে পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, ঠিক সেই পরিমাণে দেহ ও বংশের শক্তি দ্বারা নিয়মিত হয়। এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে, মেধা, বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তির সাহায্য ভিন্ন কেহ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এই সকল শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহা অতি পুরাতন কথা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া সকলে এক ফল পাইতে পারেন না। কারণ কাহারও কাহারও এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সুবিধা থাকে। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি হিমালয় শিখরে শুভ্রতুষাররাশির মধ্যে বিচরণ করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন, চিররুগ্ন বা ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি কখনও সে সৌভাগ্যের আশা করিতে পারেন না। যিনি পাঁচ মিনিট কাল শরীর উন্নত করিয়া বসিতে পারেন না, তিনি তাঁহার ন্যায় সমস্ত রজনী ধ্যানে অতিবাহিত করিবেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আর যে ব্যক্তি এমন চঞ্চল দেহ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে মুহূর্ত্তকাল সুস্থির থাকিতে পারে না, সেই বা কিরূপে যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিবে?

বাকি রহিল, সত্যপ্রিয়তা। সত্যের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে। দুর্ব্বলকায় ব্যক্তি অনেক সময়ে ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। এ জন্যই দেখা যায়, স্বাধীন দেশের সুস্থ সবল, উন্নতকায় ব্যক্তিরা পরাধীন দেশের খর্ব্ব, দুর্ব্বল রুগ্নদেহ লোকদিগের অপেক্ষা সচরাচর অধিক স্পষ্টবাদী। এরূপও দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও পরিবারের বালক-বালিকারা শৈশবকাল হইতেই মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করে।

গীতার মত।

পশ্চিমদেশীয় সুধীগণ যাহাকে দেহসংগঠন ও বংশের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গীতার মতে তাহার নাম প্রকৃতি অথবা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার। গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম-চেষ্টা করিয়া থাকে। ভূতমাত্রই প্রকৃতির অধীন, (সুতরাং) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে কি হইবে?

পুনশ্চ অষ্টাদশাধ্যায়ে—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥

হে অর্জ্জুন, যদি অহঙ্কারের অধীন হইয়া তুমি নিশ্চয় কর, 'আমি যুদ্ধ করিব না,' তবে তোমার সংকল্প মিথ্যা হইবে, (কারণ) প্রকৃতিই তোমাকে (যুদ্ধে) নিয়োগ করিবে।

প্রথমোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর প্রকৃতির অর্থ করিয়াছেন, বর্ত্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্ত পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার।* অথবা শ্রীধর স্বামীর ভাষায়, প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারাধীনস্বভাব। কিন্তু শেষোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন, প্রকৃতির অর্থ ক্ষত্রস্বভাব। যাঁহারা

* প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ।

প্রাক্তনজন্মসংস্কার মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, এই দ্বিতীয় অর্থের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত প্রায় এক। কারণ, শঙ্কর যাহাকে ক্ষত্রস্বভাব বলিতেছেন, তাঁহাদিগের মতে উহা দৈহিক সংগঠন ও বংশপ্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীতার সতের অধ্যায় জুড়িয়া যোগভক্তিকর্ম্ম-জ্ঞানের এত অমূল্য উপদেশ দিবার পরেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে হয়, "হে অর্জ্জুন, তুমি যুদ্ধ করিতে চাও বা না চাও, তোমার প্রকৃতি বা ক্ষত্রস্বভাব তোমাকে ঘাড়ে ধরিয়া যুদ্ধ করাইবে, সুতরাং নিজ হইতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ ;" তবে নব্যতন্ত্রিগণ অনায়াসেই বলিতে পারেন, এ স্থলে শাস্ত্রকার নিজমুখে বংশ বা heredityর অনতিক্রমণীয় প্রভাব স্বীকার করিতেছেন।

ধর্ম্মসাধন দ্বারা দেহ ও বংশের প্রভাব অতিক্রম করা যায় কি না।

তবে কি দেহ ও বংশের প্রভাব সত্য সত্যই অনতিক্রমণীয়? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। অথবা ইহার উত্তরে বলিতে হয়, অনতিক্রমণীয় না হইলেও দুরতিক্রমণীয় বটে। যখন পুরাণে পাঠ করি, এক এক জন তপোনিষ্ঠ সাধক আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়াও হঠাৎ এক দিন রিপুর চরণে আপনাকে আহুতি দিয়াছেন,—যখন দেখিতে পাই, কত সরলপ্রাণ, ব্যাকুলচিত্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধক সহস্রবার কৃতাপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও গলদশ্রুলোচন হইয়াও একটা দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই, তখন যথার্থই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আজন্ম সাধনভজন আর ভস্মে ঘৃতাহুতি বুঝি একই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম-সাধন নিরর্থক বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ সাধনশীল লোকের জীবন সাক্ষ্য দিতেছে, একাগ্র অধ্যবসায় কখনও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয় না। দেহ ও বংশের প্রভাব সাধন বলে নির্ম্মূল না হউক, অন্ততঃ নিস্তেজঃ ও নির্ব্বীর্য্য হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, সাধন এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে দেহ ও আত্মা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে। কারণ, ধর্ম্ম-সাধন দৈহিক-সংগঠন ও বংশপ্রভাবের অনুকূল না হইলে ব্যর্থ হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য যোগক্ষেম বা চরিত্রে যে সদ্‌গুণ আছে তাহাকে বিকশিত করা এবং যে সদ্‌গুণ নাই তাহা লাভ করা। কাহার মধ্যে কি শক্তি আছে, সাধন বা চর্চ্চা ভিন্ন তাহা ধরিবার উপায় নাই। ঋষি ইমাসন একস্থলে বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, ঐ বিশেষত্ব ধরিতে পারিলেই সে কান্তিমান্ হইতে পারে। এই ধরার কাজটা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। কঠিন বলিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেই বা চলিবে কেন? আজন্মসিদ্ধ কিংবা আজন্মপাপিষ্ঠ ব্যক্তির কথা না তুলিয়া সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, চরিত্রের উন্নতি-সাধন অথবা ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য রীতিমত সাধন আবশ্যক। সে সাধন নিশ্চয়ই দেহ ও বংশপ্রভাবের অনুকূল হইবে, ও তদনুযায়ী ফল প্রসব করিবে, কিন্তু তাহা সর্ব্বথা নিষ্ফল হইবে না।

ধর্ম্মসমাজের একটী গুরুতর ভুল, সকলকে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা। যেখানে যেখানে সমাজগঠনে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দেহ ও বংশপ্রভাব অস্বীকৃত হইয়াছে, সেখানেই মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছে। তিনিই যথার্থ নেতা, গুরু বা চালক, যিনি বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন সাধন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। এরূপ গুরু দুর্লভ, সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের ইতিহাসে এমন কাহাকেও দেখা যায় নাই, ইহা স্বীকার করি না। ঈশা ও বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহার কোন কোনটী হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের নিকট এই তত্ত্বটী অপরিচিত ছিল না।

স্রোতস্বিনী আপনার শক্তিতেই নিজের পথ করিয়া লয়, কিন্তু ভূমির প্রকৃতি দ্বারা তাহার গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। সেইরূপ, ধর্ম্মার্থী, পুরুষকার ও ব্রহ্মকৃপার সাহায্যে চরিত্রের উন্নতি সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাধন স্বীয় দৈহিক-সংগঠন ও বংশপ্রভাব দ্বারা নিয়মিত এবং অনুরঞ্জিত হয়। *

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

* এই প্রবন্ধে দৈহিকসংগঠনও বংশ চরিত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইটী ছাড়া চরিত্র-বৈচিত্র্যের আরও অনেক কারণ আছে; যেমন, আবেষ্টন (environment), রাজনৈতিক অবস্থা, ইত্যাদি। সে সকলের আলোচনা উপস্থিত করিলে প্রবন্ধ অফুরন্ত হইয়া দাঁড়াইত।

পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিচিহ্ন।

আদিনার গঠন-সৌন্দর্য্যে পাণ্ডুয়ার অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্ন নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। আদিনা না থাকিলে, সে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন সমধিক গৌরব লাভ করিতে পারিত। যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বিলুপ্ত করিয়া শেকন্দরশাহ আদিনা রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, আদিনা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত কি না, তাহা কে বলিতে পারে? আদিনার জন্যই পাণ্ডুয়া দেবমন্দিরশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা গণেশের শাসন-সময়ে পাণ্ডুয়া আবার দেবমন্দিরে অলংকৃত হইয়া উঠিতেছিল।

গণেশের শাসন সময়ের দুই শ্রেণীর ইতিহাস প্রচলিত আছে। এক শ্রেণীর ইতিহাসে—গণেশ হিন্দু মুসলমানের প্রিয়পাত্র,—পরম ন্যায়পরায়ণ—প্রজাপালক পুণ্যশ্লোক নরপতি বলিয়া প্রশংসিত। আর এক শ্রেণীর ইতিহাসে—গণেশ মুসলমানবিদ্বেষী—অত্যাচারপরায়ণ—প্রজাপীড়ক রাজ্যাপহারক বলিয়া নিন্দিত। কিন্তু উভয় শ্রেণীর ইতিহাসেই—গণেশ হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত—দেবমন্দির নির্ম্মাণকারক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সে সকল দেবমন্দির দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া, তাহার চিহ্ন মাত্রও বর্ত্তমান নাই। গণেশের পর তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সুলতান জালালুদ্দীন নামে সিংহাসন আরোহণ করায়, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজেদরচনার পুরাতন প্রবৃত্তি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই গণেশ-নির্ম্মিত দেবমন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে যে সকল হিন্দু এবং বৌদ্ধ নরপতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই শাসনপত্রে লিখিয়া দিতেন

"নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।"

পরকীর্ত্তি বিনষ্ট করা মহাপাপ বলিয়া লোক সমাজেও সুপরিচিত ছিল। মুসলমান-শাসন সময়ে এই নীতি মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাতেই পরকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া, বাদশাহগণ আত্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুসলমান নীতির অনুসরণ করিলে, আদিনা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটিত না। তিনি পরকীর্ত্তি বিলুপ্ত না করিয়া, হিন্দুনীতিরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমাননীতি গ্রহণ করায়, পুনরায় পরকীর্ত্তিলোপের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। একটি মন্দিরে তাহার পরিচয় অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহা একটি সমাধি-মন্দির বলিয়া পরিচিত। গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে সুলতান জালালুদ্দীনের, তাঁহার স্ত্রীর এবং পুত্রের মৃতদেহ সমাধিনিহিত হইয়াছিল।* অদ্যাপি সে তিনটি সমাধি বর্ত্তমান আছে। মন্দির জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল,—গম্বুজের উপর অশ্বত্থবৃক্ষ সমুদ্ভূত হইয়া তাহাকে নিরতিশয় বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল;—এখন তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, যথা যোগ্য জীর্ণসংস্কারও সাধিত হইতেছে। এই সমাধিমন্দিরের ইষ্টক প্রস্তরের সহিত বাঙ্গালার পুরাকাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহার নাম

একলক্ষি।

এরূপ নাম প্রচলিত হইল কেন, কেহ তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। এই নাম কি পুরাকালপ্রচলিত প্রকৃত পরিচয় বিজ্ঞাপক নাম? গোলাম হোসেনের সময়ে এই নাম প্রচলিত থাকিলে, তিনি ইহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কেন? ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে এই নাম উল্লিখিত আছে। তবে কি এই নাম গোলাম হোসেনের পরে এবং ইলাহিবক্সের পূর্ব্বে কোনও সময়ে সহসা প্রচলিত হইয়াছে? মুসলমান-সমাধিমন্দিরের হিন্দু নাম স্বতই এই সকল কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া থাকে। কুতবশাহী মসজেদের উত্তর পূর্ব্বে—প্রচলিত রাজপথের অনতিদূরে—একলক্ষি অবস্থিত। রাভেন্‌শা ইহাকে ৮০ ফিট আয়তনের সমচতুষ্কোণ মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে, একলক্ষি ৫০ হাত দীর্ঘ, ৪৬ হাত প্রস্থ, ২৭ হাত উচ্চ বলিয়া বর্ণিত। কাহার বর্ণনা প্রকৃত তাহা পর্য্যটক মাত্রেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।†

---

* To this day a large tower exists over his mausoleum at Panduah. The graves of his wife and son lie by the side of his mausoleum.—*Riaz-us Salateen, p. 118.*

† রাভেন্‌শার গ্রন্থে একলক্ষির যে চিত্র আছে, তাহাতে ইলাহিবক্সের বর্ণনাই প্রমাণীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

এত বড় সমাধিমন্দিরের উপর একটি মাত্র গম্বুজ। তাহাই একলক্ষির গঠন কৌশলের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব আছে। ইহাতে কোন ফলকলিপি দেখিতে পাওয়া যায় না,—কখন কোন ফলকলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। অনাবৃত হর্ম্ম্যতলে যে তিনটি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কোন ফলকলিপি সংযুক্ত হয় নাই। একটি সমাধি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ,—তাহা সকলের পশ্চিমে অবস্থিত। ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন, "পশ্চিমপার্শ্বের সমাধি সুলতান জালালুদ্দীনের, পূর্ব্বপার্শ্বের সমাধি তাঁহার পুত্র সুলতান আহম্মদশাহের এবং মধ্যস্থলের সমাধি তাঁহার স্ত্রীর বলিয়া অনুমিত হয়।*" এরূপ অনুমানের কারণ কি, ইলাহিবক্স তদ্বিষয়ে আর কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই।

একলক্ষি দেবমন্দির না সমাধিমন্দির, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ পরম্পরার অভাব নাই। গম্বুজ না থাকিলে, ইহার অন্যান্য গঠন কৌশল দেখিয়া, ইহাকে সমাধি-মন্দির বলিতে সাহস হইত না। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার;—অট্টালিকার অনুপাতে সকল দ্বারই নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন। যে দ্বারটি দক্ষিণদিকে অবস্থিত, তাহাই প্রধান দ্বার। তাহা প্রস্তরময়। উপরের চৌকাঠের মধ্যস্থলে এক দেবমূর্ত্তি! তাহার নাক মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন—"এই দ্বার কোনও দেবমন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।"† কেবল দ্বার কেন,—একলক্ষির সর্ব্বাঙ্গেই দেবমন্দিরের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কি অবস্থান, কি গঠন-পারিপাট্য, সর্ব্বাংশেই একলক্ষি দেবমন্দিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাভেন্‌শা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।‡ কিন্তু তিনি ইহাকে ঘিয়াসুদ্দীনের সমাধিমন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহার নিকট এরূপ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, রাভেন্‌শা তাহার উল্লেখ করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার টীকাকারও ইহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই।*

একলক্ষি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার যোগ্য। কিন্তু আদিনা দর্শনের ঔৎসুক্যে পর্য্যটকগণ আত্মহারা হইয়া, দূর হইতে একলক্ষির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। জেনারল কনিংহাম ইহাকে "বাঙ্গালী পাঠান-স্থাপত্যের" উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।† গম্বুজের সম্বন্ধে সে কথা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। অন্যান্য অংশের সম্বন্ধে সে কথা স্বীকার করিতে সাহস হয় না। একলক্ষি ইষ্টকগঠিত, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের সমাবেশ। ইষ্টক গুলি কারুকার্য্যখচিত। তাহাতে দেবমন্দিরের উপযোগী রচনা-কৌশল অভিব্যক্ত। যে সময়ে এই মন্দির রচিত হয়, তখন হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল। তখনকার শিক্ষা ও শিল্প উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং একলক্ষিকে "বাঙ্গালী পাঠান-স্থাপত্যের" দৃষ্টান্ত না বলিয়া, "বাঙ্গালীর স্থাপত্য-প্রতিভার" দৃষ্টান্ত বলিলেই সুসঙ্গত হয়। কারণ, এই বিচিত্র মন্দিরে হিন্দুমুসলমানের স্থাপত্যপ্রতিভা সমভাবে দেদীপ্যমান। এখানে যাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহাদের অবস্থাও সেইরূপ,—জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে মুসলমান।

সাতাইশ ঘরা।

আদিনার পূর্ব্বাংশে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজনগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় এখনও অনেক সুবৃহৎ সরোবর দেখিতে

---

* I imagine that the western tomb, which is the highest, is that of Sultan Jalaluddin, that the one to the East is that of his son Sultan Ahmed Shah, and that the middle one is the tomb of his wife.—*Khushid-jahannamah.*

† It appears from this that the lintel must have belonged to some idol-temple,—*Ibid.*

‡ It is beleived to contain the remains of Sultan Ghyasuddin, his wife, and his daughter-in-law. This tomb is a remarkable instance of the use of Hindu materials in the erection of a Muhammedan Mausoleum, for both door posts and lintels are covered with Hindu carvings.—*Ravenshaw's Gour, p. 58.*

* This can hardly be other than the "domed tomb" referred to in the Riaz-us-Salateen as that of Jalaluddin Abul Muzaffar Muhammad Shah. *See Blochmann's contributions. J. A. S. B. Vol. XLII. Part I. p. 267.*

† General Cunningham cites this tomb as "one of the finest specimens of the Bengali Pathan tomb."—*Archeological Survey Report Vol. III. p. 11*

পাওয়া যায়। আদিনার অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে নিবিড় বনের অন্তরালে একটি সরোবর এবং তাহার তীরে দুর্গাকার স্থানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান এখন "সাতাইশ ঘরা" নামে পরিচিত। সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, এই স্থানেই বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। এখানে ব্যাঘভীতি এরূপ প্রবল ছিল যে, অধিকাংশ পর্য্যটক এখানে পদার্পণ করিতেন না। রাভেন্‌শা এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ হয়। তাঁহার গ্রন্থে "সাতাইশ ঘরার" কোন চিত্র মুদ্রিত নাই। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও জনশ্রুতি মূলক। সরোবরটি উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ। রাভেন্‌শা লিখিয়া গিয়াছেন,—"তাহা মধ্যম পাণ্ডবের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া পরিচিত।" * সে যাহা হউক, সরোবরটি হিন্দুকীর্ত্তি। তাহার পার্শ্বে যে রাজদুর্গ বর্ত্তমান ছিল; তাহা প্রায় চিহ্নহীন হইয়া উঠিয়াছে। কোন পরিখা নাই,—প্রাচীরের আভাস মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই যে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে একটি স্নানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে। ইলাহিবক্‌স লিখিয়া গিয়াছেন,—এই স্নানাগার সামসুদ্দীন ইলিয়াসের কীর্ত্তি চিহ্ন। দিল্লীর ইতিহাসবিখ্যাত "সামসী" স্নানাগারের আদর্শে সামসুদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়ায় স্নানাগার নির্ম্মাণ করায়, দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ ক্রোধান্ধ হইয়া পাণ্ডুয়া অবরোধ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।† সাতাইশ ঘরার স্নানাগারের কথা এইরূপে ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গোলাম হোসেনের কথা সত্য হইলে, একটি স্নানাগারের জন্য কি অনর্থই না উৎপন্ন হইয়াছিল! ফিরোজ শাহ দুই লক্ষ পদাতিক, ষষ্টিসহস্র অশ্বারোহী লইয়া সহস্র পোতারোহণে পাণ্ডুয়ায় উপনীত হইয়া নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। একদিনের যুদ্ধে একলক্ষ সেনা কালকবলে পতিত হইয়াছিল! এই সকল কারণে সাতাইশঘরার স্মৃতি নরশোণিত স্রোতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা পাণ্ডুয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই পুরাতন রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিকটে বা দূরে অন্য কোনও রাজপ্রাসাদ থাকিলে, তাহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান থাকিত। "সাতাইশ ঘরা" এখন ধীরে ধীরে লোকলোচনের অন্তর্হিত হইতেছে,—যাহা আছে, তাহারও জীর্ণসংস্কারের চেষ্টা হইতেছে না। গৌড়ের ন্যায় পাণ্ডুয়া ইংরাজরাজের কৃপা-কটাক্ষে সুসংস্কৃত হইতেছে। কিন্তু কি গৌড়ে, কি পাণ্ডুয়ায়,—কোন স্থলেই—রাজপ্রাসাদের জীর্ণসংস্কারের আয়োজন দেখিতেছি না! ইতিহাসের নিকট মস্‌জেদ অপেক্ষা রাজপ্রাসাদের মূল্য অধিক। তাহার সহিত পুরাকাহিনার প্রধান সংশ্রব। তাহা ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইতিহাস সংকলন করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

স্নানাগারটি সরোবরের পার্শ্বদেশেই অবস্থিত ছিল। এখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা বর্ত্তমান নাই। ইলাহিবক্‌স লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই সরোবর নাসির শাহের সরোবর বলিয়া পরিচিত।"* উত্তরকালে গণেশের পুত্র পৌত্রের প্রভাবে ইলিয়াস্ বংশীয় নাসিরুদ্দীন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়,—নাসিরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী গৌড়নগরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ায় নাসিরুদ্দীনের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব হইতে সরোবর না থাকিলে, তাহার পার্শ্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্নানাগার নির্ম্মিত হইত না। সরোবরের আকার ও স্নানাগারের সান্নিধ্য ইহাকে পুরাতন সরোবর বলিয়াই ঘোষিত করিতেছে। নাসিরুদ্দীনের নামে তাহা কথিত

* The tank has its greatest length north and south, and tradition declares it to have been the work of Arjun of the race of Pandu.—*Ravenshaw's Gour, p. 67.*

† It is said that at that time Sultan Shamsuddin built a bath, similar to the Shamsi-bath of Delhi. Sultan Firuz Shah, who was furious with anger, against Shamsuddin in the year 754 A. H., set out for Lakhnauti, and after forced marches, reached close to the city of Panduah, which was then the metropolis of Bengal,—*Riaz-us-Salateen, p. 100.*

* Ilahibux notices the beautiful tank of Sataisghara, and says, it is known by the name of Nasir Shah's tank.—*H. Beveridge,*

হইয়া থাকিলেও, তাহা যে নাসিরুদ্দীনের কীর্ত্তি, এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।*

পাণ্ডুয়ার আর একটি সুপরিচিত দৃশ্যের নাম "সোনা মসজেদ।" কিন্তু পাণ্ডুয়ার সোনা মসজেদ গঠন-গৌরবে গৌড়ের সোনা মসজেদের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি তাহা পাণ্ডুয়ার একটি উল্লেখ-যোগ্য দৃশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাহা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গঠনপারিপাট্যে সুন্দর বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য।

এক সময়ে প্রস্তরগঠিত অট্টালিকার প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর প্রস্তরের সঙ্গে ইষ্টক সংযোগে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ করে। গৌড় এবং পাণ্ডুয়ার অধিকাংশ অট্টালিকায় তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে পাণ্ডুয়ার সোনা মসজেদ অনন্যসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। ইহার আদ্যন্ত প্রস্তরগঠিত।†

কুতবশাহী অট্টালিকার উত্তরে এই ক্ষুদ্র মসজেদ অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বদিকে একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বে একটি সুদৃঢ় তোরণদ্বার। তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মসজেদের মধ্যে একটি সুদৃশ্য উপাসনাবেদী বর্ত্তমান আছে। প্রস্তরফলকে লিখিত আছে,—"হিজরী ৯৯০ সালে মহম্মদ অল খলিদির পুত্র মকদুম শেখ নামক সাধুপুরুষ কর্ত্তৃক এই কুতবশাহী মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।"‡ হিজরী ৯৯৩ সালে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হইবার কথা আর একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন হিজরী ৮৮৫ সালে এই মসজেদ সুলতান বার্ব্বক শাহের পুত্র সুলতান ইউসফ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইবার কথা একখানি প্রস্তরফলকে পাঠ করিয়া গিয়াছিলেন। সে ফলক দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ফলকে ইহা "কুতবশাহী" বলিয়া উল্লিখিত আছে; তোরণ দ্বারের ফলকলিপিতে মকদুম শেখ আপনাকে কুতব শাহার দাসানুদাস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয়,—এই মসজেদ পুরাতন; মকদুম শাহ তাহা পুনর্গঠিত করিয়া, তোরণদ্বার নির্ম্মিত করিয়া থাকিবেন।

মকদুম শেখের নাম মালদহ অঞ্চলে "রাজা বিয়াবাণী" নামে পরিচিত। ইলাহিবক্স তাহার সুপরিচিত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সাধুপুরুষ "অরণ্যের সম্রাট" বলিয়া কথিত হইতেন। জনসমাজে তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ যখন পাণ্ডুয়া অবরোধ করেন, সেই সময়ে (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) এই সাধু-পুরুষের দেহান্তর সংঘটিত হয়। গৌড়েশ্বর তখন শত্রুবেষ্টিত একডালা দুর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ বর্ণশার্দ্দূলের ন্যায় গতিহীন। তাহার ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মকদুম শেখের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার কথা গোলাম হোসেনের ইতিহাসে লিখিত আছে। কোথায় এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছিল,—কোথায় এই সাধু-পুরুষের মৃতদেহ সমাধিনিহিত হইয়াছিল,—তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি জ্ঞাতব্য কথা। এই সময়ে গৌড়েশ্বর একডালা দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি তথা হইতেই গোপনে ছদ্মবেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীশ্বর সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই ছদ্মবেশে দুর্গমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কাহিনী পাঠ করিলে, একডালা দুর্গকে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একডালার দুর্গ কোথায় ছিল, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ তাহাকে দিনাজপুরে, কেহ বা সুবর্ণগ্রামের নিকটে আবিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া কোলাহল করিতেছেন! ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা

* If it was he, who made the tank, then the probability is increased that the baths were made by his ancestor, for he would naturally revert to the palace of his forefathers. বিভারিজ সাহেবের এই উক্তি অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ,—নসিরুদ্দীন পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই, এবং প্রথমে স্নানাগার পরে সরোবর—ইহাও অসঙ্গতকথা।

† North of Qutabs' house stands a small but beautiful Mosque, called the Sona Musjid, or Golden Mosque, built throughout of horneblende.—*Ravenshaw's Gour, p. 56.*

‡ The foundation of this mosque was laid by the Honourable and Venerable Mukhdum Shaikh, son of Mahammad Al-Khalidi, honoured in all places, pole-star of the pole-stars, and source of rectitude. May God extend the shadow of his property. This mosque is the Qutabshahi and its date is "Mukhdum Ubed Raji, A.H. 990." ফলকলিপির অনুবাদ।

ছিল। কিন্তু তিনি লিখিবেন বলিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন নাই,—তাহার জন্য গ্রন্থমধ্যে অলিখিত পৃষ্ঠা পড়িয়া রহিয়াছে! তিনি কেবল এই পর্য্যন্তই লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেখানে মকদুম শেখের সমাধি, তাহা সাধুপুরুষদিগের সাধারণ সমাধি স্থান বলিয়া পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে মহল্লার নাম—দেবটোলা।" এই স্থান কোথায় ছিল, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। যেখানেই হউক, তাহা যে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী, ইলাহিবক্সের লিখনভঙ্গী তাহা সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে!

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে ধর্ম্মবিস্তার করা মুসলমানদিগের প্রচলিত রীতি বলিয়া সুপরিচিত। তজ্জন্য প্রাচীন দেবমন্দিরের সান্নিধ্যে মস্‌জেদ বা সমাধিমন্দির রচনা করাও সেকালে একটি প্রচলিত রীতি হইয়া উঠিয়াছিল। দেবটোলায় সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবার কথা পাঠ করিলে, তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের পুরাতন নাম কিরূপ ছিল, কেহ তাহার তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইলে, দৃশ্যমান অট্টালিকাদির ইষ্টকপ্রস্তর মুখরিত হইয়া উঠিবে—তাহারা বিবিধ বিলুপ্ত কাহিনীর সন্ধান প্রদান করিবে,—যাহা নাই, তাহার কথায়, যাহা আছে, তাহাকে হয় ত নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিবে! ভবিষ্যতের পর্য্যটকগণ কেবল কৌতূহল চরিতার্থের জন্য শ্রম স্বীকার না করিয়া, এই সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রবন্ধরচনার সকল প্রয়াস চরিতার্থ হইবে। ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ভেরা সেজোনোভা।

মার্কিন দেশের একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক—মিঃ লিরয় স্কট রুস সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাইবার জন্য বহুকাল সেখানে বাস করিয়াছিলেন; এবং রুসিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি রুস সাম্রাজ্যের বৈপ্লাবিক দল ভুক্তা এক বীররমণীর নিজমুখ হইতে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনটীর যে ইতিহাস জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তাঁহার প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ করিয়া পাঠকের কাছে উপস্থিত করিব। এই তেজস্বিনী রমণীর ভেরা সেজোনোভা (Vera Sagonova)। এই অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকার জীবনের একমাত্র ব্রত—তাঁহার নিপীড়িত অসহায় স্বদেশবাসীর অশেষ দুঃখ মোচন।

একদা রাত্রিকালে ভেরার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আমরা উভয়ে এবং তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী বাসিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে ভেরা তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী শান্ত মৃদুস্বরে প্রকাশ করিলেন।

আমি একজন ইহুদী বালিকা, আমার পিতা কোনো এক সুবৃহৎ প্রাদেশিক নগরীতে সৈনিক বিভাগের নিম্ন পদস্থ চিকিৎসক। তাঁহার মত কর্ম্মঠ, বিচক্ষণ চিকিৎসক অতি বিরল। তুরস্ক সমরে চিকিৎসা নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার বক্ষ আজও পদক মালো সুশোভিত; কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনো পদোন্নতি হইল না। এদিকে অজাতশ্মশ্রু, নির্ব্বোধ, অলস, চরিত্রহীন কত যুবক উচ্চপদে উন্নীত হইতেছে কিন্তু পলিতকেশ, জ্ঞানী, পারদর্শী পিতৃদেবকে আজও সামান্য 'ছোক্‌রা' কর্ম্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিতে হইতেছে। শৈশবে আমি অনেক সময় ইহার কারণ কি জানিবার জন্য উৎসুক হইতাম কিন্তু ঠিক হেতুটী খুঁজিয়া পাইতাম না।

দশ বৎসর বয়সে আমি স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কালেজে (Gymnasium) প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টিত হই। যদিও আমি স্কুলের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলাম, তথাপি কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ, যথেষ্ট অপূর্ণ স্থান থাকা স্বত্বেও আমাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। এখন আমি পিতার অনুন্নতির কারণ বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের উভয়েরই এই প্রকারে বঞ্চিত হইবার হেতু আমাদের ইহুদি জাতীয়তা।

যাহা হউক, তিন মাস অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া কালেজের কর্ত্তৃপক্ষকে ঘুঁস দিয়া ও নানা উপায়ে অবশেষে পিতা আমাকে কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আমার ধনসম্পত্তিশালিনী মাসিমাতা-ঠাকুরাণী তাঁহার সঙ্গে বাস করার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে

প্রবাসী।

অমিতাভ বা অমিতায়ুস বুদ্ধ

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

লাগিলেন এবং অনুমতির জন্য আমার পিতামাতাকে নিতান্ত ধরিয়া পড়িলেন। এই পতিহীনা, নিঃসন্তান, মাসিমাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী আমি! আমি ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছিলাম।

সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু ছিল ইহাঁদিগকে আপ্যায়িত রাখিবার মতলবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত সমারোহে পান-ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল কারণে রাজকর্ম্মচারীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ধনীর ন্যায় আমিও এতদিন সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক অত্যাচার, অবিচার হইতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিলাম। সেই-হেতু রুসিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা একজন বিদেশীর অপেক্ষা কিছুমাত্র বেশী ছিল না। "সম্রাট্ সর্ব্বে-সর্ব্বা—তাঁহার আদেশ ভ্রমপ্রমাদের অতীত, তাঁহার বিধানই ঈশ্বরের বিধান" বাল্যকাল হইতে ইহাই আমাকে শেখান হইয়াছিল এবং এই বিশ্বাস প্রজাপুঞ্জের মনে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মমন্দিরে সর্ব্বত্রই গর্ভমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা আমার বলবতী ছিল। ষোল বৎসর বয়সে নিম্নশিক্ষা সমাধা করিয়া St. Petersburg বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম।

এখানে আমি আমার মাসিমার বিশেষ বন্ধু—একজন সেনাপতির সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে থাকিতাম। এখানেও মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদির বিরাট আয়োজন হইত। আমি অল্প বয়স্কা বালিকা হইলেও মাসিমাতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকে এই উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মচারীদিগের সংসর্গে মিশিতে হইত।

সেনাপতির গৃহে নানাপ্রকার উৎসবাদির আয়োজন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আমার অবসরটুকু এমন করিয়াই গ্রাস করিয়াছিল যে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম-পাঠিনীদের সঙ্গে একটু মিশিবার ও পরিচিত হইবারও কোনো অবকাশ পাই নাই। একদিন কালেজে যাইবার পথে, নেভা নদী পার হইবার সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার হৃদয় মনকে আকৃষ্ট করিল। আমি দেখিলাম ইউনিভার্সিটির বহুসংখ্যক যুবক যুবতী হস্তে রক্তবর্ণ পতাকা ধারণ করিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে নাভাতীরাভিমুখে আসিতেছেন—কালেজের প্রাঙ্গণ হইতে নাভা নদীতীর পর্য্যন্ত এমন এক বিরাট জন-প্রয়াণের কোনো অর্থ আমি ভাবিয়া পাইলাম না, কারণ সৈনিকদল ব্যতীত কোনো জনতার সৃষ্টি করা রুসিয়ার আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য। আমি নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম; ক্রমে জন-প্রয়াণের নেতাগণ আমার কাছ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল উৎসাহের পবিত্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এবং তাঁহাদের উচ্চ কণ্ঠ হইতে মাতৃভূমির বন্দনাগীতি আকাশকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। জনতার ভিতরে আমি আমার এক পরিচিতা সহপাঠিনীকে দেখিতে পাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ইনিই আমার সঙ্গিনী সোনিয়া, সেই অবধি আমরা উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমি উচ্চস্বরে সোনিয়াকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "তুমি তা জান না?"

এ যে demonstration অর্থাৎ উদ্ঘোষণা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম demonstrationএর অর্থ কি? সোনিয়া বলিলেন "ইহা গভর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত তীব্র প্রতি-বাদের একটী উপায়। "আমরা এই সমবেত ছাত্রমণ্ডলী বিশ্বাস করি, তোমরা রুসিয়ার নিরস্ত্র অসহায় প্রজাবৃন্দের দুর্গতিসাধন করিতেছ। এই ত আমরা নিরস্ত্র তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমরা অনায়াসে আমাদের বিনাশ করিয়া ফেলিতে পার কিন্তু আমাদের দৃঢ় মত ও বিশ্বাসকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না।" এই বৃহৎ জনসংঙ্ঘ রুসিয়ার গভর্ণমেণ্টকে ইহাই বলিতেছে।

চতুর্দ্দিকের এই গভীর উত্তেজনা ও ভাবস্রোত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল—আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া প্রিয়তমা সোনিয়ার পথ অনুসরণ করিলাম।

ক্রমে এই বিপুল জনসংঙ্ঘ নেভানদী উত্তীর্ণ হইয়া সম্রাটের রক্তবর্ণ শীতনিবাস প্রাসাদের নিকট দিয়া একটী বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানের সম্মুখে উপনীত হইল। কিছু দিন পরে এই স্থলে Father Gapon কর্ত্তৃক পরিচালিত সহস্র

সহস্র শ্রমজীবীকে অকারণে হত্যা করা হইয়াছিল। বিপুল জনসমাগম ধীরে ধীরে সেণ্টপিটার্সবার্গের প্রধান প্রধান রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিল।

অকস্মাৎ একদল অশ্বারোহী কশাক্‌সৈন্য ভীষণ চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং অজস্র গালিবর্ষণ ও চীৎকার করিতে করিতে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে যেখানে যাহাকে পাইল নৃশংসরূপে কশাঘাত করিতে লাগিল। আমাদের হত্যা করিবার নিমিত্ত ইহারা বন্দুক, পিস্তল, তরবারী ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তপ্ত-লৌহশলাকার ন্যায় তীব্র কশাঘাত মুহুর্মুহু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে পড়িতে লাগিল; দুর্ব্বৃত্ত কশাক্ সৈন্যগণের অশ্রাব্য গালিবর্ষণ, রক্তকলেবর ছাত্র ছাত্রীগণের আকুল ক্রন্দন, ও চাবুকের তীব্র ঘন ঘন শব্দ চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া এমন এক ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল যে আমি তাহা আজ মনে করিতেও শিহরিয়া উঠিতেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে মেডিক্যাল কলেজের একজন যুবতীর চিবুক দারুণ কশাঘাতে একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমার অতি নিকট হইতে একজন কশাক্ এই রক্তাক্তকলেবরা যুবতীর মস্তকোপরি এমন দারুণ আঘাত করিল যে যুবতী তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। যুবতীর প্রেমাস্পদ একজন সঙ্গী যুবক তৎক্ষণাৎ কশাক্‌কে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলে কশাক্ ভূমিতে পড়িয়া গেল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই অপর এক কশাকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যুবককে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল কিন্তু হায়, অতি অল্প কাল মধ্যে যুবকও তাহার প্রেয়সী মৃতা বালিকার পার্শ্বে শায়িত হইলেন।

বৃহৎ জনস্রোতের সর্ব্বত্রই এইরূপ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। নিরস্ত্র, অসহায়, আমরা—অস্ত্রধারী দুর্দ্দান্ত কশাকের সম্মুখে কি করিয়া তিষ্ঠিতে পারিব? কাজেই আমাদিগকে পলায়ন করিতে হইল। একজন কশাক্ সেনাপতি আমাকে লক্ষ্য করিয়া চাবুক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাকে তেমন বিশেষ আঘাত করিতে পারে নাই। কশাকদের ভিতর হইতে কোনোমতে উদ্ধার পাইয়া আমি একটী গলির ভিতর লুকাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেখানেও আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য একদল House Porter অর্থাৎ দ্বারবান রাখা হইয়াছিল। আপনি বোধ হয় জানেন গভর্ণমেণ্ট এই দ্বারবানদিগকে জোর করিয়া এই প্রকার কার্য্যে বাধ্য করিয়াছে এবং কশাক্‌দিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইহারা স্থানে স্থানে রক্ষিত হইতেছে। আমার বিশেষ ভাবে স্মরণ হইতেছে—এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণ-শ্মশ্রু ভীষণ মূর্ত্তি পোর্টার আমাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। আমি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম কিন্তু ইহার হাত এড়াইতে পারিলাম না। তাহার লাঠি আমার মস্তকের উপর পড়িল—আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তারপর কি হইল, আমার আর স্মরণ নাই।

সেই দিন হইতেই আমি উৎসাহী আন্দোলনকারী ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত। একটু সুস্থ হইলেই আমি সেনাপতির গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গিনী সোনিয়ার সঙ্গে একটী ঘর ভাড়া করিলাম এবং সেই অবধি আমরা উভয়ে একত্রে বাস করিতেছি।

সেনাপতির গৃহ ত্যাগ করিয়া আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এতদিন আমি ছাত্রদলের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে পারিনাই। এখন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন এক নবজন্মলাভ করিলাম। নবজীবনের আস্বাদনে আমার হৃদয় মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কোনো প্রকার স্বার্থচিন্তা, মৃত্যু-ভয়, দুঃখশোক, আমার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারিল না।

আমি আমার কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইলাম। নিরক্ষর হতভাগ্য প্রজাদিগকে শিক্ষিত করিবার ও তাহাদের কাছে স্বদেশহিতের মঙ্গলমন্ত্র প্রচার করিবার সংকল্প লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু আমাকে আরো কিছু অধ্যয়ন ও প্রচারকার্য্য শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভিন্ন দেশের অবস্থা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিতে লাগিলাম।

সেণ্ট-পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন ৩০,০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী আছেন অন্যান্য সহরের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রসংখ্যা ইহাপেক্ষা ন্যূন নহে। এই শিক্ষার্থী যুবক যুবতীর অধিকাংশই নিজের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন। এই আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার্থীদের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে, আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অর্দ্ধেক

ছাত্র একেবারেই নিঃস্ব ; অর্দ্ধভুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে কেহ বা পথের ভিখারী বা ভিখারিণী !

. বিপৎপাতের সম্ভাবনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ইঁহারা কিরূপ নির্ভয়ে, প্রফুল্লচিত্তে রাত্রিকালে গোপনে বহুসংখ্যক গুপ্তচরের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রমজীবী ও নবাগত সৈনিকদিগের নিকট দেশের প্রকৃত অবস্থারকথা প্রচার করেন তা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বৎসরের শেষভাগে আমি বাড়ীতে আসিয়া আমাদের আন্দোলনের বিষয় আমার মা ও মাসিমাকে বলিতেই তাঁহারা ভয়াকুল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "কি ? তুই তবে ভীষণ বৈপ্লাবিকদিগের দলভুক্ত হয়েছিস্ ! তুই ত আমাদের বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টিত !"

আমি বলিলাম—"তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নহে। এই রুসিয়ার হতভাগ্য প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের চেষ্টা"।

আমার মাসিমা তীব্র স্বরে বলিতে লাগিলেন "রুসিয়ার হতভাগ্যদের দুঃখে তোর কি আসে যায়। তোর ত যথেষ্ট সুখ, সচ্ছন্দতা, মান, সম্ভ্রম, ধনজন রহিয়াছে—এতেই দিব্য সুখে, আরামে, আনন্দে থাকিতে পারিবি।"

আমি তর্ক করিয়া দেশের শোচনীয় অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ইঁহারা আমার কথা কানেও নিলেন না। আমার পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে কিছুই বলিলেন না--সুধু তাঁহার শান্ত সুনীল দুটি চক্ষু একদৃষ্টে আমার মুখ পানে চাহিয়া যেন তাহার হৃদয়ের নীরব সহানুভূতি জানাইতে লাগিল।

অবশেষে আমর মাসিমাতা অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে ভয় দেখাইলেন যে যদি আমি বিপদজনক সংসর্গ ত্যাগ না করি, তবে তিনি যে আমাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যাইবেন এই মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহার এক কপর্দ্দকও আমি পাইব না ; সুধু তাহাই নয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষার ব্যয়ভারও তিনি আর বহন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি কিছুতেই দমিলাম না। মাসিমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন অতএব সেই রাত্রেই আমাকে মাসিমার গৃহ ত্যাগ করিতে হইল।

* * সমস্ত গ্রীষ্মাবকাশটী পিতা মাতার কাছে কাটাইলাম। সর্ব্বদাই আমার মা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন ও আমি কুপথে চলিয়াছি বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু পিতৃদেব কি করিতেন ! মাঝে মাঝে শ্রমজীবীদের আড্ডায় প্রচার কার্য্যে অথবা সমব্রতীদিগের সভায় উপস্থিত থাকার দরুণ আমাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতে হইত, এবং যখন আমি গৃহে ফিরিতাম তখন সমস্ত গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সকলেই নিদ্রিত, কিন্তু আমার পিতা জাগিয়া থাকিতেন। যতই দেরী করিয়া আসিতাম না কেন পিতা একখানি প্রদীপ হস্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেন। আলো জ্বালিয়া আমাকে আমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটীতে পৌছাইয়া দিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া আস্তে আস্তে নিজের শয়নাগারে যাইতেন। কোনো দিন আমাকে একটী প্রশ্ন করেন নাই ; কোনো দিন তিরস্কার করেন নাই। পিতার কোমল হৃদয় আমার কর্ম্মে, ও উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ই সায় দিত, তাঁহার নীরব সহানুভূতি আমার হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিত।

মাসিমা আমার খরচ বন্ধ করিলেন। বাবা তাঁহার স্বল্প আয় হইতে সংসারের সমস্ত খরচ পত্র চালাইয়া আমাকে কিছু দিতে পারিতেন না। তবু আমি সেণ্টপিটার্স-বার্গে ফিরিয়া আসিয়া সোনিয়ার সঙ্গে একখানি ছোট ঘর ভাড়া করিলাম। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীগণ যখন আপন আপন ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে তখন আমি কেন তাহা পারিব না ? আমি একটী ছাত্রীকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া ফ্রেঞ্চ শিখাইবার ভার লইলাম ; ইহার জন্য ছাত্রীটি আমাকে মাসিক ১৫ রুবেল করিয়া (অর্থাৎ ২৫৲ টাকা) দিতেন। এখনও আমাকে একটী ছাত্রী পড়াইতে হয় তিনিও আমাকে মাসিক ১৫ রুবেল দিতেছেন। ইহাতে আমার সমস্ত খরচ পত্র বিনা কষ্টে চলিয়া যায় ; এবং ইহা হইতে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আমি কিছু অর্থ সাহায্য করি। আমাদের দলস্থ প্রত্যেক সভ্যকেই ইহার জন্য চাঁদা দিতে হয়।

সমস্ত শীতকালটী আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। আমার ছাত্রীটি সহরের এক সুদূরপ্রান্তে থাকিতেন ; কাজেই আমাকে প্রতিদিন এই সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া যাওয়া

আসা করিতে হইত। আমার কালেজের পড়ারও তখন যথেষ্ট চাপ ছিল; তা ছাড়া আমি বাহিরের অনেক বই পাঠ করিতে চেষ্টা করিতাম এবং আমার অন্যান্য বন্ধুদের ন্যায় আমি ক্ষুদ্র একটী শ্রমজীবিদের মণ্ডলীর শিক্ষার ভার লইয়াছিলাম। কাজেই রাত্রি দুই ঘটিকার পূর্ব্বে আমি বিশ্রাম পাইতাম না।

শীতের শেষভাগে এক হত্যাকাণ্ড গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রমাণ করিয়া যে নূতন এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তাহা পাঠ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম অবশ্য এই সকল গ্রন্থ বেআইনী (illegal) বলিয়া খ্যাত। একদিন অপরাহ্নে এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিবার জন্য সহরের এক বৃহৎ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলাম। এই দোকানে আইন বিরুদ্ধ গ্রন্থাদির গোপনে বিক্রয় হইত। দোকানে বহুসংখ্যক ক্রেতার মধ্যে তিনটী যুবতীও অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমিও ঢুকিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ একদল কোতোয়াল (Gendormes—the Political Police) দোকানে প্রবেশ করিল এবং একজন রাজকর্ম্মচারী ঘোষণা করিলেন যে গভর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে এই দোকানখানি বাজেয়াপ্ত এবং দোকানস্থ ক্রেতাগণকেও ধৃত করা হইতেছে। ক্রেতা-বিক্রেতাগণ, কেরাণী ও ম্যানেজার প্রভৃতি সকলেই কারাগারে নীত হইলেন। আমরা চারিটী যুবতী একটী বৃহৎ কক্ষে আবদ্ধ হইলাম; সেখানে আরও দশটী যুবতী ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা এই ১৪টী প্রাণী এই একটী কক্ষের ভিতর বাস করিতে লাগিলাম। আপনার বোধ হয় অবিদিত নাই যে রুসিয়ার কারাগারগুলি রাজদ্রোহাভিযুক্ত আসামীতে একেবারে পরিপূর্ণ। আসামীদের একটু বিশ্রাম করিবার কি শয়ন করিবার একটু স্থান পর্য্যন্ত নাই। এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী আসামীদের জন্য স্থান করিবার নিমিত্ত চোর, ডাকাত প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

চৌদ্দটী যুবতীর মধ্যে একটী ব্যতীত আমরা সকলেই বৈপ্লবিক দলভুক্ত।

আমরা কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছি তাহা আমাদের জানান হইল না এবং কোনো প্রকার বিচারও করা হইল না। ইতিমধ্যে দোকানের স্বত্বাধিকারী তাহার দুইজন সহকারী কর্ম্মচারীসহ সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন; কিছুদিন পরেই আমাদের মধ্য হইতে পাঁচটী যুবতীকেও সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হইল।

আমার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাওয়া গেলনা, অতএব জুন মাসের প্রথমভাগে আমি কারাগার হইতে অব্যাহতি পাইলাম। বহুসংখ্যক নরনারীর ন্যায় আমিও এই গ্রীষ্মকালটী নিরক্ষর কৃষকদিগকে শিক্ষিত করার ও তাহাদের নিকট দেশের দুর্গতি জানাইয়া উদ্বোধিত করিবার কর্ত্তব্য গ্রহণ করিলাম। আপনি জানেন আমাদের বহু কোটী কৃষক এক সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র পর্য্যন্ত এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে।

গ্রামগুলির দৃশ্য দেখিলেই ইহাদের দারিদ্র্য কিছু অনুভব করা যায়; ইহারা অরণ্য হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ দ্বারা কুটীরের দেয়াল প্রস্তুত করিয়া ও তৃণাদি দ্বারা চাল নির্ম্মাণ করিয়া কোনো প্রকারে মাথা রাখিবার একটী আশ্রয় রচনা করে। অধিকাংশ গ্রাম নিকটবর্ত্তি রেলের রাস্তা হইতে ২৫, ৫০, ১০০ মাইল, এমন কি ৫০০ মাইল দূরে; কোনো প্রকার যাতায়াতের সুবিধা নাই। সমস্ত পৃথিবীর সহিত যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া এই হতভাগ্য কৃষকদের এই গ্রামগুলিতেই বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কৃষকদের কাছে পৌঁছিতে ও তাহাদিগকে লইয়া কোনো কাজ করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে; কারণ গভর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নগরের উত্তেজনা যাহাতে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। একবার কোনো প্রকারে ধৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ সাইবেরিয়ার প্রান্তে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। আমার আর একটী বিপদের সম্ভাবনা ছিল—রুসিয়ার ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি ইহুদীদিগকে ঘৃণা করিতে আমাদের কৃষকদিগকে বরাবর শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন; অনেক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন যে ইহুদী-হত্যা খুব পবিত্র কর্ম্ম উহাতে কোনোই পাপ হয় না বরং ঈশ্বর ইহাতে প্রীত হন। আমার বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন "ভেরা, যদি কৃষকেরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে যে তুমি ইহুদীবংশীয়া, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে হত্যা করিয়া

ফেলিতেও পারে। অতএব তোমার একখানি ক্রশ ধারণ করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু ক্রশ ধারণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ ইহা দ্বারা সত্যের অপলাপ করা হইবে, আমি তাহা কিছুতেই পারিব না।

যাহা হউক, আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলাম।

সহর হইতে বহুদূরস্থ কোলাহলশূন্য জীর্ণ একখানি গ্রামে উপনীত হইলাম। আমি প্রথমে অবশ্য একটু ভীত হইয়াছিলাম, কিন্তু কৃষকেরা আমাকে যেন সুদিনের বার্ত্তাবাহিকা পরম আরাধ্যা দেবীর ন্যায় গ্রহণ করিতে লাগিল। আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেই রৌদ্রতাপিত, মলিন বহুসংখ্যক রুস স্ত্রীপুরুষ তাহাদের শিশুসন্তান লইয়া অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ কুটীরের প্রান্তে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। কখনও রাস্তার পার্শ্বে বা কুটীরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকটের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিতাম। তাহারা নিবিষ্টচিত্তে আগ্রহসহকারে আমার কথা শুনিত। যে সকল বিষয় যথার্থ তাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহাই কেবল আমি সহজ সরলভাবে একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। আমি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতাম যে যতদিন তাহারা নীরব, নিস্তেজ, হইয়া রহিবে, ততদিন তাহাদের দারিদ্র্য, মূর্খতা, ও দুর্ব্বলতা কিছুতেই ঘুচিবে না।

সমাগত জনতার মধ্যে কখন কখন দুএকটী নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীও উপস্থিত থাকিত এবং তাহারা আমার বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বেই বারম্বার "এই মহিলা সম্রাটের বিরুদ্ধ পক্ষ—উহার কথা কেহ শুনিও না—উহাকে গ্রেপ্তার কর" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিত। আমি বিনীতভাবে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সর্ব্বপ্রথমে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তৎপরে বিচার করিতে অনুরোধ করিতাম। শ্রোতৃবর্গ সর্ব্বদাই আগ্রহসহকারে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন এবং আমার পক্ষই সমর্থন করিতেন।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলে বহুসংখ্যক পুরুষ আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং আমাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাহাদের যাহা উৎকৃষ্ট খাদ্য—কালো রুটী ও কফির সুপ (soup)—আমার সম্মুখে আনিয়া দিত। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কৃষকেরা এই সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে; আলু তাহাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিলাস খাদ্য; অতি কষ্টে আমার জন্য তাহারা কোনো কোনো দিন আলু সংগ্রহ করিয়া আনিত। মাংস খাইতে পারিতাম না—কারণ কৃষকেরা নিজেরাই কখনও মাংস আস্বাদন করে নাই। ইহাদের অপরিসীম দারিদ্র্য স্বচক্ষে না দেখিলে অনুভব করা যায় না। অনেক গ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে কত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হতভাগ্যদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আজ স্মরণ করিতেও হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। কত নিরাশ্রয়া দুঃখিনী জননীকে ঈশ্বরের কাছে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে তাহাদের ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের মৃত্যুভিক্ষা করিতে শুনিয়াছি, কত ক্ষুধিত বালক বালিকাকে হা-অন্ন, হা-অন্ন, করিয়া পথে পথে আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়াছি। দুর্ভিক্ষের এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি কল্পনাও করিতে পারিতাম না।

রাত্রিকালে তাহারা আমাকে একটা ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে লইয়া যাইত। অতি সংকীর্ণ রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ জন লোক বাস করে। এবম্বিধ একটা কুটীরে আমার মেষ চর্ম্মের overcoatটী কর্দ্দামাক্ত মেজের উপর বিছাইয়া কোনো প্রকারে নিদ্রিত হইতাম।

এক একটী গ্রামে আমার কাজ সমাপ্ত হইলে আমি অন্য গ্রামে যাইতাম; কোন কোন উৎসাহী কৃষক তাহাদের ক্ষুদ্র জীর্ণ অশ্ব বাহিত শকটে আমাকে পরবর্ত্তী গ্রামে লইয়া যাইত। অশ্বগুলিও যথেষ্ট আহার না পাইয়া নিতান্ত হীনশ্রী দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছে। একদিন একখানি গ্রামে পৌঁছিতেই দেখিলাম অনেকগুলি কুটীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে এবং বহুসংখ্যক কসাক্ সৈন্য নির্দ্দয়রূপে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদিগকে পীড়িত করিতেছে। অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম বহুকাল অবধি নিকটবর্ত্তী এক জন সামান্য তালুকদার রুসিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের অনুকরণে এই গ্রাম-বাসীদের প্রতি অশেষ উৎপীড়ন করিতেছিল; অবশেষে কিছুদিন হইল কতিপয় অধিবাসী ইহার গৃহ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। আজ তাহারই দণ্ড স্বরূপ কসাকগণ দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে গ্রামবাসীদের জীর্ণ গৃহগুলি ভস্মীভূত করিবার ও তাহাদের

নৃশংসরূপে বেত্রাঘাত করিবার অভিপ্রায়ে অকস্মাৎ এই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।

আমি এই কাসাকদের কর্ত্তৃক ধৃত হইলে ইহারা যে সহজেই আমার পরিচয় পাইবে এবং আমাকে এখানেই যে হত্যা করিবে, আমার সঙ্গী বৃদ্ধ কৃষকটীও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া যাইবার ত আর সময় নাই। কৃষক সুচতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল "সম্ভ্রান্ত মহিলা, আপনি শুইয়া পড়িয়া আপনার শাল খানিতে মুখ ঢাকিয়া রাখুন কোনো শব্দ করিবেন না।" কৃষক আস্তে আস্তে গ্রামে উপনীত হইলে একজন কসাক্ তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিয়া গাড়ী থমাইতে বলিল ও তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আমি শুনিলাম কসাক্ বলিতেছে "কিরে আয় গাড়ীর ভিতর থেকে বাহিরে আয়; তুই এমন করে পালাতে চেষ্টা করেছিস্ বলে তোকে সবচেয়ে বেশী বেত্রাঘাত কর্ত্তে হবে। বের হ! মজা দেখ্‌বি নিঃসহায় বৃদ্ধ কৃষক ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিল "প্রভু, আমি অন্য গ্রাম হইতে আসিতেছি; আমি আমার মেয়েকে ডাক্তারের কাছে লইয়া চলিতেছি। ধর্ম্মাবতার, সে বড় রুগ্ন তাহার দুরন্ত বসন্ত রোগ হইয়াছে।" কসাক তদুত্তরে গালি দিতে দিতে বলিতে লাগিল "রে গর্দ্দভ, মূর্খ, তবে গাড়ী থামিয়েছিস্ কেন? যা, শিগ্‌গির এ গ্রাম থেকে বের হ" এই বলিয়া নিরীহ অশ্বটার উপর এক কশাঘাত করিল। অশ্ব বেদনা পাইয়া তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে গ্রাম পার হইয়া আসিল। গ্রামের মধ্য দিয়া আসিবার সময় উৎপীড়িত নরনারীর আকুল ক্রন্দনধ্বনি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল আমি তাহাদের জন্য কিছু করিতে পারিলাম না—শুধু সেই সর্ব্বগ্রাসী বহ্নিপ্রধূমিত, শ্মশানে পরিণত গ্রামটীর দুরবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিলাম।

এই ভাবে সমস্ত গ্রীষ্মকালটী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় শত গ্রাম, পরিদর্শন করিতে পারিয়াছিলাম, আমার নিরক্ষর কৃষক ভ্রাতা ভগিনীদের কাছে যথাসাধ্য দেশের দুরবস্থা ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ব্বর অশিক্ষিত কৃষকদের কাছে আমি যেমন সরল, উদার ব্যবহার পাইয়াছি, আমার জীবনে তাহা কোনোদিন সম্ভোগ করি নাই, ইহা যে কেবল আমিই অনুভব করিয়াছি, এমত নহে, যে সকল যুবক যুবতী এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

শরৎ কালের প্রথম ভাগে আমাদের কালেজ খুলিলে আমি দ্বিগুণতর উৎসাহের সঙ্গে সৈনিকদিগের মধ্যে প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৈনিকগণ প্রচারিকাদের কত ভক্তি করে, তাহাদের সমস্ত প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কত চেষ্টা করে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার দুইটী বন্ধু ব্যারাকে এক সভার আয়োজন করিলে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে বহু সৈন্য মিলিত হইয়াছিলেন তাহারা আমাকে ভোজনাগারের প্রশস্ত গৃহে এক টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া আমার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। উৎসাহী স্বদেশানুরাগী শতধিক সৈনিকের সম্মুখে আমি প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলাম; আমার বক্তৃতায় চতুর্দ্দিকে যখন গভীর উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ গৃহ প্রবেশ দ্বার হইতে হুকুম আসিল "উহাকে গ্রেপ্তার কর।" আমরা চমকিয়া উঠিলাম। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দরজার পাশে আমার পরিচিত একজন যুবা রাজকর্ম্মচারী প্রিন্স ম—দণ্ডায়মান।—তিনি ভ্রমবশতঃ কতগুলি সংকারী কাগজ-পত্র ব্যারাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে রাত্রিকালে পুনরায় আফিসে আসিতে হইয়াছে; এবং সেখান হইতে ভোজনাগারে এক অপরিচিত নারী-কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া একবার পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আমি দৌড়াইয়া পলাইবার উদ্দেশ্যে টেবিল হইতে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িলাম; কিন্তু সে চেষ্টা নিতান্তই বৃথা। আমি নীচে নামিতেই দুইজন সৈনিক আমার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম আমার শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে; এমনি সময় কে যেন আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন "আপনি পলাইবার কোনো চেষ্টা করিবেন না—কোনো কথাবার্ত্তাও বলিবেন না" আমি ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম যে আমার বন্ধু দুইটীই আমাকে ধরিয়াছিলেন। আমরা প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে কর্ম্মচারী আমাকে কারাগারে (Barrack

prison) লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। আমাকে যাহাতে প্রিন্স ম—চিনিতে না পারে সেই জন্য আমি আমার মুখ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম আমি ও আমার বন্ধু দুইটী বরফাচ্ছাদিত অন্ধকার রজনীর ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে কারাগারাভিমুখে চলিতেছি;—কিছু দূর আসিতেই তাহারা আমার হাত মুক্ত করিয়া বলিলেন "পালাও"। আমি তীরবেগে ছুটিয়া রাজ পথে আসিয়া পৌছিলাম। কিছুক্ষণ দিশা-হারা হইয়া রাজ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে বাড়ী পৌছিলাম।

অতি অল্প কাল মধ্যেই আমার গৃহদ্বারে লোকের সাড়া পাইলাম। দ্বার খুলিয়া দেখি আমার সৈনিক বন্ধুদ্বয়ের আত্মীয় একজন সৈনিক আমাকে অভিবাদন করিয়া জানাইলেন যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধে তাহার বন্ধু দুইটী ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ইহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া এই সংবাদ জানাইতে ও কিছুতেই আমার নাম পরিচয় প্রকাশ পাইবে না এই কথা জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে উহাদের সম্পর্কে গুরুতর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে নাকি?" সৈনিক উত্তর করিল "হাঁ, তাহাদের গুলি করা হইবে।" আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলাম। সৈনিকটী চলিয়া গেলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা প্রকার চিন্তা আমার হৃদয় মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি ভাবিলাম আমার সামান্য একটা জীবনকে বাঁচাইবার জন্য আমি কখনও এই দুইটী সাহসী স্বদেশ-প্রেমিক, সৈনিককে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দিব না। ইহাদিগকে রক্ষা করিতে আমি সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিলাম।

সমস্ত প্রকার সন্দেহের হাত হইতে এড়াইবার নিমিত্ত মাসিমাতার উপহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমি প্রিন্স ম—এর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তুষারাবৃত রাজপথ বাহিয়া রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় প্রাসাদে উপনীত হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম প্রথমে ভৃত্যদের জাগাইয়া পরে তাহাদের সাহায্যে প্রিন্সের কাছে পৌছিতে হইবে; কিন্তু ভৃত্যগণ নিদ্রিত ছিল না; আমি পৌছিতেই তাহারা আমাকে একটী উজ্জ্বলালোক মণ্ডিত সুসজ্জিত ভোজনাগারে লইয়া গেল। আমি দেখিলাম বিস্তীর্ণ টেবিলের এক পার্শ্বে প্রিন্স ও অন্য তিনটী যুবা রাজকর্ম্মচারী উপবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চারিজন স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; ইহারা কোন্ শ্রেণীর মহিলা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম।

সে যাহা হউক, আমি গৃহে প্রবেশ করিতেই একজন সুরাপান বিভোর রাজকর্ম্মচারী টলিতে টলিতে আমার কাছে আসিয়া কুৎসিৎ আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রিন্স ম—আমাকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন এবং অফিসারকে তিরস্কার করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন যথারীতি অভিবাদন করিয়া প্রিন্স ম—আমাকে পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া চলিলেন; সেখানে আমি উপবিষ্ট হইলাম প্রিন্স দ্বার রুদ্ধ করিয়া এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আমার বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। প্রিন্স ম—অতি সুশ্রী যুবা পুরুষ। তাহার উন্নত দেহ, গাঢ় কৃষ্ণ গুম্ফ উজ্জ্বল মুখশ্রী, রাজোচিত গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু হায়! সুরাপানে তাহার মুখশ্রী লাবণ্য-হীন হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহাকেই একটু শান্ত, সংযত, ও প্রকৃতিস্থ দেখিলাম।

আমরা উভয়ে উপবিষ্ট হইলে আমি আর বিলম্ব না করিয়া আমার আসিবার উদ্দেশ্যটী বলিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলাম "আজ রাত্রে একজন যুবতীকে ব্যারাক্ হইতে পলাইয়া যাইতে সাহায্য করার অপরাধে আপনি, দুই জন সৈনিককে ধৃত করিয়াছেন।" ইহা বলিতেই তাঁহার নেশা যেন ছুটিয়া গেল। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, কিন্তু তুমি—তুমি কি করিয়া জানিলে?" আমি ইহার কোনো উত্তর না করিয়া বলিলাম "তাহাদের নাকি গুলি করা হইবে।" প্রিন্স—"হাঁ নিশ্চয়ই তাহাদের সমুচিত শাস্তি হইবে।"

আমি—"প্রিন্স, ঐ সৈনিকেরা আমার বন্ধু উহাদের গুলি করা হয়, ইহা কিছুতেই আমার সহ্য হইবে না।"

প্রিন্স—"আচ্ছা, তবে না হয় তাহাদের শাস্তিটা একটু লঘু করিয়া দেওয়া হইবে।"

আমি—"প্রিন্স ম—আমি সেই অপরাধিনী রমণী,

আপনার কাছে ধরা দিতে আসিয়াছি আপনি নিরপরাধ সৈনিক দুইটীকে বিনাশ করিবেন না।"

এতক্ষণে প্রিন্স আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়া সচকিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন তুমি, ভেরা সেজোনোভা-- অবশেষে বিপ্লবকারীদের দলভুক্ত হইয়াছে!

আমি উত্তর করিলাম—হাঁ, আমিই সেই যুবতী।

প্রিন্স--তুমি কি তবে তাহাদিগকে মুক্তিদানের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিবে?

আমি কহিলাম "হাঁ।" প্রিন্স নীরব হইলেন; বহুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অবশেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন--

"না, ভেরা, কেনইবা তুমি এমন করিবে ঐ দুইটী সৈনিক ত সামান্য কৃষকের বাচ্চা; ওদের থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। ওদের জীবনের কি কিছু মূল্য আছে?"

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝাইয়া দিলাম যে ঐ নির্দোষী সৈনিক বন্ধু দুইটীর পরিবর্ত্তে আমি মৃত্যুদণ্ড বরণ করিয়া লইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি। প্রিন্স পুনরায় বহুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "ভেরা, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না; সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া খুব সহজ নহে; আমাকে একটা কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। তবে ঐ সৈনিক দুইটীই যে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আমি তাহার কোনো বিশিষ্ট প্রমাণ পাই নাই; কারণ গৃহে তেমন বেশী আলো ছিল না।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—"আপনি তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিবেন?"

প্রিন্স উত্তর করিলেন "আমি বলিতেছিলাম যে হয়ত কাল প্রাতে ধৃত সৈনিক দুইটীকে যথার্থ অপরাধী বলিয়া নাও চিনিতে পারি।"

আমি—তবে তাহারা মুক্তি পাইবে!

প্রিন্স—হাঁ।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। প্রিন্স আমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করিলাম; কারণ আমার বাসস্থান তাঁহার জানা থাকা আমার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। বিদায় হইবার কালে তিনি আমাকে বিপ্লবকারীদের উদ্দেশ্য, কার্য্য প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো সময় তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে অনুরোধ করিলেন।

আমি সম্মত হইয়া একদিন কোন স্থানে মিলিত হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; আমি অভিবাদন করিয়া পুনরায় মহা নিস্তব্ধ, নিরানন্দ, তুষারাবৃত রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় একঘণ্টা পর গৃহে উপনীত হইলাম।

পাঠক! ভেরার কাহিনী এখানেই শেষ হইল না। মিঃ লিরয়-স্কট্ কিছু দিন হইল সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে কোনো বন্ধুর চিঠিতে অবগত হইয়াছেন যে ভেরা সেজো-নোভা ক্রনষ্টাড্ (Kronstadt) সহরের সৈনিকাবাসে ধৃত হইয়াছিলেন এবং পরদিনই তাহাকে গুলিকরা হইয়াছে।

শ্রীনঃ।

[শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া ইহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই এটিকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। * *

"রুসিয়ার যে পদ্ধতিতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহারই অধিকাংশ নকল করিবার চেষ্টা যদি কাহারো মাথায় আসে সেটা আমি কল্যাণকর মনে করি না। আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সামাজিক পুনর্গঠন আবশ্যক হইয়াছে তাহা উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবের মধ্যে হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। * * * নিজেদের মধ্যে বন্ধনকে পরস্পরের সেবা দ্বারা, সাধারণ হিতবুদ্ধির নিয়ত চর্চ্চা দ্বারা, দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে—পরের প্রতি বিরোধ উদ্রেক করিয়া সে শক্তির অপব্যয় করা ক্ষতিকর।

"আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে রাজ-শাসন এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা দেশের লোকের হিংস্র প্রবৃত্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে উত্তেজিত হইয়া

উঠিতেছে। উপায়হীন দুর্ব্বলের প্রতি প্রবল পক্ষ যখন বিভীষিকা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন তখন দুর্ব্বলেরা চিত্ত-জ্বালায় কুটিল পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে প্রবলের অধর্ম্ম দুর্ব্বলকে দুর্নীতির দিকে টানিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় দুর্ব্বলপক্ষ ত্রাসজড়ত্ব অথবা গুপ্তক্রূরতা এই দুই প্রকার বিপদের সঙ্কটে পড়ে। এই উভয় অবস্থাই পৌরুষের বিকার জনক। ভারতশাসনকার্য্যে আমরা নৈতিক অধোগতি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি—এই দুর্গতির কালে আমরা যদি চারিত্রনীতির বল দেখাইতে পারি তবেই আমরা যথার্থ জয় লাভ করিব। কষ্ট পাওয়াটাই পরাভব নহে কষ্টের তাড়নায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই পরাভব। রাজনীতির মধ্যে আমরা ছলনা দেখিতে পাইতেছি—তাহার একটা দৃষ্টান্ত প্যুনিটিভ পুলিসের উৎপাত। যে সকল গ্রামে কোনো প্রকার অসামান্য উৎপাত এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে সাধারণ শাসনবিধি পরাস্ত হয় সেই স্থানে দৌরাত্ম্যশাসনের উপলক্ষ্য করিয়া কোনো প্রকার বিচারের বিড়ম্বনা মাত্রও না রাখিয়া বিশেষ বিশেষ লোকদের প্রতি বিশেষ ব্যয় ভার চাপাইয়া নির্দ্দয়তা করার মধ্যে সত্যও নাই পৌরুষও নাই—অথচ ইহার লজ্জাকরতা আমাদের শাসনকর্ত্তারা অনুভব মাত্র করিতেছেন না। এই-রূপ ঘটনায় ছলনার বিরুদ্ধে আমাদের চরিত্রেও যদি ছলনা ও ক্রূরতা জন্মে তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আশুপ্রয়োজনসাধনের প্রলোভনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই দুর্ব্বলের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বিপদ। 'বয়কট' উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি। বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় যাহাদের উপজীবিকা এবং বিদেশী সামগ্রী ক্রয়ে যাহাদের প্রয়োজন বা অভিরুচি তাহাদের প্রতি অন্যায় জবরদস্তি করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রয়োজন ঘটিলে অন্যায় করা যাইতে পারে আমরা তাহার নজীর স্বরূপে বলিয়া থাকি ইংলণ্ডেও এক সময়ে ভারতীয় পণ্য বন্ধ করিবার জন্য জবরদস্তি করা হইয়াছিল। আমরা সেরূপ আইন করিয়া অত্যাচার করিতে পারি না কাজেই আইন লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করিতে হয়। জগতে অধর্ম্মের নজির খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। কিন্তু নজি-রের জোরে অন্যায় কখনই ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারে না। আমরা স্বদেশহিতের দোহাই দিয়া লোকের স্বাধীন অধিকারে যখনই হস্তক্ষেপ করিয়াছি তখনি সেই স্বদেশহিতের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছি। ধর্ম্মের নাম দিয়া বা কর্ম্মের নাম দিয়া যে কোনো উপলক্ষ্যেই স্বাধীনতাকে অপমান করিবার অভ্যাস আমাদিগকে স্বাধীনতালাভে অনধিকারী করিয়া তুলে। আমরা লবণ ব্যবসায়ীর লবণ যদি জোর করিয়া অন্যায় করিয়া জলে ফেলিয়া দিই তবে কেবল যে লবণ ফেলিয়া দিই তাহা নহে সেই সঙ্গে স্বাধীন মনুষ্যত্বলাভের অধিকারকেও জলাঞ্জলি দিই। স্বভাবকে এই উপায়ে এমন বিকৃত করিয়া তুলি যে মতের অনৈক্য বা ব্যবহারের অনৈক্যকে আমরা সহ্য করিতেই পারি না—সমস্তই গায়ের জোরে উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের জোরে একাকার করিয়া দিতে চাই। যাহারা এইরূপ অসংযত উপদ্রবকে মঙ্গলসাধনের উপায় বলিয়া জানে, যাহারা নিজের মতরক্ষা ও প্রয়োজন সাধনের বেলাতেই আইন স্বীকার করে তাহার অন্যথা হইলেই আইন ঠেলিয়া ফেলিতে বিলম্ব করে না, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙ্গালীই হউক, রাজাই হউক আর প্রজাই হউক, যে ডালে বসিয়া আছে সেই ডালে তাহারা কুঠার মারে—তাহাদিগকে মাটিতে পড়িতেই হইবে। আমরা অধীন জাতি, এবং আমাদের রাজা আমাদের শক্তিলাভের প্রতিকূল বলিয়াই আমাদের স্বদেশহিতের চরম সাধনায় অধর্ম্মই আমাদের সহায় এই কথা যদি বলি তবে এই বলা হয় যে ধর্ম্ম স্বদেশহিত নহে, স্বদেশহিত পাপেরই পুরস্কার। দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম নহে এই ভয়ঙ্কর দুর্ব্বুদ্ধি হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা কোনো মতেই সত্য হইতে ন্যায় হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই—আমরা বড় দুঃখের সময়েও যেন কাপুরুষের ন্যায় কোনো প্রকার গোপন উৎপাতের পন্থা অবলম্বন না করি। রাজনীতি যখন কলুষিত হয় তখন প্রজা যেন ধর্ম্মের দ্বারা সেই কলুষের উপরে জয়ী হইতে পারে;—এইরূপ ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা লাভকে অনেক অদূরদর্শী আপাত পরাজয় বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা দ্বারাই আমরা আমাদের সকল দুঃখ অপমানের ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিতে পারিব। দুঃখের বিষয়, বিপ্লবের নিদা-রুণতা সম্বন্ধে য়ুরোপের দৃষ্টান্তকেই আমরা একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যে খৃষ্টান সাধুগণ রোম সম্রাটের উৎপীড়ন ধর্ম্মবলে সহ্য করিয়াছেন তাঁহারা মৃত্যুদ্বারাই

সম্রাট্‌কে পরাভূত করিয়াছেন। সেই জন্যই বারবার আমাদিগকে একথা বলিতে হইবে দর্পান্ধ প্রবলতার দ্বারা আমরা যদি দলিত বিদলিত হইতে থাকি তথাপি ধর্ম্ম আমাদিগকে এমন করিয়া জয়ী করিতে পারেন যে আমাদের সমস্ত অবমাননার ভার অপমানকারীকেই অবনত করিয়া দিবে। সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

'সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে—
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্ অবমন্তা বিনশ্যতি।'

ইহার অর্থ এই, যে, হীনচরিত্রের জড়ত্ব দ্বারা নহে কিন্তু ধর্ম্মশক্তির প্রবল মাহাত্ম্য দ্বারা আমরা সমস্ত অপমানকে আনন্দে অস্বীকার করিতে পারি কিন্তু যে অবমন্তা সেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, তাহার অন্যায় অবমাননা অন্যকে বাহিরে আঘাত করে কিন্তু তাহার নিজেকে অন্তরে আক্রমণ করিয়া থাকে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূর্য্যাস্ত।

সূর্য্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক অন্ধকারে লেগে'
ভেঙে' গেছে। চূর্ণ হ'য়ে, ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেন একটা ঝড়ে
শু'য়ে আছে বর্ণগুলি চারি ধারে আকাশে ও মেঘে!—
যেন একটা বর্ণ-সৈন্য মরে' আছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পড়ে';
যেমন একটা মহানদী বহে' গিয়ে—পূর্ণ, খরবেগে,
শেষে, শাখা উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে;
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে'
ঘুমিয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্চ্ছনাতে বেজে';
যেন শিশুর সুপ্ত হাস্য; প্রতিভার সুগভীর প্রলাপবাণী;—
মাতার চিন্তা; কবির বিলাপ; প্রণয়ীর বিরহ-স্বপ্নখানি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কুকি ও মিকির।

আসামের নাগা ও আরাকানের মগদিগের প্রতিবেশী কুকিদিগের অধ্যুষিত দেশ কোলাডাইন অধিত্যকা হইতে উত্তর কাছাড় ও মণিপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৭৯৯ সালে আসিয়াটিক রিসার্চেস (Asiatic Researches, Vol. vii) নামক পত্রিকায় ইহাদের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহারা শিকারী ও যোদ্ধার জাতি। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত; প্রত্যেক দল বিশেষ পরিবার হইতে নির্ব্বাচিত দলপতি বা রাজার অধীন। ইহারা মগবংশসম্ভূত এইরূপ ঐতিহ্য। দুর্গম পাহাড়ের উপর ইহারা খুয়াঃ অর্থাৎ গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। প্রতিগ্রামে ৫০০ হইতে ২০০০ অধিবাসী থাকে। ইহাদের গৃহের পোঁতা ৪ হাত উচ্চ, পোঁতার মধ্যে গৃহপালিত পশুসকল রাখা হয়। যখন ইহারা যুদ্ধ যাত্রা করে তখন পথে গাছের উপর ঝোলা টাঙাইয়া তাহাতে রাত্রি বাস করে। ইহারা ইহাদের প্রতিবেশী বাঞ্জুগীদিগের চিরশত্রু ছিল; সুবিধা মত আক্রমণ করিতে পারিলে শিশু ভিন্ন ইহাদের হস্তে কেহই অব্যাহতি পাইত না; শিশুদিগকে ধরিয়া আনিয়া আপনাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লইত। চৌর্য্যে দক্ষতা ইহাদের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য হইত। চুরি করিতে গিয়া যে ধরা পড়ে তাহার মত হেয় আর কেহ নহে। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ চলে না, কিন্তু পত্নী থাকা সত্ত্বেও উপপত্নী রাখা চলে। ইহারা পরজন্ম বিশ্বাস করে; ইহাদের বিশ্বাস যে যত হত্যা করিতে পারে পরজন্মে সে তত সুখে থাকে। পরমেশ্বরের নাম 'খোগেন পুটিয়াং' ইহারা 'শেম শ্যাঙ্ক' নামক আর এক দেবতার পূজা করে; এই দেবতার নরাকার দারুমূর্ত্তির সম্মুখে হত শত্রুর মস্তক প্রদান করে।

চট্টগ্রামের জঙ্গলে কুকিদিগের মধ্যেই বিভিন্ন শাখায় আকারগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইতে নোংরা য়ুরোপীয়ের মত শ্বেতাঙ্গ কুকি দেখা গিয়াছে। আকার সাদৃশ্যে কেহবা মণিপুরীর মত কেহবা খাসিয়াদের মত মোঙ্গোলীয় ছাঁচের—চেপ্টা মুখ, পুরু ঠোঁট।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কাছাড়ের দক্ষিণ পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়। স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের প্ররোচনায় এখন কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং কুকি ও মিকির উত্তর কাছাড়ের সর্ব্বোত্তম প্রজা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (কেন? নিরীহ অজ্ঞানদিগের নিকট হইতে ধনাপহরণ অক্লেশ বলিয়া কি?) সম্প্রতি কুকিদিগের চারিটি বৃহৎ শাখা—থদন, শিংসন, চংসেন ও লুহুনুগুম—লুশাই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসে;

তাহাদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং ইহাদিগের মধ্য হইতে বাছা বাছা ২০০ লোক লইয়া তাহাদেরই দলপতির অধীনে সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত সীমান্ত সৈন্য সংগঠিত হইয়াছে।

প্রত্যেক দলের এক একজন রাজা আছে; তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা ইহারা গৌরব ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। সকল রাজাই এক দেবাংশসম্ভূত বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। এজন্য রাজারা পবিত্র বলিয়া গণ্য হন, এবং সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ভক্তি করে। বৎসরে এক ঝুড়ি চাল প্রায় দুই মণ, প্রত্যেক বারের শূকর বা মুরগীর ছানার মধ্য হইতে একটি করিয়া ছানা, শিকারে হত জন্তুর চতুর্থাংশ ও চারিদিনের বেগার খাটুনি রাজার প্রাপ্য। রাজা থুস্‌পে বা মন্ত্রীসভার সাহায্যে বিচার করেন। ইহাদের আইনে রাজদ্রোহীই কেবল প্রাণদণ্ডার্হ। সাধারণ নরহন্তা সপরিবারে রাজার দাস্যে নিযুক্ত হয়। চোর শুধু আপনিই বন্দী দাস হয়। ব্যভিচার বা কুলত্যাগে স্বামী বা পিতা আপন অভিপ্রায় ও শক্তি অনুসারে দোষীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। ব্যভিচার সামাজিক দোষ বলিয়া গণ্য হইলেও কি বিবাহিতা কি কুমারী সকল রমণীই রাজার ইচ্ছাভোগ্যা।

কুকিরা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তাঁহাকে ইহারা 'পুথেন' বলে। পুথেন দয়াময় সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং ইহপরত্রে তিনি সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পত্নীর নাম 'নঙ্গজর'; তিনি ব্যাধি দূর করিতে ও প্রদান করিতে সক্ষম বলিয়া এবং পুথেনের কাছে দোষীর দণ্ড হ্রাসের জন্য ওকালতি করিতে পারেন বলিয়া, নঙ্গজর পূজাপ্রাপ্ত হন। ইঁহাদের পুত্র 'থিলা' অতি কঠিন প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতা; তাঁহার স্ত্রী 'ঘুমো' যেন রায়বাঘিনী। পুথেন-পুত্র থিলার উপপত্নীজ পুত্র 'ঘুমৈশী' অশুভসমূহের দেবতা; তাঁহার স্ত্রী 'খুচোয়ান' স্বামীর মতই অশুভ সংঘটনপটীয়সী; ইঁহাদের নিকট কখন কিছু প্রার্থনা করা হয় না; কিন্তু ইঁহাদের কোপ শান্তির জন্য বলি প্রদত্ত হয়। ইঁহাদের কন্যা 'হিলৌ' জনক জননীর মতই মন্দকারিণী; ইনি যাহার উপর কুপিত হন তাহার খাদ্য অস্বাস্থ্যকর করিয়া দেন। কুকিদের গৃহদেবতার নাম 'খোমোজনো'। এতদ্ভিন্ন বন, নদী, পর্ব্বত ও প্রত্যেক ধাতুর এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

প্রায় সকল অসভ্যজাতির মত কুকিদেরও বিশ্বাস যে দেবতার কুপ্রভাবেই রোগের উৎপত্তি হয়; এবং বলিদান করিয়া তাহাদের তুষ্টিসাধন করিতে পারিলেই রোগের উপশম হয়। কোনো কোনো রোগ নির্দ্দিষ্ট দেবতার কুদৃষ্টি বলিয়াই জানা আছে; যেমন পেটে বেদনা জন্মানো হিলোর কর্ম্ম। কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট দেবতার রোগে 'থিম্পু' নামক ওঝার শরণাপন্ন হইতে হয়। এই ওঝাগিরি কর্ম্মে কাঠিন্য কিছু না থাকিলেও বিশেষ লাভজনক নহে বলিয়া কেহ এই ব্যবসায় করিতে চাহে না; এজন্য রাজাকে মধ্যে মধ্যে জোর জবরদস্তি করিয়া ইহাদিগকে আপন ব্যবসায়ে লিপ্ত রাখিতে হয়। থিম্পু আহূত হইয়া আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে, মহাবিজ্ঞের মত গোটাকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তাহার উত্তর হইতে স্থির করে কোন দেবতাকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে হইবে। যদি একটা মুরগী বলিই যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তবে থিম্পু তাহা মারিয়া পুড়াইয়া যে স্থানে প্রথম রোগী অসুস্থ হয় সেই স্থানে বসিয়া খায় এবং যাহা খাইতে পারে না তাহা বলিরূপে জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়; শূকর বা কুকুর বলি হইলে থিম্পু একাকী খাইতে অশক্ত বলিয়া আরো দুই চারি জনকে নিমন্ত্রণ করে; এবং মহিষ বলি হইলে মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়।

কুকিদিগের স্বর্গ কোনো উত্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত; সেখানে ধান্যাদি শস্য আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং সেখানে পর্য্যাপ্ত শিকার পাওয়া যায়। হত শত্রুগণ সেখানে অনুগত দাস হইয়া সেবা করিবে, এবং যে সকল পশু তাহারা এ জীবনে আহার করিবে, তাহারাই পরজীবনে গৃহপালিতরূপে উপস্থিত থাকিবে। এই জন্য ইহারা খুব অতিথি বৎসল হয়।

কুকিরা যাযাবর অথচ সামাজিক জাতি; কোনো স্থানে তিন বৎসরের বেশি থাকে না, অথচ ইহাদের নিত্য নূতন গ্রামেও হাজার ঘর বসতির কম থাকে না। কোনো গ্রাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে রাজা একটি নূতন স্থান মনোনীত করেন এবং সেখানে প্রথমে তাঁহারই বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা পথ রাখিয়া তাহারই দুধারি সারি সারি গৃহ নির্ম্মিত হয়। বাড়ীর পোঁতা উঁচু হয় এবং

বাড়ীর আকার পরিবারস্থ পরিজন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রাজার বাড়ী নিয়ম বহির্ভূত; কখনো কখনো ১৫০ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চৌড়া হয়। যখন সকলের বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়া যায় তখন রাজবাড়ী কাঠের বেড়া দিয়া সুরক্ষিত করা হয়, তাহার পর সকল গ্রামপথে আগড় দিয়া সমগ্র গ্রাম গড়বন্দী করা হয়। প্রত্যেক আগড়ের কাছে দেউড়ি ঘর নির্ম্মিত হয়, সেখানে যুবকেরা পাহারা দেয় ও রাত্রে বাস করে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে থাকিতে কুকিরা অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য পর্ব্বতশীর্ষে গ্রাম পত্তন করিত; কাছাড়ে নামিয়া আসিয়া অবধি কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে আপনাদের গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। আসামে দেখা যায় কুকিরা পাহাড় ছাড়িয়া প্রথম আসিয়া বড় বড় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, অবশেষে আপন আপন কৃষিক্ষেত্রে গোলাবাড়ী করিয়া পরস্পরে বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

কুকিরা পাকা তামাক খোর এবং অঙ্গমী নাগার মত তামাকের তেল পান করিতে ভালো বাসে।

কন্যাজন্মের তিন দিন পরে ও পুত্রজন্মের পাঁচ দিন পরে শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভোজ দেওয়া হয়। শিশুর মাতা অন্ন চিবাইয়া পাখীর মত মুখে মুখ দিয়া শিশুকে অন্ন খাওয়ায় এবং স্তন্যত্যাগ না করা পর্য্যন্ত এইরূপে মধ্যে মধ্যে শিশুকে খাওয়ায়। ১২।১৩ বৎসর বয়স হইলে কোনো বালককে গৃহে রাত্রিবাস করিতে দেওয়া হয় না; তাহাদিগকে দেউড়ি ঘরে আশ্রয় লইয়া পাহারার ভাগ লইতে হয়।

বিবাহার্থীকে কন্যা ক্রয় করিতে হয়; কন্যার মূল্য ৩০৲ টাকা বা কন্যাগৃহে দুই বৎসর দাসত্ব। দেনা পাওনার নিষ্পত্তি হইয়া গেলে কন্যার পিতার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণে উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের সম্মিলন হয়। পরদিন প্রভাতে বরবধূকে খিম্পুর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়; খিম্পু এক ভাঁড় মদ দেয় বরবধূ তাহা পান করে; তৎপরে খিম্পু বরের গলায় দুই খেই সূতা বাঁধিয়া দেয় এবং বরবধূকে এক একখানি চিরুণী উপহার দিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করে। বরের গলার সূতা আপনি পচিয়া ছিঁড়িয়া না গেলে খুলিয়া ফেলা হয় না, ছিঁড়িয়া গেলেও আর নূতন পরিতে হয় না। বৈবাহিক চিরুণী খুব পবিত্র ও শুভকর বিবেচিত হয়; চিরুণী হারাইয়া যাওয়া বড় কুলক্ষণ। স্বামী স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ সেই বৈবাহিক চিরুণী ব্যবহার করিতে পারে না। যখন কাহারো মৃত্যু হয় তখন তাহার চিরুণী তাহার শবের সহিত প্রোথিত করা হয় এবং তাহার নিকট আত্মীয়গণ তাহাদের চিরুণী ভাঙিয়া কয়েক দিন এলো চুলে থাকিয়া নূতন চিরুণী কাড়ে।

কুকিদের জাতীয় পরিচ্ছেদ নাগাদেরই মত সামান্য হাল্কা রকমের। ইহারা মাথায় পাগড়ী বাঁধে, ধনীরা 'হাতী পাখীর' পালক ও রঞ্জিত ছাগলোমের লাল ফিতা দিয়া সেই পাগড়ী সজ্জিত করে। রাজারা বনকাকের লম্বা ল্যাজের পালক পাগড়ীতে পরে। ঘাড়ের থলি ও দা গুঁজিবার পেটির চামড়ার উপরে কড়ির সারি বসানো। দা তিন কোণা অস্ত্র। ছাগলের দাড়ি শুদ্ধ গলার চামড়া কাটিয়া পায়ে গার্টার বাঁধে। বল্লম ইহাদের অপর অস্ত্র; কিন্তু ইহারা দা ও গণ্ডার চর্ম্মের বর্ম্মের উপরই বেশি নির্ভর করে। একটা গণ্ডার চর্ম্ম গলা হইতে ঝুলাইয়া গায়ের চারিদিকে জড়াইয়া বর্ম্ম করা হয়। অধিকন্তু মহিষ চর্ম্মের ঢাল ও যুদ্ধের সময় 'পঞ্জি' ব্যবহার করে। কুকিরা নুড়ির মালা পরে, এবং পুরুষপরম্পরাগত বলিয়া ইহা বহুমূল্য বিবেচিত হয়। 'টেনো' নামক একখণ্ড প্রস্তরের তিন হাজার টাকা মূল্য বিবেচিত হইয়াছিল।

কুকিদের প্রায় লুপ্ত প্রাচীন ভাষার গান একেবারে কবিত্বভাববির্জ্জিত নহে। 'খোয়েন' নামক বাদ্যযন্ত্র অনেকটা সাপুড়ের তুবড়ীর মত, একটা লাউয়ের তুম্বার মধ্যে ছিদ্রকরা, বাঁশের নল ঢুকাইয়া ফুঁ দিয়া ইচ্ছামত স্বর বাহির করে। যখন খুব জমকালো বাজনার আবশ্যক হয় তখন বাঁশীর তালে তালে কাঁসর পিটিয়া তুমুল শব্দ করে।

কুকিরা তাহাদের মৃতদিগকে কবর দেয়, কিন্তু দরিদ্রতম ব্যক্তিরও শব কবর দিবার পূর্ব্বে কয়েকদিন বাহির দিয়া রাখা হয়। বড় লোকের শব শুকো আগুনের আঁচে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া পোষাক ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া এক মাস দুই মাস রাখিয়া দেয়; এই সময়ে নিত্য মহাভোজের আয়োজনে গৃহদ্বার নিরন্তর অবারিত থাকে। অবশেষে খাদ্য পানীয় ও অন্ত্যেষ্টি ভোজে নিহত পশুকরোটি সকল দিয়া শব প্রোথিত করা হয়। কবরের চারিধারে

কুকি পুরুষ।　　কুকি স্ত্রীলোক।

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

বেড়া দেওয়া হয়। পুরাকালে রাজার কবরের উপর নরমুণ্ড উপহার দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইত, কিন্তু কুকিরা ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিয়া সেই প্রথা ত্যাগ করাই সুবিধা মনে করিয়াছে।

কুকিদিগের পাশাপাশি কপিলি নদীর তীর হইতে প্রায় ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত নওগাঁ জেলার পার্ব্বত্য অংশ ব্যাপিয়া মিকির জাতির বাস। ইহারা ভাষাগত বৈষম্যে সকল জাতি হইতে পৃথক। ইহাদের আপনার ঐতিহ্যে প্রকাশ যে কাছাড়ীরা ইহাদিগকে নওগাঁ ও কাছাড়ের মধ্যগত টৌলারামের দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা জয়ন্তিয়াদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহারা জয়ন্তিয়াদিগের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে আসামের রাজার শরণাপন্ন হয় এবং তদবধি তাহারা নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। আসামের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে নিরীহ নির্ব্বিরোধী পাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া 'ভালো' প্রজা করিয়াছেন—কারণ দেখাইয়াছেন যে মিকির যুদ্ধ বিমুখ, ইহাদের অস্ত্র থাকিলেই অপর বিক্রান্ত জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে!

মিকিরদের পরিচ্ছদ খাসিয়াদের মত এবং অনেক বিষয়ে ইহারা খাসিয়াদেরই অনুরূপ। ইহাদের পরিচ্ছদ বেশ মজার; লাল ডোরাটানা দুই খণ্ড এক ধারে ঝালরওলা কাপড় একত্র করিয়া মাথা ও হাত গলাইবার ফুটা রাখিয়া সেলাই-করিয়া জামা পরে—ঠিক মিশনীদের জামার মত। ইহাদের মুখশ্রী খাসিয়ার মত, কিন্তু অবয়বে হীন। ইহারা উঁচু পোঁতার একটা বড় ঘরে সকলে মিলিয়া জটলা করিয়া থাকে; কখনো এককক্ষবিশিষ্ট এক গৃহে ত্রিশটি দম্পতিকে থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটা কাঠের গায়ে খাঁজ কাটিয়া তাহাই উঁচু ঘরে উঠিবার সিঁড়িরূপে ব্যবহার করে।

মিকির গোরু ভিন্ন সকল পশুই আহার করে, গোরু পবিত্র বলিয়া গণ্য করে, কিন্তু দুধ খাইতে ভালবাসে না।

বয়স না হইলে বিবাহ হয় না; বিবাহের কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান নাই; কেবল বিবাহ এবং পুত্রজন্ম উপলক্ষে ভোজ দেওয়া হয়। বহুবিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবা বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের ধর্ম্ম সংস্কার বিশেষ পরিস্ফুট বা মৌলিক নহে। ইহারা 'হেম্পাটিম' নামক পরমেশ্বরের আরাধনা করে।

মিকিরদের জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজার।*

মুদ্রা-রাক্ষস।

ভক্ত ও কবি।†

এই জগৎ সকলের জন্যই আছে। যিনি জগৎপতি তিনিও সকলের জন্য আছেন। সকলেই চোখ মেলিয়া জগতের শোভা দেখিতে পারে। জীবনের রহস্য ও ঈশ্বরের অনন্ত ভাব অনুভব করিবার অধিকারও সকলেরই আছে। অথচ বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে অতি অল্প লোকই প্রবেশ করিতে পারে, জীবনের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করাও সকলের শক্তিতে কুলায় না এবং অধিকাংশ মনুষ্যকেই ভাবের বহির্দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এজন্য প্রকৃত ভক্তের সংখ্যাও অল্প; প্রকৃত কবির সংখ্যাও বড় বেশী নহে।

একথা প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই অনুভব করিয়া থাকেন যে, বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এবং মানবজীবনের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অসীম ভাবের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে, বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত কোন মানসিক বৃত্তির সাহায্য চাই। সেই মানসিক বৃত্তির কার্য্যকে মনের মনন-ক্রিয়া অথবা আত্মার ধ্যানদৃষ্টি বলা যাইতে পারে। মানবপ্রকৃতির মধ্যে এ কি যে এক মানসিক আলস্য আছে, বুঝা যায় না;—মানুষ দূর ও শারীরিক শ্রম করিতে রাজি হয়, তবু মনের মনন-ক্রিয়া দ্বারা কিম্বা ধ্যানস্থ হইয়া কোন অদৃশ্য বস্তুর সত্তায় তন্ময় হইতে চাহে না। অনেকে ভাবিয়া দেখেন না যে, শুধুই ইন্দ্রিয়ের শক্তি অতি সামান্য। উহার উপর নির্ভর করিলে প্রতিদিন যাহা চোখে পড়ে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। প্রতিদিনই পূর্ব্বাকাশে রবি উদিত হইয়া তাহার স্বর্ণ রশ্মিতে ধরণীকে শোভাময়ী করিয়া তোলে, প্রতিদিনই নীলাকাশ উজ্জ্বল নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হয়,

---

* Col. Dalton, C.S.I. প্রণীত Descriptive Ethnology of Bengal হইতে সঙ্কলিত।

† চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী-গৃহে পঠিত।

প্রতি পূর্ণিমাতেই চন্দ্র তাহার শুভ্র জ্যোৎস্নায় যামিনীকে হাস্যময়ী করিয়া তোলে। শুধুই আমাদের চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইলে, চন্দ্রসূর্য্যকে সোণার থালা, নক্ষত্রসমূহকে এক একটি আলোকের পুষ্প বলিয়া মনে করিতাম। ভাগ্যে আমাদের মনন-শক্তি ও ধ্যানদৃষ্টি ছিল, তাই ত চক্ষু উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেখিলেও মন ঐ সকলকে বৃহৎ বলিয়া অনুভব করে।

যাহা হৌক, অধিকাংশ লোকই মননশক্তি ও ধ্যানদৃষ্টির অভাবে এই সৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না; জীবনের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটনেও তাঁহারা অক্ষম; জগতের মহা ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন না, প্রকৃত কবি হইতেও পারেন না, কিন্তু যে অল্পসংখ্যক মনস্বী ব্যক্তির মননশক্তি অত্যন্ত অধিক, ধ্যানদৃষ্টি অতিশয় প্রবল;—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা জগৎপতির স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও বিভূতি দর্শন করেন, তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট ও ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্ত হইয়া উঠেন; এবং ভক্তির প্লাবনে নরনারীর ধর্ম্মহীন শুষ্ক চিত্তকেও অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া তোলেন। কেহ কেহ বা জগতের অনন্ত রূপে, জীবনের অসীম রহস্যে নিমগ্ন হইয়া, সৌন্দর্য্যের মধুরতায় ও ভাবের মাদকতায় বিভোর হইয়া উঠেন; এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট ও ভাবরস উচ্ছলিত করিয়া কবি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

এখন আমরা কবিকে ভক্ত হইতে, ভক্তকে কবি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইব; এবং ইঁহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ কবির কথাই আলোচনা করা যা'ক। ছেলে-বেলায় উপকথায় অনেক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, রাজপুত্র এক অপূর্ব্ব পুরীতে উপনীত হইয়া নিরুপমা রাজকন্যার দর্শন পাইতেন। রাজকন্যা তাঁহার বিচিত্র স্বর্ণ অট্টালিকার এক একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, রাজপুত্রকে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইতেন। এই কথাটা কবির পক্ষেও খাটে। কবি যখন সূক্ষ্ম ধ্যানদৃষ্টির বলে বিশ্বের সৌন্দর্য্যপুরীতে গিয়া উপনীত হন, তখন প্রকৃতি স্বহস্তে তাহার সৌন্দর্য্য-অট্টালিকার এক একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কবিকে জগতের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখাইতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে। কবি যখন আবার মানবের জীবনরহস্যের মধ্যে তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সম্মুখে মহা ভাবের রাজ্য খুলিয়া যায়; তিনি তন্মধ্যে মানবের সুখদুঃখ হর্ষবিষাদ স্নেহপ্রেম ও পাপপুণ্যের অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। সুতরাং সৌন্দর্য্য ও ভাবের অনুভূতি সম্বন্ধে, পূর্ব্বে যে কবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রভাতকালে হরিৎবর্ণ তরুশাখায় যখন একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে; তখন একজন সাধারণ লোক ফুলটির কোমল মসৃণ দলগুলির রমণীয় বর্ণ দেখিয়া ও সুমিষ্ট গন্ধ পাইয়াই পুলকিত হন; তাহার বেশী আর কিছুই নহে। কিছু আশা করাই যায় না। কিন্তু একজন কবি ফুলটির বর্ণ, গন্ধ ও সুষমার অন্তরালে একটি প্রাণ দেখিতে পান; একটি প্রেমের স্পর্শ অনুভব করেন। তাই প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া ফুলের সঙ্গে এমন করিয়া আপনার প্রাণের ভাব মিশাইয়া ফেলেন যে, তিনি ফুলের ভাষা শুনিতে পান, ফুলের সুখদুঃখের কাহিনী অবগত হন; এমন কি, ফুলটির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাকেই আপনার সখী বলিয়া মনে করেন।

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, হিমালয়ের একটি মনোরম নির্ঝরিণীর কূলে দুই বন্ধু গিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে এক বন্ধু কবি নহেন; আর এক বন্ধু কবি। যিনি কবি নহেন, তিনি অল্প সময় মাত্র নির্ঝরিণীটি দেখিয়া "বাঃ বেশ ত?" বলিয়াই চলিয়া গেলেন। যিনি কবি, তিনি নির্ঝরিণীটি দেখিতে দেখিতে উহার অনুপম দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখন নির্ঝরিণী তাঁহার নিকট আর একটি নিম্নগামিনী জলধারা মাত্র রহিল না। ঐ নির্ঝরিণী বিরহিণী-নারী-মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কবি দেখিলেন, এক সুন্দরী তরুণী প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া, করুণ সঙ্গীতে শৈলবক্ষ পূর্ণ করিয়া, প্রিয়তমের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। কবি এই যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, ইহাই মধুর ছন্দে ও মিষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিলেন; তাহার বর্ণনাই একটি মর্ম্মস্পর্শী

কবিতা হইয়া দাঁড়াইল। কাব্যের অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা হয় ত এইরূপেই রচিত হইয়াছে।

উক্তরূপ এক একটি দৃশ্য, এক একটি ঘটনা কবির মনকে যে কোথায় লইয়া যায়, কবির সম্মুখের দৃশ্যপটে কত ছবি যে অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্র বাবুর নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "প্রকৃতিগাথা" ও "সোনার তরী" শীর্ষক দুখানি চমৎকার কাব্য আছে। "প্রকৃতি-গাথা"র এক একটি কবিতা পাঠককেও এক অভিনব সৌন্দর্য্যের দেশে লইয়া যায়; "সোনার তরী"র এক একটি কবিতা এক অজ্ঞাত অথচ চিরবাঞ্ছিত রাজ্যের সংবাদ ও চিত্র আনিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে। আমরা এই দুখানি কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। তাহা হইলে আমাদের মনের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

নব বর্ষা সমাগমে বঙ্গভূমি শ্রীশালিনী হইয়া উঠে;—তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি। কিন্তু সেই দৃশ্য কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান দৃষ্টির সম্মুখে কি অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কবি নববর্ষীয় বঙ্গভূমির দৃশ্য দেখিয়া লিখিতেছেন;—

"নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীল নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

* * *

ওগো নদীকূলে তীর তৃণতলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘাটে কোথা ভেসে যায়?

* * *

বিকচ কেতকী তট ভূমি পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী
তরুণ তরণী?"

এই মনোহর কবিতাটি দীর্ঘ বলিয়া উহার এক একটি স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে কবিতাটির সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইতেছে। আমরা এখন কবিতাটির শেষের কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিব।—

"ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।"

যাত্রীর নৌকা গ্রাম্য নদীর ঘাটে ঘাটে লাগিয়া, যাত্রী লইয়া যায়। এ দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। কিন্তু "সোনার তরী"র কবি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কোন্ রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং কোন্ রাজ্যের নেয়ে ও যাত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন, তাহা "যাত্রী" শীর্ষক কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিচিত্র কবিতাটির কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। শুধু পড়িয়া ইহার মর্ম্ম কথাটি হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। যাত্রা কবিতার নেয়ে যাত্রীভরা নৌকায় বসিয়া নদীতীরের একজন যাত্রীকে বলিতেছে—

"আছে আছে স্থান
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।

* * *

এস এস নায়ে
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্ না ধূলা পায়ে।

* * *

যাত্রী আছে নানা,
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণের তরে
বস্‌বে আমার তরী পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এস
যাত্রা আছে নানা।
কোথা তোমার স্থান?
কোন গোলাতে রাখ্‌তে যাবে
একটি আঁটি ধান?
বল্‌তে যদি না চাও তবে
শুনে আমার কি ফল হবে;
ভাব্‌ব বসে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি
কোথা তোমার স্থান?"

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের সম্মুখেই বঙ্গভূমি মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির কি অপরূপ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেই কবির মননশক্তি ও ধ্যান-দৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবি বঙ্গভূমির অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেছেন ; —

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে !
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্র আগুন বরণ।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি ;
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্র-বসনা ?"

আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতটি হয় ত অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। এখন কবির নরনারীর জীবন রহস্যের মধ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। এই সংসারে মানবের জীবন—রঙ্গভূমিতে স্নেহ প্রেম বাৎসল্য করুণা পাপ পুণ্য দুঃখ শোক হর্ষ বিষাদের বিচিত্র অভিনয় চলিতেছে। আমরা সাধারণ লোকেরা যেন দূরে দাঁড়াইয়া সেই অভিনয় দেখিতেছি। কিন্তু কবি অভিনয় গৃহের গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের সহানুভূতিতে নরনারীর সঙ্গে এমন এক প্রাণ হইয়া যান, যে নরনারী আপন আপন হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, অন্তরের রহস্য কথা, হর্ষবিষাদ ও মনোব্যথা কবিকে জানাইতে থাকেন। কবি সেই বিচিত্র কাহিনীই কাব্যের মধ্যে বর্ণনা করিয়া, নানা রসে কাব্যকে রসাত্মক করিয়া তোলেন। সেই জন্যই কাব্য আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

কবির কবিত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কথাই বুঝানো হইল। এখন ভক্তের ভক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং॥"

অর্থ—গঙ্গার স্রোত যেমন স্বভাবতঃ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত, সেইরূপ আমার গুণাবলী শ্রবণ মাত্র যাহার সমগ্র চিত্তের গতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়াছে।

একদিন বাঁকিপুরের কুলপ্লাবী খরস্রোতা গঙ্গার তীরে বসিয়া এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য কি, ভাবিতেছিলাম। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, গঙ্গা যেমন সিন্ধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট, গঙ্গা যেমন সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিতৃপ্ত ; তেমনি যাহার চিত্ত ঈশ্বরের আকর্ষণেই আকৃষ্ট, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনেই পরিতৃপ্ত ; তাহাকেই প্রকৃত ভক্ত বলা যায়। বাস্তবিক ইহাই ভক্তের লক্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরের আকর্ষণকারিণী শক্তি কি ? সৌন্দর্য্য ও প্রেম। সকলেই জানেন, সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেমন আমাদের মনকে মুগ্ধ করিতে পারে, প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন আর কোন বস্তুই পারে না। এজন্য পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, ভক্ত যখন মননশক্তি ও ধ্যানদৃষ্টির সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন হন ; তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিস্মিত, মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ ও প্রেমে আত্মহারা হইয়া যান, তখনই তিনি ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন।

ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেম অপর কেহ অনুভব করিতেই পারে না। যেমন সাগরে অনন্ত রত্ন থাকা সত্ত্বেও, ডুবুরী অতল জলে নিমগ্ন হইয়া সকল রকম রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে না ; তেমনি অনেক সাধকও ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেম অনুভব করিতে পারেন না। এজন্য এদেশে জ্ঞানপথাবলম্বী ও ভক্তিপথাবলম্বী এই দুই শ্রেণীর সাধকের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানপথাবলম্বী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ ঈশ্বরকে এক অখণ্ড সত্য রূপে দর্শন করিয়া, তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম কিছুই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ভক্তিপথাবলম্বী সাধক উহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যিনি সত্যম্‌, তিনিই শিবম্‌, তিনিই সুন্দরম্‌। তাই তাঁহার মতে এই বিশ্বমানব কেবল এক অখণ্ড চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি নহে ; এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও প্রেমেরও অভিব্যক্তি বটে !

এই জন্য ভক্ত জগতের প্রত্যেক সৌন্দর্য্য চিত্র ও মানবের প্রতিদিনের প্রেমলীলার মধ্যে, সৌন্দর্য্যময় প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের একটী ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মহর্ষি তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে"র দ্বিতীয় উপদেশের একস্থলে বলিতেছেন ;—

"উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। * * তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হন। * * যখন চন্দ্রমা সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্নাসুধা বর্ষণ করে * * তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? * * উষাকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্। প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্। নিশাকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্ প্রকাশ পাইতেছেন।"

মহর্ষি শুধু যে মুখেই এই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহার জীবনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একবার তিনি ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সে দিন পূর্ণিমা তিথি ছিল। রাত্রিকালে শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয়ের যখন আহার সম্পন্ন হইল; তখন মহর্ষি দালানের ছাদের উপরে উঠিলেন। ছাদে উঠিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্নারঞ্জিত নীলাকাশে কি দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁহারই সৌন্দর্য্যময় স্বামীর অপূর্ব্ব রূপের আভায় বিশ্ব আলোকিত হইয়াছে; এবং সেই সৌন্দর্য্যময়ের প্রেম-সুধা জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

মহর্ষি এই অনুপম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের স্বরূপে ডুবিয়া গেলেন। তার পর রাত্রি দুইটা বাজিল। শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয় জাগ্রত হইলেন। তখন তাঁহারা ছাদের উপরে গিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, মহর্ষি প্রেমমত্ত মাতালের ন্যায় ঈশ্বরের ভাবে মত্ত হইয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি মহর্ষির মৃত্যুদিনে "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" শীর্ষক এক খণ্ড সাময়িক পত্র বিতরিত হইয়াছিল উহার এক স্থানে লেখা আছে যে;—

একদা মহর্ষি অমৃতসহরে অবস্থিতিকালে বসন্তকালে ঐ সহরের একটি ফলফুল শোভিত বাগানে গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বসন্তে ফলভরে অবনত কতকগুলি বৃক্ষের সম্মুখে হাফেজের একটি গজল্ গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। সেই গজলের অর্থ এই "হে ঈশ্বর, বসন্তের সমাগমে ফলফুলে শোভিত এমন যে শোভনীয় বৃক্ষরাজি, ইহাদিগকে প্রলয়ে লইয়া যাইও না।" এইরূপে গাহিতেছেন, এমন সময় দেখেন, তাঁহার পিছনে একজন মুসলমান নিঃশব্দে নৃত্য করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" উত্তরে তিনি বলিলেন "আমি দেওয়ান হাফেজের ঐ গজল্ জানি, তাই আপনাকে তাহা গাহিতে দেখিয়া আমিও নৃত্য করিতেছিলাম।" মহর্ষি শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং তাঁহার বৈটুয়াতে (Purse) যে ৪০৲ টাকা ছিল, তাহা দিলেন।"

মহর্ষির সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলার আবশ্যক নাই। এ কথা অতি সত্য যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে ভক্ত ভগবানের মাধুর্য্য ও প্রেমই দর্শন করেন। তজ্জন্য ভক্তের নিকট এই সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যাই অন্যরূপ। ভক্ত বলেন, জগৎপতির প্রেমের জন্যই মানবের সৃষ্টি। তিনি ইতর প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতর প্রাণীকে তিনি প্রেম দিতে পারেন। কিন্তু ইতর প্রাণীর কাছে প্রেম ত পাইতে পারেন না। বিনিময় ভিন্ন প্রেমের সার্থকতা কি? তাই ভগবান মানুষকে আপনারই স্বরূপের অনুরূপ জ্ঞানপ্রীতিতে ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, ভগবানের প্রেমের উচ্ছলিত রসধারা যেমন নরনারীর হৃদয়ে নামিয়া আসিবে, তেমনি নরনারীর হৃদয়ের প্রেমও উচ্ছ্বসিত হইয়া ভগবানের অভিমুখে যাইবে। এই দুই প্রেমের মিলনের নামই ভক্তি যোগ। ভক্তিযোগেই দুর্ল্লভ মানব জন্মের সার্থকতা।

এই যোগের আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ আকুল হইয়া ঈশ্বরকে চাহিতেছে। আবার ঈশ্বর এই বিশ্বভুবনে আপনার সৌন্দর্য্য ও প্রেম প্রকাশ করিয়া মানুষকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণের নিমিত্তই জগতে সৌন্দর্য্যের এত গৌরব! প্রেমের এত মহিমা! নচেৎ সৌন্দর্য্য যদি শুধুই প্রাণহীন জড়ের আবরণ মাত্র হইত, প্রেম যদি সুখপ্রিয় মানবের শুধুই ভাব মাত্র হইত; তাহা হইলে সৌন্দর্য্য ও প্রেম কি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, আজ পর্য্যন্ত মানুষকে আকুল করিয়া রাখিতে পারিত?

মানুষের এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। মানুষ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জন্য না করিতে পারে এমন সাধনা নাই। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম মানুষকে জগতের সীমা হইতে অসীমের দিকে লইয়া যায়; এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম ক্ষুদ্র মানুষকে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের শক্তিতেই মানুষ আদিম বর্ব্বরতাকে

অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ইহারই শক্তিতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু হায়, মানুষের এমনও দুর্ভাগ্য যে, মানুষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যময়কে না দেখিয়া, উহার ভিতর আপনার সুখস্পৃহা পরিতৃপ্তির উপকরণই খুঁজিয়া বেড়ায়! প্রেমের আকর্ষণে প্রিয়তম দেবতার অভিমুখে না গিয়া, বাসনার মায়া কুহকেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে! কিন্তু ভক্ত ঐ সকল বাসনা-জালে আবদ্ধ প্রবৃত্তিপরায়ণ অবিশ্বাসী লোকের সম্মুখ দিয়াই, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়া উপনীত হন এবং ভূমানন্দ লাভ করেন।

ভক্ত ও কবির বিষয় মোটামুটি এক রকম বর্ণনা করা গেল। এখন ভক্ত ও কবির মধ্যে পার্থক্য কি, তাহাই নির্দ্দেশ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্ত ও কবি দুজনই সৌন্দর্য্য ও ভাবের উপাসক। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কবি সৌন্দর্য্য ও ভাবের নদীতে কল্পনার তরণী ভাসাইয়া, দুই তীরে জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধের কত বিচিত্র লীলা,—স্নেহ, প্রীতি, পাপ, পুণ্য, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, দেবত্ব ও মহত্ত্বের কত অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিতে দেখিতে চলিতে থাকেন। কিন্তু ঐ সকল অতিক্রম করিয়া যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের এক অনন্ত সমুদ্র আছে, কবিরা তাহার সন্ধান পান বটে; অথচ অনেকেই সেই সমুদ্রে গিয়া পৌছিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যের মায়াপুরীর ভিতর যে ভাবের রাজকন্যা রহিয়াছেন; অনেক কবি তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই জন্য অনেক কবিই ভক্ত নহেন।

কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি সৌন্দর্য্যভাবের নদীতে কল্পনার তরণী ভাসান না; আপনার জীবন তরণী ভাসাইয়া দেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার দৃষ্টি তীরের কোন মায়াপুরীর কোন মায়াবিনী রাজকন্যার আকর্ষণেও আকৃষ্ট হইয়া থাকে না। সেরূপ উদ্দেশ্যই তাহার নয়। তিনি সৌন্দর্য্য ও ভাবের অনন্ত সমুদ্রের উদ্দেশেই ঘরের বাহির হইয়াছেন এবং সেই সমুদ্রে গিয়াই বিশ্রাম ও তৃপ্তিলাভ করেন।

সুতরাং ভক্তিহীন কবি ও ভক্ত সাধকের মধ্যে এই এক পার্থক্য দেখিতেছি যে, কবি সৌন্দর্য্য ও ভাবের চরমসীমায় গিয়া উপনীত হন না; আর ভক্ত সৌন্দর্য্য ও ভাবের চরম-সীমায় গিয়াই উপনীত হন। এজন্য অনেক ভক্তিবিহীন কবি বিশ্বে কেবল সৌন্দর্য্যের লীলা ও ভাবের অভিনয়ই দেখিতে পান; কিন্তু ভক্ত দেখেন, যেমন এক সূর্য্যরশ্মিই নানা পাত্রের ভিতর দিয়া নানা বর্ণচ্ছটায় মনোরম হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; তেমনই এক অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ও প্রেমময় ঈশ্বরেরই সৌন্দর্য্য এবং প্রেম বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুষমায় ও স্নেহকরুণায় মনোহর হইয়া এই বিশ্বে প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু ভক্তের সঙ্গে সকল কবিরই যে উক্তরূপ পার্থক্য আছে, তাহা নহে। যে কবির মধ্যে কবিত্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যিনি সৌন্দর্য্য ও ভাবের শেষ সীমায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই সৌন্দর্য্যময় প্রেমস্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্ত হন। এজন্য ভক্তিতেই কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ—ইহা বলা যাইতে পারে।

এখানে আর একটি কথা। ভক্তিতেই কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু ভক্তের অন্তরে ভক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কি কবিত্বেরও উন্মেষ হইবে? এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ভক্ত যখন সৌন্দর্য্য ও ভাবের উপাসক; তখন ভক্তের মর্ম্মস্থলে যে কবিত্বের মূল ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ভাবের অনুরূপ ভাষা না থাকায় অনেকেই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে। ভক্ত অনেক সময় ভগবানের সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে এমন উন্মত্ত হইয়া যান যে, অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার মত তাঁহার সংযম এবং শক্তিই থাকে না।

কিন্তু তথাপি প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত যিনি রচনা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি ভক্ত। কিন্তু শুধু কি তিনি ভক্ত? কবি না হইলে ভাগবতের স্থানে স্থানে কি কাব্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত? পুরাতন কালের কথা নয় ছাড়িয়াই দেওয়া যা'ক। এই বাঙ্গলা দেশে প্রকৃত কাব্যের সূচনা ও উহার চরমোৎকর্ষের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখি যিনি ভক্ত, তিনিই কবি। আমাদের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার পক্ষে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে বৈষ্ণবদিগের দ্বারা

বাঙ্গালির চিত্ত ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবদিগের দ্বারাই বাঙ্গলা সাহিত্যে কবিত্বের বিকাশ হইয়াছে।

যদি এক একজন প্রসিদ্ধ ভক্তের নাম ধরিয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখি, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কবিত্ব ছিল। নানক, কবির ও তুলসীদাসের এক একটি উপদেশপূর্ণ শ্লোক পাঠ করুন, দেখিবেন, উহা ভাবরসে সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে অথবা চৈতন্য ভাগবতে ভক্ত চৈতন্যের উক্তি পাঠ করুন, দেখিবেন উহার ভিতর কি কবিত্ব। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভক্ত চৈতন্যের রচিত দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি॥"

জগদীশ! চাহিনা ত আমি ধন জন
পাণ্ডিত্য সুন্দরী নারী মনের মতন।
আমি চাহি জন্ম জন্ম যেন তোমাপরে
অহেতুকী ভক্তি থাকে আমার অন্তরে।

"নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং
গদ্গদা রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব
নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

হে প্রভু, আমার কবে অশ্রু বিগলিত হবে
নয়ন যুগল হতে, তব নাম করি ;
কবে গদ গদ ভাবে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে
পুলকে উঠিবে মোর শরীর শিহরি।

আমাদের এ কালের ভক্তদিগের কথা যদি আলোচনা করা যায়, তবে তাঁহাদের মধ্যেও কবিত্বের বিকাশ দেখিতে পাই। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন যথার্থ ঈশ্বরভক্ত লোক। তাঁহার সরল মধুর এক একটি ধর্ম্মকথা কবির কাব্যগাথার মতই ভাবমাধুর্য্যে মনোমুগ্ধকারী। তিনি মানুষের প্রাণের ভাষাটি আবিষ্কার করিয়া যেরূপ ভাবে মনের কথা কহিয়াছেন ;—কই ? এমন ত আর কাহাকেও বলিতে শুনি না। তৎপরে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নামোল্লেখ করিতে পারি। শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্ববাদিসম্মত ভক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই মহর্ষির স্বরচিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার মধ্যে কিরূপ কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। এখন ভক্ত কেশবের "সেবকের নিবেদন" গ্রন্থের "দর্শন ও নিরীক্ষণ" শীর্ষক উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ব্রহ্ম পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রস্ফুটিত হন। যদিও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। * * একটি গোলাপফুল যখন কেবল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমুদায় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব সুন্দর হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মপুষ্প ক্রমে ক্রমে তাহার সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করেন।"

* * *

"মধুকর যেমন প্রথমে অল্পে অল্পে পুষ্পমধু পান করে, পরে ক্রমশঃ পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বারংবার ঈশ্বরকে দর্শন করেন। * * যদি ভক্তি নয়নে দেখ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে সেই একজন ক্রমাগত নূতন নূতন বেশ করিতেছেন, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।"

ইহা কেবল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকথা নহে। উত্তম কাব্যের এক একটি অংশও বটে। যাহা হো'ক যাঁহার অন্তরে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে কবিত্বেরও উন্মেষ হইবে, তাহা আমরা সপ্রমাণ করিলাম। এখন দেখাইব, যে কবির মধ্যে কবিত্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাঁহার মধ্যে ভক্তিরও স্ফুরণ হইয়াছে। ইহা দেখাইবার জন্য বাঙ্গলা দেশে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ যদি ইহাই হয় যে, উহা পড়িতে পড়িতে ছায়া-শরীরী সৌন্দর্য্য ও ভাব কায়া ধারণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পাঠকের মনকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া এক বিচিত্র-লোকে লইয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত কবিত্বের উন্মেষ হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে, এবং বিকাশ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে অনেকেই যথার্থ ভক্ত ছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবীয় প্রেমের মধ্য দিয়াই তাঁহারা শিব-সুন্দরের অনন্ত রূপমাধুরী ও অসীম প্রেম দর্শন করিয়াছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মধ্য দিয়া ভক্তিতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন ; বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মানবের প্রেমের ভিতরই অসীমের মহা প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিদিগের বিষয় সকলেই জানেন। তাঁহাদের ভক্তিরসাত্মক কবিতা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভক্তিরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই সুদীর্ঘ রচনাটি সমাপ্ত করিব।

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য পাঠ করিলে, উহার মধ্যে কবিত্বের একটি আশ্চর্য্য বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা রবীন্দ্র বাবুর "শৈশব সঙ্গীত" হইতে "মানসী" রচনার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা ও মানব প্রেমের নানা রহস্যের বিষয়ই অবগত হই। সোনার তরীর সূচনা হইতেই তাঁহার কবিতার মধ্যে একটি উন্নত লোকের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আভাস পাই। তৎপরে চিত্রার মধ্যে উহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। "চিত্রা"র "দেবী" ও "জীবন দেবতা"কে আর মানবীয় ভাবে ধরা ছোঁয়া যায় না। উহার মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবই পরিস্ফুট। "চিত্রা"র "জ্যোৎস্না রাত্রি" প্রভৃতি কবিতার সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য আর জড়ের রূপ মাত্র নহে; উহা চিন্ময় ঈশ্বরেরই অনুপম মাধুর্য্য। "চিত্রা"র পর "নৈবেদ্যে"র মধ্যে কবি আর কোন কথা কবিত্বের রহস্যজালে আচ্ছন্ন রাখেন নাই। নৈবেদ্যের এক একটি সরল ও ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে ভক্তিরস উছলিত হইয়াছে; এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্প যেমন সুগন্ধ ও সুষমায় পূর্ণ হইয়া উঠে তেমনি নৈবেদ্যের এক একটি কবিতা সৌন্দর্য্যে ও প্রেমের মিষ্টরসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তৎপরে রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী যখন মুদ্রিত হইয়াছে, তখন উহার মধ্যে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। কবি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত নানা অর্থে নানা ভাবে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, এখন তাঁহার "অন্তর্য্যামী" "জীবনদেবতা"র প্রকাশে সমস্ত কথার একই অর্থ বুঝিতেছেন। তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বর্ণনার মধ্যদিয়া ঈশ্বর আপনারই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন; ঈশ্বর তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কবি তৎপ্রণীত "জীবন-দেবতা" কাব্যের "অন্তর্যামী" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন;—

"বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাষায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মুরতি কি কহিছে বাণী।
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি।
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।"

কবি নৈবেদ্যের একটি কবিতায় বলিতেছেন;—

"কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি;
তোমা পানে যায় তার শেষ অর্থখানি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কেবল যে এই কয়েকটি কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রত্যেকখানি কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ যে এক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার কোন্ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন? বলিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বলীলার কাহিনীই তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্র বাবুর যে সকল হাস্য কৌতুকের কবিতা আছে; তিনি তাহাকেও ঈশ্বরের কৌতুককাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার "কৌতুক" কাব্যের ভূমিকায় ঈশ্বরকে বলিতেছেন;—

'আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে
মাণিকের হার পরি এলো কেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে!
* * *
আজ এই বেশে এসেছ আমারে
ভুলাতে!"

যে কবি আপনার সুখ দুঃখ শোক তাপ হাস্যামোদ সকল অবস্থা ও সকল ভাবের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে তাঁহার নানা ভাবের বর্ণনা করেন; তিনি যদি ভক্ত না হন ত ভক্ত কে? আমরা পূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের নদীর উল্লেখ করিয়াছি; এদেশের অনেক কবি সেই নদীতীরস্থ মায়াপুরীর অপরূপ রাজকন্যার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সেই খানেই আবদ্ধ রহিয়াছেন বটে; কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ কোথাও আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি নদী অতিক্রম করিয়া একেবারে সৌন্দর্য্য ও ভাবের সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাই সেখানে অনন্তভাবময় অসীম সুন্দর পুরুষের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে; এবং তাঁহাকেই জীবন দেবতা রূপে বরণ

করিয়া স্বীয় জীবন ও স্বরচিত কাব্য এই উভয়কেই গৌরব দান করিয়াছেন।

রবীন্দ্র বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলীর পর "খেয়া" শীর্ষক একখানি অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যরসগ্রাহী ভক্ত ভিন্ন, ঐ গ্রন্থের সকল কবিতার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন বটে। কিন্তু তথাপি উহার অনেকগুলি কবিতা অতিশয় ভক্তিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া তৎসম্বন্ধেও দু একটি কথা বলিতেছি। আমরা সর্ব্বাগ্রে উক্ত গ্রন্থ হইতে "মিলন" শীর্ষক কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। কবি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সংস্পর্শে পুলকিত হইয়া বলিতেছেন;—

"আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
　জুড়াল হৃদয় জুড়াল—আমার
　জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
　পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
　নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
　দেখেছি একেলা আলোকে, দেখেছি
　আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা-সনে
　সে নীরব সভা মাঝারে দেখেছি
　চির জনমের রাজারে।
　　*　　*　　*
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
　দেহমন মোর ফুরালো যেনরে
　নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
　জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
　আদি অন্ত জুড়ালো!"

ভক্ত যখন ঈশ্বরকে দর্শন করেন, ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ লাভ করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি পুলক ও প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহার মর্ম্মের ভিতর দিয়া কি সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা এই কবিতাটি পাঠ করিয়া পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই কবিতাটি যত বার পড়ি, তত বারই ভক্তিরসে প্রাণ আপ্লুত হইয়া যায় এবং কবির ন্যায় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এখন "খেয়া"র শেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করিব। কবিতাটি এই;—

তুমি এপার ওপার কর কে গো
　ওগো খেয়ার নেয়ে,
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
　দেখি যে তাই চেয়ে
　ওগো খেয়ার নেয়ে।
　ভাঙিলে হাট দলে দলে
　সবাই যাবে ঘাটে চলে,
　আমি তখন মনে করি
　আমিও যাই ধেয়ে
　ওগো খেয়ার নেয়ে।
তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে
　তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন সুরে
　ওঠে যে গান গেয়ে,
　ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলে কল কলে
আঁখি আমার ছল ছলে,
ওপার হতে সোনার আভা
　পরাণ ফেলে ছেয়ে
　ওগো খেয়ার নেয়ে।
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই
　ওগো খেয়ার নেয়ে,
কি যে তোমার চোখে লেখা আছে
　দেখি যে তাই চেয়ে
　ওগো খেয়ার নেয়ে।
　আমার মুখে ক্ষণ তরে
　যদি তোমার আঁখি পড়ে
　আমি তখন মনে করি
　আমিও যাই ধেয়ে
　আমিও যাই ধেয়ে
　ওগো খেয়ার নেয়ে।"

ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি অনেক শোকতাপ পাইয়াছেন। তাই জন্ম ও মৃত্যুরহস্য পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যু যে ভবনদীর এপারে ওপারে আসা যাওয়ার ব্যাপার মাত্র, কবি তাহা দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের আভাস পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। জীবন সন্ধ্যায় কত লোকের সংসারের হাট ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; কত লোকের দোকান পাট বন্ধ হইতেছে;—আর সেই ভবনদীর নাবিক কত লোককে তাঁহার খেয়ার নৌকায় ওপারে পৌঁছাইয়া দিতেছেন;—এই বিচিত্র দৃশ্যও কবির ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবিতায় তাহার একখানি অনুপম চিত্র আঁকিয়া আমাদের মনকে উদাস করিয়া তুলিয়াছেন। এই সুন্দর কবিতাটির সঙ্গে সুর যুক্ত করিয়া ইহাকে একটি সঙ্গীত করা হইয়াছে। রবীন্দ্র বাবুর প্রিয়শিষ্য এবং আমার পরম স্নেহের পাত্র একজন গায়ক যখন করুণ ও মধুর সুরে এই

গানটি গাহিতে থাকেন, তখন সংসারাসক্ত চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়; বহির্মুখীন দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য পরকালের দিকে চলিয়া যায়!

আমরা রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। ইহাতে আমাদের রচনাটি অতিশয় দীর্ঘ হইল বটে; কিন্তু আশা করি আমাদের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে। কারণ পরিষ্কার দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মধ্যদিয়া অবশেষে ভক্তিতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত কবিত্বের সঙ্গে ভক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সৌন্দর্য্য ও ভাবের মধ্য দিয়া কবির ঈশ্বরের কাছে আসিয়া পৌঁছানই স্বাভাবিক। অতএব কবির পক্ষে ভক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এবং কবির নীতিহীন ও ভক্তিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

গত বৎসর আমরা রুড়কী গিয়াছিলাম। এখানে বাঙ্গালীদের একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এই উপনিবেশের কথা আমরা সময়ান্তরে সাধারণের গোচর করিব। এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাত গাঙ্গেয় খাল এবং টমাসন কলেজ প্রধান দর্শনীয় বস্তু; কিন্তু যাহা দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত ও আশান্বিত হইলাম তাহাই অদ্য আমাদের সংক্ষেপে বক্তব্য। রুড়কী প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এখানে এক অভিনব ও গৌরবজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি কাচের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের একটী কারখানা খুলিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পথের নূতন পথিক নহেন। বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ষ্টেপ্‌ল্‌টন্‌, ডাক্তার ই, জি, হিল্‌ ও ডাক্তার লেদার প্রমুখ অনেকেই বেণীবাবুর নির্ম্মিত যন্ত্রাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতে বৈজ্ঞানিক কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত প্রণালীর বিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশে সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা না থাকায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং রুড়কী টমাসন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়-দ্বয়ের অনুমত্যনুসারে একটী ক্ষুদ্র কারখানা খুলিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে নির্ম্মিত যন্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটী বহুপরীক্ষিত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বর্ণনাত্মক সচিত্র পুস্তিকার প্রথম খণ্ড * প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকাভুক্ত হয় নাই এমন সকল যন্ত্র, নমুনা বা নক্সা পাইলে তিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং সমগ্র যন্ত্র বা তাহার পৃথক পৃথক অংশ নির্ম্মাণ ও সরবরাহ করেন।

ডাক্তার লেদার (Dr. J. W. Leather, Agricultural Chemist to the Government of India) বেণীবাবুর নির্ম্মিত টপ্‌লার পম্প্‌ প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—"* * * Both the pumps which you made are very well done and so was the other special glass aparatus * * *" ডাক্তার হিল (Dr. E. G. Hill, Professor of Chemistry, Muir Central College, Allahabad). বেণীবাবুর নির্ম্মিত আণবিক গুরুত্ব নির্দ্ধারক যন্ত্র (Apparatus for the determination of molecular weights by the rise of Boiling point) ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—"This was made for me by B. M. Mukerjee. The apparatus was well made and blown. It worked excellently * * * *" তিনি অন্য একটী যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—"This was made for me (by B. M.

* Catalogue of Scientific apparatus—Section I. Vacuum Pumps, Mercury Distillation apparatus, molecular weight apparatus, &c. &c. &c. made by B. M. MUKERJEE, B.A. F.C.S., Roorkee. Printed at the Indian Press, 1907, Allahabad.

Mukerjee). The work was quite good and the apparatus gave good results."

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গত অক্টোবর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে বেণী বাবুর কাচের যন্ত্র সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The catalogue of Scientific Apparatus by Mr. B. N. Mukherji of the Thomason College, Roorkee, is a new departure in the field of scientific activity, which will not fail to enlist the admiration of connoisseurs of Scientific Apparatus in India. * * * It is a pleasure, therefore, to observe signs of great manipulative skill in close association with mental powers of a high order in the various apparatus described in the catalogue under review. So far as we are aware, this is the first time that glass apparatus requiring such skill and finish, have been manufactured and offered for sale in India. The enormous difficulties, Mr. Mukherji has had to encounter, will be evident from the fact that he taught himself the difficult art of glass-blowing with only the meagre help he might have derived from books, which are far from being perfect. In order to learn the art as thoroughly as he has done, it must have cost him years of hard unremitting labour. * * * Some of the apparatus, moreover, are new designs of Mr. Mukherji, and, being very simple and cheap, ought to find a good market."

মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় কারখানায় এখনো অধিক কারিগর তৈয়ার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু সহৃদয় বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারেন। এবং তদ্দারা এদেশে রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য সুলভ ও সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু এই মহৎকার্য্যে কৃতকার্য্যতার পরিমাণ সরকার বাহাদুরের সাহায্যের পরিমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতেছে। আমরা আশা করি সর্ব্বসাধারণ বেণীবাবুর এই মহৎকার্য্যের সহায় হইবেন। সরকারী, এবং বে-সরকারী সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিতেই তাঁহার কারখানার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া দেশবাসিগণ স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন ইহাই আমাদের কামনা। বিলাতের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এদেশে নির্ম্মাণ করাতেই যথেষ্ট গৌরব আছে, অধিকন্তু বেণীবাবু যে অনেক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা তাঁহারই স্বকপোলকল্পিত এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ইহাতে তিনি বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ এবং সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন।

দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টায় যাঁহারা লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ডোমসার নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা কাশীচন্দ্র সেন উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন বৈদ্যসন্তান। গুরুপ্রসাদ বাবুর বয়স যখন এক বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহাঁর জননী সারদা সুন্দরী তখন নিরুপায় হইয়া কাঁচাদিয়া গ্রামে স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথ সেন মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন;—এই মহীয়সী রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন। গুরু প্রসাদ বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার মাতার এ সমুদয় সদ্‌গুণাবলীর প্রভাব সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার মাতার সুশিক্ষার গুণে। সে সময়ে বিক্রমপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে পার্সী শিক্ষার জন্য এক একটী মক্তব ছিল। ঐ সকল মক্তবে এক একটী মুন্সীর অধীনে থাকিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বালকবৃন্দ বাংলা ও পার্সী শিক্ষা করিত। গুরুপ্রসাদ বাবুর বাল্যকালেও এইরূপ একটী মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁহার মাতুল রাধানাথ সেন সে সময়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জজ আদালতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার নিজের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাঁহার এই ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ সেন ও তাঁহার অপর ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তান সুকবি শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ গুপ্তকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। উক্ত গুপ্ত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতি পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ও গুরুপ্রসাদ বাবুর ন্যায় [illegible]

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উক্ত দুই মাস্‌তুতো ভ্রাতা একত্র এক পরিবারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল তদ্রূপ স্নেহ ও ভালবাসা এক মাতৃগর্ব্ভজাত সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় না। দ্বারিক বাবু গুরুপ্রসাদ বাবু হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহাঁদের মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয় যদিও স্বয়ং ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না কিন্তু পারস্য ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তখন বঙ্গদেশে কেবল ইংরেজী বিদ্যার ক্ষীণ আভা চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাধানাথ সেন মহাশয় উক্ত আলোকে ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদকে আলোকিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গুরুপ্রসাদ মক্তব ছাড়িয়া ইংরেজী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যত্নবান হইলেন। ইনি বাল্যাবধি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। যে বয়সে অন্য বালকগণ খেলিয়া বেড়ায় গুরুপ্রসাদের অধ্যয়নে একান্ত মনোযোগিতা সে সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়। তখন আজকালকার মত গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না, বর্ত্তমান সময়ের মত প্রতি গ্রামে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও দেখা যাইত না, গুরুপ্রসাদ এমন দিনে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার বহু পরে বিক্রমপুরে কাউলিপাড়ার বাবু দিগের যত্নে তাঁহাদের বাস স্থানে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বাবু ত্রিপুরা চরণ দাস সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহাঁর সুশিক্ষাগুণে বিক্রমপুরে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত 'প্রভাকরে' যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারি কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ত্রিপুরা চরণ দাস,
দিলেন সুন্দর চাষ
"বেঘের" সে বেগ হ'ত,
মলিন কুলীন যত
গাঙ্গুলী লাঙ্গুলি হ'ল সার।"

সে সময়ে বিক্রমপুরের মধ্যে "বেঘে" গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ইহাঁরাই তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। কি দীন, কি ধনী সমাজস্থ ছোট বড় সকলেরই ইহাঁদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইত। ইংরেজী শিক্ষার সাম্যভেরী নিনাদিত হইলে ইহাঁদের কঠোর শাসন তিরোহিত হইবার উপক্রম দেখিতে পাইয়াই বোধ হয় কবি এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর ইংরেজী শিক্ষা স্বীয় মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয়ের উপার্জ্জনস্থল ময়মনসিংহে আরম্ভ হয়। এই স্থান হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ইহার পর যথাক্রমে ঢাকা কালেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন ও পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজ হইতে বি এ ও এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কেহ বি এ পরীক্ষায় পাস করে নাই। এই সময়ে তাঁহার মেধাশক্তির কথা সর্ব্বত্র এইরূপ ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অধিবাসিবর্গ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। গুরুপ্রসাদ বাবু সর্ব্ব প্রথমে প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। পরে বি এল পরীক্ষায় পাস করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে ও পরে বেহার অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঁকিপুর গমন করেন। গুরুপ্রসাদ বাবু চিরকালই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অন্যের নিকট আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ন্যায়বুদ্ধি কোন দিনই বিসর্জ্জন দেন নাই। কোন এক ক্ষুদ্র কারণে পাটনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় তিনি "চিরদিন ভিক্ষা করিয়া খাইব তথাপি অপরের দাসত্ব করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা হইতেও তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ একটী উচ্চ পদের আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই বাঁকিপুরই তাঁহার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। এই বেহার অঞ্চলেই তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাপন করিয়া ইহার অশেষ কল্যান সাধন করিয়া গিয়াছেন। আইনের কূটতর্কে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখিয়া একদিকে যেমন লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইত অপরদিকে তেমনি প্রত্যেক দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত।

পাটনা অঞ্চলে গুরুপ্রসাদ বাবুর যাইবার পূর্ব্বে বেহারিগণ নীলকর সাহেব দিগের অত্যাচারে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত থাকিত। তাঁহারি যত্নে নীলকরদিগের অত্যাচার একরূপ নিবারিত হয়। শুনিয়াছি রাজপুরুষগণের খামখেয়ালীতে বেহারিগণ অনেক সময় অন্যায় রূপে উত্যক্ত হইতেন, কিন্তু গুরুপ্রসাদ বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এবং তীব্র প্রতিবাদে শীঘ্রই সে সকল প্রশমিত হয়। আজ কাল Behar Landholders' Association নামে বেহার প্রদেশের ভূস্বামিগণের যে রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ আলোচনার সভা আছে উহাও গুরুপ্রসাদ বাবুর বহু চেষ্টা ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক থাকিয়া বেহার অঞ্চলের বহু হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বেহারের অভাব ও অভিযোগ জানাইবার জন্য তিনি "Behar Herald" নামক যে ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিয়াছেন তাহা জীবিত থাকিয়া অদ্যাপি তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এখানি বেহার প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম কাগজ। তৎপূর্ব্বে কি ইংরাজী, কি হিন্দী, কোন ভাষাতেই কেহ কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাবু যত দিন জীবিত ছিলেন গভর্ণমেণ্টের সামান্য অত্যাচার ও অবিচারে তিনি এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন যে গবর্ণমেণ্টও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রধাবিত হইত। বেহার প্রদেশে সুশিক্ষার অভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে নিজ ব্যয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনের ভার পরিশেষে কোনও সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন ও উহা পরিশেষে বর্ত্তমান T. K. Ghosh's Academyর সহিত মিলিত হয়। দীন দরিদ্রের জন্য গুরুপ্রসাদ বাবুর হৃদয় যথার্থই কাঁদিত, তিনি বহু নিঃস্ব গরিবের সন্তানকে প্রতিপালন নিজের ব্যয়ে নিজের বাসায় রাখিয়া বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

চিরকাল বেহার প্রবাসে জীবনাতিবাহিত করিয়াও তিনি শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর স্নেহ বিস্মৃত হ'ন নাই। দূরে রহিয়াও [illegible] সর্ব্ববিধ আন্দোলনেও [illegible] যোগদান করিতেন। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে গুরুপ্রসাদ বাবু একবার ছোটলাটের আইন সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিক্রমপুরস্থ কাঁচাদিয়া গ্রামে গুরুপ্রসাদ বাবুর মাতুলালয় ছিল; উক্ত গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর কাঁচাদিয়া গ্রামবাসিগণ কামার খাড়া নামক গ্রামে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় উক্ত গ্রামের "স্বর্ণগ্রাম" নামকরণ করিয়া যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন গুরুপ্রসাদ বাবুর সে সকল কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ স্থলে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি এক সময়ে সরল বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন, এমন কি উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সময়ে তাঁহার সে মত কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইলেও তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। সমাজের মঙ্গলজনক কোন কার্য্য সম্পাদনেই তিনি ভীত হইতেন না। গুরুপ্রসাদ বাবু শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার পুত্র ও জামাতৃবৃন্দকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও প্রাচীন বয়সে ভ্রমণোদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। ইংরাজী ভাষায় যদিও তিনি কয়েক খানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। সেকালের সুবিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৩০৭ সনের ২৮শে আশ্বিন বাঁকিপুরে তাহার দেহান্ত হয়।

অমলেন্দু গুপ্ত।

গোয়ালিয়রে জমী ও গ্রাম।

সম্পাদক মহাশয় গত পৌষ সংখ্যায় যে বাঙ্গালীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তি ও শিল্পবাণিজ্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। যে সকল বঙ্গবাসী কিছুকাল প্রবাসে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে দেশের জলবায়ু বা আহারীয় দ্রব্যাদি এতই প্রতিকূল যে অধিকাংশ নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাস করা এক প্রকার কষ্টকর ও ব্যাধিময় বিবেচনা

করেন। অতএব প্রবাসে যাহাতে বাঙ্গালিত্ব বজায় রাখিয়া বাস করিতে পারেন তাহার চেষ্টা বিধিমতে আমাদিগের কর্ত্তব্য। প্রবাসী পত্রিকায় ৪র্থ ভাগের ৪৭০ পৃষ্ঠায় যে "মাহেন্দ্র যোগ" প্রবন্ধে সিন্ধিয়া মহারাজার দেশস্থিত জমী গ্রামাদির নূতন ধরণের বিলিব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় তাহা তৎপরে উক্ত প্রবন্ধের নায়ক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং "প্রবাসীর" ৫ম ভাগের ৪৯৬ ও ৭৩২ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছেন, ও ৬ষ্ঠ ভাগের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ও তাহার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন। সকল রাজ-কার্য্যেই অনেক গোলোযোগ ও বিলম্ব ঘটে। শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ত্তমান সিন্ধিয়া মহারাজ নিতান্ত অমায়িক ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারীরাও ক্রমে ক্রমে ভদ্র ও সুশিক্ষিত ন্যায়শীল হইতেছেন। ইহাতে ভরসার কথা আমি বিশেষ বলিতে পারি। এক্ষণে বীনাগুনা রেল লাইনের ধারে যে তিনটী ষ্টেশন আছে, অর্থাৎ পাছার সাদোরা ও পাগারা, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েক ঘর বাঙ্গালী গিয়া বাস আরম্ভ করিয়াছেন। আমি জানিতে উৎসুক যে তাঁহাদের কার্য্যের কি রূপ অবস্থা। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা একটী কোম্পানিকে বিশেষ লাভজনক সর্ত্তে বিস্তর গ্রামাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদেব বিশেষ জানিবার আবশ্যক। কোম্পানি মহারাজার আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ অর্থাৎ যেমন কোম্পানি অ্যাক্ট্ ইংরাজরাজ্যে আছে তদ্রূপ মহারাজাও বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানির মন্তব্য গুলি সংক্ষেপে নিম্নে দিতেছি।

(১) জমী গ্রামাদি মালব প্রদেশ অথবা অন্য সিন্ধিয়া রাজ্যে গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া কৃষি কার্য্যের উন্নতি ও তৎসঙ্গে ফ্যাকটরি ও কল কারখানাদি করিয়া কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে প্রেরণ না করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানেই উহা ব্যবহার্য্য রূপে প্রস্তুত করা। যেমন, তূলা মালব প্রদেশে প্রভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে জিনিং মিল, প্রেস তথা স্পিনিং মিল ও বুনানি কারখানা স্থাপন করিয়া সেই তূলাকে কাপড় রূপে তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করা। অথবা ইক্ষু ও খেজুর হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ার করা।

(২) ব্যাঙ্কিং কার্য্য।

(৩) ফল ও পুষ্প বাগান ও তৎসংক্রান্ত কারবার।

(৪) ঘোড়া, গরু, ছাগল, ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জন্তুগণের ফারম।

(৫) দুগ্ধ মাখনের ফারম ইত্যাদি।

এক্ষণে মালবা প্রদেশে প্রায় ৭।৮ শত গ্রাম সিন্ধিয়া সরকারে রাজস্ব আদায় করিতে পারে না ও সেই গ্রাম-গুলিকে "টুট্" গ্রাম কহে। উক্ত কোম্পানিকে যে কোন টুট্ গ্রাম হউক না কেন লইতে অনুমতি হইয়াছে। এবং তাহার সর্ত্ত এইরূপ।

১। গত পাঁচ (৫) বৎসরে রাজস্বের যেরূপ গ্রামখানি হইতে আয় হইয়াছে তাহার বাৎসরিক গড়পড়তা হিসাব করিয়া তাহা হইতে ৮ (আট) টাকা শতকরা কম করিয়া যে টাকা হইবে তাহা কোম্পানিকে উক্ত গ্রামের দরুন খাজানা দশ বৎসর পর্য্যন্ত দিতে হইবে। তৎপরে দশ বৎসরের জন্য দশম বৎসরে যে প্রজা বিলি প্রত্যেক গ্রামে হইবে অর্থাৎ জমাবন্দীর মোট হইবে তাহা হইতে পনেরো (১৫) টাকা শতকরা বাদ দিয়া বক্রী যে টাকা হইবে তাহা রাজস্ব দিতে হইবে।

২। এই বিশ বৎসরে অভাব পক্ষে শতকরা ১৫ হিসাবে গ্রামের চাষের উন্নতি করিতে হইবে।

৩। যদি কোন অংশীদার কোন বিশেষ গ্রাম জমীদারী হিঃ লইতে চাহেন তো কোম্পানির সুপারিষের মত সিন্ধিয়া দিবেন। অবশ্য সেলামী টাকা বা রাজস্ব তখন ধার্য্য হইবে ও অংশীদার সম্মত হইয়া লইবেন।

৪। কল কারখানা ও বাটী ইত্যাদি কোম্পানির যাহা এমারত ইত্যাদি হইবে তাহার পুরা মালিক কোম্পানিই থাকিবেন।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে এইরূপ সর্ত্তে আমাদিগের প্রবাসী বাঙ্গালীর একটী বা বহু উপনিবেশ মালব প্রদেশে অনায়াসে স্থাপিত হইতে পারে। এবং শ্রীযুক্ত মহারাজার কৃপায় আরো বিশেষ সুলভ বন্দোবস্ত হইতে পারে। তবে একটী বিষয় অত্যাবশ্যক—তাহা এই যে মোং লস্কর গোয়া-লিয়রবাসী বঙ্গবাসী মাত্রেই এই বিষয় যোগদান করিয়া মহারাজের পার্শ্ববর্ত্তী অমাত্যগণকে সর্ব্বদা সহযোগী করিয়া রাখেন। বা যাহাতে আমাদিগের অন্ততঃ একজন বা দুইজন সর্ব্বদা [illegible]

তাঁহার সর্ব্বদা গোচর করিতে থাকেন এরূপ করা চাই। আমার ভরসা আছে যে চেষ্টা করিলে এই কার্য্যে বিস্তর বঙ্গবাসীর অন্ন হইবে। অবশ্য আশা উচ্চ। কিন্তু আরম্ভেই যে একেবারে আশার উচ্চতম চূড়া অধিকার হইবে তাহা অসম্ভব। চেষ্টা করিলে শ্রীযুক্ত মহারাজা আরও সুলভ সর্ত্তে গ্রামাদি দিতে পারেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে লাভ কোথায়? গত পাঁচ বৎসরে এই সকল "টুট" গ্রামে রাজার রাজস্ব ৫০ হইতে ৭০ টাকা শতকরায় বেশী হয় নাই। তাঁহার যে রাজস্ব পূর্ব্বে আদায় হইত, তাহা অনাবৃষ্টি ও প্লেগ কলেরা প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতে এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অল্প সংখ্যক গ্রাম একেবারে নির্জ্জনও হইয়াছে। তাহার উপর সিন্ধিয়ার নিম্ন কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করায় আর সরকারী টাকার আয় পুরা হয় না। এবং মহারাজার বন্দোবস্ত সম্বৎ ১৯৬০ সালে নূতন করিয়া হওয়ার কথা ছিল। সেই নিমিত্ত প্রজারাও সকল কূপ ও বাওলী ও জলাশয় গুলি কতক কতক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। যাহতে তাহাদের জমা অধিক বৃদ্ধি না হয়। সেই নষ্ট কূপাদি উদ্ধার করিতে সামান্য খরচ পত্র হইবে বটে।

এই বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে ন্যূন কল্পে পৌনে দুই লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্যক—অর্থাৎ একটী উত্তম জিনিং ও প্রেস করিতে ১লক্ষ ও বক্রী জমীদারী ও গ্রামাদির বন্দোবস্ত জন্য। আমার বিবেচনা হয় যে এই টাকা আমরা সমস্ত প্রবাসী বঙ্গবাসী একত্রিত হইলে অনায়াসে হইতে পারে। অথবা জিনিং প্রথম বৎসর না করিলে ক্ষতি নাই। প্রথম বৎসর গ্রাম গুলির বিলি ব্যবস্থা করিতেই যথেষ্ট পরিশ্রম ও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন হইলেই যথেষ্ট হইবে।

কোম্পানির অধীনে (অংশীদার হইয়া) যাঁহারা চাষ বাস কার্য্য করিবেন তাঁহারা সুলভে করিতে পারিবেন ও একটী বড় কার্য্যের সংশ্রবে থাকা প্রযুক্ত বলীয়ান হইয়া করিতে পারিবেন। এক্ষণে যে কয়টী বঙ্গবাসী তথায় আছেন সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতেছেন। যদিও আমরা তৃণবৎ তথাপি কোম্পানি করিয়া গুণত্ব প্রাপ্ত হই না কেন?

যদি কেহ বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তো আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীকালীপদ বসু,
উকীল, মীরাট।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

(গত বর্ষের শেষ সংখ্যার পর।)

মোটের উপর এক কথায় এই পুস্তক অসামঞ্জস্যের প্রতি একটি নিপুণ কশাঘাত। ইহা মূল আখ্যান হইতে ছোট ছোট অবান্তর ঘটনা পর্য্যন্ত—যেমন যুধিষ্ঠির চাষার বাবু পুত্র হারাণের চিত্র, যুগল বৈষ্ণবী যুবতী বল্লভ বৃদ্ধ বৈরাগী ইত্যাদি—সকলগুলিতেই খাটে।

এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে এক একটি অতি সামান্য ঘটনায় নিপুণ চিত্র হৃদয়টাকে ভরিয়া দেয়। যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িতা যুবতী বিধবা মুসলমানীর একনিষ্ঠ মধুর প্রেম, মধু ধোপার নিমন্ত্রণ ইত্যাদি দুই চারি কথায় ফুটিয়া মনোরম হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সকল চরিত্রই এমন সুচিত্রিত যে সকলগুলিরই পরিচয় দিবার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য। তথাপি গ্রন্থগত অপরাপর পার্শ্বচর চরিত্র বিশ্লেষণের আবশ্যক নাই পাঠক সহজেই তাহাদের পরিচয় পাইবেন। এই সুন্দর বাঁধা, সুমুদ্রিত, বিপুলকায় গ্রন্থ দেড় টাকা মাত্র খরচ করিয়া যিনি পড়িবেন তিনিই শিক্ষামূলক আনন্দ উপভোগ করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য সামাজিক উপন্যাসের কথোপকথনে সকল স্থলে চলিত কথা ব্যবহৃত না হইয়া মাঝে মাঝে সাধুভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় রসভঙ্গ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে (সত্বর হইবে আশা করি) এই ত্রুটি সংশোধিত হইলে ভালো হয়।

বঙ্গীয় কবি (অম্বষ্ঠ খণ্ড)—শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত। স্বাধীন ত্রিপুরা, আগরতলা বঙ্গীয় কবি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। অষ্টাংশিত ক্রাউন ৬৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২॥০ টাকা। ইহাতে 'বঙ্গভাষার অতীত কালের বৈদ্যজাতীয় লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মূল্যবান মত সমর্থন করিয়া আমরাও বলি 'পুস্তকখানি বহু পরিশ্রমে রচিত হইয়াছে। এরূপ ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক আছে; এই সমস্ত উপকরণ দ্বারা বঙ্গভাষা ভবিষ্যতে নানারূপে উপকৃতা হইবে, সন্দেহ নাই'। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে 'বিপ্র-খণ্ড', কায়স্থ-খণ্ড', 'ইসলাম-খণ্ড' প্রভৃতি ক্রমে সর্ব্বজাতীয় লেখকগণের বিবরণ প্রকাশ করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। সকল লোকের মধ্যে কবিরাই শুধু জাতিহীন বা সর্ব্বজাতিক; তাঁহাদেরও এমন জাতিবিভাগ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যেরূপে এই বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে মার্জ্জনীয় মনে হয়। বৈদ্যজাতির মধ্যে কবিত্বস্ফূর্ত্তি কতদূর হইয়াছিল ইহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গীয় কবির অম্বষ্ঠ খণ্ড রচিত হইয়াছে; অতঃপর বিষয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য লেখককে জাতি অনুসারে কবি জীবনী প্রকাশ করিতে হইবে। বঙ্গের সুদূরপ্রান্ত ত্রিপুরায় যেরূপ পরিষ্কার মুদ্রাঙ্কন সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বঙ্গরাজধানীর বহু মুদ্রণালয়ের অনুকরণীয়। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ৫ম হইতে ৮ম খণ্ড। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। 'ব' প্রায়

শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর করিবে। ইহার মত চরিতাভিধান বাংলায় আরো আবশ্যক আছে। কোনো কোনো লেখকের নাম ও পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, সংগ্রহকর্ত্তার এদিকে আরো অধিক মনোযোগ ও অনুসন্ধান আবশ্যক। তবুও ইহাতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব লেখকের পরিচয় কিছু না কিছু পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থ সাধারণের নিকট অনুমোদনের অল্পই অপেক্ষা রাখে; ইহা আপনার গুণে আপনি প্রচারিত হইবে।

অশ্রুমালা—অসমাসুন্দরী সিংহ প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। এবং কল্পনাকুসুমমালা—শ্রীসুষমাসুন্দরী বসু প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা। দুখানিই কবিতা পুস্তক। সোজাসুজি ভাষায় মনের সাধারণ চিন্তা ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। দুই একটি পদ্যে কবিত্বের অস্ফুট আভাস আছে। অশ্রুমালার 'সুখ-দুখ' কবিতাটি বেশ লাগিয়াছে। উভয় পুস্তকেই ছন্দ ও ভাষার আবাধ প্রবাহ আছে; কাব্যাংশে অশ্রুমালা কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট।

সতী লীলা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী রচিত। ৭৫ পৃষ্ঠা. অষ্টাংশিত ক্রাউন। মূল্য ছয় আনা। ইহাতে একটি পতিপ্রাণা নারীর সতীত্ব রক্ষার উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। দাম্পত্য প্রীতির একটি অতি মনোরম কাহিনী ইহাতে সুন্দর সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকার পুরাতন বা সাধারণ ঘটনাও নূতন করিয়া, প্রীতিকর করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি বলিয়া দুই চারিটি ত্রুটির উল্লেখ করিব। প্রথম, আখ্যানবর্ণনায় কলাচাতুর্য্যের অভাব; গ্রন্থের প্রথম কয়েক ছত্র পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় ঘটনা কোন দিকে গড়াইয়া কিরূপে পরিসমাপ্ত হইবে; ইহাতে পাঠকের কৌতূহল ক্ষীণ হইয়া ধৈর্য্যহানি ঘটে। দ্বিতীয়, সাধু ভাষার মধ্যে মধ্যে চলিত, অপভ্রংশ শিথিল পদ প্রয়োগে ভাষার মাধুর্য্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তৃতীয়, স্থানে স্থানে অনবধানতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। যেমন মুসলমান জমিদারের হিন্দু দ্বারবান একই ব্যক্তি এক স্থানে পাঁড়ে ও অপর স্থানে চৌবে হইয়াছে।

চতুর্থ,—আখ্যায়িকার সকল চরিত্রগুলি পরিষ্কাররূপে বিকশিত হয় নাই। বানুবেগম, চুড়িওয়ালী ও মীর মহম্মদের চিত্র চেষ্টা করিলে এই অল্প পরিসরের মধ্যেই প্রস্ফুট হইতে পারিত। ভবিষ্যতে অবহিত হইয়া আখ্যায়িকা বর্ণনায় কলানৈপুণ্য যোগ করিতে পারিলে ইহাঁর রচনা আরো প্রীতিকর হইবে। পুস্তকের শেষে কয়েকটি এবং প্রথমে একটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি ভাব, ভাষা ও ছন্দের দৈন্যে অতি সাধারণ রকমের হইয়াছে। লেখিকার পদ্য রচনা অপেক্ষা গদ্য রচনায় যথেষ্ট নিপুণতা আছে। তাঁহার অনুশীলন দ্বারা গদ্য রচনারই উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হওয়া উচিত। পুস্তকের ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

সাবিত্রী—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিবৃত মহাভারতের উপাখ্যান। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। এই পুস্তকে বিশেষত্ব কিছুই নাই। পুস্তকশেষে গ্রন্থকার মাতা ও কন্যার কথোপকথন ছলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রত অনুষ্ঠান দ্বারা মননশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং সেই শক্তিতে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। সেই ব্রত ধান্যদূর্ব্বা লইয়া নাড়াচাড়ায় নহে পরন্তু সেই ব্রত মানসিক। এই সুন্দর কথাটির অবতারণা করিয়াছেন মাত্র কিন্তু লেখক তাহা অজ্ঞনাগণের বোধগম্য করিতে পারেন নাই। পুস্তকের ভাষাও সরস নহে, সাধু ভাষার মধ্যে মধ্যে নিতান্ত চলিত অপভ্রংশ মিশ্রিত হইয়া শ্রুতিকটু হইয়াছে, ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দও বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া ভারতীয় জননীগণকে তাঁহার সতীত্বের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে বলিতেছেন। সাবিত্রী পত্নীর

কৌমুদী ও কুসুম—শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত। পুস্তকপৃষ্ঠা যথাক্রমে ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৪৮ ও ৪৫, মূল্য প্রত্যেক পুস্তকেরই চারি আনা। দুই খানিই কবিতাপুস্তক, কারণ ইহারা যেমনই হৌক ছন্দে গ্রথিত, অধিকন্তু পুস্তকের মলাটের উপরে ছাপার অক্ষরে 'কবিতা পুস্তক' লেখা আছে। পুস্তকের ভূমিকায় বেদ উপনিষদ, পুরাণ সংহিতা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া অদ্বৈতবাদ, মায়া, আত্মা, আর্য্য সভ্যতা ইত্যাদি কত অসংলগ্ন কথা গাঁথিয়া এক বিরাট হেঁয়ালি রচিত হইয়াছে। ইহা 'পণ্ডিতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে'। কবি এক স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন 'More is meant than meets the ear'—আমরা এই কবির কাব্যে সেরূপ ভাবের অনুকরণ ত' দেখিলাম না, হৃদয়ে প্রতিধ্বনিও অতি অল্প কবিতাই তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। একটি শ্লোকের বড় জোর প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে—

'কথা আছে রস নাই আমাদের কবিতায়'! পরেই কবি বলিতেছেন

'আসে মনে যা যখন এল মেল বকে যায়;
জগতের কবিগণ নিশ্চয় পাগল হায়?'

'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এ প্রবচন নেহাৎ মিথ্যা নয়। তারপরকবির উক্তি—'পাঠক পাগল হ'লে কবিতা বুঝিতে পারে'। আমাদের এমন কবিতা তবে বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে কবিতাগুলি অতি সাধারণ রকমের বলিয়াই বোধ হইয়াছে। দেশের মহাপুরুষ দিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল সনেট লিখিত হইয়াছে সেগুলিও শুধু রূপগুণের ছন্দোময়ী তালিকা হইয়াছে। কোনো কবিতাতেই অবাধ ভাবপ্রবাহ বা ভাষার ঝঙ্কার নাই। কবি একজন বেতর রকমের রাজভক্ত। যুবরাজ ও লাট মিণ্টোর শুভাগমন উপলক্ষ্যে বাংলা ইংরাজি পদ্যে নির্জ্জলা স্তুতি গান করিয়াছেন। ভারতের সম্বন্ধে কবির ধারণা -

'হীন বীর্য্য এবে ভারত সন্তান,
ইংলণ্ড প্রসাদে পুষ্ট কলেবর।'

এবং

Immense are the blessings heap'd on India,
The labouring swains reap a fruitful field?

লর্ড মিণ্টো সম্বন্ধে কবির ধারণা—

A right man in a right place at a time
When the people are in a heated mood:

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

হোমিও-গাথা—শ্রীকুলচন্দ্র দে প্রণীত। অষ্টাংশিত ক্রাউন ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পদ্য পুস্তক লেখকের গদ্য পদ্য রচনায় বেশ শক্তি আছে। এমন নীরস বিষয়ও বেশ সরস সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠ করিতে করিতে ডাক্তার জোন্সের Homeopathic Mnemonics নামক ইংরাজি পদ্যগ্রন্থ মনে পড়ে। সখের প্রথম শিক্ষার্থী বা অন্তঃপুরিকারা ইহা পাঠে বিশেষ আমোদ ও শিক্ষা লাভ করিবেন, হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার মূলতত্ত্বগুলি দিব্য শৃঙ্খলায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। পদ্য মুখস্থ থাকিবার সহায়, অধিকন্তু ইহা অতীব সরস ও কৌতুকময় হইয়াছে। পুস্তক খানি কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। এমন বই ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই হইবে আশা করি। তখন এই ত্রুটির সংশোধন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, বি,এল, প্রণীত। অষ্টাংশিত ফুলস্ক্যাপ ৩৪৯ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা। ইহাতে বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থা,ভূতত্ব, জীবজন্তু, শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, জাতিতত্ব, বঙ্গদেশের কালানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভাগ,

পর্য্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজি, পার্সী, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষার ঐতিহাসিক উপকরণের সহিত লেখকের চিন্তা, আলোচনা ও মৌলিক গবেষণা প্রভৃতির সংযোগে বইখানি বড় উপাদেয় হইয়াছে। একত্র সংক্ষেপে এত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হওয়ায় ইতিহাস-জিজ্ঞাসু পাঠক ও ভবিষ্য ঐতিহাসিকের পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। লেখকের সকল সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত তাহা লেখকও স্বীকার করেন না; এবং এরূপ গ্রন্থ কখনো নিতান্ত আধুনিক গবেষণার অনুসারী (up-to date) হইতে পারে না। এসব ত্রুটি অনিবার্য্য এবং ধর্ত্তব্য নহে। তথাপি আমরা দুই একটির উল্লেখ করিব। ভবিষ্য পুরাণ নিতান্ত অধুনিক, তাহাকে কোনো সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি করা যুক্তি সঙ্গত নহে। লেখক মাল ও কোচ জাতি এক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কারণ উভয় জাতিরই জাতির শ্রেণীবিভাগ একই প্রকারের এবং উভয়ের প্রধান দেবতা মনসা। এরূপ সিদ্ধান্ত আরো প্রমাণসাপেক্ষ। লেখকের ধারণা জলাচরণীয় জাতি মাত্রই আর্য্য, অন্যথা অনার্য্য। হাড়ি মুচি ডোম প্রভৃতি জাতি অনার্য্য। লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে পুরাকালে জাতি গুণের তারতম্যানুসারে সামাজিক উন্নতি অবনতি লাভ করিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি আধুনিক অন্ত্যজ জাতি এককালে ব্রাহ্মণ ছিল, সামাজিক শাসনে তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এবং বিশ্বামিত্রের মত বহুব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে দেখা যায়। এই সমস্যার মীমাংসা ভারতীয় সার্ব্বজাতিক তুলনা ব্যতিরেকে হওয়া দুষ্কর। গোঁড় জাতি হইতে গোয়ালার উৎপত্তি শুধু অনুমান, প্রমাণ কৈ? বাংলার অপরাপর জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রশংসনীয় হইলেও এখনো নির্দ্বন্দ্ব নহে। যাহাই হউক এই বইখানি পড়িয়া আমরা অনেক শিখিয়াছি ও প্রীত হইয়াছি। বই খানির ছাপা ভালো। কাপড়ে বাঁধা শক্ত মলাটে বহিঃ সৌষ্ঠবও সুন্দর হইয়াছে। এমন একখানি পুস্তকে বিষয়ানুক্রমিক সূচী ও বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট পত্র না থাকায় বড়ই অভাব ও অসুবিধা বোধ হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ভাগ শীঘ্রই প্রকাশ হইবে, তাহাতে যেন এ ত্রুটি না থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮ কোটি। প্রকৃত সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারিকোটি।

ঠাকুরমার ঝুলি বা বাঙ্গলার রূপকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। সুপার রয়াল ষোড়শাংশিত ২৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। আমাদের ঠাকুরমার ঝুলি লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল দক্ষিণা বাবু তাহা কুড়াইয়া স্নেহসরস মিষ্টান্নকণাগুলি বঙ্গীয় শিশুগণকে পরিবেশন করিয়াছেন। ইহাতে শুধু শিশু নয়, শিশুর পিতামাতাও তৃপ্ত। যে বাড়ীতে এই মিষ্টান্ন ঝুলি প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ীতে শিশুর দৌরাত্ম্য কমিয়াছে, খোকা খুকি পড়ায় মন দিয়াছে; কেবল বিপদ বাড়িয়াছে ছেলেদের একই সময়ে সকলের ইহা অধিকার করিবার চেষ্টায় কাড়াকাড়ি ঝগড়া মারামারি কোলাহল ক্রন্দনে। প্রত্যেক শিশুকে এক খানি কিনিয়া দিলেই নিশ্চিন্ত। পুরাতন গল্প দক্ষিণা বাবুর কবির ভাষায়, ঠাকুরমার স্নেহসরস কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হইয়া বড় প্রীতিকর হইয়াছে। পুস্তকের বাহ্য সৌষ্ঠবও সুন্দর, রঙীন কালীতে ছাপা, দক্ষিণাবাবুর নিজহাতে আঁকা বহুচিত্রভূষিত। চিত্রগুলিতে কলানৈপুণ্য [illegible] থাকিলেও শিশুর মনোহর হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বালকের সহচর হোক।

নিদ্রাভঙ্গ—ফুলমালা ক্রমের প্রথম খণ্ড। শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান এলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই অতি ক্ষুদ্র বই খানি যখনই সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সমালোচনার জন্য পাইলাম; তখনই প্রাচীন বঙ্গদর্শনে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর একটি সমালোচনা মনে পড়িল। বঙ্কিম বাবু কোনো একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে 'এই পুস্তক খানি লম্বে ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ২॥০ ইঞ্চি; ইহা গলিভরের পকেটে লিলিপুটের আমদানি।' বর্ত্তমান পুস্তকখানিও লিলিপুটীয়; ইহাও লম্বে ৪ ইঞ্চির কম ও প্রস্থে ৩ ইঞ্চির একটু বেশি। অর্থাৎ ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ৪৪ পৃষ্ঠা মাত্র। ফুলমালার এই ছোট্ট একটু কুঁড়ি কিন্তু রূপে গুণে অনিন্দ্য; মালা সম্পূর্ণ হইলে মালীর নিপুণতা ও মালার সৌরভ সকলকে মুগ্ধ করিবে আশা করি। এই ছোট্ট বই খানির একটু বিস্তৃত পরিচয় দিব।

এই গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; ছন্দে প্রাণ ও প্রবাহ আছে; প্রতি পংক্তিতে কবিত্ব আছে; বর্ণনার মাধুর্য্য আছে; ভাবে গভীরতা আছে। সমালোচকব্রত অবলম্বন করিয়া এমন প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিতে প্রায়ই পাই না বলিয়া ক্ষুণ্ণ থাকি; আজ যদি প্রীতির আধিক্যে একটু অত্যুক্তি ঘটে ত' ঘটুক। লেখককে আমি চিনি না, কখনো নামও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পরম সমাদরে তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে আবাহন করিতেছি। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হউক।

এই গ্রন্থের আখ্যায়িকা এই— তপোবনে শান্ত পবিত্র কুটিরে বনবালা জননী শিশু লইয়া বাস করিতেন; দেবশিশু সায়ংপ্রাতে উদয়াস্তের সূর্য্যের পানে নির্নিমেষ চাহিয়া উদাত্ত গম্ভীর গাথা গাহিতে গাহিতে আত্মহারা হইয়া যাইত; যখন আত্মস্থ থাকিত তখন সিংহশিশু ধরিয়া খেলা করিয়া ভবিষ্য বলবিক্রমের পরিচয় দিত। কৈশোরে সেই বালক 'বনে বনে ধনু হাতে মৃগয়ার আশে' ঘুরিত, দৈত্যগণ দ্বারা ঋত্বিকগণের যজ্ঞবিঘ্ন দূর করিত। তার পর দিগ্বিজয়ী পুত্র বনবাসিনী মাতাকে রাজরাজেশ্বরী করিয়াছে; কিন্তু ক্রমে ঐশ্বর্য্যব্যসন পুত্রকে মত্ত ও অসতর্ক করিয়াছে, শত্রু আসিয়া মাতার লাঞ্ছনা করিয়া গিয়াছে। তখন পুত্রের চেতনা আসিল কিন্তু তখন মাতার চিতাভস্ম মাত্র অবশেষ। কঠোর সাধনাতেও মাতৃসাক্ষাৎ যখন ঘটিল না তখন হতাশ পুত্র রক্তের নদীতে ডুব দিল, কিন্তু মরিল না, রাজরাজেশ্বরী মাতাকে পুনর্ব্বার লাভ করিয়া রক্তবেদীতে স্থাপন করিয়া 'উল্লাসে আবেশে মাতি, জননীরে চাহি, সন্তান উঠিল গাহি বন্দে মাতরম্।'

সরস্বতী নদীতটে যেখানে—

'প্রকৃতির শ্যামল শয়ান
চির-শ্যাম-তৃণ-রেখা মিশিয়াছে আসি
পুণ্যতোয়া কল্লোলিনী আশ্রমবাহিনী
সরস্বতী-রৌপ্য-রেখা সনে। নব পত্রে
শ্যামপরিচ্ছদে দাঁড়াইয়া বৃক্ষগুলি
প্রদানিছে তারে চির-ছায়া—'

সেখানকার প্রভাত ও সন্ধ্যার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যে কয় ছত্র লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'ম্লান মুখে নিশারাণী
চকিত নয়নে দেখিলা চাহিয়া দূরে
পশ্চিম গগনে, ছাড়ি তারে নিশানাথ,—
প্রিয় তার—গিয়াছে চলিয়া। ত্রস্ত পদে
পাছে পাছে তার নিশারাণী গেলা চলি
সুদূর পশ্চিমে। নব দুর্ব্বাদল পরে—
গাছের পাতায়, রাখি গেলা বিরহের
পূত অশ্রুমালা। উদয় অচল পথে
সলাজ বয়ানে, লাজ-রক্ত ছুটাইয়া
[illegible]

* * * *
উজলি পড়িল আসি
অস্তগামী তপনের সোণার কিরণ
বালকের প্রফুল্ল আননে। * *
* * * *
* * * বিস্ময়ে বালক চাহি
দেখিল অদূরে স্বচ্ছতোয়া তটিনীর
রজতের রেখা হইয়া গিয়াছে সোণা।
চাহিল আকাশ পানে, দেখে শুধু সোণা,
ধরণীর পরে দেখে সোণামাখা সব।
* * * *
সাঙ্গ করি দিবসের খেলা, দিনমণি
পর পাড়ে গেলা চলি ধীরে। গগনের
স্বর্ণরেখা গুলি সন্ধ্যার ধূসর ছায়ে
হইল বিলীন। তটিনীর স্বর্ণজলে
কালো ছায়া উঠিল ফুটিয়া। * *।'

মুদ্রা-রাক্ষস।

চিত্র পরিচয়।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় দুটি তিব্বতদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিলাম। মূর্ত্তি দুইটি তিব্বতীয় হইলেও ইহাদের ভাব সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয়; এ দুটিতে মঙ্গোলীয় শিল্পের কোন চিহ্ন নাই বলিলেও হয়। তিব্বত হইতে আনীত অধিকাংশ ধাতব শিল্পদ্রব্যের মত এ দুটিও সম্ভবত নেপালী শিল্পীদের নির্ম্মিত। এই দুটি মূর্ত্তি হাবেল সাহেবের মতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় সুকুমার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা।* যে সকল সমালোচক কেবল শরীরসংস্থানবিদ্যার যথাযথ অনুবর্ত্তনেই শিল্পীর গুণ দেখিতে চান, তাঁহারা এ দুটিতে অনেক খুঁৎ ধরিতে পারিবেন, কিন্তু যাঁহারা উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের আদর বুঝেন, তাঁহারা এ দুটির মুখাবয়ব আদিতে ব্যক্ত ধর্ম্মভাব ও গাম্ভীর্য্য এবং সমুদয় ছবিখানির পরিকল্পনার অনুরাগী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

প্রথম ছবিটি সমস্তই তাম্রনির্ম্মিত ও গিল্টিকরা, এবং পিটিয়া গড়া। কেবল মূর্ত্তিটির মস্তক ও দেহের উর্দ্ধদেশ এবং পাদদেশের সিংহ মূর্ত্তি দুটি ঢালা। বুদ্ধের অবতার পদ্মের উপর উপবিষ্ট, বামহস্তে একটি ঘণ্টা ও দক্ষিণে বজ্র ধারণ করিয়া আছেন। ঘণ্টা দ্বারা মঙ্গলকর্ত্তা প্রেতাত্মারা আহূত ও বজ্রদ্বারা অমঙ্গলের কারণীভূত দুষ্ট আত্মারা তাড়িত হয়। বুদ্ধের এই অবতারকে তিব্বতীয়েরা বজ্রধর বুদ্ধ কহিয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি সমস্তই তাম্রনির্ম্মিত, গিল্টিকরা, এবং ঢালা। বুদ্ধের এই অবতারের নাম অমিতাভ বা অমিতায়ুষ বুদ্ধ। ইহাঁকেই তিব্বতীয়েরা পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া থাকেন। তিনি দুই হাতে নির্ব্বাণামৃতের ভাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

* "These two figures represent the highest type of modern Indian Fine Art. Critics who only look for merit in anatomical precision will find much to cavil out in them, but those who can appreciate higher artistic qualities cannot fail to admire the dignity and religious feeling in the expression of the figures and the beautiful design of the composition as a whole." E. B. Havell, *Technical Art Series 1900*

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভাসমূহে রাজকীয় বার্ষিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া গেল। ভারতবর্ষীয় সভ্যগণের কেবল বক্তৃতা করার পরিশ্রমই সার বলিলেও চলে। গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ নিজের স্বার্থ অনুসারেই ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন। সেই জন্য জনসাধারণকে ভীত করিয়া রাখিবার জন্য এবং বহুসংখ্যক ইংরাজের অন্নসংস্থানের নিমিত্ত এক অতি বৃহৎ সৈন্যদল পোষণ করা হইতেছে, প্রায় সেই উদ্দেশ্যে পুলিশের ব্যয়ও ক্রমাগত বাড়ান হইতেছে। অপর দিকে জনসাধারণের শিক্ষার দিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষীয়গণ কিসে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই। লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও প্লেগে মারা যাইতেছে; তাহার প্রকৃত প্রতিকারের চেষ্টা নাই। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহা নিবারণের চেষ্টা নাই।

আমরা জানি যে সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বা চেষ্টা নাই বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিতেই সরকার কিছু না কিছু চেষ্টার উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু যেমন "পিণ্ডি রক্ষা" পর্য্যাপ্ত আহার নয়, তেমনি এই সকল চেষ্টাও ফলদায়ক নহে। এগুলি লোক দেখান চেষ্টা;—সভ্যজগতের নিকট মান রক্ষার উপায় মাত্র।

দুর্ভিক্ষেরই কথা ধরুন। ইংরাজেরা বলেন অনাবৃষ্টি

দুর্ভিক্ষ হয় ত আমরা কি করিব? অর্থাৎ অনাবৃষ্টির দরুন শস্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার উত্তর দ্বিবিধ। অনাবৃষ্টির প্রতিকার খাল ও কূপ খনন। তাহা কি গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছেন? বিদেশী লৌহব্যবসায়ীদের লাভের জন্য রেলওয়ে লাইন বাড়ান দরকার; বিলাতী জিনিষ দেশের সামান্য গ্রামটি পর্য্যন্ত চালাইয়া উহার কাটতি বৃদ্ধি ও স্বদেশী শিল্পের বিলোপ সাধন জন্য রেলওয়ে বাড়ান দরকার; দেশের সর্ব্বত্র অতি শীঘ্র সৈন্যদল চালান করিতে পারিলে জনসাধারণ সর্ব্বদা ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিবে, স্বাধীনতার চেষ্টা করিবে না, সুতরাং রেল বাড়ান দরকার। প্রধানতঃ এই সব কারণে রেল বাড়িতেছে। ইহাতে আমাদের যে সুবিধা কিছুই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু রেল বিস্তৃতিতে আমাদের শিল্পগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র মারা গিয়াছে, ম্যালেরিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশের শস্য বৎসর বৎসর অধিকতর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। রেলের দ্বারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও সহজে শস্য আমদানী করিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করা যায়, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু রেলের দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় না। তাহার প্রমাণ এই যে রেল বাড়া সত্ত্বেও পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ভীষণতর এবং বিস্তৃততর স্থানব্যাপী হইতেছে। রেলে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেকও খাল ও কূপে ব্যয়িত হইলে দেশের অবস্থা এমন হইত না।

তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে আমাদের দেশে হাজার অজন্মা হইলেও সমুদয় অধিবাসীর জন্য যথেষ্ট খাদ্য থাকে। কেবল অধিবাসীদের কিনিবার টাকা না থাকায় তাহারা অন্নাভাবে মারা পড়ে। তাহার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশ হইতে খুব দুর্ভিক্ষের সময়ও বিদেশে শস্য রপ্তানী হয়। অর্থাৎ বিদেশের লোকে যত দাম দিতে পারে, আমরা তাহা দিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিতে পারি না। আমরা ধনশালী হইলে সব শস্য নিজেদের আহারের জন্য দেশে রাখিতে পারিতাম। কি সুবৎসর কি দুর্বৎসর, বর্ত্তমান-কালে ইংলণ্ডে ইংরাজদের আহারের জন্য যথেষ্ট গম কোন বৎসরই হয় না; যত দরকার আন্দাজ তাহার সিকি [illegible]। যদি দেশে অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডে চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজমান থাকিত। কিন্তু সেখানে ত দুর্ভিক্ষ হয় না। কারণ, তথাকার লোকে শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা এরূপ ধন উপার্জ্জন করে যে বিদেশ হইতে খাদ্য কিনিয়া আনিতে পারে।

আমরাও এক সময়ে পৃথিবীতে শিল্পবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলাম। কোম্পানীর রাজত্বের সময় প্রধানতঃ নানা আইনকানুন ও অত্যাচারের দ্বারা সে সব নষ্ট হইয়াছে। ভারতের সহস্রাধিক বন্দর এখন আর নাই; এখন যে কয়টিতে ঠেকিয়াছে, তাহা আঙ্গুলে গোনা যায়। আমাদের বিদেশগামী শত শত জাহাজ ছিল; সে সবও নাই। আমাদিগকে সরকার সাহিত্য, দর্শন ও পুঁথিগত বিজ্ঞান মুখস্থ করাইয়াছেন, নিজেদের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ কেরাণী ও নিম্নতর কর্ম্মচারী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু খুব সাবধানতার সহিত শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

এখন উপায় কি? অন্যান্য সভ্য দেশে প্রজারা যে ট্যাক্স দেয়, তাহা তাহাদের মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হয়; আমাদের টাকা প্রধানতঃ ইংরাজের সুবিধার জন্য খরচ করা হয়। আমরা প্রতিবাদ করিলে কেবা শুনে? আমাদের টাকা আমাদের কাজে লাগিতেছে না। আমরা বিরক্ত হইয়া যদি প্রতিবাদ করা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করি বা না করি, দেশরক্ষা ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। একবার সরকারকে ট্যাক্স দিতেছি, অতিরিক্ত মাত্রাতেই দিতেছি। আবার দেশের হিতের জন্য টাকা দেওয়া সহজ নহে। কিন্তু দিতেই হইবে। যে পাপে আমরা পরাধীন হইয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সেই প্রায়-শ্চিত্ত অর্থ দিয়া, বুদ্ধি বিদ্যা দিয়া, দেহপাত, প্রাণপাত করিয়া করিতে হইবে। আমাদের যে পরিমাণে অধোগতি হইয়াছে, আমাদের আত্মোৎসর্গ, সেই পরিমাণে আমাদের জীবনব্যাপী, আমাদের সর্ব্বশক্তিগ্রাসী হওয়া চাই। নতুবা উদ্ধার নাই। আমাদিগকে যুগপৎ সকল দিকেই লাগিতে হইবে। অন্নকষ্ট নিবারণ, সাধারণ ও অর্থকরী বিদ্যাদান, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, দেশের লোকদের চরিত্রোন্নতি, সকল দিকেই চেষ্টার একান্ত [illegible]

বিলাসব্যসনের সময় নাই, হাসিবারও সময় নাই। এখন কঠোর তপস্যা ও সাধনার সময়।

কবি-সম্ভাষণ।

(কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত।)

(১)

সরস ব্যঙ্গে হাসির রঙ্গে
বিপুল বঙ্গ-মজ্‌লিসে—
করিছ সৃষ্টি বচন মিষ্টি,
আম্র-শ্রেষ্ঠ ফজ্‌লি সে।
ছাড়েনা চাদর "বিলাতি বাঁদর,"
হচ্ছে তাদেরো সুখ্যাতি;
পাচ্ছে দণ্ড যতেক ভণ্ড
"চণ্ডী" "নন্দ" ইত্যাদি।

(২)

শুধু কি হাসাও? কাঁদিয়ে ভাসাও,
পাষাণে বসাও চিহ্ন;
রূপসী নবীনা "পাষাণী" প্রতিমা
রচিবে কে তোমা ভিন্ন?
তাপেতে তপ্তা সে অভিশপ্তা
কাঁদিলে মুক্তা ঝরে;
কুড়ায়ে সে ধন সতীরা এখন
হারের রতন করে।

(৩)

'ইরা' গুণবতী করুণামূরতি
'দৌলত' সতীরত্ন;
প্রীতির দেহের পরাণ 'মেহের'
ঢালেরে মোহের স্বপ্ন।
ওগো ও মিত্র, অতি-পবিত্র
তোমার চিত্রতুলিকা;
বিবিধ বর্ণে সুরভি পর্ণে
এঁকেছ পুণ্যকলিকা।

(৪)

মহান উচ্চ দীপ্ত সূর্য্য
দেবতাপূজ্য "গৌতমে"
হেরিবা মাত্রে ভক্তিনেত্রে
মলিন চিত্ত ধৌত হে।
জড়তাযুক্ত চেতনালুপ্ত—
আঁধারে সুপ্ত মহীতে
নবভানুতাপ প্রসারি "প্রতাপ"—
আনিল প্রভাত চকিতে।

(৫)

হাসিয়ে হাসাও, কাঁদিয়ে কাঁদাও,
শৌর্য্যে মাতাও প্রাণ;
বিভবে গরবে অক্ষয় হবে
এ ভবে তোমার গান।
রহি পবিত্র, সরস নিত্য,
পাশরি চিত্ত-ব্যথা,—
বিবিধ ছন্দে মধুরে মন্দ্রে
গাহ দ্বিজেন্দ্র, গাথা!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনা।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। | ২য় সংখ্যা।

গোরা।

২২

গোরা তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিল। বাড়ি যাইবার সহজপথ ছাড়িয়া সে অনেকটা ঘুরিয়া গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিল। তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক্‌সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাসকালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত।

প্রকৃতি কোনো দিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার মন নিজের সচেষ্টতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়াছিল;—যে জল স্থল আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টার ক্ষেত্র নহে তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে, আর, কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্দ্ধে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মত তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট্ অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়াছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল—আজ কি হইল? আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালোজল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।

পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্ বিলাতী লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরার

ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দ্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল;—সেখানে নির্জ্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কি ফুল ফুটাইয়াছে—কি ছায়া ফেলিয়াছে!—সেখানে নির্ম্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া। চারিদিক হইতে মাধুর্য্যের আবর্ত্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্ব্বে কোনো দিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনায় এবং আনন্দে তাহার সমস্ত মনকে একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহত করিতে লাগিল। আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে, এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল;—এই মহারাণীকে সে এতদিন নতমস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ অকস্মাৎ তাহার শাসনের ইন্দ্রজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জলস্থল আকাশের সঙ্গে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বিস্মিত হইয়া নদীর জলশূন্য ঘাটের একটা পইঠায় বসিয়া পড়িল। বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব, এবং ইহার কি প্রয়োজন! যে সংকল্পদ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনি বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাত খানির অঙ্গুলিগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল; সে তাহার এই নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল—ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

অনেক রাত্রে যখন গোরা বাড়ি গেল তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত করলে যে বাবা, তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

গোরা কহিল, "কি জানি মা, আজ কি মনে হল, অনেকক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসে ছিলুম।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনয় সঙ্গে ছিল বুঝি?"

গোরা কহিল "না, আমি একলাই ছিলুম।"

আনন্দময়ী মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। বিনা প্রয়োজনে গোরা যে এত রাত পর্য্যন্ত গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিবে এমন ঘটনা কখনই হয় নি। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবা তাহার স্বভাবই নহে। গোরা যখন অন্যমনস্ক হইয়া খাইতেছিল আনন্দময়ী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহার মুখে যেন একটা কেমনতর উতলা ভাবের উদ্দীপনা।

আনন্দময়ী কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি বিনয়ের বাড়ি গিয়েছিলে?"

গোরা কহিল—"না, আজ আমরা দুজনেই পরেশ বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম।"

শুনিয়া আনন্দময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওঁদের সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?"

গোরা কহিল—"হাঁ হয়েছে।"

আনন্দময়ী। ওঁদের মেয়েরা বুঝি সকলের সাক্ষাতেই বেরন?

গোরা। হাঁ, ওঁদের কোনো বাধা নেই।

অন্য সময় হইলে এরূপ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা প্রকাশ পাইত, আজ তাহার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া আনন্দময়ী আবার চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া গোরা অন্যদিনের মত অবিলম্বে মুখ ধুইয়া দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে গেল না। সে অন্যমনস্কভাবে তাহার শোবার ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের গলি...

পূর্ব্বের দিকে একটা বড় রাস্তায় পড়িয়াছে; সেই বড়-রাস্তার পূর্ব্ব প্রান্তে একটা ইস্কুল আছে; সেই ইস্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জাম গাছের মাথার উপরে পাৎলা একখণ্ড শাদা কুয়াসা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের অরুণ রেখা ঝাপ্সা হইয়া দেখা দিতেছিল। গোরা চুপ করিয়া অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেই ক্ষীণ কুয়াসাটুকু মিশিয়া গেল, উজ্জ্বল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেকগুলো ঝক্‌ঝকে সঙিনের মত বিঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাস্তা জনতায় ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে অবিনাশের সঙ্গে আর কয়েকটি ছাত্রকে তাহার বাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া গোরা তাহার এই আবেশের জালকে যেন এক প্রবল টানে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে নিজের মনকে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বলিল—না, এসব কিছু নয়; এ কোনো মতেই চলিবে না।—বলিয়া দ্রুতবেগে শোবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গোরার বাড়িতে তাহার দলবল আসিয়াছে অথচ গোরা তাহার অনেক পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া নাই এমন ঘটনা ইহার পূর্ব্বে আর একদিনও ঘটিতে পায় নাই। এই সামান্য ত্রুটিতেই গোরাকে ভারি একটা ধিক্কার দিল। সে মনে মনে স্থির করিল আর সে পরেশ বাবুর বাড়ি যাইবে না এবং বিনয়ের সঙ্গেও যাহাতে কিছুদিন দেখা না হইয়া এই সমস্ত আলোচনা বন্ধ থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

সে দিন নীচে গিয়া এই পরামর্শ হইল যে গোরা তাহার দলের দুই তিন জনকে সঙ্গে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে;—পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই লইবে না।

এই অপূর্ব্ব সংকল্প মনে লইয়া গোরা হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া এইরূপ খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল। ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় যে একটা জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, এই বাহির হইবার কল্পনাতেই, সেটা যেন ছিন্ন হইয়া গেল বলিয়া তাহার মনে হইল। এই সমস্ত ভাবের আবেশ যে মায়ামাত্র এবং কর্ম্মই যে সত্য সেই কথাটা খুব জোরের সহিত নিজের মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য, ইস্কুল-ছুটির বালকের মত গোরা তাহার একতলার বসিবার ঘর ছাড়িয়া প্রায় ছুটিয়া বাহির হইল। সেই সময় কৃষ্ণদয়াল গঙ্গাস্নান সারিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঘরে চলিয়াছিলেন। গোরা একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। লজ্জিত হইয়া গোরা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া "থাক্ থাক্" বলিয়া সসঙ্কোচে চলিয়া গেলেন। পূজায় বসিবার পূর্ব্বে গোরার স্পর্শে তাঁহার গঙ্গাস্নানের ফল মাটি হইল। কৃষ্ণদয়াল যে গোরার সংস্পর্শই বিশেষ করিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন গোরা তাহা ঠিক বুঝিত না; সে মনে করিত তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই সংস্রব বাঁচাইয়া চলাই অহরহ তাঁহার সতর্কতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল; আনন্দময়ীকে ত তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া দূরে পরিহার করিতেন,—মহিম কাজের লোক, মহিমের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাতেরই অবকাশ ঘটিত না। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল মহিমের কন্যা শশিমুখীকে তিনি কাছে লইয়া তাহাকে সংস্কৃত স্তোত্র মুখস্থ করাইতেন এবং পূজার্চ্চনাবিধিতে দীক্ষিত করিতেন।

কৃষ্ণদয়াল গোরাকর্তৃক তাঁহার পাদস্পর্শে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাঁহার সঙ্কোচের কারণ সম্বন্ধে গোরার চেতনা হইল এবং সে মনে মনে হাসিল। এইরূপে পিতার সহিত গোরার সমস্ত সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক এই আচারদ্রোহিণী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত।

আহারান্তে গোরা একটি ছোট পুঁটলিতে গোটাকয়েক কাপড় লইয়া সেটা বিলাতী পর্য্যটকদের মত পিঠে বাঁধিয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—"মা, আমি কিছু দিনের মত বেরব।"

আনন্দময়ী কহিলেন "কোথায় যাবে বাবা?" গোরা কহিল "সেটা আমি ঠিক বল্‌তে পারচি নে।" আনন্দময়ী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো কাজ আছে ?" গোরা কহিল—"কাজ বল্তে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয়—এই যাওয়াটাই একটা কাজ !"

আনন্দময়ীকে একটু খানি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গোরা কহিল—"মা, দোহাই তোমার, আমাকে বারণ করতে পারবে না। তুমি ত আমাকে জানই, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব এমন ভয় নেই। আমি মাকে ছেড়ে বেশি দিন কোথাও থাকতে পারিনে।"

মার প্রতি তাহার ভালবাসা গোরা কোনোদিন মুখে এমন করিয়া বলে নাই—তাই আজ কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইল।

পুলকিত আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি তাহার লজ্জাটা চাপা দিয়া কহিলেন—"বিনয় সঙ্গে যাবে বুঝি ?"

গোরা ব্যস্ত হইয়া কহিল—"না, মা, বিনয় যাবে না। ঐ দেখ, অমনি মার মনে ভাবনা হচ্চে, বিনয় না গেলে তাঁর গোরাকে পথে ঘাটে রক্ষা করবে কে ? বিনয়কে যদি তুমি আমার রক্ষক বলে মনে কর সেটা তোমার একটা কুসংস্কার ;—এবারে নিরাপদে ফিরে এলে ঐ সংস্কারটা তোমার ঘুচ্‌বে।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "মাঝে মাঝে খবর পাব ত ?"

গোরা কহিল, "খবর পাবে না বলেই ঠিক করে রাখ—তার পরে যদি পাও ত খুসি হবে। ভয় কিছুই নেই ; তোমার গোরাকে কেউ নেবে না মা,—তুমি আমার যতটা মূল্য কল্পনা কর আর কেউ ততটা করে না। তবে এই বোঁচ্‌কাটির উপর যদি কারো লোভ হয় তবে এটা তাকে দান করে দিয়ে চলে আস্‌ব ; এটা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দান করব না—সে নিশ্চয় !"

গোরা আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া হাত চুম্বন করিলেন—কোনো প্রকার নিষেধ মাত্র করিলেন না। নিজের কষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কল্পনায় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আনন্দময়ী কখনো কাহাকেও নিষেধ করিতেন না। নিজের জীবনে তিনি অনেক বাধা বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবী তাঁহার কাছে অপরিচিত নহে ; তাঁহার মনে ভয় বলিয়া কিছু ছিল না। গোরা যে কোনো বিপদে পড়িবে সে ভয় তিনি মনে আনেন নাই—কিন্তু গোরার মনের মধ্যে যে কি একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে সেই কথাই তিনি কাল হইতে ভাবিতেছেন। আজ হঠাৎ গোরা অকারণে ভ্রমণ করিতে চলিল শুনিয়া তাঁহার সেই ভাবনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

গোরা পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া রাস্তায় যেই পা দিয়াছে এমন সময় হাতে ঘনরক্ত বসোরা গোলাপযুগল সযত্নে লইয়া বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা কহিল—"বিনয়, তোমার দর্শন অযাত্রা কি সুযাত্রা এবারে তার পরীক্ষা হবে।"

বিনয় কহিল—"বেরচ্চ না কি ?"

গোরা কহিল—"হাঁ।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ?"

গোরা কহিল—"প্রতিধ্বনি উত্তর করিল কোথায়।"

বিনয়। প্রতিধ্বনির চেয়ে ভাল উত্তর নেই না কি ?

গোরা। না। তুমি মার কাছে যাও, সব শুনতে পাবে। আমি চল্লুম।—বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

বিনয় অন্তঃপুরে গিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের পরে গোলাপফুল দুইটি রাখিল।

আনন্দময়ী ফুল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কোথায় পেলে বিনয় ?"

বিনয় তাহার ঠিক স্পষ্ট উত্তরটি না দিয়া কহিল—"ভাল জিনিষটি পেলেই আগে মায়ের পূজোর জন্যে সেটি দিতে ইচ্ছা করে।"

তার পরে আনন্দময়ীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বিনয় কহিল—"মা, তুমি কিন্তু অন্যমনস্ক আছ।"

আনন্দময়ী কহিলেন—"কেন বল দেখি ?"

বিনয় কহিল, "আজ আমার বরাদ্দ পানটা দেবার কথা ভুলেই গেছ।"

আনন্দময়ী লজ্জিত হইয়া বিনয়কে পান আনিয়া দিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দুপর বেলা ধরিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গোরার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিনয় কোনা কথা পরিষ্কার বলিতে পারিল না।

আনন্দময়ী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল বুঝি তুমি গোরাকে নিয়ে পরেশ বাবুর ওখানে গিয়েছিলে ?"

বিনয় গত কল্যকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল। আনন্দময়ী প্রত্যেক কথাটি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শুনিলেন।

যাইবার সময় বিনয় কহিল, "মা, পূজা ত সাঙ্গ হল, এবার তোমার চরণের প্রসাদী ফুল দুটো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি ?"

আনন্দময়ী হাসিয়া গোলাপ ফুল দুইটি বিনয়ের হাতে দিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এ গোলাপ দুইটি যে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্যই আদর পাইতেছে তাহা নহে—নিশ্চয়ই উদ্ভিদতত্ত্বের অতীত আরো অনেক গভীর তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে।

বিকাল বেলায় বিনয় চলিয়া গেলে তিনি কতই ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানকে ডাকিয়া বারবার প্রার্থনা করিলেন—গোরাকে যেন অসুখী হইতে না হয় এবং বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের যেন কোনো কারণ না ঘটে।

২৩

গোলাপ ফুলের একটু ইতিহাস আছে।

কাল রাত্রে গোরা ত পরেশ বাবুর বাড়ি হইতে চলিয়া আসিল—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে সেই অভিনয়ে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব লইয়া বিনয়কে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

এই অভিনয়ে ললিতার যে কোনো উৎসাহ ছিল তাহা নহে—সে বরঞ্চ এসব ব্যাপার ভালই বাসিত না। কিন্তু কোনো মতে বিনয়কে এই অভিনয়ে জড়িত করিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যেন একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত কাজ গোরার মতবিরুদ্ধ, বিনয়কে দিয়া তাহা সাধন করাইবার জন্য তাহার একটা রোখ জন্মিয়াছিল। বিনয় যে গোরার অনুবর্ত্তী, ইহা ললিতার কাছে কেন এত অসহ্য হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেমন করিয়া হোক্ সমস্ত বন্ধন কাটিয়া বিনয়কে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে, এম্নি হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতা তাহার বেণী দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"কেন মশায়, অভিনয়ে দোষটা কি ?"

বিনয় কহিল—"অভিনয়ে দোষ না থাক্‌তে পারে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে অভিনয় কর্ত্তে যাওয়া আমার মনে ভাল লাগ্‌চে না।"

ললিতা। আপনি নিজের মনের কথা বল্‌চেন, না আরো কারো ?

বিনয়। অন্যের মনের কথা বলবার ভার আমার উপরে নেই—বলাও শক্ত। আপনি হয় ত বিশ্বাস করেন না, আমি নিজের মনের কথাটাই বলে থাকি—কখনো নিজের জবানীতে, কখনো বা অন্যের জবানীতে।

ললিতা একথার কোনো জবাব না দিয়া একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিল মাত্র। একটু পরে কহিল—"আপনার বন্ধু গৌরবাবু বোধ হয় মনে করেন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেই খুব একটা বীরত্ব হয়—ওতেই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার ফল হয়।"

বিনয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমার বন্ধু হয় ত না মনে করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি। লড়াই নয় ত কি ! যে লোক আমাকে গ্রাহ্যই করে না, মনে করে আমাকে কড়ে' আঙুল তুলে ইসারায় ডাক্ দিলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব তার সেই উপেক্ষার সঙ্গে উপেক্ষা দিয়েই যদি লড়াই না করি তা হলে আত্মসম্মানকে বাঁচাব কি করে ?"

ললিতা নিজে অভিমানী স্বভাবের লোক—বিনয়ের মুখের এই অভিমানবাক্য তাহার ভালই লাগিল। কিন্তু সেই জন্যই, তাহার নিজের পক্ষের যুক্তিকে দুর্ব্বল অনুভব করিয়াই ললিতা অকারণ বিদ্রূপের খোঁচায় বিনয়কে কথায় কথায় আহত করিতে লাগিল।

শেষকালে বিনয় কহিল—"দেখুন্ আপনি তর্ক করচেন কেন ? আপনি বলুন্ না কেন, 'আমার ইচ্ছা, আপনি অভিনয়ে যোগ দেন।' তা হলে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষার খাতিরে নিজের মতটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে একটা সুখ পাই।"

ললিতা কহিল—"বাঃ, তা আমি কেন বলব ? সত্যি যদি আপনার কোনো মত থাকে তাহলে সেটা আমার অনুরোধে কেন ত্যাগ করতে যাবেন ? কিন্তু সেটা সত্যি হওয়া চাই।"

বিনয় কহিল "আচ্ছা সেই কথাই ভাল। আমার সত্যিকার কোনো মত নেই। আপনার অনুরোধে নাই হল, আপনার তর্কেই পরাস্ত হয়ে আমি অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হলুম।"

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই বিনয় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল—"অভিনয়ের জন্ম প্রস্তুত হতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলে দেবেন।"

বরদাসুন্দরী সগর্ব্বে কহিলেন—"সে জন্যে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, সে আমরা আপনাকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারব। কেবল অভ্যাসের জন্ম রোজ আপনাকে নিয়মিত আসতে হবে।"

বিনয় কহিল—"আচ্ছা। আজ তবে আসি।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"সে কি কথা? আপনাকে খেয়ে যেতে হচ্চে।"

বিনয় কহিল—"আজ নাই খেলুম্।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"না, না, সে হবে না।"

বিনয় খাইল, কিন্তু অন্ত দিনের মত তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল না। আজ সুচরিতাও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া ছিল। যখন ললিতার সঙ্গে বিনয়ের লড়াই চলিতেছিল তখন সে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। আজ রাত্রে কথাবার্ত্তা আর জমিল না।

বিদায়ের সময় বিনয় ললিতার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া কহিল—"আমি হার মানলুম তবু আপনাকে খুসি করতে পারলুম না।"

ললিতা কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

ললিতা সহজে কাঁদিতে জানেনা কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কি হইয়াছে? কেন সে বিনয় বাবুকে বার বার এমন করিয়া খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে?

বিনয় যতক্ষণ অভিনয়ে যোগ দিতে নারাজ ছিল ললিতার জেদও ততক্ষণ কেবলি চড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু যখনি সে রাজি হইল তখনি তাহার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। যোগ না দিবার পক্ষে যতগুলি তর্ক সমস্ত তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মন পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল কেবল আমার অনুরোধ রাখিবার জন্ম বিনয় বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অনুরোধ! কেন অনুরোধ রাখিবেন! তিনি মনে করেন, অনুরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করিতেছেন! তাঁহার এই ভদ্রতাটুকু পাইবার জন্ম আমার যেন অত্যন্ত মাথা ব্যথা!

কিন্তু এখন অমন করিয়া স্পর্দ্ধা করিলে চলিবে কেন? সত্যই যে সে বিনয়কে অভিনয়ের দলে টানিবার জন্ম এতদিন ক্রমাগত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে! আজ বিনয় ভদ্রতার দায়ে তাহার এত জেদের অনুরোধ রাখিয়াছে বলিয়া রাগ করিলেই বা চলিবে কেন? এই ঘটনায় ললিতার নিজের উপরে এমনি তীব্র ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হইল যে স্বভাবত এতটা হইবার কোনও কারণ ছিল না। অন্তদিন হইলে তাহার মনের চাঞ্চল্যের সময় সে সুচরিতার কাছে যাইত। আজ গেল না এবং কেন যে তাহার বুকটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া তাহার চোখ দিয়া এমন করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে সুধীর লাবণ্যকে একটি তোড়া আনিয়া দিয়াছিল। সেই তোড়ায় একটি বোঁটায় দুইটি বিকচোন্মুখ বসোরা গোলাপ ছিল। ললিতা সেটি তোড়া হইতে খুলিয়া লইল। লাবণ্য কহিল—"ও কি করচিস্?" ললিতা কহিল, "তোড়ায় অনেক গুলো বাজে ফুল পাতার মধ্যে ভালো ফুলকে বাঁধা দেখলে আমার কষ্ট হয়; ওরকম দড়ি দিয়ে সব জিনিষকে এক শ্রেণীতে জোর করে বাঁধা বর্ব্বরতা।"

এই বলিয়া সমস্ত ফুলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ললিতা সে গুলিকে ঘরের এদিকে ওদিকে পৃথক্ করিয়া সাজাইল; কেবল গোলাপ দুটিকে হাতে করিয়া লইয়া গেল।

সতীশ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি ফুল কোথায় পেলে?"

ললিতা তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "আজ তোর বন্ধুর বাড়ীতে যাবি নে?"

বিনয়ের কথা এতক্ষণ সতীশের মনে ছিল না, কিন্তু তাহার উল্লেখ মাত্রেই লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"হাঁ যাব!" বলিয়া তখনি যাইবার জন্ম অস্থির হইয়া উঠিল।

ললিতা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সেখানে গিয়ে কি করিস্?"

সতীশ সংক্ষেপে কহিল "গল্প করি।"

ললিতা কহিল "তিনি তোকে এত ছবি দেন্ তুই তাঁকে কিছু দিস্নে কেন?"

বিনয় ইংরেজি কাগজ প্রভৃতি হইতে সতীশের জন্ম নানাপ্রকার ছবি কাটিয়া রাখিত। একটা খাতা করিয়া

সতীশ এই ছবিগুলা তাহাতে গঁদ দিয়া আঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে পাতা পুরাইবার জন্য তাহার নেশা এতই চড়িয়া গিয়াছে যে ভাল বই দেখিলেও তাহা হইতে ছবি কাটিয়া লইবার জন্য তাহার মন ছটফট করিত। এই লোলুপতার অপরাধে তাহার দিদিদের কাছে তাহাকে বিস্তর তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে।

সংসারে প্রতিদান বলিয়া যে একটা দায় আছে সে কথাটা হঠাৎ আজ সতীশের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভাঙা টিনের বাক্সটির মধ্যে তাহার নিজের বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কোনোটারই আসক্তিবন্ধন ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ নহে। সতীশের উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া ললিতা হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—"থাক্ থাক্ তোকে আর অত ভাব্‌তে হবে না। আচ্ছা, এই গোলাপ ফুল ছুটো তাঁকে দিস্।"

এত সহজে সমস্যার মীমাংসা হইল দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং ফুল ছুটি লইয়া তখনি সে তাহার বন্ধুঋণ শোধ করিবার জন্য চলিল।

রাস্তায় বিনয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। "বিনয় বাবু" "বিনয় বাবু" করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে ডাক দিয়া সতীশ তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জামার মধ্যে ফুল লুকাইয়া কহিল, "আপনার জন্যে কি এনেছি বলুন দেখি।"

বিনয়কে হার মানাইয়া গোলাপ ফুল ছুইটী বাহির করিল। বিনয় কহিল "বাঃ, কি চমৎকার! কিন্তু সতীশ বাবু এটিত তোমার নিজের জিনিষ নয়। চোরাই মাল নিয়ে শেষকালে পুলিসের হাতে পড়বনা ত?"

এই ফুল ছুটিকে ঠিক নিজের জিনিষ বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সতীশের হঠাৎ ধোঁকা লাগিল। সে একটু ভাবিয়া কহিল—"না, বাঃ, ললিতা দিদি আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে!"

এ কথাটার এই খানেই নিষ্পত্তি হইল, এবং বিকালে তাহাদের বাড়ি যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিনয় সতীশকে বিদায় দিল।

কাল রাত্রে ললিতার কথার খোঁচা খাইয়া বিনয় তাহার বেদনা ভুলিতে পারিতেছিল না। বিনয়ের সঙ্গে কাহারো প্রায় বিরোধ হয় না। সেই জন্য এই প্রকার তীব্র আঘাত সে কাহারো কাছে প্রত্যাশাই করে না। ইতিপূর্ব্বে ললিতাকে বিনয় সুচরিতার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী করিয়াই দেখিয়াছিল। কিন্তু অঙ্কুশাহত হাতি যেমন তাহার মাহুতকে ভুলিবার সময় পায় না, কিছু দিন হইতে ললিতা সম্বন্ধে বিনয়ের সেই দশা হইয়াছিল। কি করিয়া ললিতাকে একটু খানি প্রসন্ন করিবে এবং শান্তি পাইবে বিনয়ের এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া ললিতার তীব্র-হাস্যদিগ্ধ জ্বালাময় কথাগুলি একটার পর একটা কেবলি তাহার মনে বাজিয়া উঠিত এবং তাহার নিদ্রা দূর করিয়া রাখিত। "আমি গোরার ছায়ার মত, আমার নিজের কোনো পদার্থ নাই, ললিতা এই বলিয়া অবজ্ঞা করেন, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।" ইহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তি সে মনের মধ্যে জড় করিয়া তুলিত। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি তাহার কোনো কাজে লাগিত না। কারণ ললিতা ত স্পষ্ট করিয়া এ অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনে নাই—এ কথা লইয়া তর্ক করিবার অবকাশই তাহাকে দেয় নাই। বিনয়ের জবাব দিবার এত কথা ছিল তবু সেগুলা ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহার মনের ক্ষোভ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে কাল রাত্রে হারিয়াও যখন ললিতার মুখ সে প্রসন্ন দেখিল না তখন বাড়িতে আসিয়া সে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সত্যই কি আমি এতই অবজ্ঞার পাত্র?"

এই জন্যই সতীশের কাছে যখন সে শুনিল যে ললিতাই তাহাকে গোলাপফুল ছুটি সতীশের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সে অত্যন্ত একটা উল্লাস বোধ করিল। সে ভাবিল, অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হওয়াতেই সন্ধির নিদর্শন স্বরূপ ললিতা তাহাকে খুসি হইয়া এই গোলাপ ছুটি দিয়াছে। প্রথমে মনে করিল ফুল ছুটি বাড়িতে রাখিয়া আসি, তাহার পরে ভাবিল—না, এই শান্তির ফুল মায়ের পায়ে দিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়া আনি।

সে দিন বিকালে বিনয় যখন পরেশ বাবুর বাড়িতে গেল তখন সতীশ ললিতার কাছে তাহার ইস্কুলের পড়া বলিয়া লইতেছে। বিনয় ললিতাকে কহিল—"যুদ্ধেরই রং লাল, অতএব সন্ধির ফুল শাদা হওয়া উচিত ছিল।"

ললিতা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল। বিনয় তখন একটি গুচ্ছ শ্বেত করবী চাদরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ললিতার সম্মুখে ধরিয়া কহিল—"আপনার ফুল দুটি যতই সুন্দর-হোক্ তবু তাতে ক্রোধের রংটুকু আছে ; আমার এ ফুল সৌন্দর্য্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু শান্তির শুভ্র রঙে নম্রতা স্বীকার করে আপনার কাছে হাজির হয়েছে।"

ললিতা কর্ণমূল রাঙা করিয়া কহিল, "আমার ফুল আপনি কাকে বল্‌চেন ?"

বিনয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"তবে ত ভুল বুঝেছি। সতীশ বাবু, কার ফুল কাকে দিলে ?"

সতীশ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"বাঃ, ললিতা দিদি যে দিতে বল্লে !"

বিনয়। কাকে দিতে বল্লেন্ ?

সতীশ। আপনাকে।

ললিতা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া সতীশের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—"তোর মত বোকা ত আমি দেখিনি ! বিনয়বাবুর ছবির বদলে তুই তাঁকে ফুল দিতে চাইলি নে ?"

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল—"হাঁ, তাইত, কিন্তু তুমিই আমাকে দিতে বল্লে না ?"

সতীশের সঙ্গে তক্‌রার করিতে গিয়া ললিতা আরো বেশি করিয়া জালে জড়াইয়া পড়িল। বিনয় স্পষ্ট বুঝিল ফুল দুটি ললিতাই দিয়াছে, কিন্তু বেনামীতেই কাজ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল। বিনয় কহিল, "আপনার ফুলের দাবী আমি ছেড়েই দিচ্চি—কিন্তু তাই বলে আমার এই ফুলের মধ্যে ভুল কিছুই নেই। আমাদের বিবাদ নিষ্পত্তির শুভ উপলক্ষ্যে এই ফুল কয়টি"—

ললিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমাদের বিবাদই বা কি, আর তার নিষ্পত্তিইবা কিসের ?"

বিনয় কহিল—"একেবারে আগাগোড়া সমস্তই মায়া ? বিবাদও ভুল, ফুলও তাই, নিষ্পত্তিও মিথ্যা ? শুধু শুক্তিতে রজত ভ্রম নয়, শুক্তিটা শুদ্ধই ভ্রম ? ঐ যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে অভিনয়ের একটা কথা হচ্ছিল সেটা—"

ললিতা কহিল—"সেটা ভ্রম নয়। কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া কিসের ? আপনি কেন মনে করচেন আপনাকে এইটেতে রাজি করাবার জন্যে আমি মস্ত একটা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছি—আপনি সম্মত হওয়াতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কাছে অভিনয় করাটা যদি অন্যায় বোধ হয় কারো কথা শুনে কেনইবা তাতে রাজি হবেন ?"

এই বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সমস্তই উল্টা ব্যাপার হইল। আজ ললিতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিনয়ের কাছে নিজের হার স্বীকার করিবে এবং যাহাতে অভিনয়ে বিনয় যোগ না দেয় তাহাকে সেইরূপ অনুরোধ করিবে। কিন্তু এমন করিয়া কথাটা উঠিল এবং এমন ভাবে তাহার পরিণতি হইল যে, ফল ঠিক উল্‌টা দাঁড়াইল। বিনয় মনে করিল, সে যে অভিনয় সম্বন্ধে এতদিন বিরুদ্ধতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই প্রতিঘাতের উত্তেজনা এখনো ললিতার মনে রহিয়া গেছে। বিনয় যে কেবল বাহিরে হার মানিয়াছে—কিন্তু মনের মধ্যে তাহার বিরোধ রহিয়াছে এই জন্য ললিতার ক্ষোভ দূর হইতেছে না। ললিতা এই ব্যাপারটাতে যে এতটা আঘাত পাইয়াছে ইহাতে বিনয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির করিল এই কথাটা লইয়া সে আর কোনো আলোচনা উপহাসচ্ছলেও করিবে না—এবং এমন নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কাজটাকে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে যে কেহ তাহার প্রতি ঔদাসীন্যের অপরাধ আরোপ করিতে পারিবে না।

সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া "খ্রীষ্টের অনুকরণ" নামক একটি ইংরেজি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আজ সে তাহার অন্যান্য নিয়মিত কর্ম্মে যোগ দেয় নাই। মাঝে মাঝে গ্রন্থ হইতে মন ভ্রষ্ট হইয়া পড়াতে বইয়ের লেখাগুলি তাহার কাছে ছায়া হইয়া পড়িতেছিল—আবার পরক্ষণে নিজের উপর রাগ করিয়া বিশেষ বেগের সহিত চিত্তকে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছিল—কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছিল না।

এক সময়ে দূর হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল বিনয় বাবু আসিয়াছেন ;—তখনি চমকিয়া উঠিয়া বই রাখিয়া বাহিরের ঘরে যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের এই ব্যস্ততাতে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুচরিতা আবার

চৌকির উপর বসিয়া বই লইয়া পড়িল। পাছে কানে শব্দ যায় বলিয়া দুই কান চাপিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় ললিতা তাহার ঘরে আসিল। সুচরিতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"তোর কি হয়েচে বল্‌ত ?"

ললিতা তীব্র ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"কিছু না !"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ছিলি ?"

ললিতা কহিল—"বিনয় বাবু এসেচেন, তিনি বোধ হয় তোমার সঙ্গে গল্প করিতে চান।"

বিনয়বাবুর সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছে কি না, এ প্রশ্ন সুচরিতা আজ উচ্চারণ করিতেও পারিল না। যদি আর কেহ আসিত তবে নিশ্চয় ললিতা তাহার উল্লেখ করিত কিন্তু তবু মন নিঃসংশয় হইতে পারিল না। আর সে নিজেকে দমনের চেষ্টা না করিয়া গৃহাগত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্যের উপলক্ষ্যে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুই যাবি নে ?"

ললিতা একটু অধৈর্য্যের স্বরে কহিল—"তুমি যাও না—আমি পরে যাচ্চি।"

সুচরিতা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিনয় সতীশের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

সুচরিতা কহিল—"বাবা বেরিয়ে গেছেন, এখনি আস্‌বেন। মা আপনাদের সেই অভিনয়ের কবিতা মুখস্থ করার জন্যে লাবণ্য ও লীলাকে নিয়ে মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে গেছেন—ললিতা কোনো মতেই গেল না। তিনি বলে গেছেন, আপনি এলে আপনাকে বসিয়ে রাখ্‌তে—আপনার আজ পরীক্ষা হবে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এর মধ্যে নেই ?"

সুচরিতা কহিল—"সবাই অভিনেতা হলে জগতে দর্শক হবে কে ?"

বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে এ সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিতেন। তাই তাহার গুণপনা দেখাইবার জন্য এবারও ডাক পড়ে নাই।

অন্য দিন এই দুই ব্যক্তি একত্র হইলে কথার অভাব হইত না—আজ উভয় পক্ষেই এমন বিঘ্ন ঘটিয়াছে যে কোনো মতেই কথা জমিতে চাহিল না। সুচরিতা গোরার প্রসঙ্গ তুলিবে না পণ করিয়া আসিয়াছিল। বিনয়ও পূর্ব্বের মত সহজে গোরার কথা তুলিতে পারে না। তাহাকে ললিতা এবং হয়ত এ বাড়ির সকলেই গোরার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বলিয়া মনে করে ইহাই কল্পনা করিয়া গোরার কথা তুলিতে সে বাধা পায়।

অনেক দিন এমন হইয়াছে বিনয় আগে আসিয়াছে, গোরা তাহার পরে আসিয়াছে—আজও সেইরূপ ঘটিতে পারে ইহাই মনে করিয়া সুচরিতা যেন এক প্রকার সচকিত অবস্থায় রহিল। গোরা পাছে আসিয়া পড়ে এই তাহার একটা ভয় ছিল এবং পাছে না আসে এই আশঙ্কাও তাহাকে বেদনা দিতেছিল।

বিনয়ের সঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাবে দুই চারটে কথা হওয়ার পর সুচরিতা আর কোনো উপায় না দেখিয়া সতীশের ছবির খাতা খানা লইয়া সতীশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছবি সাজাইবার ত্রুটি ধরিয়া নিন্দা করিয়া সতীশকে রাগাইয়া তুলিল। সতীশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। আর বিনয় টেবিলের উপর তাহার প্রত্যাখ্যাত করবীগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমার এই ফুল কয়টা ললিতার লওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দে চমকিয়া সুচরিতা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল হারানবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। তাহার চমকটা অত্যন্ত সুগোচর হওয়াতে সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হারানবাবু একটা চৌকিতে বসিয়াই কহিলেন—"কই, আপনাদের গৌরবাবু আসেন নি ?"

বিনয় হারানবাবুর এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কহিল—"কেন, তাঁকে কোনো প্রয়োজন আছে ?"

হারানবাবু কহিলেন—"আপনি আছেন অথচ তিনি নেই এ ত প্রায় দেখা যায় না; তাই জিজ্ঞাসা করচি।"

বিনয়ের মনে বড় রাগ হইল—পাছে তাহা প্রকাশ পায় এই জন্য সংক্ষেপে কহিল "তিনি কলিকাতায় নেই।"

হারান। প্রচারে গেছেন বুঝি ?

বিনয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল, কোনো জবাব করিল না। সুচরিতাও কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

হারানবাবু দ্রুতপদে সুচরিতার অনুবর্তন করিলেন কিন্তু তাহাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। হারানবাবু দূর হইতে কহিলেন "সুচরিতা, একটা কথা আছে।"

সুচরিতা কহিল "আজ আমি ভাল নাই।" বলিতে বলিতেই তাহার শয়নগৃহে কপাট পড়িল।

এমন সময়ে বরদাসুন্দরী আসিয়া অভিনয়ের পালা দিবার জন্য যখন বিনয়কে আর একটা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন তাহার অনতিকাল পরেই অকস্মাৎ ফুলগুলিকে আর সেই টেবিলের উপরে দেখা যায় নাই—সে রাত্রে ললিতাও বরদাসুন্দরীর অভিনয়ের আখড়ায় দেখা দিল না—এবং সুচরিতা "খৃষ্টের অনুকরণ" বই খানি কোলের উপর মুড়িয়া ঘরের বাতিটাকে এক কোণে আড়াল করিয়া দিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত দ্বারের বহির্ব্বর্ত্তী অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে যেন একটা কোন্ অপরিচিত অপূর্ব্ব দেশ মরীচিকার মত দেখা দিয়াছিল; জীবনের এত-দিনকার সমস্ত জানাশুনার সঙ্গে সেই দেশের একটা কোথায় একান্ত বিচ্ছেদ আছে;—সেই জন্য সেখানকার বাতায়নে যে আলোগুলি জ্বলিতেছে তাহা তিমির নিশীথিনীর নক্ষত্র মালার মত একটা সুদূরতার রহস্যে মনকে ভীত করিতেছে; অথচ মনে হইতেছে, জীবন আমার তুচ্ছ, এতদিন যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ এবং প্রত্যহ যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা অর্থহীন—ঐখানেই হয়ত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে, কর্ম্ম মহৎ হইয়া উঠিবে এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। ঐ অপূর্ব্ব অপরিচিত ভয়ঙ্কর দেশের অজ্ঞাত সিংহদ্বারের সম্মুখে কে আমাকে দাঁড় করাইয়া দিল? কেন আমার হৃদয় এমন করিয়া কাঁপিতেছে—কেন আমার পা অগ্রসর হইতে গিয়া এমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে?

সমসাময়িক ভারত।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

গ্রাম্য ভারত।

২

আবু-পর্ব্বতের উপর আমি কতকগুলি দেবালয় দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। আমাদের ক্যাথিড্রাল-গির্জ্জার যে অংশ গায়কবৃন্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট—এই সকল দেবালয়ের মধ্যে সেই অংশটিরও সমাবেশ হয় না। দালান-গুলি ক্ষুদ্র ও নিম্ন, কিন্তু শিল্পী এই সকল গম্বুজের ভিতর-ছাদের গোলাপের নক্সায়, সরু সরু শুভ্র থামের লতাপাতার ভূষণে, এবং যে সকল পৌরাণিক দেবমূর্ত্তি থামকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই সকল দেবমূর্ত্তির রচনায় এমন একটা ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহার মধ্যে এমন একটা প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, এবং মর্ম্মর-প্রস্তরগুলি এরূপ অমল-ধবল, মন্দিরের কুলঙ্গির মধ্যে বসিয়া যে সকল ভক্ত সাধু ধ্যানে মগ্ন তাঁহাদের এরূপ প্রশান্তভাব যে, এই ক্ষুদ্রাদর্শের মন্দিরগুলি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া অনুভূত হয়... ইহাও কি তোমার মনে হয় না যে, এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নগর-গুলি—যাহার দিগন্ত এত ক্ষুদ্র, যাহার খিলানমণ্ডপগুলা এত নিম্ন—উহারা জীবন-সমস্যাটি কেমন সহজভাবে ও নিজের ধরণে সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছে? উহাদের অভাব খুবই কম, তাহাও তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইতেছে,—বিনা প্রযত্নে পূর্ণ হইতেছে। চমৎকার সামাজিক বন্ধন, চমৎকার পরস্পর-সাপেক্ষতা, চমৎকার সোপান-পরম্পরা! ইহার তুলনায়, আমাদের সমাজ অসম্বদ্ধ জনতা বলিলেও হয়—অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষে পূর্ণ। বরং এই সমাজ অতিমাত্র পূর্ণতা, অতিমাত্র সর্ব্বাঙ্গীনতা, অতিমাত্র সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে; যেন চরম বিকাশের জন্য তিলমাত্রও স্থান রাখে নাই।

এতক্ষণ আমরা এই ক্ষুদ্র নগরগুলির আর্থিক অবস্থাই আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উহাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সকল বন্ধন-সূত্র বিভিন্ন অঙ্গকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যে সকল মুখ্য শক্তি সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছে, সকলকে শাসন করিতেছে, সহজ পথ ধরিয়া সহজভাবে অবাধে চলিতেছে, এক্ষণে সেই সমস্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের শাসনভার কৃষকমণ্ডলীর হস্তে। তাহাতে ভৃত্যদের, কারিগরদের কোন হাত নাই। কখন, কৃষকসমাজ অব্যবহিতরূপে নিজেই গ্রাম শাসন করে এবং প্রধানবংশের কর্ত্তৃপক্ষেরা মিলিয়া একটা স্থায়ী 'মিউনিসিপালিটি' গঠন করে; কখনবা, কোন বংশানু-ক্রমিক প্রধানের হস্তে উহারা নিজ অধিকার ছাড়িয়া দেয়।

প্রথমোক্ত বর্গের গ্রামগুলিতে পার্লেমেন্ট-ধরণের এক প্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে। এন্‌ষ্টী (Anstey) বলেন,—"প্রাচ্য-মহাদেশই 'ম্যুনিসিপালিটি'র জনক।" সিদ্ধান্তবাগীশেরা অনুমান করেন, "কুলানুক্রমিক প্রধান," পরে প্রবর্ত্তিত হয়; আদিম আদর্শ অনুসারে, সকল গ্রামেরই শাসনকার্য্য ক্ষুদ্র পার্লেমেণ্টদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। ভারত যে স্বাধীন বিচারতর্কের অনুরাগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখাইব যে, এই স্বাধীন বিচারতর্ক সেই সকল বিষয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, যে সকল বিষয়ে আমরা এখনও নিরুপায়। যে পঞ্চায়ৎ, জা'ত-সংক্রান্ত ব্যাপারের নিয়ামক, উহা একটি অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যবস্থা। যাই হোক্ অনেকগুলি গ্রাম্য-সমাজই নিজের কাজ নিজে নির্ব্বাহ করে; পরিবারের কর্ত্তারা মিলিয়া একটা স্থায়ী পরিষৎ গঠন করে; ব্যবস্থা পরামর্শ ও শাসনকার্য্য উভয়ই তাহাদের কাজ; এই পরি-ষদের অন্তর্ভূত সকল ব্যক্তিরই সমান ক্ষমতা, এবং প্রত্যেকেই এই ক্ষমতা সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়োক্তবর্গের গ্রামগুলির শাসনকার্য্য-পরিচালক প্রধানেরা পূর্ব্বতন বনিয়াদি কুল-প্রধানদেরই বংশধর; তাহারাই গোড়ায় গ্রাম পত্তন করে কিংবা সেই গ্রামে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করে। এই কৌলিক প্রাধান্য বশতই এই সকল প্রধানেরা, সরকারি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে অগ্রাসন প্রাপ্ত হয়; এই জন্যই, ইহারা একটা সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রভুত্ব, এবং শাসন ও বিচারকার্য্যে উচ্চ পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের গৃহই ("ঘরি") গ্রামের 'পাথুরে কেল্লা'।

অধুনা, যিনি ভূস্বামী, পূর্ব্বপূর্ব্ব শতাব্দীতে তিনিই যুদ্ধের নেতা। সেই ব্যক্তিই সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে, কিংবা দস্যুদলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। অধুনা "ব্রিটানিকী শান্তি" তাহার কার্য্যক্ষেত্র কমাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার গৌরব-প্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস করে নাই; কেননা, সে এখনও নিজ পদেই প্রতিষ্ঠিত আছে; নিজ গ্রাম ও কেন্দ্রগত রাজশক্তি—এই উভয়ের মধ্যে সে মধ্যস্থরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ম্যুনিসিপ্যালিটি-সমন্বিত গ্রামগুলিতে, ইংরাজ-সরকার একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন; তাঁহার ক্ষমতা কতকটা "মেয়র ও জস্‌টিস্ অফ্ দি পীসের" ক্ষমতার মত,—তিনিই "লম্বরদার"।

বহু পূর্ব্ব হইতেই, গ্রামের মধ্যে একজন লিপিকারের প্রয়োজন হইয়াছিল; সেই লিপিকার গ্রামের হিসাবাদি লিখিত, তাহার নাম 'করণম'। লেখাপড়া না জানিয়াও গ্রামের মধ্যে কেহ-না-কেহ শীঘ্রই প্রধান হইয়া পড়ে। যেখানে ভূমি অসংখ্য অংশে বিভক্ত, যেখানকার স্বত্বাধিকার অত্যন্ত জটিল সেখানে একমাত্র 'করণম'ই এই সমস্ত জটিলতার নিরাকরণ করিতে পারে। করণমের উপরেই লম্বরদার। করণম ও লম্বরদার এই দুইজনে মিলিয়া স্বকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আশ্রিত গ্রামবাসীদিগের সর্ব্ব-নাশ করে। কোন ব্যক্তির পত্নী যদি সুন্দরী হয়, আর সে যদি চোখ্ বুজিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা বড়ই খারাপ। একজন আমাকে বলিল, করণম জাল হিসাব কিংবা জাল পত্র প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, এবং এইরূপ হিসাব প্রস্তুত করিয়া, সেই স্ত্রীলোকের নামে কিংবা ক্ষেতের নামে আদালতে (অনেক সময়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞাতে) নালীশ রুজু করিয়া দেয় এবং এইরূপে ডিক্রী করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে, তাহাকে বে-ইজ্জৎ করে… এইরূপ পিশাচবৃত্তি অসম্ভব হইত যদি ইংরাজ সরকার গ্রামের বিচার সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য হরণ না করিতেন। কোন য়ুরোপীয় রাজসরকারের এ বিষয়ে দক্ষতা আদৌ নাই। প্রাচ্যদেশের কোন ব্যবস্থাপ্রণালী যতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, তাহাতে স্বল্পমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও, তাহার পূর্ব্বে দীর্ঘ অনুশীলনের আবশ্যক।

ক্ষুদ্র আকারে পরিণত হিন্দুসমাজতন্ত্রই গ্রাম্যসমাজ। এই সহজ সংক্ষিপ্ত আকারেই বৃহৎ সমাজটি আমাদের নিকট ধরা দেয়। গ্রামের দিগন্তটি আমাদের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে তিনটি মূল শক্তি গ্রামের উপর কার্য্য করিতেছে তাহা সহজেই আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। সেই তিনটি শক্তি,—বর্ণভেদপ্রথা, বংশানুক্রমিকতা ও ধর্ম্ম।

সমাজ ও ধর্ম্ম এই উভয় লইয়াই ব্রাহ্মণ্য; এই ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রে সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পরের সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্ম্মটি অতি মুক্ত, অতি উদার;—কোন বিশ্বাসকেই, কোন

নীতিকেই উহা বহিষ্কৃত করে না, ক্ষুদ্র বৃহৎ যেরূপ দেবতাই হউক, যে পদবীর দেবতাই হউক, সকলকেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার মন্দিরে স্থান দিয়াছে। একই মন্দিরের মধ্যে, এমন কি, একই বেদীর উপর, পাশাপাশি বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি স্থাপিত অথচ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা নাই। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? তাই আমি বলি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এমন একটি ধর্ম্ম, যাহার বিশেষত্ব ধর্ম্মবিশ্বাস নহে, পরমার্থবিদ্যা নহে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ নহে—তাহার বিশেষত্ব ব্রাহ্মণের প্রাধান্য; ব্রাহ্মণই পুরোহিত, ব্রাহ্মণই প্রভু। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যেমন একদিকে অবারিতদ্বার, আতিথেয়, সর্ব্বগ্রহণশীল, ব্রাহ্মণ্যের অন্তর্গত সমাজটি আবার তেমনি রুদ্ধ; ইহা বর্ণভেদ ও কৌলিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামকে বুঝিবার পক্ষে বর্ণভেদপ্রথা যেরূপ আমাদিগকে সাহায্য করে, বর্ণভেদপ্রথা বুঝিবার পক্ষে গ্রামও সেইরূপ সাহায্য করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক দলের পর আর এক দল ক্রমান্বয়ে আসিয়া একই ভূমিখণ্ডের উপর গোড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে; এবং প্রত্যেক দল নিজ নিজ স্বত্বাধিকার ও স্বতন্ত্রতা প্রাণপণে রক্ষা করে। এই আগন্তুক দলগুলিই বিভিন্ন বর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দল ও বর্ণের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। এখন যাহা বর্ণ, গোড়ায় অনেক সময়ে তাহাই একটা উপনিবেশিকের দল ছিল। ভূস্বামী, কুম্ভকার, নাপিত—ইহারা প্রত্যেকেই এখন একএকটা বর্ণভুক্ত; তাহারই অনুরূপ গোড়ায় গায়ের রং ও বংশ অনুসারে পার্থক্য সংঘটিত হয়। উভয়ের মধ্যে এইরূপ একটা সাদৃশ্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কোন ব্যক্তি জন্মাধিকারসূত্রেই কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; তাহাকে জাতিচ্যুত না করিলে সে তাহা হইতে কখনই বাহির হইতে পারে না। জাতিচ্যুত হইলেই সে চণ্ডাল কিংবা পারিয়া হইয়া যায়। যে বর্ণের যে লোক, সে সেই বর্ণের মধ্যেই বিবাহ করে, সেই বর্ণের লোকদিগেরই সহিত এক সঙ্গে আহারাদি করে। বিবাহ ও ভোজন এই দুইটিই বর্ণভেদপ্রথার মুখ্য জিনিস। এই বর্ণভেদ, বাহ্যচিহ্নের দ্বারাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত, মুণ্ডিত মস্তকের চূড়াদেশে কেশগুচ্ছ ধারণ……ইহার দ্বারা সূচিত হয়, কোন এক ব্যক্তি পুরাতন আর্য্য-শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তা ছাড়া আরও দেখা যায়, এই বর্ণভেদপ্রথা প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মের উপর একটা যেন বিশেষ ধরণের ছাপ্ বসাইয়া দিয়াছে; জন্ম বিবাহ ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই একটু নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের নীতিতন্ত্র স্বতন্ত্র, অন্য বর্ণের নীতির সহিত তাহার মিল নাই। চোর ডাকাতদিগেরও একটা বিশেষ বর্ণ আছে,—যেমন "ঠগ"। একজন মুচিও আপনার দলের মধ্যে "হাম্-বড়া।" "স্ববর্ণের ভিতরে সবই ভাল, স্ববর্ণের বাহিরে সবই মন্দ"।

সমাজের এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে, মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করা একটু কঠিন। এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসার পক্ষে হিন্দুর ধৈর্য্যও যথেষ্ট নহে। এই জন্যই প্রত্যেক গ্রামে, পুরাতন কুলপতি-শাসনতন্ত্রের ধরণে (Patriarchal) একএকটি ক্ষুদ্র পার্লেমেণ্ট অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ম্যুনিসিপ্যালিটির সহিত পঞ্চায়েতের একটু প্রভেদ আছে। প্রচলিত প্রথা, সামাজিক আচার ব্যবহার, নীতি-রক্ষা, সাহায্যদান—পঞ্চায়েতের উপর এই সমস্ত বিষয়সম্বন্ধে মীমাংসার ভার। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধেরা গ্রামের গাছতলায় আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা পদমর্য্যাদার নিয়ম নির্দ্ধারণ করে—(এইরূপ সমাজে ইহা একটা গুরুতর কাজ)—জাতি-চ্যুতির দণ্ডবিধান করে, ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয়, স্বামী স্ত্রীকে পৃথক্ করিয়া রাখে, কিংবা তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দেয়, অশক্ত অক্ষম লোকদিগের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে। সুজন্মার বৎসরে গ্রামের মধ্যে একটিও দরিদ্র, একটিও পরিত্যক্ত লোক দেখা যায় না। দরিদ্রদের সাহায্যার্থে পঞ্চায়ৎ, গ্রাম হইতে চাঁদা উঠায়। গ্রামের নীতি-রক্ষা করা যেমন প্রয়োজনীয়, গ্রামের দারিদ্র্য মোচন করাও তেমনি প্রয়োজনীয়। গ্রামের জমি বণ্টন করা, হিসাব ঠিক্ করা, জমি ও ভিটার সীমানা নির্দ্ধারণ করা—এই সমস্তই পঞ্চায়তের অধিকারায়ত্ত কাজ, কিংবা একসময়ে অধিকারায়ত্ত কাজ ছিল। কিন্তু এখন এই ক্ষুদ্র পার্লেমেণ্টের অধিকার অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ইংরাজ-স্থাপিত জেলা আদালতে, মোকদ্দমা-মাম্‌লাই প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে; এই আদালতের রঙ্গভূমিতে চাঁষা অপেক্ষা 'কর্ণম্' কিংবা

চেটিই প্রধান অভিনেতা। এমন যে চমৎকার ব্যবস্থাপ্রণালী যাহা গ্রাম্য সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহপক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়— দুঃখের বিষয় ইহা ক্রমশই লোপ পাইতেছে; তা ছাড়া একথাও বলা আবশ্যক, য়ুরোপীয় শাসনাধীনে দেশের যত কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাও একটি। বর্ণ-বংশানুক্রমিকতা। কোন এক বিশেষ বর্ণের লোক, যাহারা বিবাহ, আহার ক্রিয়াকর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের ভিন্নতা প্রযুক্ত অন্য বর্ণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, তাহারা আপনার গণ্ডির মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করিতেছে। সেই গণ্ডির মধ্যে আর কেহই প্রবেশ করিতে পারে না। বংশানুক্রমিকতাই যেন প্রথার জীবন্ত মূর্ত্তি। এই রক্ষণশীল সমাজে প্রত্যেক কার্য্যই যেন একটা নজীর। গ্রামবাসীদের সকল কাজই নজীরের উপর, চির-অভ্যাসের উপর, চিরপ্রথার উপর স্থাপিত। নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করাই পাষণ্ডতা— নাস্তিকতা। বর্ণের ন্যায় কর্ম্মও বংশানুক্রমিক। আমাদের এই কুম্ভকারের পিতাও কুম্ভকার। নটীর মেয়ে নটী, বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা; এবং তাহারাও অন্যের ন্যায় স্বকীয় গোষ্ঠী ও কুলের জন্য গর্ব্বিতা। এ দেশে এমন কি আছে যাহা বংশানুক্রমিক নহে? এখানকার লোকেরা সভ্যতা-সূর্য্যের গতিরোধ করিয়াছে; সচল জগতের মধ্যে থাকিয়া অচল-ভাবে জীবন যাপন করা—ইহাই উহাদের চরম আদর্শ।

এই মাত্র আমি সামাজিক নাস্তিকতার উল্লেখ করিয়াছি। এ দেশে কোন প্রকার ধর্ম্মমতে নাস্তিকতা হয় না। যেমন একদিকে মনোরাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তেমনি আবার সমাজের মধ্যে ভীষণ দাসত্ব। এখানে ধর্ম্ম একটিমাত্র নহে; সমাজের ন্যায় ধর্ম্মও ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। ধর্ম্ম সকলের জন্য, ধর্ম্ম প্রত্যেকের জন্য। বড় বড় দেবতা বাদে প্রত্যেক বর্ণেরই পৃথক পৃথক নিজস্ব দেবতা আছে, পৃথক ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, পৃথক পূজাপদ্ধতি আছে। কাহারও দেবতা হনুমান, কাহারও কৃষ্ণ, কাহারও গণেশ। ভারতে যে সকল আদিম নিবাসী লোককে হিন্দুধর্ম্ম আপনার ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিল, বর্ণভুক্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই নিজের দেবতাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম সেই দেবতাদিগকে শীঘ্রই আপনার করিয়া লইল, বৈধ করিয়া লইল, মন্ত্রপূত ও বিশোধিত করিয়া লইল। যে সকল নীচবর্ণের লোক গ্রামের উপকণ্ঠে বাস করে,—তাহারাই ভীষণ শীতলা দেবীকে, ওলা-দেবীকে নৈবেদ্যের দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা প্রশমিত করিতে পারে। ঐ সব মন্ত্র তাহাদেরই একচেটিয়া। ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে যত প্রকার বর্ণ ও জাতি আছে, তত্তপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মমতও তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাই, প্রকৃত ধর্ম্ম যে কি, মনের কোন্ অবস্থাকে গোঁড়ামী বলা যায়—হিন্দুর নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য। উচ্চতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কতকগুলি বাছা-বাছা দীক্ষিত লোকদিগের মধ্যেই বদ্ধ। তাহারা Fontenelleএর এই কথাটি বোধ হয় সন্তোষের সহিত আবৃত্তি করিতে পারে:—"আমি যদি মুঠা-ভরা সত্য পাই, আমি কখনই আমার মুঠা খুলি না।" তবে এই ধর্ম্মটি কি?—সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। ভারত, পুরোহিত-তন্ত্রের দ্বারা একেবারে অনুবিদ্ধ। এই ধর্ম্ম কিংবা বাহ্যানুষ্ঠান (যাহা এ স্থলে একই কথা) প্রত্যেক ব্যক্তির—প্রত্যেক বর্ণের ক্ষুদ্রতম কার্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান,—গ্রামের সমস্ত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে, গ্রাম্যজীবনের সমস্ত বিকাশের মধ্যে বর্ত্তমান। ধর্ম্মোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থযাত্রা—ইহারই সমষ্টি হিন্দুধর্ম্ম।

কি ব্যক্তিগত কার্য্য, কি পারিবারিক কার্য্য, কি সামাজিক কার্য্য, কোন কার্য্যই দেবতাদের আয়ত্তের বাহিরে নহে। ঔষধের একটি বড়ি খাইতে চাও, বিদেশে যাত্রা করিতে চাও, একটা ভারী জিনিস যন্ত্রের দ্বারা উঠাইতে চাও, ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে চাও,—যে কোন কাজই কর, তাহার পূর্ব্বে দেবতার সম্মতি চাই;—ব্রাহ্মণকে মধ্যস্থ করিয়া দেবতারা আপনার বৃত্তি এই প্রকারে নিয়মিতরূপে আদায় করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ! এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এখনও আমি কিছু বলি নাই। ব্রাহ্মণই এই সমাজ-গৃহের কুঞ্চিকা; তাঁহাতেই এই তিনটি মুখ্য শক্তি মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে:—বর্ণভেদ কৌলিকতা, ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ হওয়া মহা অহংকারের বিষয়, উহা ভারতীয় আভিজাত্যের মুখ্য পদবী; বহু জন্মের তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করা—ইহাই ভক্ত হিন্দুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

ব্রাহ্মণের বর্ণ বলিতে পুরোহিতের বর্ণ ততটা বুঝায় না যতটা আভিজাত্যের বর্ণ বুঝায়; অথবা আরও যথাযথরূপে বলিতে

হইলে, (কেন না, উহার অনুরূপ আমাদের মধ্যে কিছুই নাই) উহারা কতকগুলি বাছা-বাছা বিশিষ্ট লোকের সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিয়া থাকে এবং কথাটাও সত্য যে, প্রায় অধিকাংশস্থলেই, বংশের বিশুদ্ধতা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উহাদের মধ্যেই সংরক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যে-কোন কাজে নিযুক্ত হইতে পারে,—ব্রাহ্মণ, মুটিয়ার কাজ করিতে পারে, বেণিয়ার পাচক হইতে পারে, কিংবা "পানি! পানি!" চীৎকার করিয়া, রেলওয়ে ষ্টেশানে রেল-যাত্রীদিগকে পানীয় জল যোগাইতে পারে—সবই করিতে পারে, কিন্তু তবু তাহার প্রভু সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিংবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতত্ত্বের কথাও ভাবে না, নীতির কথাও ভাবে না, যজ্ঞানুষ্ঠানের কথাও ভাবে না। তাহার যে কাজ তাহা নিয়ে বলিতেছি।

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ লোক-গুরু; তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা যেন গুরুর আসন হইতেই বলেন; তাঁহার প্রভাব নিগূঢ় রহস্যময়, তাঁহার বাক্যই চরম প্রমাণ; তিনিই বিধান দেন, সম্মতি দেন, মন্ত্রের দ্বারা সমস্তই শোধন করিয়া লন। ব্রাহ্মণের অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজ হইতে পারে না। পারিবারিক উৎসবাদিতে, জন্মে, বিবাহে, বালিকার যৌবন প্রাপ্তিতে, রোগে শোকে; ব্রাহ্মণের উপস্থিতি, ব্রাহ্মণের উপদেশ, ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ অপরিহার্য্য; কৃষিকর্ম্মের, বীজ বপনের, শস্য কর্ত্তনের শুভদিনক্ষণ তিনিই নির্দ্ধারণ করেন। বিভিন্ন ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, তিনিই বেদমন্ত্র পাঠ করেন; কেন না বেদমন্ত্র একমাত্র তাঁহারই জানিবার কথা; কিন্তু কেহই তাহা বুঝে না, তিনি নিজেও বুঝেন না; অথচ এই বেদমন্ত্র পাঠের অধিকারই তাঁহার প্রতিপত্তি—তাঁহার শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিয়াছে।

পরিবারের মধ্যেও তাঁহার অসীম প্রভাব। একজন হিন্দু আমাকে বলিয়াছিলেন :—

"অধ্যয়নের জন্য আমার পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু বিলাত যাইতে হইলে "কালা-পানি" পার হইতে হয়; আর "কালাপানি" পার হওয়া একটা মহাপাপ। আমার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া পুরোহিতেরা আমার মায়ের নিকট আসিয়া আপত্তি জানাইল। আমার এখানে তিনজন ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকে; একজন আমার স্ত্রীর জন্য, একজন আমার মেয়ের জন্য, এবং আর একজন আমার নিজের জন্য। বলিতে গেলে, উহারাই এখানকার প্রভু; উহাদের প্রত্যেককে, মাসিক ৬ টাকা করিয়া আমার দিতে হয়।"

ছয় টাকা মাত্র! যখন ভাবি, এই মহাপুরুষেরা সুপোচিত বদান্যতার পাত্র, তখন ইহা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ, পুরোহিতের স্বর্গ বলিলেই হয়। ধর্ম্মঘটিত পরান্নজীবিতা এখানে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিরাজ করিতেছে। পবিত্র পায়রাগুলার ন্যায় ব্রাহ্মণও সাধারণের ব্যয়ে প্রতি-পালিত এবং একইরূপ সম্মানের অংশভাগী। ত্রিবাঙ্কুরে খুব জাঁকালো জাঁকালো সুসজ্জিত পান্থশালা আছে, সেখানে শত শত ব্রাহ্মণ রাজার ব্যয়ে আতিথ্যসৎকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল অতিথিশালায় উহারা দিব্য আরামে দিনপাত করে; একটা অতিথিশালায় থাকিয়া যখন ক্লান্তি জন্মে কিংবা সেখানকার একঘেয়ে ভোজন অরুচিকর হইয়া উঠে, তখন উহারা আর একটা অতিথিশালায় চলিয়া যায়। দরিদ্র গ্রাম্য লোকেরাও রাজার ধরণ-ধারণ অনুকরণ করে। ব্রাহ্মণ-ভোজন একটা মহা পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু হায়, ইহাতেই লোকের সর্ব্বনাশ! এই ফলারে বামুনগুলা নিজ ক্ষুধার পরিমাণ বুঝিতে পারে না, উহাদের উদরে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, দড়িটা ছিঁড়িয়া গেলেই উহারা ভোজনে বিরত হইয়া উঠিয়া পড়ে। অথবা ভৃত্যেরা, এক একটা কলাপাতার উপর খানিকটা চাউল, স্তূপাকার ফল ও মিষ্টান্ন রাখিয়া তাহা প্রত্যেক অতিথির হস্তে অর্পণ করে—অতিথিরা উহা লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে চলিয়া যায়।

আমি কোন জাপানী গৃহস্থের বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানেও এই প্রথা প্রচলিত দেখিলাম। এই স্মৃতি-বাসরে, কুলজির পর্দা খোলা হইল, এবং অভিনব রেশমি বস্ত্রে বিভূষিত শুভঙ্কর দেবতাদের সম্মুখে লাল রঙের সমস্ত মোম্-বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। ত্রিশজন স্ত্রী-পুরোহিত চারিদিকে ঘিরিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে; তাহাদের সম্মুখে এক একটি ক্ষুদ্র চায়ের পেয়ালা,—হাতে এক একটি ক্ষুদ্র 'পাইপ'। উহারা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ জপমালা টিপিয়া টিপিয়া ঘুরাইতেছে—জপমালার বীচিগুলা বাদামের

মত বড়, জপমালাটা এত দীর্ঘ যে সমস্ত ঘরটি ঘুরিয়া আসিতেছে। উহারা আনন্দ! আনন্দ! বলিয়া গান করিতে লাগিল; তাহার পর, একটু বিরাম;—এই সময়ে সমস্ত পাইপ্-চুরোট্ হইতে সবেগে ধূম উদ্গারিত হইতে লাগিল। তাহার পর, সেই প্রকাণ্ড জপমালা অন্তর্হিত হইল। এই সময়ে প্রত্যেক পুরুত্‌নীর নিকট এক একটা ক্ষুদ্র ধাতব খঞ্জনী ও এক একটা হাতুড়ী আনা হইল; সমস্ত খঞ্জনী এইবার তালে তালে বাজিতে লাগিল—সেই সঙ্গে,—"আনন্দ! আনন্দ! বুৎসু!"—এই গান চলিতে লাগিল, এবং পাইপের আগুনও নিয়মিতরূপে জ্বলিতে লাগিল।

ইহা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র! এই সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিল। তাহারা 'সাকে'-মদিরার বোতল, চায়ের জল-ভরা চা-দানী, লাল গালার কতকগুলা গুলি, কতকটা সূপ—তাহাতে চিংড়ী ভাসিতেছে,—কতকগুলা শামুক, কাঁচা লাল মাছের কতকগুলা টুক্‌রা, কতকগুলা সামুদ্রিক তৃণ, কতকগুলা পিষ্টক ও সুগন্ধী মিষ্টান্ন আনিল...প্রত্যেক পুরুত্‌নীর সম্মুখে এইগুলি রাশীকৃত হইল। এইবার পাইপ্‌টানা বন্ধ হইল। পুরুত্‌নীরা স্বকীয় মণ্ডিত মস্তক নত করিয়া, শিষ্টতার বিবিধ মুখভঙ্গী সহকারে, 'ওক্' ফলের পেয়ালার প্রমাণ পেয়ালায় ভরা, ধূমায়মান গরম সাকে-মদিরা পরস্পরকে দিতে লাগিল।

ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধাদের নির্ব্বাপিত চোখ্‌গুলা জ্বলিয়া উঠিল, সব মাথাগুলা মর্কটের মাথার মত নড়িতে লাগিল, আড়-চোখে আমাকে দেখিতে লাগিল, কখনও বা ভুলক্রমে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর একটা হাসির গর্‌রা উঠিল—এবং বন্দুকের দেওড়ের মত উহা ক্রমেই প্রসারিত হইল। এই সময়ে পরিচারিকারা আবার আসিল এবং হাতের এক সাপটে সেই লাল গালা, ফল, পিষ্টক, সূপ সমস্ত একস্থানে রাশীকৃত করিল, তাহার পর ঐ সমস্ত সযত্নে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া গেল। এই গায়িকাবৃন্দ আবার গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া খাদ্যের পুঁটুলিটি বগলে করিয়া সংযতভাবে প্রস্থান করিল—বোধ হয় ঐ খাদ্য তাহাদের সপ্তাহকাল চলিবে।

আর কিছু না হউক, এই হিন্দু গ্রাম্যতন্ত্র, একটা নূতন মতবাদ খাড়া করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়া গৌরবের ভাগী হইয়াছে। আবার ইহার বিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে; কেহ কেহ, এইভাবে ইহার আলোচনা করে, যেন ইহা শুধু একটা সামান্য তর্কের বিষয় মাত্র, তাহার অধিক কিছুই নহে। এই কৃষি-মধুচক্রের জীবন-প্রণালী, ইহার নিঃসঙ্গ শাসন-স্বাতন্ত্র্য, ইহার অন্তর্বর্ত্তী লোকদিগের ঘনিষ্ঠ দলবন্ধন ও ঘনসংহতি, যাহার বিষয় আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং ভূসম্পত্তির প্রকৃতি—এই সমস্ত আলোচনা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তবাগীশ, কলম্বসের ন্যায় "পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া উঠিলেন; কালগণনায়, সমবেত ভূসম্পত্তি—ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন... আর্য্যাণদিগের পুরাতন "সামরিক যাত্রা-প্রণালী" এখন মৃত! কিন্তু এই দেখ, এইখানে আমাদের চক্ষের সমক্ষে—গ্রাম-সমবায়ের একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি! এই সিদ্ধান্তটি চিরকালের মত সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত যতই প্রামাণিক হয় দুর্ভাগ্যক্রমে ততই যেন বহুল আক্রমণের বিষয় হইয়া পড়ে। এই সকল জমকালো "তুষার-রাণী" নির্ম্মিত না হইতে হইতেই উহাদিগকে আবার কন্দুকের আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। লোকে আরও কাছে আসিয়া যখন দেখে, তখন মনে হয় উহা নেত্র-বিভ্রম বই আর কিছুই নহে। ধ্বংসকর্ত্তা করিলেন কি?—না, তিনি সেই একই উপাদান লইয়া আর একটা সিদ্ধান্ত গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কালের অগ্রপশ্চাৎ লইয়াই ইহার যা কিছু নূতনত্ব, তা ছাড়া আর কোন নূতনত্ব নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, কালের হিসাবে, সমবেত ভূসম্পত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী না হইয়া, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিই পূর্ব্ববর্ত্তী হইল।

গ্রামে ভূসম্পত্তির যৌথ-বন্দোবস্ত ছিল,—এই চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্তটি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আদিম ব্যবস্থাদির ইতিহাস লেখক Sumner Maine প্রচলিত করেন। তিনি বলেন, গোড়ায় একটা মূল-আদর্শ বিদ্যমান ছিল; স্থান বিশেষে এক্ষণে যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তৎসমস্তই সেই মূল-আদর্শের উপর স্থাপিত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভূসম্পত্তির উপর কোন গ্রাম অধিষ্ঠিত, সেই গ্রামই সেই ভূসম্পত্তির অধিকারী কিংবা সেই ভূসম্পত্তির ফলভোগী। অবশ্য এই সামবায়িক বন্দোবস্তটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে।

কেন নহে? যে হেতু, এই ভাবটি বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। স্থানে স্থানে দেখা যায়, এই আদিম আদর্শটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিংবা রূপান্তরিত হইয়া উহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ক্রমশ প্রবেশ করিয়াছে। এমন গ্রামও আছে যেখানে ভূমি অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া আবার ব্যক্তিগত স্বত্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও, এই আংশিক বিলোপ সত্ত্বেও,—অন্য স্বত্বাধিকার আসিয়া প্রথম স্বত্বাধিকারের উপর চাপিয়া বসিলেও—মূল আদর্শের স্থূল রেখাগুলি এখনও ধরিতে পারা যায়। এমন কি, যেখানে পৃথক্ স্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে, সেখানেও তাহার ফলভোগসম্বন্ধে এত অসংখ্য খুঁটিনাটি নিয়ম আছে, যে কার্য্যতঃ উহা অবিভক্ত স্বত্বেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের শাসনকার্য্য যাহার হস্তে সেই পঞ্চায়ৎই, মৌসমের শেষে হিসাব নিষ্পত্তি করে, ফসল ভাগ করে। অনেক গ্রামই সমবেতভাবে খাজনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থূল কথা, ব্যক্তিগত পৃথক স্বত্ব উত্তর কালে সৃষ্ট হইয়াছে—এই পরিবর্ত্তনটি হালের। প্রাচীন আদর্শের অবনতি হইয়াই এই ব্যক্তিগত স্বত্বের সৃষ্টি। আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত আদিম গ্রামে, সমস্ত সমাজ সমবেতভাবেই অবিভক্ত ভূমির অধিকারী ছিল। মেন্-সাহেব আরও এই কথা বলেন;—ইহা ত জানা কথা যে, আর্য্যজাতিগণ সমবেতভাবে একই ভূমি অধিকার করিত; তার সাক্ষী—পুরাতন জার্ম্মণজাতির "সাময়িক যাত্রা"। ইহাও একটা নূতন প্রমাণ—জলন্ত প্রমাণ।

একটা ইংরাজি কথা আছে—"লাফ্ দিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া"—এস্থলে তাহাই হইয়াছে। মেন-সাহেব যখন ১৮৭০ অব্দে, এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তটি জনসমাজে প্রচার করেন, তখন বাস্তবিক তিনি এই বিষয়ের কি জানিতেন? উত্তর প্রদেশের গ্রামসম্বন্ধেই তাঁহার জানাশুনা ছিল। রাজস্বের মোট সংস্থান ও তাহার পুনর্ব্বণ্টন—এই উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ কিরূপ—ইহার উপরেই সমস্ত অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য প্রদেশের গ্রামগুলি সম্বন্ধে এ বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টপরিমাণে ছিল না; শিক্ষকের সুবিধার জন্য ও ব্যবহারের জন্য, যে সকল সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই তিনি যাহা-কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এখন ইংরাজদিগের এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তাহাদের রিপোর্টগুলি, নানাবিধ তথ্যে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। যাঁহার উপর শাসনভার সেই কালেক্টার এখন সেই আদিম বংশদিগের সমাজগঠনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা আমাদের গোচরে আসিয়াছে, কিন্তু এই গুলি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখে এরূপ সূক্ষ্ম সমালোচক অধুনা কেহ নাই। আর কিছু না হউক, যদি কেহ এই রত্নখনিটি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন, তা হইলে হয় ত দেখিতে দেখিতে হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িবে—কোন স্থানে একটা স্তর-শিরা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে! মেনের সিদ্ধান্ত প্রাচীন কালের সমাজগঠনসম্বন্ধে, কিন্তু ইংরাজসরকারের কর্ম্মচারী Baden Powell ইঙ্গ-ভারতের প্রচলিত রাজস্ব প্রণালীটি ভাল করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলনের ফল, ১৮৯২ অব্দে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নাম "ইঙ্গভারতে জমির বন্দোবস্ত প্রণালী,"—৩খণ্ডে সমাপ্ত। যে সকল বহু-বিস্তৃত রিপোর্টের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই উপলক্ষে, সেই সব রিপোর্ট তাঁহাকে অনেক ঘাঁটিয়া দেখিতে হইয়াছিল। পৌএল সাহেব তাহার মধ্য হইতে কোন মতবাদ কিংবা সিদ্ধান্ত বাহির করেন নাই, কিন্তু এমন কতকগুলি সুনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা হইতে জানা যায় যে খুব আধুনিক কালেও সমবেত সাধারণ গ্রাম্য সমাজের অস্তিত্ব ছিল।

১৮৭০ অব্দে মেন্-সাহেব এইমাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন যে গ্রাম্যসমাজ গোড়ায় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কতকটা এই বিশ্বাসের উপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে,—ভারতীয় জাতিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হওয়ায়, সে সম্বন্ধে আমাদের মতের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকল বিজ্ঞানের মধ্যে জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্তনির্ণয়ে বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা আবশ্যক হইলেও, এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে ভারতীয় জাতিদিগের দেহে আর্য্যরক্ত অতীব লঘুপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছিল। তাছাড়া যে সব জাতি আসিয়া দক্ষিণভারত ও মধ্যভারতে বসতি স্থাপন করে—নর্ম্মদা হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত তাহারা সমস্তই দ্রাবিড়ীয়। আর্য্য-

গণের ধারাবাহিক প্রবাহ বিন্ধ্যাচলে আসিয়া আটকাইয়া পড়িয়াছিল, কেবল কতকগুলি দুঃসাহসিক লোক ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপ্রচারক এই বাধা লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে। তাছাড়া আর্য্যজাতির আর একটি দল, সিন্ধুনদ বাহিয়া পশ্চিম প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সেখান হইতে ক্রমশ অবতরণ করিয়া বোম্বায়ের দিক দিয়া উচ্চ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানেই, অর্থাৎ পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই আর্য্যনরপতিগণের ও ব্রাহ্মণিক সভ্যতার পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কথা যেন মনে থাকে, আর্য্যগণ জেতৃ-জাতি—শ্রেষ্ঠ জাতি হইলেও, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাহারা কৃষি-প্রণালী উদ্ভাবন করে নাই, তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি প্রচলিত ছিল। শুধু তাহা নহে, এই শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতির প্রধানেরা কৃষিকার্য্যকে অবজ্ঞা করিত, কেবল দেশের সাধারণ লোক বৈশ্যেরাই কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহার পর একটা সুদীর্ঘ অন্ধকারের যুগ। এই সময়ে আর্য্যনৃপতিগণ প্রায় সকলেই অন্তর্হিত। আর্য্যবংশের যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারাও দেশ হইতে দূরীকৃত হইল। আবার কতকগুলি নূতন দল আসিয়া হিন্দুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল; নিঃশেষিতপ্রায় আর্য্যদের সহিত যাহারা কুটুম্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল সেই রাজপুতের দল—এবং অন্যান্য দল,—যেমন হিন্দ-শিথীয় বংশের 'জাট্' ও 'গুজার', দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি, বৈশ্যজাতির কতকগুলি ভগ্নাবশিষ্ট লোক, রাজপুত, উত্তর প্রদেশের জাট্ ও গুজার,—এখনকার গ্রাম্যসমাজের ইহারাই মুখ্য উপাদান। ইহা যদি সত্য হয়, তবে কি এ কথা বলা যাইতে পারে কিংবা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, আর্য্যভিত্তির উপরেই এই সকল গ্রাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত? তাহার বিপরীতে বাডেন-পোঐল বরং এই কথা বলেন, আর্য্যবংশীয়েরা কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, তাহাদের পূর্ব্বে গ্রামের যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল উহারা তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন করে নাই। কথাটা একটু বেশী মাত্রায় বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে, এবিষয়ে আর্য্য-প্রভাব কিছু-মাত্র প্রকটিত হয় নাই। আর্য্যেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে, তাহা সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল।' ইহা কি সম্ভব, এই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্মব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার যেটি মুখ্য বিষয়—সেই গ্রামের আর্থিক বন্দোবস্ত, তাহাকে এই সভ্যতা একেবারেই স্পর্শ করিল না! আর্য্য-গণকর্ত্তৃক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই কথাটা হাল্কাভাবে বলা হইয়াছে। গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অথচ যদি আমরা বলি—দলিল আদি প্রমাণের অভাবেই যদি আমরা বলি যে—আর্য্যেরা এবিষয়ে কোন প্রভাব প্রকটিত করে নাই—তবে ইহা কি একটা পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া দাঁড়ায় না? কৃষকদিগের মধ্যে আর্য্যের ভাগ কি পরিমাণ ছিল তাহা জানা নাই। তাহাদের কার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ—কতটা প্রভাব তাহারা প্রকটিত করিয়াছিল—এ বিষয়ে দলিলাদি একেবারেই মূক। আরও সঠিক তথ্যাদি যতদিন না হস্তগত হয় ততদিন সকলেই যে পথে চলিতেছে আমা-দেরও সেই পথ কাজেই অনুসরণ করিতে হইবে।

উৎপত্তির কথাটা এখন থাক্ কেননা, আর যাই হউক, ইহা যে একটা সংশয়-সঙ্কুল বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রাম্য স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য? যে সকল তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে সাধারণ ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব কি সপ্রমাণ হয়? বি-পৌএল, তাঁহার হিসাবের মধ্যে সরকারী জরিপ-কাগজের শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি গ্রামগুলিকে দুই বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন; যেখানে ভূস্বামীরা ব্যক্তিগত হিসাবে কর দেয় সেই দক্ষিণ ও মধ্য প্রদেশের গ্রাম এবং যাহারা সমবেতভাবে খাজনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই অল্পসংখ্যক উত্তর প্রদেশের গ্রামসমূহ। এই প্রথম বর্গের গ্রামগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানা ছিল না; ১৮৭০ অব্দের কাছা-কাছি কোন সময় হইতে উহাদের সম্বন্ধে রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়। ইহা সত্ত্বেও উহাদের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা হইয়াছিল। আসল কথা, এই সকল গ্রামের কর্ষণীয় ভূমিখণ্ড গুলি পৃথক ছিল এবং উহাদের কৃষিকার্য্যও পৃথক ভাবেই নির্ব্বাহিত হইত। দলিলাদির অবিদ্যমানে ইহা বিশ্বাস করিবার সম্পূর্ণ হেতু আছে যে, ঐ সকল গ্রামের বন্দোবস্ত বরাবর এই রূপই ছিল। উত্তর প্রদেশের মত, কতকগুলি জাতি আসিয়া ঐ গ্রামগুলি পত্তন করে। কিন্তু ক্রমে উহাদের "জাতীয়" বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল জাতি দ্রাবিড়বংশোদ্ভব। দ্রাবিড়ীয়

গ্রামগুলি, আমাদের মতে, শুধু দাক্ষিণাত্যের আদিম আদর্শ নহে, পরন্তু সম্ভবতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের আদিম আদর্শ। এই প্রথম আদর্শ-গ্রাম আর্য্যদের পূর্ব্বে গঠিত হয়, আর্য্যেরা আসিয়া তাহার কোন পরিবর্ত্তন করে নাই। অতএব, দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে সাধারণ স্বত্বাধিকার অথবা অবিভক্ত স্বত্বাধিকারের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। তবে দেখ, যে বর্গটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা গণনার বাহিরে—প্রচলিত সিদ্ধান্তের বাহিরে পড়িয়া যাইতেছে। অবশ্য মেন্ ইহার প্রতিবাদে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে আদিম আদর্শের গঠনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন সে গ্রামগুলি নাই, না থাকিলেও এককালে সেই গ্রামগুলির যৌথ স্বত্বাধিকার ছিল।

ভূমির যে বিভাগপ্রণালী লইয়া তুমি প্রতিবাদ করিতেছ সে সময়ে উহা তর্কস্থলেই আসে নাই। এই বিভাগ প্রণালীর বাস্তবিকতা বহুকাল অস্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রণালীর নিদর্শন এখনও দেখা যায়; তার সাক্ষী এই দেখ না একটা প্রথা আছে—যে প্রথা-অনুসারে জমির বিনিময়ের জন্য কিংবা পুনর্বণ্টনের জন্য,—যে সব ভূমি পূর্ব্বে বিলি হইয়া গিয়াছে তাহা সাধারণ ভূমির মধ্যে আবার ভুক্ত করা হয়; ইহা সাধারণ স্বত্বাধিকারের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে। এই তথ্যটি সম্বন্ধে পৌএল্ কোন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, ইহাতে একটা সাম্য-স্পৃহা প্রকাশ পায় মাত্র। সেই সব জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিবেশীর সমান পরিমাণ ভূমি পাইতে চাহে। আর কিছু না, শুধু কথাটা এই—যাহাতে কোন সম্পত্তির বেশী বৃদ্ধি না হয়, তাই তাহা হইতে কিয়দংশ বাহির করিয়া লইয়া, সুবিধার জন্য আর এক অংশের মধ্যে উহাকে আনা হয়।

যাহাই বল না কেন, এই কার্য্যের মধ্যে সাধারণ অধিকারের একটা ভাব আছে। এ ভাবটী খুব চোখে পড়ে। উত্তর প্রদেশের কোন কোন গ্রামেও ইহা লক্ষিত হয়। সে কথা পরে বলিব।

যাই হউক, এই ধ্বংসদশাগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যসমাজগুলি আদিম আদর্শের পরিচয় দেয় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, পঞ্জাব প্রদেশে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায়, এই আদর্শটি অক্ষুণ্ণভাবে,—জীবন্তভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

অতএব, এই কৌতুকাবহ নমুনাটি খুব নিকট হইতে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামগুলিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখিবামাত্র চোখে পড়ে। এই গ্রামগুলি কোন প্রধানের দ্বারা পরিশাসিত হয় না; পরন্তু ম্যুনিসিপালিটির দ্বারা পরিশাসিত হয়। এই ম্যুনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বত্বাধিকার সমান এবং এই গ্রাম্য-সমাজ, সাধারণের হইয়া, খাজনার হিসাবে একটা থোক্ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়—পরে আপনাদের মধ্যে অংশ বণ্টন করিয়া আদায় করিয়া লয়। এই প্রমাণটি সারবান হইলেও, সমবেত সমাজতন্ত্ররূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে! এইবার তবে চূড়ান্ত তথ্যটি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করি!—ব্যক্তিগত স্বত্বের হিসাবে ভূমি বিভক্ত হয় না, খণ্ডখণ্ডরূপে জমির বণ্টন হয় না; সমস্ত গ্রাম সমবেতভাবে জমির চাস করে, অথবা প্রজাবিলি করিয়া তাহাদের দ্বারা চাস করায়। পঞ্চায়ৎ ফসল ভাগ করে। ইহাই সমবেত-স্বত্বাধিকারবিশিষ্ট গ্রামের অক্ষুণ্ণ জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

যে দৃষ্টান্ত মেনের নিকট সুনিশ্চিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল,—অধুনা আরও সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারে, এবং পৌএল-কর্ত্তৃক রাশি রাশি রিপোর্টের অনুসন্ধান ফলে, অধুনা জানা যাইতেছে যে ঐ দৃষ্টান্তটি আসলে ঠিক্ নহে। যে আদর্শগ্রামের অবলম্বনে মেন্ একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন, আসলে তাহা হইতে ওরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার কোন ন্যায্য হেতু নাই।

প্রথমতঃ রাজস্ব সংগ্রাহকদিগের রিপোর্টে প্রকাশ পায়, উত্তর প্রদেশে শুধু যে এই সমবেত-অধিকারেরই আদর্শ ছিল তাহা নহে, সেখানে দুইটি বিভিন্ন আদর্শ বর্ত্তমান ছিল—এবং এই উভয় আদর্শের মধ্যে যে দুইটি সাধারণ লক্ষণ তাহার বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি; সে দুইটি কি? না, ম্যুনিসিপ্যালিটি এবং রাজস্বের জন্য সমবেত দায়িত্ব। উভয় আদর্শের মধ্যে শুধু এই দুই বিষয়েই ঐক্য—ইহার বাহিরে উহারা বিভিন্ন। যে প্রথম গ্রামটিকে মেন্ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন উহা বংশবিশেষের সম্পত্তি; এবং তাঁহার দ্বিতীয় গ্রামটি কোন ক্ষুদ্র শাখা-জাতির সম্পত্তি। প্রথমটির যে সমবেতত্ব সে শুধু

বাহ্যিক। আবার গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া যাক্‌। বংশ-তালিকা দৃষ্টে সপ্রমাণ হয় যে, বর্ত্তমান ভূস্বামিগণ সেই সব উচ্চাধিকারবিশিষ্ট রাজা কিংবা ঠাকুরের বংশধর যাহারা নিজ প্রাধান্যের অধিকারসূত্রেই সমস্ত গ্রামটি প্রাপ্ত হয়। চিরপ্রথানুসারে, পরে এই ভূস্বামীর পুত্রপৌত্রাদি গ্রামটিকে অধিকার করিতে লাগিল, এই বংশ ক্রমেই বিস্তৃত হইতে লাগিল, অবশেষে গ্রামটি এই বংশেরই সম্পত্তি হইয়া গেল; কিন্তু অবিভক্ত ভাবেই রহিল;—ইহার কারণ হয়ত উত্তরাধিকারিগণের ঈর্ষা, কিংবা প্রজাদের দ্বারা ভূমি কর্ষিত হইত বলিয়া। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রীতিমত ভূমির অংশবিভাগ না থাকিলেও, বংশ-সোপানের ধাপ অনুসারে, প্রত্যক উত্তরাধিকারী, অল্পাধিক পরিমাণে খাজনা কিংবা ফসলের অধিকারী। অতএব, অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি—ইহাই প্রকৃত কথা। এ কথা ত সকলেই জানে যে, আমাদের পরিবার অপেক্ষা হিন্দু পরিবার বহুবিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ। রোমানদিগের ন্যায়, হিন্দু পিতা, ভূসম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী নহে, পরন্তু সমস্ত ভূসম্পত্তিই পারিবারিক সম্পত্তি। পরিবারের অন্তর্ভূত ব্যক্তি মাত্রই ঐ স্বত্বের অংশী।

দ্বিতীয় আদর্শের গ্রামটি—একটি ক্ষুদ্র শাখা-জাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। উহার উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক অবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কিন্তু উহার মধ্যে অবিভক্ত স্বত্ব আদৌ নাই। এই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির একটা অংশ আছে—একটা সমান অংশ আছে। প্রথম আদর্শটির মধ্যে,—জন্ম-সম্বন্ধ-অনুসারে, বংশ সোপানের ধাপ-অনুসারে যেরূপ এই অংশের তারতম্য হয়, এই আদর্শের মধ্যে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু আমার মনে হয়, সমবেত স্বত্বাধিকারের সিদ্ধান্ত হইতে এখনও আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। সমবেত স্বত্বাধিকারের অস্তিত্ব আমরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অবশ্য, পূর্ব্ব-ক্রয়বিক্রয় ঘটিত স্বত্বাধিকার, স্বজাতির বাহিরে ভূমির হস্তান্তরীকরণ নিবারণের নিয়মাবলী, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভূমির সাময়িক বিনিময়—এই সমস্ত প্রথা দেখিয়াই মেন্‌ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; এই প্রথাগুলি হইতে সহসা মনে হয় যেন ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির কতকগুলি উচ্চতর স্বত্বাধিকার ছিল।

এখন তবে, চরম সিদ্ধান্তটি কি? গ্রামের সমবেত স্বত্বাধিকার ছিল কি?—না, ছিল না। মেনের মতবাদটি তথ্যের রাজ্য ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার? সে কথা বলিতেছি। বলিতেছি মাত্র—তাহার অধিক নহে। দলিলাদির সাহায্যে, B. Powell এই বিষয়ে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অস্পষ্ট সিদ্ধান্তের উচ্ছেদ হইয়াছে। প্রচলিত ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের অস্তিত্ব, এমন কি, যে স্থলে ভূসম্পত্তি অবিভক্ত, সে স্থলেরও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের অস্তিত্ব তিনি বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের মত যাহাই হউক না কেন, তাঁহার বিশ্লেষণ হইতে একথাও কি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে না যে, ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার—বংশগত উচ্চতর স্বত্বাধিকারকে রহিত করে নাই! সকলের মধ্যেই এই বিস্ময়জনক তথ্যটি বিদ্যমান:—ভূমির সাময়িক বিভাগ কিংবা বিনিময়। B. Powell ইহার মধ্যে শুধু দুর্জ্জয় সাম্যস্পৃহা দেখিতে পান। যদি সমস্তই সমবেত সম্পত্তি হয়, যদি সকলে মিলিয়া সাধারণ ভাবেই জমির চাস করে তাহা হইলে, ভূমির কোন অংশ-বিশেষ অল্প উর্ব্বরা হউক অধিক উর্ব্বরা হউক, বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, তাহাতে কি আইসে-যায়? সে কথা সত্য, কিন্তু এই ব্যাপারটা সম্ভব হয় না যদি ঐ বংশ নিজস্ব অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব বজায় না রাখে। এই ভাবে সীমাবদ্ধ হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্বাধিকার, প্রতিনিধির স্বত্বাধিকারে পরিণত হয়; তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই স্বত্বাধিকারের মধ্যে একটা অস্থায়িতার ভাব, আপাত-ব্যবহার্য্যতার ভাব, প্রত্যাখ্যেয়তার ভাব রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিবে কে? ভূমি অংশে অংশে বিভক্ত হইলেও, যে "গোষ্ঠী" (clan) নিজস্ব স্বত্বাধিকার কখন ত্যাগ করে নাই, সেই গোষ্ঠী স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকার সূত্রেই উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। যে কালে, স্বত্বাধিকারের ভাবটা একটু আচ্ছন্নভাবে, ছিল, যে জাতি (race) অসঙ্গতির জন্য আদৌ কুণ্ঠিত হইত না, সেই কালে ও সেই জাতির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন স্বত্ব যে একাধারে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এস্থলে ব্যক্তিগত স্বত্ব ও সমবেত স্বত্ব—পরস্পরকে বহিষ্কৃত করে না;—সীমাবদ্ধ করে মাত্র। যে সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের উপর স্থাপিত,

অবশ্য সে সিদ্ধান্তটি বাহ্যত দেখিতে বেশ সরল সুন্দর, তাহার এই সরলতাতেই চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়; আর আকৃষ্ট হয় তাহার মিথ্যা একত্বে; কেননা তাহাতে যে একত্ব আছে সে একত্ব আমরাই তাহাতে জুড়িয়া দিয়াছি। আসল কথা, ভারতবর্ষে বাস্তবিক সত্য ততটা সরল নহে।

কিসে জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা, ধন, ঐশ্বর্য্য, ও কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি হয়, তাহারই অনুসন্ধানে য়ুরোপীয় সমাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; ইহাকেই বলে উন্নতি। পক্ষান্তরে প্রাচ্য-সমাজ, বিশেষত হিন্দুসমাজ একেবারেই নিশ্চল। তাহারা মনে করে, পরিবর্ত্তন তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর; সমাজে নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেরূপ আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের মৃগতৃষ্ণিকা,—সেইরূপ উহাদের সমক্ষে অতীতের মৃগতৃষ্ণিকা প্রসারিত।

ক্ষুদ্র গ্রাম্যসমাজও নিশ্চল। এরূপ অদ্ভুত নিশ্চলতা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিলেও হয়। আসনটি টল্‌মল্ করিতেছে, তবু ভারত সেই আসনে দিব্য আরামে বসিয়া আছে। একটা উদগ্র তীক্ষ্ণমুখ শৈলের উপর হিন্দুকে বসাইয়া দেও, তুমি দেখিবে সে তাহাতেই বেশ গুছাইয়া বসিয়াছে, আপনাকে তাহার সহিত বেশ বনি-বনাও করিয়া লইয়াছে; কিন্তু শৈলটি একটু চাঁচিয়া-ছুলিয়া লইলে যে সুবিধা হইতে পারে একথা সে একবারও ভাবে না। এরূপ জড়ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। গ্রামের একটি সংকীর্ণ ঘেরের মধ্যে বিভিন্ন মূল-জাতি (race), বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন বংশ পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিয়া, বেশ শান্তিতে বাস করিতেছে। বর্ণদিগের মধ্যে, কতকগুলা নিয়ম দুর্ভেদ্য প্রাকারের মত খাড়া হইয়া রহিয়াছে—এই প্রাকার কেহই লঙ্ঘন করিতে সাহস করে না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, একজন ঝাড়ুবর্দ্দার হয় ত তৃষ্ণায় মরিবে, তবু সে একটু জল ভিক্ষা করিবার জন্য একজন উচ্চবর্ণের চৌকাঠ মাড়াইবে না;—কেননা, তাহা নিষিদ্ধ। এরূপ নিয়মিতভাবের কাজ, এরূপ অনাগত বিধান, এরূপ অন্ধ শক্তির বশবর্ত্তিতা, একটা মধুচক্রেও দেখা যায় না। গ্রামের প্রত্যেক লোকই, মধুমক্ষিকার মত, অভ্রান্ত দক্ষতার সহিত, স্বাভাবিক পটুতার সহিত, আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই গ্রাম্যজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এত ঘেঁসাঘেঁসি, এত ঠেলাঠেলি সত্ত্বেও, প্রাচীরগুলা এতকাল ভাঙ্গে নাই কেন?—ভাঙ্গা দূরে থাক, একটুও টলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামগুলি যেন বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন। স্বতন্ত্রশাসিত নগরগুলায়, বাহিরের প্রভাব বড় একটা পৌঁছিতে পারে না। তাহারা যে বায়ুমণ্ডল আপনাদের চতুর্দ্দিকে রচনা করে, তাহা বিদ্যুদ্‌বাহী নহে; কিন্তু অভ্যন্তরের ব্যাপার অন্যরূপ হইতেও পারে। অবিশ্রান্ত ঘষাঘষি, ঠেকাঠেকিতে এই জটিল যন্ত্রটি এক সময়ে বিগ্‌ড়াইবার কথা। কিন্তু না,—যন্ত্রটি কখনই থামে না, কখনই বিগ্‌ড়ায় না।

ইহার একটা কারণ প্রথমেই মনে হয়—এই গ্রামগুলি চাষাদের নগর। আমার বিশ্বাস,—ঋতুর নিয়মিত পর্য্যায়, ও কৃষকের অবিশ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় কর্ম্মচক্র হইতেই সর্ব্বদেশীয় কৃষকের মনে, বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষকের মনে, প্রাকৃতিক নিয়মের যন্ত্রবৎ সুনিশ্চিততা ও অবিচলতা প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, একটি স্থানীয় বিশেষ কারণও পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের যন্ত্রটি নিখুঁত বলিলেও হয়। ইহাতে ভারকেন্দ্রের সমতা অতীব নিপুণভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সকল বিষয়েরই বিধি নিষেধ পূর্ব্ব হইতেই এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে যে, ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীনভাবে যে কোন কাজ করিবে,—নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করিবে,—তাহার কোন পথ নাই। এই সমাজতন্ত্রে, দেবতার কাজও সীমাবদ্ধ,—কতকগুলি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না—এই বিষয়ের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ শাস্ত্রীয় নিয়ম ও শাসন, তাহাতে সমাজ একটা গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অমুক স্থলে, অমুক অবস্থায় কি করিতে হইবে, জীবনের মধ্যে একবারও হিন্দুর তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। একবার নেত্র উন্মীলন করিলেই হিন্দু দেখিতে পায়—তাহার সম্মুখে সুচিহ্নিত পথ প্রসারিত—স্থানে স্থানে পিল্‌পা, স্থানে স্থানে প্রাচীরের বেড়া। বর্ণগুলা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—উহাদের প্রবেশ-দ্বার একেবারে রুদ্ধ। এক বর্ণ অপর বর্ণসম্বন্ধে কিছুই জানে না। বর্ণগুলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য

কাজ করে, চিন্তা করে। এমনি কড়াক্কড় শাসন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার বাহিরে একপাও যাইতে পারে না। সামাজিক শাসন, ধর্ম্মমন্ত্রের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। বদ্ধ প্রাচীর, বিবিধ নিষেধ, দুর্লঙ্ঘ্য প্রথা, তাহার উপর আবার ধর্ম্মের শিলমোহর—এই সমস্ত বন্ধনে, এই সমস্ত গ্রন্থিতে, সমাজ অষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ—নিষ্পেষিত—অবরুদ্ধ।

ইহাতেও সম্যক্ ব্যাখ্যা হয় না; সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে জাতিগত প্রকৃতিকেও ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে হয়। এখানকার লোকেরা কোন একটা কাজ হইয়া গেলেই তাহা ললাটলিপি বলিয়া শান্তচিত্তে গ্রহণ করে, তাহারা পরিবর্ত্তনকে ভয় করে। যাহা কিছু নূতন তাহাই মন্দ, তাহাই পাপ।

যেমন কঠোর তপশ্চর্য্যা ও সন্ন্যাসব্রত আমাদের রুচি-বিরুদ্ধ, সেইরূপ আমাদের ছট্‌ফটানি, আমাদের চলিষ্ণুতা, আমাদের সামাজিক কল্পনা, মধুর ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আকুলতা, আমাদের পার্থিব সুখের অন্বেষণ, দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত জীবন যাপন করিবার আমাদের চেষ্টা—এই সমস্ত হিন্দুর নিকট দুর্ব্বোধ্য। বাঁচিবার আগ্রহে, পৃথিবীকে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপযোগী করিয়া তোলা,—ইহাই আমাদের চেষ্টা। আমরা প্রকৃতিকে বশীভূত করি, আমরা প্রকৃতিকে আমাদের কাজে খাটাই, প্রকৃতির দ্বারা আমাদের অভাব মোচন করি। কিন্তু হিন্দুর নিকট জীবনটা—জন্মজন্মান্তরের আবর্ত্ত-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা কঠোর, ইহা ভারবহ। ইহা ভবিষ্যতের জন্য এমন কিছুই দেখাইতে পারে না যাহা লোভনীয়, যাহা আশাপ্রদ, সুতরাং এরূপ জীবন না থাকাই ভাল। প্রত্যেক হিন্দু মনে করে,—এই জন্মপরম্পরায় ক্ষণস্থায়ী জীবন-তরঙ্গে নিঃক্ষিপ্ত হইবার জন্যই সে অনন্ত-ধ্যানের দিব্য নিদ্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। মনে করিও না, এই সূক্ষ্ম কল্পনাটি কেবল দার্শনিক পণ্ডিতের মস্তিষ্কের মধ্যেই বদ্ধ। "ভারতের জাতি ও বর্ণ"—এই গ্রন্থের প্রণেতা রিজ্‌লী সাহেব আমাকে একদিন কলিকাতায় এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"এই চত্তরের ছায়াতলে দেখ এই গরিব বেচারারা শুইয়া আছে; ইহারা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত নহে; বাস্তবিকই ইহাদের জীবনে বিতৃষ্ণা হইয়াছে, জীবনকে ইহারা কষ্টকর বলিয়া মনে করে, এবং কি করিয়া এই দুঃখময় সংসার হইতে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাইবে ইহারা এই স্বপ্নই দেখে এবং এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই একেবারে অচেতন হইয়া পড়ে।" এ দেশে "যোগী" নামে অদ্ভুত এক দল লোক আছে; এই ভাবটি,—এই আদর্শটি, তাহাদের মধ্যেই যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে।

এই "ক্লরোফর্ম্"-সুপ্ত হতচেতন সমাজ যদি বা কখন জাগরণোন্মুখ হয়, উহার শিয়রে যে দুই প্রহরী বসিয়া আছে রমণী ও পুরোহিত, তাহারা আবার তাড়াতাড়ি উহার নেত্র নিমীলিত করিয়া দেয়। সমাজের যে কোন সংস্কার হউক না কেন, উহারা তাহার পরিপন্থী। অবশ্য ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সমাজের একটা সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও, তাহার নিজস্ব অধিকারের উপর আঘাত লাগে। স্ত্রীলোকদের প্রতিকূলতার তেমন কিছু হেতু দেখা যায় না। যে সামাজিক অবস্থা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ী তাহার সেই অবস্থায় যদি কিছু পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয় সে ত আশারই কথা, তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি আছে? কিন্তু এই বন্দিনী তাহার শৃঙ্খলকেই আগ্রহের সহিত চুম্বন করে, এই নির্য্যাতিতা নারী স্বকীয় কষ্ট যন্ত্রণা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সহ্য করিয়া থাকে। যখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণের বিরুদ্ধে আইন প্রচারিত হয়, তখন রমণীরা ইহার প্রতিবাদ করে। যখন অল্পবয়স্কা বালিকার বিবাহের বিরুদ্ধে, বালিকার চিরবৈধব্যের বিরুদ্ধে, আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সর্ব্বাগ্রে প্রতিবাদ করে কে?—রমণীরাই। যখন পবিত্র গঙ্গাতীরে সতীত্বের জন্য স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে আত্মহত্যা করিত—তখন তাহারা যে চিরবৈধব্যের পক্ষপাতী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই ভীষণ ব্রতটি মানব-হৃদয় হইতেই প্রসূত। সহমরণ, সন্ন্যাসব্রত, কঠোর বৈধব্যব্রত—এই সমস্ত উচ্চবর্ণেরই বিশেষ-অধিকার,—উহার দ্বারা উচ্চবর্ণের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়। Snobism সমাজের উৎকৃষ্ট পুলিস-প্রহরী নহে কি? যে রমণী কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে সে একটা উচ্চতর জগতে প্রবেশ করে না কি? সেকালে মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হওয়া একটা শিষ্টাচারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

তীর্থযাত্রী হিয়ুয়াং-থ্সাং একটা অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন:—"অসাধারণ দীর্ঘকায় একজন অর্হান্ কোন পর্ব্বতগুহায় নেত্র নিমীলিত করিয়া বসিয়াছিলেন। ঘন নিবিড় কেশগুচ্ছ ও শ্মশ্রুরাজিতে তাঁহার স্কন্ধ ও মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—এ লোকটি কে? একজন শ্রমণ উত্তর করিলেন;—ইনি একজন অর্হান্, ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন। বহুবর্ষ ধরিয়া এই ভাবেই কালাতিপাত করিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি উপায়ে ইঁহাকে জাগ্রত করা যায়? শ্রমণ উত্তর করিলেন:—বহুবর্ষব্যাপী অনাহারের পর যদি একবার সমাধিভঙ্গ হয়, তবে ঐ যোগীপুরুষের শরীর গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। প্রথমে মাখন ও দুগ্ধের দ্বারা ইঁহার শরীরকে সিক্ত ও শরীরের পেশীগুলাকে নরম করা আবশ্যক। তাহার পর উহাঁকে বেড়াইবার জন্য ও জাগাইবার জন্য কাঁশর বাজাইতে হইবে।"

"শ্রমণের এই উপদেশ-অনুসারে, তখনই সেই মৃত কলেবরে দুগ্ধ সেচন করা হইল, ও কাঁশর বাজানো হইল। অর্হান্, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুষ্পার্শ্বের লোকদিগকে দুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে স্বকীয় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ হস্তে তুলিয়া ধরিয়া ধীরগম্ভীর ভাবে আকাশে উঠিলেন।"

হিন্দুগ্রাম দেখিয়া আমার এই গল্পটি মনে হয়। এই রুদ্ধ, নিস্তব্ধ শ্মশানবৎ গ্রাম্যজীবন,—ঐ কঙ্কালসার অর্হানের যোগনিদ্রার অনুরূপ। মৃত, না, নিদ্রিত?—কে জানে কি। কিন্তু যদি উহার সমাধিভঙ্গ করিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা না যায়, যদি উহার শরীর অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ হস্তের সংস্পর্শে আইসে, তবে উহাও অচিরাৎ গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে ব্রিটিশ শান্তি।

The agency which maintains order may cause miseries greater than the miseries caused by disorder.
Herbert Spencer.

ইংরেজ বণিকবেশে যখন এ দেশে প্রবেশ করে, রাজ-বেশ ধারণ করিবার তাহার কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আর দশ জন বিদেশী যেমন বাণিজ্যের জন্য ভারতে আসিয়াছিল, সেও তেমনি আসিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া বুদ্ধির জোরে সে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছে। যখন মোগল শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয়ে সকলেই মনে করিয়াছিল ঐ শক্তির আশ্রয়ে ভারত অরাজকতা হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু যখন তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তি বিনষ্ট হইল তখন খণ্ড ভারতকে অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার মত শক্তি আর রহিল না। চারিদিকে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইল। ছলে বলে কৌশলে এই অশান্তি নিবারণের ওজুহাত লইয়া ইংরাজ ভারত-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল এবং ভারতবাসীও অবস্থার ফেরে পড়িয়া ঐ শান্তি স্থাপনকে ইংরাজের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্য বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে যে ভারতবাসী বিদেশীর সহায়তা করিয়াছিল তাহার কারণ এই যে তখনও ইংরাজ আপনার স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করে নাই, তখনও শান্তির আবরণ তাহার গাত্রে জড়িত ছিল। দেশের অশান্তি দূর করিবার জন্য ইংরাজ তখন শান্তির জল ছিটাইতেছিল, গুর্খা হাঁকায় নাই, রেগুলেশন লাঠি চালায় নাই, পিটুনি পুলীশ বসায় নাই; উদারনৈতিক সাম্য ও মৈত্রীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা অশান্ত দেশকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাই আবার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আমরা যে শান্তি পাইলাম, এ শান্তিতে আমাদের কি কেবলই লাভ হইল? আমরা অশান্তির বিরোধী, কিন্তু শান্তিও প্রকৃত মঙ্গলজনক হওয়া চাই।

শান্তি কিম্বা সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যত্বের বিকাশই একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাক্, এ উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সংগ্রামভীরু; অর্থাৎ যাহা কিছু আয়াসসাধ্য তাহা হইতেই তাহারা বিমুখ। কোন রকমে নির্ব্বিবাদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাহাদের জীবনের আদর্শ। এই সমস্ত মানুষকে নরাকার পশু বলা যাইতে পারে। কেন না, পশুর ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, মনুষ্যত্ববৃদ্ধির কোনও চেষ্টা নাই। ইহারা পশুর ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে আহার বিহার করিয়াই সন্তুষ্ট। ইহারা চায় এই নিম্নস্তরের শান্তি—শান্তিতে ধন উপার্জ্জন কর, শান্তিতে সন্তান উৎপাদন কর, শান্তিতে তাহাদের "শিক্ষা"র ব্যবস্থা কর, এবং শান্তিতে

তাহাদের জন্য একটু কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা কর। এই তাহাদের জীবনের আদর্শ। ইহার মধ্যে এক স্বদেশী ও স্বরাজের হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়া দেশে কি এক মহা অনর্থ টানিয়া আনিয়াছে। সুতরাং এই লোকগুলিকে ধরিয়া শূলে দাও। এই শ্রেণীর জীবে ও পশুতে কোনই বিভিন্নতা নাই। ইহারা কোনও উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তাই ইহারা ভারতে ব্রিটিশ শান্তির বড়ই পক্ষপাতী। শান্তি তো সকলেই চায়, অশান্তি চায় না; কিন্তু যাহা মনুষ্যত্বের বিনাশকারী তাহা কি মানুষের পক্ষে একটা আদরের বস্তু হইতে পারে? যে শান্তি কেবল নির্ব্বিঘ্নে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে তাহা কি শান্তি নামের যোগ্য? সে শান্তি আর মনুষ্যত্বের বিনাশ এ দুইয়ে বিভিন্নতা কি? উহা মৃত্যুর নিশ্চেষ্টতার নামান্তর মাত্র! কিন্তু যে শান্তি সেই সকল কর্ম্মের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করে যাহা দ্বারা মানব আপনার পুরুষার্থের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, আপনার উচ্চতর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাকে সাধন করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত শান্তি। তাহাই একমাত্র লোভনীয় জিনিষ। নতুবা যে শান্তি উন্নত কর্ম্মচেষ্টার সকল দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মানুষকে খাওয়া পরা রূপ স্বার্থপর জীবনের নিম্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ করে সেই শান্তির সুখকে যাহারা একটা মস্ত আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে, এই ব্রিটিশ শান্তি তাহাদিগকে কিরূপ মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, এই শান্তির মহিমা কীর্ত্তন ও তজ্জনিত আত্মপ্রসাদেই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কর্ম্মময় জীবনের সকল সংগ্রামকে এক আদর্শের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া জীবনের সকল বিভাগের কর্ম্মকে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অধীন করিয়া দিয়া মানুষ যে শান্তি লাভ করে তাহাই প্রকৃত শান্তি। নতুবা যেখানে কর্ম্ম নাই, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম নাই, সেখানে আবার শান্তি কি? আমরা কি ব্রিটিশ রাজত্বে এই উচ্চতর শান্তি এই প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছি? শান্তি দুই প্রকারে লাভ হইতে পারে। এক তমোগুণাচ্ছন্ন শান্তি, আর সত্ত্বগুণাশ্রিত শান্তি। যেখানে রজোগুণের আবির্ভাব হয় নাই, যেখানে কর্ম্মচেষ্টা নাই বা বাহির হইতে পশুবলে কর্ম্মচেষ্টাকে চাপিয়া রাখা হইতেছে, সেখানে যে শান্তি তাহা তমোগুণাচ্ছন্ন, এই শান্তিই ভারতে ব্রিটিশ শান্তি নামে অভিহিত। এখানে তো মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবই নয়, ইহা পশুকেও জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। সত্ত্বগুণাশ্রিত যে শান্তি, তাহাতে কর্ম্মকে চাপিয়া রাখা হয় না, তাহাতে বরং রজোগুণের পূর্ণ বিকাশ। কর্ম্ম সেখানে আপনাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়া নিজেই নিজেকে নিয়মিত করে। সকল কর্ম্ম মানবের পুরুষার্থ সাধনে নিযুক্ত হইয়া আদর্শের দ্বারা স্বতঃই নিয়মিত হইয়া যায়, আর সংগ্রাম থাকে না। ইহাই প্রকৃত শান্তি। আমেরিকায় ব্রিটিশ শাসনেও শান্তি ছিল আবার এখনও শান্তি আছে। কিন্তু বিভিন্নতা কি? পূর্ব্বে ছিল কর্ম্মহীনতার শান্তি, এখন আছে কর্ম্মশীলতার শান্তি। কর্ম্মহীনতার উপর কর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, সর্ব্বপ্রকার জড়তার অবসান হইল। যে শক্তি কর্ম্মকে চাপিয়া রাখিয়াছিল সে শক্তি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। কর্ম্ম আপনার ক্ষেত্র লাভ করিল। নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। বাহিরের শক্তি এত দিন যে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহারা মাথা তুলিল। উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশ বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এই বিবাদের দ্বারা বিরোধের চির মীমাংসা হইয়া গেল, আমেরিকায় প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল। এত দিন কর্ম্মহীনতা ও নিশ্চেষ্টতাকে শান্তি মনে হইতেছিল; কর্ম্ম আসিয়া নিশ্চেষ্টতাকে বিনাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মহীনতার অন্তরালে যে অশান্তির বীজ নিহিত ছিল তাহাকেও অপসারিত করিয়া প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিল। প্রকৃত শান্তির এই একমাত্র পথ। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজ এ দেশে রাজ্যভার গ্রহণ করে, ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, তখন পরস্পরে বিবাদ করিয়া আমরা উচ্ছন্ন যাইতেছিলাম, সুতরাং ইংরাজের পক্ষে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এই দেড়শত বছরের পরও শুনিতেছি, ইংরাজ চলিয়া গেলে আমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিনাশ পাইব। তবে জিজ্ঞাসা করি, এই দেড়শত বৎসর ইংরাজ শাসনের শান্তিতে বাস করিয়া আমাদের লাভটা হইল কি? মনুষ্যত্বের দিকে কি এক পদও অগ্রসর হই নাই? তাই যদি হয়, তবে যত দিন এই শান্তি থাকিবে, ততদিনই তো আমাদের মনুষ্যত্ব চাপা পড়িয়া থাকিবে, প্রকৃত শান্তি লাভ হইবে না; ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ শান্তির বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি? প্রকৃত শান্তির রাজ্যে কর্ম্মের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে

হয়। সে দরজা যতদিন না খুলিতেছে, দুই হাজার বছর এই ভুয়ো শান্তির আশ্রয়ে বসিয়া থাকিলেও কোন লাভ হইবে না। বরং এই শান্তিরক্ষার মাশুল স্বরূপ বৎসরে ৫০ কোটী টাকা কর দিতে দিতে দিন দিন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িব এবং অবশেষে একেবারে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইব। আমরা এই পথেই চলিয়া আসিয়াছি। এই অনর্থ হইতে উদ্ধারের এক মাত্র উপায় কর্ম্মের উপাসনা। এই জন্য আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় এবং ইংরাজের তাহাতে বাধা না দেওয়ায় উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। কিন্তু ইংরাজ রাজ মনে করেন কর্ম্ম আসিলেই তাঁহাকে দুর্ব্বল হইতে হইবে। তাই কর্ম্মের নামে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং অশান্তি অশান্তি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। এই অশান্তি নিবারণের ওজুহাতে তিনি দেশের সকল কর্ম্মের মস্তকে লগুড়াঘাত করিতেছেন। আর সম্মোহনমুগ্ধ হতভাগ্য আমরাও তাহাই বুঝিতেছি। রুষ জাপান সন্ধির পর তো জাপানী ছাত্রেরা রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। বুয়র যুদ্ধের সময় তো ইংরেজ ছাত্রেরা ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া আনন্দোৎসব করিল। কই, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য তো কার্লাইল সাকুলার, রিজ্‌লি সাকুলারের জন্ম হইল না? আর ভারতেই কেন ছেলেরা স্কুল ছাড়িয়া একটু রাস্তায় আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর এত জুলুম? সব সভ্য দেশেই তো ছাত্রেরা রাজনীতির চর্চ্চা করে, তবে আমাদের দেশেই এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন? কারণ ব্রিটিশ রাজের কর্ম্মভীতি। এত কাল আমরা যে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছি তাহা কেবল বাগ্দেবীর শ্রাদ্ধ, সুতরাং তাহাতে রাজা ভয় পান নাই। কিন্তু ছাত্রদের মধ্য দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে, দুর্ভিক্ষে, 'স্বদেশী' প্রভৃতিতে কর্ম্মের আবির্ভাব দেখিয়া রাজার প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। সকল বৈদেশিক শাসনই একটা যাদুমন্ত্রবলে পরদেশ শাসন করে। সে যাদুমন্ত্রটী হইতেছে দেশবাসীদের আপনার নিজ শক্তির উপর অবিশ্বাস—আমরা আমাদের নিজের দেশ নিজেরা শাসন করিতে পারি না। ইহাই বিদেশী শাসনকর্ত্তাগণের হস্তের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। দেশীয় শাসন কিম্বা বিদেশীয় শাসন কেহই কয়েক সহস্র সৈন্যের সাহায্যে পশুবলে স্বীয় প্রজার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। যদিই বা স্বীকার করা যায় রুসিয়া পশুবলে পোলাণ্ড শাসনাধীন রাখিয়াছে কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ডের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। সমস্ত ইংলণ্ড উঠিয়া আসিয়া ভারত শাসন আরম্ভ করিলেও ভারতের এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ত্রিশ কোটী প্রজাকে পশুবলে শাসন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই। তাই একটা সম্মোহন অস্ত্র চাই। ইংলণ্ডের হস্তে সেই অস্ত্র আমরা দিয়াছি। এটা আমাদের স্বশক্তির উপর অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস বক্তৃতায় যাইবে না, এ অবিশ্বাস রেজলিউশনে যাইবে না। কেবল কর্ম্মক্ষেত্রের পরীক্ষায় এ সম্মোহন বিনষ্ট হইতে পারে। তাই সর্ব্বদাই আমাদিগের কাণের কাছে বলা হইতেছে তোমরা স্বায়ত্ব শাসনের উপযুক্ত নও। অথচ যে সকল কর্ম্মের দ্বারা আমাদের ক্ষমতা পরীক্ষিত হইবে তাহার ধারেও আমাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে না। দিলেই তো সর্ব্বনাশ! সম্মোহন ভাঙ্গিয়া যাইবে যে! সুতরাং সেরূপ কর্ম্ম রাজদ্রোহিতা মাত্র। আমাদিগকে যে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না, তাহার কারণ ইহা নয় যে আমরা সে সকল কার্য্য হাতে পাইলে কাজ চালাইতে পারিব না বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিব, কিন্তু অতি সুচারুরূপে চালাইতে পারিব বলিয়াই আমাদিগকে দেওয়া হয় না। তাহা হইলে আমাদের নিজেদের উপর অবিশ্বাস চলিয়া যাইবে যে! এ অবিশ্বাস চলিয়া গেলে বিদেশী শাসনের মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে অর্দ্ধোদয় যোগে পুলীশের সাহায্য ছাড়াই আমরা বিরাট জনসঙ্ঘ নিয়মিত করিলাম, কর্ত্তারা তাহা ভাল করিয়া স্বীকার করিতেছেন না কেন? স্বীকার করিলে তো তাঁহাদের ব্যবসাই চলিয়া যায়? এই যে এত কাল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের এত কুৎসা রটনা করা হইল এমন কি বিলাতের Times পর্য্যন্ত বলিলেন, "It is high time to exert all the powers of the law to suppress this evil" ইহার ভিতরে বৈদেশিক শাসননীতির একটি গূঢ় চাল নিহিত রহিয়াছে। স্বাবলম্বন মানুষের মনে স্বশক্তির উপর বিশ্বাস আনয়ন করে এবং এই বিশ্বাস হইতেই আত্মনির্ভর জন্ম গ্রহণ করে। ইংরাজ চলিয়া গেলে আমাদের কি দশা হইবে আমরা একেবারে নিরুপায় হইব, আমাদের মনের এই শোচনীয় অবস্থাই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের মেরুদণ্ড। আত্মনির্ভর লাভ করিলে এই মেরুদণ্ড

ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং যে স্বেচ্ছাসেবকদল দেশের বুকে এই স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে, রাজপুরুষগণ আত্মরক্ষার জন্য যদি তাহার উপর খড়্গাহস্ত হন তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহা হউক ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শান্তি একটা জাতির, যে জাতিটা একদিন স্বগৌরবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার সমস্ত কর্ম্মশক্তি হরণ করতঃ তাহাকে শিশুর ন্যায় অসহায় অবস্থায় আনয়ন করিয়া তাহার যে ক্ষতি করিয়াছে, ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃত বা কল্পিত কোন উপকারই তাহার প্রতিদান স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। তবে কথা এই যে পৃথিবী অন্ধশক্তি দ্বারা পরিচালিত নহে, এক জ্ঞানময় ন্যায়বান মহান্ পুরুষ ইহার বিধাতা। তাই কোন অপকারই একপেশে নহে। অপকারে যে কেবল যাহার অপকার করা হয় তাহারই ক্ষতি হয় তাহা নহে, অপকারকারীরও অনিষ্ট হয়। ভারতবাসীকে অধীন কর্ম্মহীন অসহায় অবস্থায় আনিয়া তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে করিতে ইংরেজও ক্রমে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছে, একথা সকলেই এখন স্বীকার করেন। তাই বেশীদিন একদল ইংরাজের এদেশে থাকা কর্ত্তারা নামঞ্জুর করিয়াছেন। নেভিনসন সাহেব সেদিন এই বলিয়া ভারতবাসীদিগকে দোষ দিয়াছেন যে তোমরা একদল ভদ্রলোককে গুণ্ডায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছ (apparent gentlemen into "bounders"); অর্থাৎ গুরুমহাশয়ের এমন হাতযশ যে ঘোড়া পিটিয়া গাধা বানাইয়া দিয়াছেন। এ দোষ আমাদের নয়। ইংরাজ আমাদিগকে মানুষ হইতে দিতেছে না, গাধা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে এবং গাধার সংসর্গে সেও গাধা হইয়া যাইতেছে।• ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে কোটী কোটী টাকা লুট করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদানে তাহার সন্তানগণ পশুত্বপ্রাপ্ত হইতেছে; ইহাই ন্যায়বান বিধাতার ব্যবস্থা; what doth it avail you if you gain the whole world but lose your own soul? ভারতের বৃটিশ শান্তি শাঁখের করাতের ন্যায় দুদিকই কাটিতেছে। তবে সোজা দিকটাই সাধারণের চোখে পড়ে, এই মাত্র বিভিন্নতা।

গবর্ণমেণ্ট ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিব কোন্ মানদণ্ডের সাহায্যে? দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে, মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ, মানুষ নির্ব্বিঘ্নে আহার বিহার করিতেছে, কেবল ইহাই কি সেই মানদণ্ড? মনে রাখিতে হইবে man doth not live by bread alone. আবার ধনপ্রাণও আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কতটা নিরাপদ তাহাও বিবেচ্য। যদিই বা ধরিলাম নিরাপদ তবুও তো মীমাংসা হইল না। যে সমস্ত ব্যাপারে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য নাই তাহা নিরাপদ হইলেই কি হইল? তাহা তো নয়। যে সমস্ত বৃত্তির বিকাশে মানুষের মনুষ্যত্ব, যে সমস্ত বৃত্তির বলে মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই সমস্ত বৃত্তির বিকাশ হইতেছে কিনা, এই মাপকাঠির দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন এ বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইবে কি? ভারতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শান্তি ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করিতেছে কি? এই কথাই কি সত্য নয়, যে সমস্ত কর্ম্মে দেহ ও মন বললাভ করে, আত্মা পরিপুষ্ট হয়, জাতীয় জীবনের সেই সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার ভারতবাসীর নিকট রুদ্ধ? কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া কল্পনাক্ষেত্রে মানুষ গড়িবে না। বিশ্বমানবের সংস্পর্শ ছাড়া মানবহৃদয়ে বিশ্বজনীন ভাব বিকশিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতবাসীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বমানবের সংসর্গবিচ্যুত করিয়া আপনার স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; এক কথায় তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল পথই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে জাতি কর্ম্মক্ষেত্রের সুখ দুঃখ, ভুল ভ্রান্তি, জয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষিত না হইয়া কেবলমাত্র ইতিহাসের গৎ মুখস্থ করিয়াই জীবনের সিদ্ধি খুঁজিতে যায়, তাহার মনুষ্যত্বলাভ কি সুদূরপরাহত নহে? ব্রিটিশরাজ বিশ্বমানবের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সন্তর্পণে ভারতবাসীকে দূরে রাখিয়া তাহার যে অনিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট মানুষের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। মানুষ মানুষ হয় উচ্চতর স্বার্থের কাছে নিম্নতর স্বার্থকে বলি দিয়া, জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে দমন করিয়া এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সংস্পর্শে আসিয়া। কিন্তু যেদেশে প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি প্রকারান্তরে আইনতঃ দণ্ডনীয় সে দেশে

দেশের জন্য আত্মত্যাগের দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ কোথায়? যাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ শান্তির স্তাবক, যাঁহারা ঐ শান্তির জন্য আর সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা এই কথাটা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন কি? যদি মনুষ্যত্বই হারাইলাম তবে শান্তিতে পশুজীবন যাপন করিয়া লাভ কি?

উপসংহারে আর একটী কথা বক্তব্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজ বণিক্‌বেশে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল দৈবঘটনায় সে রাজবেশ ধরিয়াছে। কিন্তু আপনার ডাক কখনও ভুলে নাই। তবে এতদিন যে শান্তির কথা শুনিয়াছি সে কেবল আপনার বণিক্‌বৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছিল বলিয়া। যতদিন আমাদের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট করিয়া ইংরাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল ততদিন কোন গোলমাল হয় নাই। কিন্তু যেই বাণিজ্যের কণামাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছে, অমনি ইংরাজ নিজ প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চুলোয় যাক্ তোমার শান্তি, চুলোয় যাক্ তোমার আইন আদালত। জজ মাজিষ্টর হইতে আরম্ভ করিয়া চৌকীদার কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সদলে রাজকার্য্য ছাড়িয়া বিলাতী জিনিষের মোট ঘাড়ে করিয়াছে—চাই বিলাতী নুন, চাই বিলাতী কাপড়! বিগত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে শান্তি অশান্তি, বাক্যের স্বাধীনতা অধীনতা, ও সব ফক্কিকার। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে ও সব পদদলিত করিতে মুহূর্ত্তও লাগিবে না। যখন প্রয়োজন হইল হিন্দুর বিপক্ষে মুসলমানকে উত্তেজিত করিয়া দেশময় অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তুলিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল কি? উদ্দেশ্য হিন্দুকে এই কথা বলা—তুমি যে স্বরাজ চাও, আমি চলিয়া গেলে মুসলমানের হাতে তোমার কি দুর্দ্দশা তাহা দেখ! দুঃখের বিষয় হিন্দুর উত্তরটা গায়ে বড় লাগিয়াছে! যাহা হউক, এ শান্তির মূল্য কি তাহাও আমরা বুঝিয়াছি, এ শান্তির অর্থ কি তাহাও আমরা জানিয়াছি। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ইহার জন্ম, ইংলণ্ডের স্বার্থের সঙ্গে ইহার যেখানে বিরোধ, সেখানে ইহার মৃত্যু। ইংরাজরাজ এখন স্ববেশে আবির্ভূত হইয়া এই শান্তির অন্তর্নিহিত গূঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

য়ুরোপে পদার্পণ।

ইংরাজি ১৯০১সাল ১৮ই জানুয়ারি ভূমধ্যসাগর বক্ষে পি এণ্ড ও কোম্পানির "অষ্ট্রেলিয়া" নামক জাহাজ খানি ছুটিতেছে। ৫ই জানুয়ারি বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম,—আজ দুই সপ্তাহ কাল একাদিক্রমে মাতা বসুন্ধরার স্পর্শবিরহিত—প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আজ জাহাজে আমার শেষরাত্রি। কল্য প্রাতে জাহাজ মার্সেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছিবে। সেখানে এক বেলা থাকিয়া জাহাজ আবার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে। কতক লোক মার্সেল্‌সে নামিবে,—বাকী লণ্ডনযাত্রী সমস্ত পথই জাহাজে যাইবে। ধন্য তাহারা—যাহারা নামিবে না। ধন্য তাহাদের ধৈর্য্য। সমুদ্রকে নমস্কার—আমি স্থলচর প্রাণী, জীবনের অষ্টাবিংশতি বৎসর স্থলে কাটাইয়াছি—সুখে কাটাইয়াছি;—কিন্তু জলে দুই সপ্তাহেই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

জাহাজে কি আমার বেশী শারীরিক কষ্ট হইয়াছিল?—তাহা ত নহে। বোম্বাই ছাড়িয়া অবধি সমুদ্র বেশ শান্ত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল। শীতকালে আরব্যসাগর শান্তই থাকে,—বর্ষাকালেই যাহা কিছু গোলযোগ। বোম্বাই ছাড়িবার পর দশম দিবসে লোহিত সাগর পার হইয়া পোর্ট সেদে পৌঁছিলাম, তখনও পর্য্যন্ত একদিনের তরেও সমুদ্রপীড়া অনুভব করি নাই। পোর্ট সেদ ছাড়িলে—দিন দুই মাত্র—সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশী হইয়াছিল, জাহাজ একটু বেশী দুলিয়াছিল,—একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। "সমুদ্রপীড়া" বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা হয় নাই। ক্যাবিনে শয্যার উপর চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকিতাম, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধও সহ্য করিতে পারিতাম না। ষ্টিউয়ার্ড (খানসামা) দুই একটি আপেল ফল আনিয়া দিত, তাহাই খাইতাম, এক আধ গেলাস নেবুর সরবৎ আনিয়া দিত, তাহাই পান করিতাম; এবং একটি ফাউণ্টেন পেন লইয়া, "ষোড়শী"তে প্রকাশিত "কাশীবাসিনী" নামক গল্পটি রচনা করিতাম। দুই দিন পরে, যখন ইতালী সমীপবর্ত্তী হইল, তখন সমুদ্রও শান্ত হইল, আমিও গা-ঝাড়া দিয়া "চাঙ্গা" হইয়া উঠিলাম। জাহাজে আমার ত কষ্ট হয় নাই। তথাপি জাহাজ আমার কারাগার স্বরূপ মনে হইতেছিল, নামিতে পাইলে বাঁচি।

১৮ই জানুয়ারি রাত্রি দশটার সময় তাই প্রফুল্ল মনে শয়ন করিতে গেলাম। কল্য প্রভাতে আমার মুক্তি। "রাজা ও রাণী"র কয়েক লাইন ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—

এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ !
কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে !—অবলার—

না—না—অবলাসংক্রান্ত কোনও গোলযোগ জাহাজে উপস্থিত হয় নাই। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধৃতাংশ হইতে শেষ কথাটি কাটিয়া দিবেন, ইহা ভুলিয়া বলিয়াছি। জাহাজে একটি অবলার সহিত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বটে,—এবং তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ উপহারও দিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু বয়সে তিনি প্রবীণা,—এবং তাঁহার উপহার একশিশি সুগন্ধি নয়, ঔষধের বড়ি মাত্র। তিনি ও তাঁহার স্বামী কাপ্তেন—আমাকে বলিয়াছিলেন—"বিলাতের শীতে প্রথম প্রথম তোমার সর্দ্দি কাসি উপস্থিত হইবে, 'সোরথ্রোট' হইতে পারে, এই ঔষধ তখন এক এক বড়ি খাইও।" দুর্ভাগ্যবশতঃ পৌছিয়া আমার সর্দ্দি কাসি কিছুই হয় নাই। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে এক একটা সেই বড়ি খাইতাম। রোগ নাইবা হইল, তাহা বলিয়া কি ভাল ঔষধটা নষ্ট করিতে আছে ?

শয়ন করিলাম, কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না। মাঝে মাঝে কাকনিদ্রা আসে, মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠি। রাত্রি পাঁচটার সময় জাগিয়া দেখি, জাহাজের গতি বড় ধীর। এঞ্জিনের যে একটা ধম্ ধম্ করিয়া শব্দ হয়, তাহা অতি ধীরে, দেরিতে দেরিতে হইতেছে। তবে পৌছিলাম বুঝি ? তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রাত্রি-বসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া, চটি জুতা পায়, ডেকের উপর ছুটিলাম। গিয়া দেখি, আরোহীর মধ্যে একজন ইংরাজ বালকমাত্র দাঁড়াইয়া আছে, আর নাবিকেরা আছে। অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। কেবল দূরে একটা লাইট হাউস্। আলোকটা নিরবচ্ছিন্ন নহে। জ্বলে আর নিবিয়া যায়, ঘন ঘন এইরূপ হইতেছে। কখনও শ্বেত, কখনও লোহিত, কখনও নীল, এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনও হইতেছে। আমি এবং সেই বালকটি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বালকটি বলিতে লাগিল—Isn't it pretty !

নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মার্সেলস্ আর তিন চারি মাইল মাত্র ব্যবধান আছে। জাহাজ অতি ধীরে, মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রির অন্ধকারও কমিতে লাগিল।

ঘণ্টা খানেক পরে, জাহাজ একবারেই থামিয়া গেল। দূরে পাহাড়ের মত দেখা যাইতেছে। তখন সামান্য আলোকও হইয়াছে, একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মার্সেলস্ কোথা ?"

সে তটভূমি দেখাইয়া বলিল—"ঐ।"

"কৈ ?"

"ঐ যে।"

"ও ত দেখিতেছি পাহাড়ের মত। সহর কৈ ?"

"ঐ সহর।"

"বাড়ী ঘর কৈ ?"

"সব আছে। কুয়াসায় ঢাকা আছে।"

বিশ্বাস হইল না। তটভূমি ত বেশ স্পষ্টই দেখিতেছি—কুয়াসা ত কৈ দেখিতেছি না। ঐখানেই সহর আছে, ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, তাহাই হইল। যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে, অল্পে অল্পে, যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে সহর ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে একটি দুইটি করিয়া পুরুষ আরোহী ডেকে দেখা দিতে লাগিলেন। সকলেই আমার ন্যায় "আনড্রেস" অবস্থায়, কারণ ৮টার পূর্ব্বে মহিলাগণের ডেকে আসিবার অধিকার নাই! শুনিলাম বন্দর হইতে পাইলট বোট আসিবে, আসিয়া আমাদের জাহাজকে বন্দরে লইয়া যাইবে।

যখন সাড়ে সাতটা, তখন বেশ আলো হইল, পাইলট বোট আসিল। বন্দরে পৌছিতে ৮টা বাজিয়া গেল। আমি ইতিপূর্ব্বেই, বেশ পরিধান করিয়া, জিনিষপত্র গুছাইয়া, প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। জাহাজ যখন তীরে লাগিল, নামিবার জন্য সিঁড়ি পড়িল, ঠিক সেই সময়ে জাহাজের প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজিল। দেখিলাম দলে দলে নরনারী ভোজন কক্ষে গিয়া খাইতে বসিলেন। আমি নামিবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে সে বিলম্ব আমার সহিল না। পূর্ব্বেই একটু চা ও দুই চারি খানি বিস্কুট খাইয়া ছিলাম। প্রাতরাশ বাদ দিয়া, পূর্ব্বকথিত কাপ্তেন ও তাঁহার পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া পড়িলাম।

তীরে টমাস্ কুকের পরিচ্ছদধারী একজন কর্ম্মচারী ছিল,

তাহার সাহায্যে কষ্টম হাউসের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। ইংরাজি মুদ্রার (যাহা বোম্বাই হইতে লইয়া গিয়াছিলাম) বিনিময়ে কিছু ফরাসী মুদ্রা সে আমায় আনিয়া দিল। বন্দর হইতে ষ্টেশন চারি মাইল ব্যবধান। বলিল—"ষ্টেশনেও আমাদের লোক আছে, সে আপনাকে ট্রেণে চড়িতে সাহায্য করিবে।"

গাড়াখানি ব্রহামের আকার। সমুদ্রের তীরে তীরে কিয়দ্দূর ছুটিয়া, গাড়ী নগরে প্রবেশ করিল। তখনও মাসেল্‌স্‌ নিজ প্রাতরাশ শেষ করে নাই। সেই কারণে পথে লোকসংখ্যা অল্প।

ষ্টেশনে পৌছিয়া, কুকের লোককে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী বিদায় করিয়া, মুটের জিম্মায় জিনিষ রাখিয়া, কুকের লোককে খুঁজিতে লাগিলাম। ট্রেনের তখনও বিলম্ব ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিলাম। ষ্টেশনের নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, অবশেষে দেখি, বাগানে একখানা বেঞ্চিতে কুকের কর্ম্মচারী বসিয়া আছে, একজন জুতাবুরুষওয়ালা তাহার জুতা বুরুষ করিয়া দিতেছে। সে বলিল, দশটার সময় ট্রেন ছাড়িবে, ঘণ্টা খানেক বিলম্ব আছে। যথা সময় আমায় ট্রেনে উঠাইয়া দিবে। ষ্টেশনে ফিরিয়া, আমার জিনিষপত্রগুলির কাছে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম।

বসিয়া বসিয়া বিরক্ত বোধ হইল। উঠিয়া একটু ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। এক স্থানে দেখিলাম, ষ্টেশনের ভোজনশালা, বহু লোক খাইতে বসিয়াছে। আমারও ক্ষুধাটা বিলক্ষণ পাইয়াছিল। একবার ভাবিলাম, প্রবেশ করিয়া বসিয়া যাই, কিন্তু একটা বিষয়ে আশঙ্কা হইল। শুনিয়াছিলাম, ফরাসীরা নাকি বেঙ খায়। কি জানি মহাশয়, যদি না জানিয়া বেঙ খাইয়া ফেলি ? ভাষাও জানিনা যে জিজ্ঞাসা করিব। এই ভয়ে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সাহস হইল না। অভুক্ত অবস্থায় জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়াছি বলিয়া, নিজের বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

ক্রমে সময় হইল ; কুকের লোক আসিয়া আমায় ট্রেনে উঠাইয়া দিল। তখন তাহাকে বলিলাম—"আমায় কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া দিতে পার ?" সে বলিল—"আসুন"—পূর্ব্বকথিত ভোজনশালায় তাহার সঙ্গে গিয়া, একখানা রুটি, একটু মাখন, খানিকটা রোষ্ট মটন এবং কিছু ফল ক্রয় করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! দেখিলাম, আমার হাতবাক্সটি, যাহাতে আমার টাকা কড়ি সমস্তই ছিল, তাহা সেই খালি কামরার বেঞ্চির উপর রহিয়াছে ;—ডালাটি খোলা। আমিই তাড়াতাড়িতে অসাবধানতায়, বাক্সটি তদ্রূপ খোলা অবস্থায় রাখিয়া, খাবার কিনিতে নামিয়া গিয়াছিলাম। বাক্সতে আমার সম্বল, দশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। কেহ যদি তাহা লইয়া থাকে ? তবে এ বিদেশপথে কি বিপদেই না পড়িব ! লণ্ডন অবধি টিকিট অবশ্য আমার আছে ;—কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া, কুলি-ভাড়াই বা দিব কোথা হইতে, পথে খাইবই বা কি ? আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া বাক্স অনুসন্ধান করিলাম ; দেখিলাম টাকা গুলি আছে, কেহ লয় নাই। তখন দেহে প্রাণ পাইলাম।

গাড়ী যখন ছাড়িল, তখন বোধ হয় সাড়ে দশটা। ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আমাদের মধ্যম শ্রেণীর মত। এক একখানি গাড়ী পাঁচ ছয়টি কামরায় বিভক্ত। বসিয়া যাইবার স্থান মাত্র, শয়নের ব্যবস্থা নাই, স্নানাগারও নাই ;—অথচ সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি চলিয়া আমরা প্যারিসে পৌছিব।

গাড়ী ছাড়িল। আমার কক্ষে আরও দুই তিনটি সহযাত্রী। অল্পক্ষণ পরেই নগরসীমা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র—মাঝে মাঝে কোনও গ্রামের গির্জ্জার উন্নত চূড়া, দুই চারিখানি শাদা বাড়ী দেখা যায়। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, যাহা আমাদের দেশ হইতে বিভিন্ন। গাড়ী চলিয়া যে শব্দটা হইতেছে, তাহা যেন টং টং করিতেছে। আমাদের দেশের মৃত্তিকা কোমল, প্রস্তরহীন। তাই শব্দটাও কোমল ! অনুমান করিলাম, এখানকার মৃত্তিকা প্রস্তরবহুল হওয়ার জন্য শব্দটা বোধ হয় ধাতব শুনা যায়।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আমার কামরায় কত লোক উঠিতে লাগিল, আবার নামিয়া যাইতে লাগিল। ফরাসী দেশের প্রথা অনুসারে তাহারা আসিয়াই আমাকে স্মিতমুখে অভিবাদন করে, নামিয়া

াইবার সময়ও অভিবাদন করে। কেহ কেহ বা আমাকে ক জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না। আন্দাজি ইংরাজিতে বলি—"আমি ভারতবর্ষ হইতে াসিতেছি।"—তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে না। অবশেষে উভয়ে হতাশভাবে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া থাকি।

ক্রমে বামে একটা ক্ষুদ্র নদী দেখা যাইতে লাগিল। একজন সহযাত্রীকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কোন্ নদী?" উত্তরে সে ব্যক্তি কি বলিল আমি কিছুই ঝিলাম না; আমার প্রশ্নও সে অনুমান করিতে পারে নাই বোধ হয়। গাড়ীতে একখানা মানচিত্র ছিল, তাহা হইতে ক্রমে আবিষ্কার করিলাম, নদীটি রোন্। নদীটির আকার দেখিয়া নিতান্ত অভক্তি হইল। কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি প্রস্থে যতটুকু, নদীটির প্রস্থ তাহার অপেক্ষা অধিক নহে। এই রোণ! এই নগণ্য নদীরই নাম বাল্যকালে ধস্থ করিয়া মরিয়াছি!

দিবা অবসান হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। একটি লকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া উঠিলেন। তিনি আমায় ফরাসীতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আন্দাজি ইংরাজিতে একটা উত্তর দিলাম। শুনিয়া তিনি ইংরাজিতে বলিলেন—"আপনি ইংরাজি কহেন? আমিও ইংরাজি একটু একটু জানি।"—দেখিলাম, তিনি ইংরাজি জানেন বটে, কিন্তু সৎসামান্য। কষ্টেস্পষ্টে, কোন মতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হন মাত্র। আমি ইংরাজের প্রজা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"The Queen of England is very very bad"—তখন বুঝিনাই যে তিনি মহারাণীর স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করিতেছেন। আমি যখন বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম তখন ভিক্টোরিয়া পীড়িত হন নাই। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়ায় সংবাদ আমরা সমুদ্রের উপর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, বৃদ্ধ বুঝি বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষ্যে মহারাণীর নিন্দা করিতেছেন।

সারাদিন, সারারাত্রি কাটিল। ভোর ছয়টার সময় ট্রেন প্যারিসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে, পথে পথে আলো জ্বালাইয়া প্যারিস তখনও নিদ্রিত। আমি উৎসুক হইয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। বড় যে সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, দেখি কেমন প্যারিস্! কিন্তু প্যারিস-বধূ তখন মুখখানির উপর কুয়াসার ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছিল, ভাল দেখা গেল না।

গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ইহা দক্ষিণ-প্যারিস। আমাকে পুনর্যাত্রা করিতে হইবে উত্তর-প্যারিস্ ষ্টেশন হইতে। সুতরাং নগরের অভ্যন্তর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমায় যাইতে হইবে। ভাবিয়াছিলাম, "কুক" আছে, চিন্তা কি? আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। ষ্টেশনে নামিয়া কুক্‌কে অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু কোথায় বা কুক্ কোথায় বা কে। সেই ভোরে—শীতে—আসিবার জন্য তাহার ত বহিয়া গিয়াছে।

কি করি? ইসারা করিয়া একজন মুটেকে ডাকিলাম। আমার টিকিটে লেখা ছিল Paris-Nord হইতে যাত্রা করিতে হইবে। জিনিষ দেখাইয়া মুটেকে বলিলাম—"পারী নর্দ"—বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীর দিকেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল। কোন্ দূর দেশ হইতে কোন্ বিদেশী আসিয়াছে—বোধ হয় তাহার একটু মায়া হইল। গাড়োয়ান পাছে আমায় ঠকাইয়া বেশী ভাড়া লয়, এই কারণে বোধ হয় সে নিজের পকেট হইতে একটি ফ্র্যাঙ্ক (আধুলির আকার, মূল্য দশ আনা) বাহির করিয়া, বাম হস্তের উপর রাখিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারায় তাহার উপর বারকতক টোকা দিয়া, আমাকে পঞ্চাঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। বুঝিলাম বলিতেছে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক ভাড়া লাগিবে। গাড়ীতে উঠিলাম। বখশিস্ করিয়া মুটেকে বিদায় দিলাম।

তখনও প্যারিস সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া নিদ্রামগ্ন। ক্বচিৎ কোথাও দুই একটি নরনারী বাহির হইয়াছে। বেশ দেখিয়াই বুঝা গেল, তাহারা দরিদ্র। বড় বড় দোকান, সব বন্ধ। পথগুলি আর্দ্র, বোধ করি রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকিবে। দুই একখানা ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা পরে উত্তর-ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

কুলি ডাকিয়া, ঘোড়ার গাড়ী বিদায় দিলাম। কুলি জিনিষ পত্র নামাইয়া আমায় কি বলিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"ক্যালে—লন্দ্রে"—অর্থাৎ ক্যালে হইয়া লণ্ডন

যাইব। সে আমার জিনিষগুলি তুলিয়া লইয়া, আমায় ইসারায় ডাকিয়া অগ্রসর হইল। একটা স্থানে লইয়া গেল, তাহা গুদামের মত। আমার জিনিষগুলা সেই গুদামে দিল। কর্ম্মচারী আমাকে একটি সংখ্যাঙ্কিত টিনের চাকতি দিল। বুঝিলাম, আমার জিনিষ জিম্বায় রাখিল, চাকতি খানি আমার নিদর্শন। অতঃপর কুলিটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"Neuf."

এ আবার কি বলে? আমি বুঝিতেছি না দেখিয়া সে আবার বলিল—"নোফ্ নোফ্"। আমি নিরাশ ভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলাম। তখন সে পকেট হইতে নিজের ঘড়িটি বাহির করিল। ছোট কাঁটাটা যেখানে ছিল, কাচের উপর সেই স্থানটায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। পরে, অঙ্গুলি কাচের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়া, নয়টার অঙ্কে গিয়া থামিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"Neuf"—বলিয়া, রেলগাড়ী ছাড়িলে এঞ্জিনে যেমন শব্দ হয়, নিজের মুখে সেইরূপ শব্দের অনুকরণ করিতে লাগিল—পফ্-পফ্-পফ্-পফ্। আমি হাসিয়া ফেলিলাম—বুঝিলাম নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িবে। সেও একটু হাসিয়া, কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

নিকটে একটা বেঞ্চি ছিল, তথায় উপবেশন করিলাম। কিন্তু শীতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। উঠিয়া একটু এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া, সহর বেড়াইতে সাহস হইল না—শেষে কি যাত্রা শুনিতে গিয়া নীলকমলের দশা হইবে? ষ্টেশনের বাহিরেই, রাস্তার ওপারে একটা খাদ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। কাচের জানালায় লেখা আছে—English is spoken here—দেখিয়া মনটা খুসী হইল। যাই, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি মাত্র যুবতী সেখানে বসিয়া আছে। বলিলাম—"আমায় একখানা রুটি, একটু মাখন আর কিছু ফল দাও।"—যুবতীটি ফরাসী ভাষায় কি বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কি ইংরাজি কহ না?" বলিয়া, তাহাদের কাচের জানালায় সেই লেখাটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। যুবতীটি একটু মৃদু হাস্য করিয়া ফরাসীতে আরও কি বলিল। তখন মনোভাব বিনিময় সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, ইসারায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম।

এ সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক গল্প বলি। একবার একজন জবরদস্ত জন বুল, প্যারিসে দোকানে এইরূপ লেখা দেখিয়া, জিনিষ কিনিতে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে স্ত্রী পুরুষ অনেক গুলি কর্ম্মচারী ছিল, কিন্তু কেহই এক বর্ণ ইংরাজি বুঝিল না। তখন জন বুল মহা খাপ্পা হইয়া হাঁক ডাক আরম্ভ করিল। গোলমাল শুনিয়া ক্রমে দোকানের মালিক উপর হইতে নামিয়া আসিল। কেবল সেই কিঞ্চিৎ ইংরাজি জানিত। জন বুল রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, আপনাদের কেমন ব্যবহার? দোকানের বাহিরে লিখিয়া রাখিয়াছেন 'এখানে ইংরাজি কথিত হয়'—কিন্তু দেখিতেছি আপনার কর্ম্মচারীরা কেহই ইংরাজি বুঝেনা!—কে ইংরাজি কহে আমি জানিতে চাই।" দোকানদার মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"কেন মহাশয়, এইত আপনিই ইংরাজি কহিতেছেন। আমাদের অনেক খরিদ্দারই আসিয়া ইংরাজি কহে। আমরা ত জানালায় এমন কথা লিখি নাই যে আমরা ইংরাজি কহিয়া থাকি।"—ন্যায়ের ফাঁকিতে জন বুল অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে কুলি আসিয়া আমায় গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল। আমার কামরায়; অন্যান্য লোকের সঙ্গে, একটি ফরাসী যুবতীও উঠিয়াছিল। তাহার গলায় একটি অতি সূক্ষ্ম শিফঁ বসনের রুমাল জড়ানো। গাড়ী ছাড়িলে, যুবতী সেই রুমালটিকে খুলিয়া সযত্নে গুটাইয়া গুটাইয়া একটি ফুলের মত করিল। করিয়া আবার গলায় পরিল। তাহার পর একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হইতে সে কিছু খাদ্য এবং একটি বোতল বাহির করিল। খায় আর মাঝে মাঝে বোতলে মুখ দিয়া মদ্য পান করে। ক্রমে সমস্ত বোতলটি পার করিয়া, জানালা গলাইয়া সেটি বাহিরে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখনকার দিনে আমি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলাম, মদ্য মাত্রকেই ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কির মত তীব্র মনে করিতাম। জানিতাম না, ফরাসীরা জলের পরিবর্ত্তে যে মদ্য ব্যবহার করে তাহা নিতান্তই লঘু। কোনও ষ্টেশনে পানীয় জলের কোনই বন্দোবস্ত দেখিলাম না। আমার সঙ্গে একটি গেলাস ছিল, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিবার অবসর পাই নাই। কমলা নেবু খাইয়াই সারাপথ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

বেলা ৩টার সময় ক্যালে বন্দরে পৌঁছিলাম। সেখানে মুটিয়ারা ইংরাজি কহিতে পারে, আর কোনও অসুবিধাই রহিল না।

ক্যালে হইতে ডোভার ২৬ মাইল। ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সমস্ত পথ কি বাতাস! ডেকের উপর দাঁড়াইলে যেন উড়াইয়া জলে ফেলিয়া দেয়।

সন্ধ্যা ৫টার সময় ডোভারে পৌঁছিলাম। ঘাটের উপরেই ট্রেন্ সজ্জিত ছিল। আরোহণ করিলাম। কলিকাতা হইতে যে পরিবারের নামে আমি পরিচয়পত্র আনিয়াছিলাম, লণ্ডনে যাঁহাদের গৃহে আমি অবস্থিতি করিব,—পূর্ব্ব হইতে পত্র লেখা ছিল যে ডোভারে পৌঁছিয়া আমার আগমনসংবাদ তাঁহাদিগকে তারযোগে জানাইব। গাড়ীতে উঠিলাম, ছাড়িবারও বেশী বিলম্ব নাই, তখন 'কোথায় তারঘর—কোথায় তারঘর' যদি অন্বেষণে বহির্গত হই, তবে হয় ত গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। সুতরাং সে সাহস করিলাম না। একটা মুটেকে বলিলাম—"দেখ, একটা টেলিগ্রাফ লিখিয়া দিতেছি—পাঠাইয়া আসিতে পার?"—সে বলিল, পারে। আমার কাছে খুচরা কিছুই ছিল না। টেলিগ্রামটি এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা (মূল্য ১৫৲) তাহাকে দিয়া বলিলাম—"সময় থাকিতে বাকী টাকা আমায় আনিয়া দিতে পারিবে ত?"—সে বলিল—"নিশ্চয়।"—বলিয়া ছুট দিল।

এ দিকে ট্রেন ছাড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। লোক-টাও আসে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম,—বড় বিষয়ে যাহাই হউক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইংলণ্ডের সাধারণ লোক অনেকটা সাধু। তাহারা সুবিধা পাইলে ব্যাঙ্ক ভাঙ্গে বটে কিন্তু দুই চারি টাকা চুরি করাটা অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করে। সেই সাহসেই আমি লোকটাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও আসে না কেন? দিল বুঝি ফাঁকি!—শেষ মুহূর্ত্তে দেখিলাম সে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বলিল ছয় পেনি লাগিয়াছে—বাকী সাড়ে উনিশ শিলিং আমায় গণিয়া দিল। আমি তাহাকে ছয় পেনি বখশিস্ করিয়া বিদায় দিলাম, ট্রেনও ছাড়িল।

লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রশ্ ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন ছয়টা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে। রাত্রি হইয়াছে। ষ্টেশনে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে। আর এত লোক দাঁড়াইয়া আছে—অসম্ভব জনতা। তখন ভাবিয়াছিলাম, প্রত্যহই বুঝি এইরূপ হয়।

পরে শুনিলাম, তাহার অল্পক্ষণ পরেই জর্ম্মণ-সম্রাটের পৌঁছিবার কথা ছিল, তিনি মহারাণীকে দেখিতে আসিতেছেন,—তাঁহারই প্রতীক্ষায় সেদিন ষ্টেশনে অত জনতা হইয়াছিল,—আমার প্রতীক্ষায় নহে।

একজন মুটিয়া আমার জিনিষপত্র একখানি ফোর-হুইলারে উঠাইয়া দিল। লণ্ডনে ক্যাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—হ্যানসম ও ফোর-হুইলার। হ্যানসমের মাত্র দুইখানি চাকা—দুই জন লোকের বসিবার স্থান, বেশ দ্রুত চলে। ফোর-হুইলারের চারি খানি চাকা, গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর, চারিজন লোকের বসিবার স্থান,—মালপত্র বেশী থাকিলে ফোর-হুইলারেই সুবিধা। গাড়ী লণ্ডনের জনসংঘ ভেদ করিয়া ছুটিল। আমি দুই পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, অর্দ্ধ ঘণ্টায়, ঠিকানায় পৌঁছিলাম।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়োয়ানকে বলিলাম:—"নামিয়া বাড়ীর লোককে ডাক—আমার এই কার্ড লও।"—গাড়োয়ান নামিয়া দরজায় "নকার" ঠক ঠক করিতে লাগিল। দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল—কার্ড লইয়া গেল। কার্ড পাইয়া, বাড়ীর সকলে একবাবে সদলে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল। একটি যবক, দুইটি যুবতী ও একজন প্রবীণাকে দেখিলাম। তাঁহাদের ড্রয়িং রুমে গিয়া বসিলাম। একটি যুবতী বলিলেন—"ষ্টেশনে বাবার সঙ্গে দেখা হয় নাই? তিনি যে আপনাকে আনিতে গিয়াছেন"?

আমি বলিলাম—"কৈ না—কাহারও সহিত ত দেখা হয় নাই।"

"আপনি কয়টার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?"

"পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের গাড়ীতে।"

"তবে যে ডোভাব হইতে আপনি টেলিগ্রাম করিয়া-ছিলেন 'ছয়টার সময় আজি পৌঁছিব?' তাইত বাবা আপনাকে miss করিয়াছেন।"

পাঁচ—টা—পঞ্চা—শ—মিনিট আবার কে লেখে, আমি সোজা সুজি ছয়টা লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমাকে কেহ ষ্টেশনে আনিতে যাইবেন ইহা আমাব উদ্দেশ্যও ছিল না,—

আমি যে আসিতেছি এই সংবাদটা মাত্র দিয়াছিলাম। আর, কেহ যদি ষ্টেশনেই আসেন, তিনি মিনিট হিসাব করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিবেন তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব?—আমরা হইলে ত আধঘণ্টা আগে ষ্টেশনে আসিয়া থাকি।

আমি বলিলাম—"তিনি কেন কষ্ট করিয়া ষ্টেশনে গেলেন!"—ইত্যাদি রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গৃহকর্ত্তা ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ষ্টেশনে আমায় অনেক খুঁজিয়া, অবশেষে হুতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গৃহকর্ত্তার আকার খর্ব্ব, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার নাম ডাক্তার অ,—তিনি ঔষধের ডাক্তার নহেন, একজন H. D. উপাধিধারী। ইনি জাতিতে জর্ম্মান্ কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছেন, ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সরস্বতী ইহাঁকে যে পরিমাণে কৃপা করিয়াছেন, কমলা সে পরিমাণ করেন নাই। ইনি পূর্ব্বে Royal Naval Collegeএ জর্ম্মান্ ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষক হইয়া এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইহাঁর জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়।*

ইহাঁর এক পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রটি বিবাহিত,—চাকরি করেন,—স্থানান্তরে থাকেন। প্রতি রবিবার মধ্যাহ্ন কালে সস্ত্রীক আসিয়া পিতা-মাতা ভগিনীর সহিত সারা দিবস অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পর নিজ গৃহে ফিরিয়া যান। যে যুবকটির উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই পুত্র। যুবতী দুইটি একটি তাঁহার পত্নী, একটি ভগিনী। ডাক্তার অ—র কনিষ্ঠা কন্যাটি সে সময়ে জর্ম্মানীতে ছিলেন।

যাহা হউক, তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। সে দিনটি গৃহিণীর জন্মদিন ছিল। পরে, অনেক সময়ে, আমাকে দেখাইয়া তিনি লোককে বলিতেন—"He is my birth-day present from L—" (আমি ল—মহাশয়ের নিকট হইতেই ইহাঁদের নিকট পরিচয় পত্র লইয়া গিয়াছিলাম)

পরদিন ২১শে জানুয়ারি—প্রাতরাশের পর আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম "আমাকে শীঘ্রই ভর্ত্তি হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয়ের নিকট আমার পরিচয়পত্র আছে, তিনি আমাকে ভর্ত্তি হইতে সাহায্য করিবেন। তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করা আবশ্যক। তাঁহাকে আপনারা জানেন কি?"

তাঁহারা বলিলেন—"খুব জানি। এখান হইতে বেশী দূর নহে। তিনি ৮২নং টলবট্ রোডে থাকেন।" বলিয়া লণ্ডনের একখানি মানচিত্র বাহির করিলেন। বলিলেন—"এই দেখ Regent's Canal ইহার ধারে এই Blomfield Road যেখানে আমার বাড়ী। এই পথে গিয়া এইখানে আসিয়া সেতু। সেই সেতু পার হইয়া বরাবর এই পথে যাইবে। বামে এই Royal Oak Station থাকিবে। আর একটু গিয়া এই দেখ Talbot Road সুরু হইয়াছে। মোড়ের উপর এই যে † চিহ্ন রহিয়াছে, এটা গির্জ্জা। এই পথে গিয়া ৮২নং বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে না?"

"খুব পারিব।" বলিয়া কাগজে ম্যাপের সেই অংশটা আঁকিয়া, বাহির হইলাম।

তখন বেলা সাড়ে নয়টা হইবে। সূর্য্যদেবের চিহ্নমাত্রও নাই। অল্প অল্প কুয়াসা। পথে যাইতেছি, এমন সময় এক দীনবেশিনী বৃদ্ধা আমাকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"Are you an African subject of Her Majesty?"

আমি বলিলাম—"না। আমি ভারতবর্ষীয় প্রজা।"

বৃদ্ধা বলিল—"Poor old lady! She is very ill."

---

* এই বৃদ্ধ অদ্যাবধি জীবিত আছেন। এখন তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর। জীবনের সায়ংকালে তাঁহার অদৃষ্টে একটি বিশেষ সম্মান লাভ হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট, প্রিন্স অব ওয়েলসের দুইটি পুত্র এখন ইহাঁর নিকট জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। একদিন কুমারদ্বয়, বিনা সংবাদে, হঠাৎ দরিদ্র আচার্য্যের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার নিকট হইতে সম্প্রতি আমি যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে এই বিষয়টির বর্ণনায় লেখা আছে—Last year they came here one Sunday for a surprise visit, just two dear little boys who played with the dogs and asked all sorts of questions like Gibby Flemming or any other natural boy. I have an autograph letter from the elder about one of my stories in the "Crown," which he liked, about the garden and a thrush and a big cherry; have dedicated one of my books to the Prince of Wales' children by permission and am allowed to send them my books and always get nice letters of thanks.

আমার দেহবর্ণটি কালো বটে—কিন্তু তবু কি আমি নিগ্রো বলিয়া ভ্রান্ত হইবার যোগ্য? মনে মনে বুড়ীর উপর আমি মহা চটিয়া গেলাম। পরে জানিয়াছিলাম,—আমরা পরস্পরের মধ্যে যে গৌর-শ্যামের প্রভেদ করি,—তাহারা অতটা লক্ষ্য করিতে পারে না। সেটা দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে যদি তদ্দেশীয়কে কখনও বলিতাম—"আমার বন্ধু অমুকের অপেক্ষা অমুক অনেক ফর্সা নহেন কি?" তাঁহারা বলিতেন—"কৈ, আমরা ত বুঝিতে পারি না।" তাঁহাদের দোষ দিব কি, আমি যখন প্রথম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম—তখন, যে সকল লোক আমাদের মধ্যে খুবই গৌরবর্ণ, তাহাদিগকেও কালো মনে হইত। শাদা রঙের ঘোর চোখে এমনি লাগিয়া গিয়াছিল, যে, সকলকে বেবাক্ কালো মনে হইত। তবে বেশী কালো অল্প কালো তফাৎ করিতে পারিতাম বটে। লোককে জিজ্ঞাসা করিতাম—"আচ্ছা অমুক ত খুব গৌরবর্ণ ছিল, এত কালো হইয়া গেল কি করিয়া?—উত্তর পাইতাম—"কালো হইবে কেন? যেমন ছিল তেমনিই ত আছে।"—আমার দৃষ্টিশক্তির এইরূপ বিকৃতি কাটিতে দুই তিন মাস লাগিয়াছিল।

বাড়ীর নম্বর ধরিয়া আমি ত ৮২ নম্বরে উপস্থিত হইলাম। "নক" করিতে দাসী আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"Is Mr. Dutt in, please?"

দাসী বলিল—"Junior or senior?"

আমি তখন জানিতাম না যে দত্ত মহাশয়ের পুত্রও ঐ বাটীতে থাকেন। আমি বলিলাম—"Senior"

দাসী আমাকে সঙ্গে করিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল।

এই ভারতগৌরব মহাপুরুষকে আমি তৎপূর্ব্বে কখনও চাক্ষুষ দেখি নাই। আমি প্রবেশ করিবামাত্র দত্ত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, তখন তিনি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া, লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার টেবিলের উপর নানা পুস্তক, পার্লামেণ্টের ব্লুবুক উদ্‌ঘাটিত। তখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত Economic History of British India গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—"আপনি কোন্ innএ ভর্ত্তি হইবেন স্থির করিয়াছেন?"

"আমি ত কিছুই স্থির করি নাই। আপনি কি বলেন?"

"ও সকলগুলিরই সমান মর্য্যাদা। তবে, আমাদের দেশের অনেকেই Middle Templeএর অন্তর্ভুক্ত। আমিও Middle Temple."

আমি বলিলাম—"তবে আমিও Middle Templeএ ভর্ত্তি হইব। কি করিতে হইবে?"

"দুই জন ব্যারিষ্টারের সহি করা প্রস্তাবপত্র চাই।"

"আমি ত কাহাকেও চিনি না।"

"আমি Middle Templeএর একজন ব্যারিষ্টারের নামে অনুরোধ পত্র দিতেছি। তিনি নিজে সহি করিয়া দিবেন এবং সেখানে অনেক ব্যারিষ্টার আছে, আর কাহাকেও দিয়া একটা সহি করাইয়া লইবেন। আপনি Middle Templeএ যাইতে পারিবেন?"

"ক্যাব লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারি।"

দত্ত মহাশয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিলেন। পরে বলিলেন—"Busএ যাইলে দুই তিন পেনিতে হইবে, অনর্থক কেন দুই তিন শিলিং খরচ করিবেন?* আচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি।"

বলিয়া তিনি একখানি অনুরোধপত্র লিখিলেন। লিখিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি তখনও নিদ্রিত। তখন দত্ত মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা—আসুন, আর একজনকে সঙ্গে দিতেছি।" বলিয়া আমাকে লইয়া বাহির হইলেন।

দুই তিন মিনিটের পর আমরা অন্য একটি বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বাস করিতেন। তিনিও আইনশিক্ষার্থী।

* বড়লোক হইয়াও কি প্রকার মিতব্যয়ী হওয়া যায়, দত্ত মহাশয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। পরে, একবার তিনি Canning Townএ একটি বক্তৃতা দিবার সময়, আমাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন—বাড়ী হইতে যেন আমি পথে লাঞ্চের জন্য কিছু Sandwiches প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, কারণ ভোজনশালায় অধিক ব্যয়। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন I don't believe in throwing away good money. বিলাতে অনেক সময়ে দত্ত মহাশয়কে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, সেই যুবক আমাকে লইয়া াহির হইলেন।

কয়েক মিনিট পদব্রজে যাইবার পর, Electric Tube ailwayর একটি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। দুই পেনি য়া এক একখানি টিকিট কিনিয়া, আমরা একটি সুবৃহৎ াচার (lift) মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার মধ্যে আরও নেরো বিশ জন লোক। বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে। একজন রবান তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। লোক ভর্ত্তি হইলে, াচার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া, সে ব্যক্তি একটা কল টিপিল। াচাটা তৎক্ষণাৎ হু হু করিয়া, ভূগর্ভে অবতরণ করিতে াগিল। প্রায় চল্লিশ হাত এইরূপ নামিয়া, থামিয়া গেল। রবান, খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা বাহির হইয়া খিলাম, একটা ষ্টেশনের আকার। নানা স্থানে বিদ্যুৎ ালোক জ্বলিতেছে। যাত্রিগণ ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বমান। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খবরের কাগজের দোকানও াছে। লোকের আপিস যাইবার সময়। এই সময়টা দুই ন মিনিট অন্তর একখানা করিয়া গাড়ী আসে। খবরের াগজ বিক্রেতা বালক রাশি রাশি কাগজ বিক্রয় করিতেছে। াৎ কোন কাযে সে কোথায় গেল। তাহার দোকান রক্ষিত পড়িয়া রহিল। সেই সময়টুকুতেও যাত্রিগণ টকাটক বরের কাগজ তুলিয়া লইয়া, সেই টেবিলের উপর পেনি লিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বালক ফিরিয়া াসিয়া, তাহার অনুপস্থিতিতে বিক্রীত কাগজের পেনিগুলি ড় করিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। ইহাতে শ্রেণী ভাগ নাই। সবগুলি গাড়ীই প্রথম শ্রেণীর তুল্য। দূরত্ব ুসারে ভাড়ারও তারতম্য নাই। একটা ষ্টেশন গেলেও ই পেনি, পাঁচটা ষ্টেশন গেলেও দুই পেনি, সারাপথ গেলেও াহাই।

এই tube railwayটি লণ্ডনের এক প্রান্ত Shepherd's ush হইতে অপর প্রান্ত Bank পর্য্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে নেকগুলি ষ্টেশন আছে। আমরা Chancery Lane শনে নামিলাম। আবার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া, ধরাপৃষ্ঠে নীত হইলাম। বাহির হইয়া যেখানটায় পড়িলাম, তাহার ম Holborn—এই খানেই প্রথম লণ্ডনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিলাম। গত রাত্রে বাড়ী যাইবার পথে লণ্ডনকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। অদ্য প্রাতে, আমাদের বাড়ী হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী এবং তথা হইতে ষ্টেশন, যে অংশ দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। দেখিলাম —হবর্ণের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া মোটর কার ছুটিয়াছে, বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। হাঁ--এই লণ্ডনের খ্যাতির উপযুক্ত "ট্র্যাফিক" বটে। কলিকাতায় এরূপ দেখি নাই—বোম্বাইয়ে এরূপ দেখি নাই। আমি বিস্মিত নেত্রে লণ্ডনের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

রাস্তা পার হইয়াই চান্সেরি লেন। মোড়ের উপরই একটা ভোজনশালা আছে—তাহার নাম British Tea Table Co.--ভাবিলাম, এইটা চিহ্ন রহিল। যখন একাকী আসিব, চান্সেরি লেন খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।—গল্প আছে, থানায় গিয়া এক ব্যক্তি নালিস করিল,—"দারোগা বাবু, বাজারে জিনষ কিনিতে গিয়াছিলাম, দোকানদার আমার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।"

"কার দোকান?"

"তাত জানি না হুজুর।"

"দোকান চিনাইয়া দিতে পারিবি?"

"খুব পারিব। সেই দোকানের সামনে একটা কালো গোরু শুইয়া আছে।"

পরে দেখিলাম, আমার চিহ্ন স্থাপনও তদ্রূপ। লণ্ডন সহরে নানা স্থানে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশটা বৃটিশ টী টেব্‌ল কোম্পানির দোকান আছে;—সমস্ত দোকান গুলির সম্মুখ ভাগই ঠিক একই প্রকার, যেন ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত।

চান্সেরি লেন পার হইয়া ফ্লীট ষ্ট্রীটে পড়িলাম। সেখানেই Middle Temple Lane—একটি সরু গলির মত। প্রবেশ দ্বারে দ্বারবান দণ্ডায়মান। ওক কাষ্ঠ নির্ম্মিত, বিপুল কবাট যুগল এখন খোলা, রাত্রে বন্ধ করিয়া দিবে। Middle Temple অনেকটা স্থান জুড়িয়া,— ইহার মধ্যে অনেক ব্যারিষ্টার বা ছাত্রের বাস করার উপযোগী গৃহাদি আছে। ব্যারিষ্টারগণের কার্য্যালয় বা চেম্বার্স আছে। তাহা ছাড়া আফিসাদি, লাইব্রেরি, ডাইনিংহল, বিশ্রামাদি করিবার কমন রূম প্রভৃতি আছে। বাড়ীগুলি সংখ্যাকৃত, রাস্তা গুলি নামাঙ্কিত। স্থানে স্থানে

চত্বরাকৃতি খোলা স্থান আছে, তাহার নাম Court—ডিকেন্স কর্তৃক অমরীকৃত Fountain Court * এর নিকট দিয়া, আমরা সেই ব্যারিষ্টারের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম।

সেখানে গিয়া শুনা গেল, ভদ্রলোকটি কোথায় গিয়াছেন, বৈকাল চারিটার সময় ফিরিবেন। আমার সঙ্গী বলিলেন—"আপনি এখন কি করিবেন ?"

"অপেক্ষা করিব। ভর্ত্তি হইবার জন্য, একটা ব্যাঙ্কের উপর দেড়শত পাউণ্ডের ড্রাফ্‌ট্ আছে, ইতিমধ্যে সেইটা অনুগ্রহ করিয়া ভাঙ্গাইয়া দিন।"

তিনি ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া আমার ড্রাফ্‌ট্ ভাঙ্গাইয়া দিলেন। ফ্লীটষ্ট্রীটগামী অম্‌নিবসে আমায় উঠাইয়া দিয়া, তিনি বাসায় ফিরিলেন।

আমি আবার Middle Templeএ ফিরিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

চারিটা বাজিল, তথাপি ভদ্রলোকটি ফিরিলেন না। এদিকে সন্ধ্যা হইতেও আর বিলম্ব নাই। সুতরাং আমি গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইলাম।

চান্সেরি লেন পার হইয়া, হবর্ণে আসিলাম। দেখিলাম একটা অমনিবস যাইতেছে, তাহার গাত্রে, অন্যান্য স্থানসহ Royal Oak অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ করিলাম। ভাবিলাম, রয়াল ওক ষ্টেশন ত অদ্য প্রভাতেই দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে পৌছিয়া ঠিক বাড়ী চিনিয়া যাইতে পারিব।

রয়াল ওক বলিয়া যেখানে আমায় নামাইয়া দিল, দেখিলাম তাহা একেবারেই অদৃষ্টপূর্ব্ব। সে ষ্টেশনও নাই, কিছুই নাই। লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "রয়াল ওক কোথা ?" তাহারা একটা বৃহৎ বাড়ী দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, সে বাড়ীর উপর রয়াল ওক লেখা রহিয়াছে বটে—তাহা একটা পানশালা। সেই পানশালার নাম অনুসারেই তাহার কিয়দ্দূরে অবস্থিত ষ্টেশনের নামও রয়াল ওক হইয়াছে। উত্তম পরিচয় বটে। বিলাতে অনেক সময়, পানশালার নাম অনুসারেই সেই অঞ্চলটা পরিচিত হয়। নামও অদ্ভুত অদ্ভুত আছে। একবার একজন হাস্যরসিক, অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া চালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আমাকে Paradise এ লইয়া যাইতে পার?" চালক উত্তর দিল—" I can't take you to Paradise but I can take you to the Angel"—বলা বাহুল্য, Angel একটি পানশালার নাম, তদভিমুখ অম্‌নিবস গুলিতে Angel বলিয়াই গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকে।

অনেক জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, দশমিনিটের স্থানে অর্দ্ধঘণ্টায় গৃহে পৌছিলাম।

পরদিন প্রভাতে আবার গিয়া দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তাই ত!"

আমি বলিলাম—"আর ত সময়ও নাই। আজ ২২শে—নয়দিন পরে টার্ম শেষ হইবে। ইতিমধ্যে আমাকে ছয়টা ডিনার খাইতে হইবে।* কি করা যায় ?"

দত্ত মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন—"All right, I will beard the lion myself—চল।"

পথে বলিলেন—"দুইজন ব্যারিষ্টারের সহি চাই। আমিও ত একজন ব্যারিষ্টার। কিন্তু ত্রিশ বৎসর মধ্যে প্র্যাকটিস না করিলে নাম কাটিয়া দেয়। আমার নাম কাটিয়াছে কি না তাহা ত জানি না। কি জানি, যদি Prof. Murisonএর সাক্ষাৎ না—ই পাওয়া যায়। চল, মিস্ ম্যানিং এর নিকট হইতে আর কোনও ব্যারিষ্টারের নামে এক খানা চিঠি লওয়া যাউক।" মিস ম্যানিংএর বাড়ী নিকটেই ছিল।† দত্ত মহাশয় তাঁহার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিলেন। চিঠি পাওয়া গেল।

---

* ডিকেন্স Middle Templeএর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার Martin Chuzzlewit নামক উপন্যাসে, Tom Pinchএর ভগিনী Ruth বৈকালে আসিয়া এই Fountian Courtএর নিকট ভ্রাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেন। আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া Tom Pinch সন্ধ্যাবেলা বাহির হইতেন, এবং ভগ্নীর সহিত একত্র হইয়া গৃহে ফিরিতেন।

* ব্যারিষ্টার হইতে হইলে, শুধু পরীক্ষা পাস করিলেই খালাস নয়। প্রত্যেক টার্মে অন্ততঃ ছয়টা করিয়া ডিনার খাইতে হইবে। এইরূপ ১২টা টার্ম যে রাখিয়াছে এবং সমস্ত পরীক্ষা যে পাস করিয়াছে, সেই ব্যারিষ্টার হইতে পায়। অনেক লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, ব্যারিষ্টার হইতে হইলে "খানা দিতে" হয়। দিতে হয় না, খাইতে হয়। তবে খাইতে মূল্য লাগে বটে। বৎসরে চারিটা করিয়া টার্ম।

† আমি স্থানান্তরে লিখিয়াছি—"সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস্ ম্যানিং লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননী-স্বরূপা।...তাঁহাদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ।

ঠিকানা অনুসারে দত্ত মহাশয় আমায় লইয়া গিয়া, সহি করাইয়া লইলেন। সেখানে Law Directory হইতে জানা গেল, দত্ত মহাশয়ের নাম তখনও কাটে নাই—সুতরাং দ্বিতীয় সহিটি তিনি নিজেই করিলেন। প্রস্তাবপত্র সহ আমাকে Middle Templeএর আফিসে লইয়া গেলেন।

কোন পাব্লিক পরীক্ষায় পাস করা না থাকিলে, ভর্ত্তি হইবার সময় একটা পরীক্ষা দিতে হয়। সেই কারণে আমি আমার বি এ উপাধির ডিপ্লোমাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আফিসের অধ্যক্ষ সাহেব, আমার সার্টিফিকেট এবং আবেদন পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—"সার্টিফিকেটে রহিয়াছে মুখোপাধ্যায়, আবেদন পত্রে দেখি মুখার্জি!"

দত্ত মহাশয় বলিলেন—"ও একই। কোন তফাৎ নাই।"

তথাপি সাহেবের সন্দেহ যায় না। দত্ত মহাশয় অনেক করিয়া বুঝাইতে, তখন সন্দেহ মিটিল। নব্বই পাউণ্ড দিয়া ভর্ত্তি হইলাম।*

তখন বেলা ১২টা। দত্ত মহাশয়কে বহু ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"আমি এই খানেই থাকি। খানা খাইয়া গৃহে ফিরিব।" দত্ত মহাশয় প্রস্থান করিলেন। আমি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল। বহির্দ্দেশ অত্যন্ত পুরাতন, কৃষ্ণবর্ণ। প্রত্যেক বাড়ীতে বহুসংখ্যক ব্যারিষ্টারের চেম্বার্স আছে। দ্বারদেশে ব্যারিষ্টারগণের নাম এবং কক্ষের সংখ্যা লেখা আছে। কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ গুলিও সুন্দর নহে। যিনি যত বড়ই ব্যারিষ্টার হউন না,—নিজ বাসগৃহকে তিনি ইন্দ্রালয় করিয়া সাজাইলেও, আপিস কক্ষ ধূলি ধুসরিতই থাকিবে। যাহার আপিসের কার্পেট অত্যন্ত পুরাতন বিবর্ণ ও ছিন্ন নহে, সে ভাল ব্যারিষ্টারই নয়। যাহার আসবাব পত্র চক্ চক্ করিতেছে তাহাকে বিপজ্জনক নূতন ব্যারিষ্টার জ্ঞানে মক্কেল শতহস্তেন তফাৎ থাকিবে। এইত কক্ষগুলির পারিপাট্য—তাহার উপর আবার অনেক গুলি প্রায়ান্ধকার—দিনের বেলায় আলো জ্বালিতে হয়। ডিকেন্সের পাঠকগণ এই সকল চেম্বার্সের অবিকল বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। Pickwick Papersএ এক স্থানে একটা "ভূতো" চেম্বার্সেরও উল্লেখ আছে। একজন ব্যারিষ্টারের চেম্বার্সে একটা বহুপুরাতন, দেওয়ালে কাটা কবার্ড ছিল। সেটাকে তিনি কোনও দিন খোলেন নাই। একদিন রাত্রে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পানের পর, ব্যারিষ্টার মহাশয় সেই কবার্ড খুলিয়া দেখেন,—তাহার মধ্যে একটা নরকঙ্কাল। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে হে তুমি?"

"আমি কেউ না—একজন ভূত।"

"ভূত!—এখানে কি করছ?"

"এইটাই আমার চেম্বার্স ছিল কিনা। আমিও ব্যারিষ্টার ছিলাম। অনশনক্লেশ আর সহ্য করতে না পেরে, কাউকে না বলে কয়ে, একদিন এইটের মধ্যে ঢুকে আত্মহত্যা করেছিলাম।"

ব্যারিষ্টারটি একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"তা বেশ করেছিলে। কিন্তু একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি! লণ্ডনে এখন এই দারুণ শীত, ভয়ানক কুয়াসা, সূর্য্যের মুখ দেখবার যো নেই, যারা বড় মানুষ, কেউ ইটালীতে কেউ দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়ে আরাম উপভোগ করছে। তোমাদের ত যাতায়াতে সিকি পয়সা খরচ নেই—তা শুধু তোমায় বলছিনে, তোমরা সকলেই, যত অন্ধকার আর গলিঘুঁজি আর খারাপ জায়গায় থাকতে কেন ভালবাস বল দেখি? মিছে কেন কষ্ট পাও?"

ভূত শুনিয়া বলিল—"ওহো হো—ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ! ওটা এতদিন আমার মনেই হয় নি!"—বলিয়া হুস করিয়া উড়িয়া কোথায় সে চলিয়া গেল।

মিডল্ টেম্পল এবং ইনার টেম্পল্ পরস্পর সংলগ্ন, ব্যবধানবিহীন। কবিবর চসার মিডল্ টেম্প্লের ছাত্র ছিলেন। চার্লস ল্যাম্ব মিডল্ টেম্প্লেই জন্মগ্রহণ করেন, এবং সাত বৎসর বয়স অবধি এখানে বাস করিয়াছিলেন। Brick Court নামক অংশে গোল্ডস্মিথ অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনারটেম্পেল্ তাঁহার সমাধি আছে। মিডল্ টেম্পেলর ভোজনাগার

বিপদে আপদে শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন।" কিন্তু ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকপ্রাপ্ত।

* ভর্ত্তি হইবার সময় এই টাকা এবং বাহির হইবার সময় ৬০ পাউণ্ড লাগে। মাঝে আর কিছুই দিতে হয় না।

লণ্ডনের মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেক্সপিয়ারের Twelfth Night নাটক এই স্থলেই প্রথম অভিনীত হয়। এই হল এবং লাইব্রেরীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বিখ্যাত Temple Gardens—এই বাগান ক্রিশান্থেমস্ (গোদাবরী) ফুলের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে এ বাগান গোলাপ ফুলের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখনকার লণ্ডনের বায়ু কয়লার ধূমে এত বিষাক্ত যে গোলাপ আর ফুটে না। সেক্সপিয়র তাঁহার ষষ্ঠ হেনরি নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন, প্ল্যাণ্টাজেনেট এবং সমরসেটের মধ্যে টেম্প্লের ভোজনাগারেই বিবাদ বাধিল, পরে তাঁহারা বাগানে আসিয়া শ্বেত ও রক্ত গোলাপ তুলিয়া লইয়া ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিলেন।*

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইলে, বাহিরে গিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আসিলাম। তৎপরে লাইব্রেরীতে বসিয়া ছয়টা অবধি কাটাইলাম।

ছয়টার সময় ডিনার। গাউন পরিয়া ভোজনে বসিতে হয়। হলেই এই গাউন ভাড়া পাওয়া যায়;—এক টার্ম্মের ভাড়া দুই শিলিং মাত্র। দুই শিলিং দিয়া প্রতিবার ডিনারের টিকিট খরিদ করিতে হয়।

হলের অপর প্রান্তে, উচ্চ বেদিকায়, বেঞ্চারগণের বসিবার স্থান। নিম্নে, কক্ষের আড়ভাবে, লম্বা টেবেল, তাহা Ancients গণের জন্য অর্থাৎ প্রাচীন ব্যারিষ্টারগণ তথায় বসিবেন। ইদানীং মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সেখানে বসিয়া ভোজন করিতে দেখিয়াছি। দেওয়ালের কাছ ঘেঁসিয়া লম্বভাবে দুইটি সারি ছাত্র ও সাধারণ ব্যারিষ্টার গণের জন্য। বেঞ্চে বসিতে হয়। চারি জন মিলিয়া একটি করিয়া mess গঠিত হয়। দুই জন দেওয়ালের দিকের বেঞ্চে, দুইজন তাঁহাদের সম্মুখে অপর অপর দিকের বেঞ্চে উপবেশন করেন। যিনি দেওয়ালের দিকে আছেন অথচ বেঞ্চারগণের বসিবার স্থানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তিনিই হইলেন ক্যাপ্টেন। খানা আরম্ভ হইলে তিনি অপর তিন জনকে জিজ্ঞাসা করেন, "what wines shall we order, gentlemen?" শ্যাম্পেন অথবা অন্য কোনও মূল্যবান মদ্য হইলে, এক বোতল, ক্লারেট প্রভৃতি হইলে দুই বোতল, চারি জনের বরাদ্দ। তাহা ছাড়া, বিয়র মদ্য যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া হয়। বরাদ্দ মদ্যের অতিরিক্ত চাহিলে, মূল্য দিতে হয়। ভোজনের মধ্যভাগে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করার নিয়ম আছে। যিনি মদ্যপান করেন না, তাহাকে জলের দ্বারাই স্বাস্থ্যপান করিতে হইবে—যদিও জলের দ্বারা স্বাস্থ্য পানটা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। ভোজনকাল ছয়টা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত। সাধারণ দিনে, ভোজনান্তে ধূমপানের নিয়ম নাই। তবে প্রতি টার্ম্মে দুইটি বিশেষ দিন আছে তাহা Grand Night এবং Call Night। এই দুই রাত্রে "ভূরিভোজন"—মদ্যের বরাদ্দও দ্বিগুণ,—এবং বেঞ্চারগণ প্রস্থান করিলে, ধূমপান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে Grand Night এও পারা যাইত না। কিন্তু একরাত্রে বর্ত্তমান সম্রাট—তখন প্রিন্স অব্ অয়েলস, উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভোজনান্তে একটি চুরুট ধরাইলেন এবং বেঞ্চারগণকেও নিজ চুরুট উপহার দিলেন। তখন বেঞ্চারগণ মহা বিপদে পড়িলেন। "নিয়মের সম্মান রাখিব না রাজপুত্রের সম্মান রাখিব"—এই দ্বিধায় পড়িয়া তাঁহারা শ্যামই রাখিলেন। সেই অবধি Grand Night এ এবং Call Nightএ ধূমপান আর নিষিদ্ধ রহিল না।

বর্ত্তমান সম্রাট মিডল্ টেম্প্‌লের একজন ব্যারিষ্টার। তাঁহাকে পরীক্ষাও দিতে হয় নাই এবং টার্ম্মও রাখিতে হয়

* *Suffolk.*
Within the Temple hall we were too loud.
The garden here is more convenient. ... ...
Plantagenet
Let him that is a true-born gentleman,
And stands upon the honour of his birth,
If he suppose that I have pleaded truth,
From off this briar pluck a white rose with me.
Somerset.
Let him that is no coward, nor no flatterer,
But dare maintain the party of the truth,
Pluck a red rose from off this thorn with me.
* * * * *
Warwick.
This brawl to-day,
Grown to this faction in the Temple Gardens,
Shall send, between the red rose and the white,
A thousand souls to death and deadly night.
First Part of Henry VI. Act II, Scene 4.

ই। তবে রীতিমত তাঁহাকে call করা হইয়াছিল। দিন তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন সেই দিনই তাঁহাকে কারও মনোনীত করা হইল। আইন ব্যবসায়ীর ভোজাদি সবে যখন স্বাস্থ্য পানের জন্য রাজার নাম প্রস্তাব করা তখন বলা হয়—"The King, Bencher of the iddle Temple and Barrister-at-Law."

গ্র্যাণ্ড নাইটে প্রায়ই বেঞ্চারগণ বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ রিয়া আনিয়া থাকেন। সে রাত্রে রাজার স্বাস্থ্যপান রিতে হয়—এই কারণেই সেই রাত্রে দুই বোতল শ্যাম্পেন াদ্দ—কারণ রাজস্বাস্থ্য শ্যাম্পেন ভিন্ন অন্য মদে পান করা িষিদ্ধ। যথা সময় উপস্থিত হইলে, একজন কর্ম্মচারী একটা ঠের হাতুড়ী লইয়া তিনবার টেবিলে ঠুকিয়া শব্দ করে। র বলে—Gentlemen, charge your glasses.—ান সকলে, গেলাস হাতে ধরিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। ি প্রধান বেঞ্চার, তিনি বলেন—"The King"—ইহা ণ মাত্র হলশুদ্ধ লোক সমস্বরে বলিয়া উঠে "The King" ং গেলাস একবার উচ্চে উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ নামাইয়া, পান র। ইহা ছাড়া, Grand Nightএ, loving cup পান িবারও রীতি আছে। সে একটা বৃহৎ রৌপ্য পাত্র। হাতে নানাবিধ মদ্য নির্ম্মিত লাল রঙের একটা কি পদার্থ ক। পাত্রটির দুইটা আঙটা। সেই একই পাত্র হইতে লকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান কবিতে হয়। এটি বহু ীন প্রথা। এই প্রথা হইতেই, দুই জনে এক পাত্র ত পান করিলে তাহাকে loving cup বলা হয়।

এই প্রথম রাত্রে, আমরা যে সময় খানায় ব্যাপৃত াম, সেই সময় ইংলণ্ডের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় া উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন আমরা কিছুই জানিতে িলাম না। ছয়টা ত্রিশ মিনিটে, Isle of Wight এ রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণবিয়োগ হইল। খানার আরম্ভে বে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা (Grace) বলা হইয়া থাকে। সে দিনও, সাতটার সময় যখন খানা শেষ হইল, তখন প্রধান বেঞ্চার দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন। তাহার মধ্যে ছিল God Save the Queen—কিন্তু তখন Queen নাই—King—এ কথা তখন লণ্ডনের সকলেই জানিতে পারিয়াছে —কেবল আমরাই অজ্ঞ ছিলাম।* ভোজনান্তে বাহির হইলাম। ফটকের বাহিরেই ফ্লীট ষ্ট্রীট—সেখানে পড়িয়াই দেখিলাম, কাগজ বিক্রেতা বালকগণ, যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে, চাপা গলায়, বলিতেছে—The Queen's dead—আর হাজারে হাজারে কাগজ বিক্রয় করিতেছে। আমি অর্দ্ধ পেনি দিয়া একখানি Evening News কিনিয়া লইলাম।

বাড়ী পৌছিলে দেখিলাম, তাঁহারা তখনও শুনেন নাই। ড্রয়িংরুমে মহিলারা ছিলেন, সেই খানেই আমি সংবাদটা বলিলাম। কুমারী অ—আমাকে বলিলেন—"আপনি গিয়া বাবাকে বলুন—I am sorry to inform you, Doctor, that the Queen is dead"—কিরূপ ভাষায় বলিতে হইবে, তাহাও আমায় শিখাইয়া দিলেন;—বোধ হয় আশঙ্কা ছিল আমি বিদেশী মানুষ—পাছে "I am sorry" টুকু বাদ দিই!

পরদিন আমি বাহিরে যাইবার সময়, কুমারী অ—একটি কালো বনাতের ব্যাণ্ড আনিয়া আমার হ্যাটের চারিদিকে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমার পরিচ্ছদে শোকচিহ্ন না দেখিলে, পথে ঘাটে লোকে আমায় অপমান করিতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনায় God Save the King উচ্চারিত হইল। উপস্থিত প্রাচীনতম ব্যারিষ্টারও বলিলেন—"এ হলে এ কথা অদ্য প্রথম শুনিলাম।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

---

* ছয়টা একত্রিশ মিনিটে লণ্ডনের রাজপথে এ সংবাদ প্রচারিত হয়। বড় বড় সংবাদপত্র আফিসের সঙ্গে মহারাণীর Isle of Wightএর প্রাসাদ টেলিফোনের দ্বারায় সংযুক্ত ছিল।

মিডল্ টেম্প্ল্ গলি।

গোল্ড স্মিথের কবর। মিড্ল্ টেম্প্ল।

মিড্ল্ টেম্প্ল—ফৌণ্টেন কোর্ট।

হিন্দু বিধবা আশ্রম, পুণা

পুণা।

বোম্বাই অঞ্চলে পুণা একটি পুরাতন এবং বিখ্যাত সহর। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বাজী রাওয়ের অধীনে এখানে মহারাঠাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৬৩ সালে হায়দারাবাদের নিজাম আলি ইহাকে লুট এবং ধ্বংস করে। পেশবা ও সিন্ধিয়া উভয়ের মিলিত সৈন্য যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক এইখানে পরাজিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুণার সন্নিকটে ইংরাজের সহিত কিরকীর যুদ্ধে মহারাঠা সূর্য্য অস্তমিত হয়। কথিত আছে পার্ব্বতী মন্দিরের এক গবাক্ষ হইতে শেষ পেশবা বাজীরাও কিরকীর যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সৈন্যের পরাজয় দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই মন্দির সহরের দক্ষিণে এক পাহাড়ের উপর ১৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে পেশবা বালাজী বাজী রাও কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিবরাত্রি ও দেবালীর দিনে এখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং অন্যান্য দিনে সন্ধ্যার সময় কেহ কেহ বেড়াইতে বা দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যায়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা সহর ইংরাজহস্তগত হয়। সহরের নিকটেই ইংরাজদিগের সৈন্যাবাস এবং ইংরাজ কর্ম্মচারী ও ধনী লোকের বাসোপযোগী বহু অট্টালিকা আছে। এখানকার জল বায়ু নাতিশীত নাতিউষ্ণ বলিয়া ইংরাজদিগের অত্যন্ত প্রিয়। বোম্বাই অঞ্চলের সৈন্যের প্রধান আড্ডা পুণা ছাউনিতে অবস্থিত। বর্ষাকালে প্রায় তিন মাস বোম্বাই লাট এই খানে বাস করেন। পুণা সহর ও ছাউনিতে ১৫৩,০০০ লোকের বাস ছিল বলিয়া ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে ধার্য্য হইয়াছিল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা ইংরাজহস্তগত হইলে দূরস্থ লোকের এখানে আর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। বাহিরের লোকের চক্ষে ইহার প্রাধান্য কমিলেও ইহা মহারাঠা ব্রাহ্মণদিগের কেন্দ্রস্থলরূপে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ পুণাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। পুণাবাসী তাহাদের লুপ্ত গৌরবের দিন এখনও সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই এবং ব্রাহ্মণগণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এইরূপ বিশ্বাসই এই সন্দেহের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে কিছুদিন হইতে পুণা পুনরায় দূরস্থ ভারতবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এখানে স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি প্রতিভাশালী লোকের বাস; ফর্গুসন কলেজ, সার্ব্বজনিক সভা, হিন্দু বিধবা বালিকাশ্রম, ভারতবর্ষীয় সেবক সমিতি প্রভৃতি সভা ও মঠের অবস্থান; ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনের এক প্রধান আড্ডা; কেশরী ও মহারাট্টা পত্রিকার উৎপত্তি স্থান। পুণা এক্ষণে আধুনিক স্বদেশপ্রেমী ভারতবাসীদিগের প্রধান তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই তীর্থের প্রধান প্রধান সমিতি ও মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

দক্ষিণী শিক্ষা-সমিতি ও ফর্গুসন কলেজ।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এবং স্বর্গীয় মহাদেব বল্লাল নামযোশীর সাহায্যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ চিপ্লোঙ্কর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় (New English School) নামে পুণা সহরে এক পাঠশালা স্থাপন করেন। সাধারণ লোকের পক্ষে শিক্ষা সুলভ করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ক্রমশঃ অন্যান্য স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত লোক স্থাপনকর্ত্তাদিগের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন এবং ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চেষ্টার এইরূপ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়া স্থাপনকর্ত্তাগণ একটি কলেজ ও স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রসার করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহার প্রসার ও ইহা স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা একটি সমিতির উপর ইহার ভার অর্পণ করিলেন। এই সমিতির নাম Deccan Education Society বা দক্ষিণী শিক্ষাসমিতি। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে এই সমিতি রেজেষ্টারী হয় এবং পর বৎসর জানুয়ারি মাসে তদ্দ্বারা পুণা সহরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। বোম্বাই বিভাগের ভূতপূর্ব্ব লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ফর্গুসন সাহেবের নামে ইহার নামকরণ হয়।

"To facilitate and cheapen education by starting, affiliating or incorporating at different places as circumstances permit, schools and colleges under private management or by any other ways best adapted to the wants of the people."

অর্থাৎ অল্প কথায়, দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষা সুলভ করাই এই

সমিতির উদ্দেশ্য। তিন শ্রেণীর সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত ;—(১) আজীবন সভ্য (life members), (২) সাধারণ সভ্য (fellows) ও অভিভাবক (patrons)। সমিতির স্থাপিত বিদ্যালয়ে যাঁহারা অন্ততঃ ২০ বৎসর শিক্ষা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকার করেন তাঁহারা আজীবন সভ্য। যাঁহারা অন্যূন ২০০৲ টাকা দান করেন তাঁহারা সাধারণ সভ্য এবং যাঁহারা ১,০০০৲ বা তদূর্দ্ধ টাকা দান করেন তাঁহারা অভিভাবক রূপে গণ্য হয়েন। আজীবন সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সমানসংখ্যক, সাধারণ সভ্য ও অভিভাবকদিগের মধ্য হইতে মনোনীত, লোক লইয়া "কৌন্সিল" গঠিত হয়। এই কৌন্সিলের উপর সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যালয় রক্ষা ও পরিচালনের ভার। আজীবন সভ্যগণ ফর্গুসন কলেজ ও নূতন ইরাজী স্কুলের শিক্ষা ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক বিষয়ের পরিচালন করেন, কৌন্সিল মূলধন (permanent funds) এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ও অন্যান্য বহিঃস্থ বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সাতারা নগরে নূতন ইংরাজী স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পুণায় একটী প্রাথমিক পাঠশালাও ইঁহারা চালাইতেছেন। দক্ষিণী শিক্ষাসমিতি এক্ষণে সর্ব্বসমেত পুণায় একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি প্রথমশ্রেণীর এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক পাঠশালা এবং সাতারায় একটি এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় চালাইতেছেন। ১৯০৬।০৭ সালের শেষে সমিতির তহবিলে ৩,১৭,৩০৪৷৶০ মূলধন রূপে মজুত ছিল। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সমিতির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে।

ফর্গুসন কলেজের অট্টালিকা, ছাত্রাবাস, জমী, পুস্তক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রভৃতি সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের হইবে। কলেজমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত, ও দৃশ্য। চারিদিকে বাগান ও প্রশস্ত জমী আছে। সীমার মধ্যে প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকদিগের বাসের জন্য পাঁচ খানি বাঙ্গলা' আছে। ছাত্রাবাসে প্রায় ১৫০ ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয়। ১৯০৬-০৭ সালে কলেজে ৫০০ ছাত্র ছিল —এম, এ, শ্রেণীতে ৭ জন, সীনিয়র বি, এ, ৬৩, জুনিয়র বি, এ, ৫৫, আই, ই, ১১৪, পি, ই, ২৪৫, বি, এস্ সি. ১, সীনিয়র আই. এস্ সি. ৮, এবং জুনিয়র আই. এস্ সি. ৭ জন। ঐ বৎসরে নিম্নলিখিত ছাত্র সংখ্যা য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে—এম, এ, ১, বি, এ, ৩৮, আই. এস্ সি. ২, আই. ঈ. ৪৯, পি. ঈ. ১০৮। ১৯০৪-৫ সাল হইতে ফর্গুসন কলেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য পাইতেছে। পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা কম সাহায্য পাইত। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলেও ইহা প্রধানতঃ বেসরকারী লোকের দ্বারা স্থাপিত ও চালিত। সব দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেসরকারী স্বদেশী কলেজ বলা যাইতে পারে। য়ুনিভার্সিটি কমিশনও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলেজে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে এবং জীব-বিজ্ঞান (Biology) শিক্ষার আয়োজন হইতেছে। বোম্বাই অঞ্চলে গভর্ণমেণ্টের কলেজ অপেক্ষা এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার উৎকৃষ্ট আয়োজন আছে বলিয়া অনেকের মত।

পুণা নূতন ইংরাজী স্কুলে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ৭২২ ছাত্র ছিল। বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস, খেলিবার স্থান ও বাগান আছে। ১,৩৮,৫০০ ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

ফর্গুসন কলেজ ও দক্ষিণী শিক্ষাসমিতির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বিষয় আজীবন সভ্য। ইঁহারা অন্ততঃ ২০ বৎসর অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। সংসার নির্ব্বাহার্থে মাসিক ৭৫৲ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন। প্রধান অধ্যাপক ভাতা স্বরূপ আরও ২৫৲ টাকা পাইয়া থাকেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে প্রমুখ বিদ্বান ও প্রতিভাশালী লোক ইহাতে যোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নিয়মিত ২০ বৎসর কাল অধ্যাপনা করিয়া এক্ষণে রাজনীতি চর্চ্চায় রত আছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ফর্গুসন কলেজের মঙ্গলার্থে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আজীবন সভ্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি সীনিয়র র‍্যাঙ্গলার হইলে, শিক্ষাসমিতি তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অন্তরায় না হইবার জন্য

াহাকে অঙ্গীকার হইতে মোচন করিতে চাহিয়াছিলেন। ন্তু তিনি অঙ্গীকার পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছলেন। এক্ষণে তিনি ফর্গুসন কলেজের প্রধান অধ্যাপক, াবং মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন ও ২৫৲ টাকা ভাতা পাইয়া াকেন। সরকারী কার্য্য করিলে তিনি কত উপায় ও ম্মান লাভ করিতে পারিতেন, এবং শিক্ষা সমিতিতে যোগ দেওয়াতে কত স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ াহজেই বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাপকদিগের অসাধারণ ার্থত্যাগই এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রাণ। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। দৃষ্টান্ত বহুল হইলে দেশের মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। ঋষিদিগের ন্মভূমিতে এ দৃষ্টান্তের কি অভাব হইবে? আমাদের র্ভাগ্যবশতঃ সত্য সত্যই কি সাগর শুকাইয়া গিয়াছে, লক্ষী াক্ষী-ছাড়া হইয়াছে?

আনন্দাশ্রম, পুণা।

স্বর্গীয় মহাত্মা মহাদেব চিম্নাজী আপ্তে প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে আনন্দাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, এবং উইল দ্বারা এই আশ্রমের রক্ষার্থে ১,২৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই আশ্রমের তিনটি উদ্দেশ্য :--

(১) পুরাতন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও রক্ষা করা।

(২) মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা ও তজ্জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন করা।

(৩) অন্ততঃ পাঁচটি বিদ্বান সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতকে আশ্রয় ও আহার দেওয়া। ইঁহারা নানা হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া তাহাদের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিবেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিবেন।

উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে আশ্রমস্থাপক আপ্তে-মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় ৯০০০০ টাকা ব্যয়ে পুস্তকাগার, ছাপাখানা, সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতি, যাহাতে অগ্নি সংযোগের আশঙ্কা না হয়, এরূপ উপকরণে পুস্তকাগার নির্ম্মিত। ইহাতে ৫০,০০০ পুস্তক রাখিবার স্থান আছে, এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপরি তলায় শাস্ত্রীয় বক্তৃতাদির জন্য একটি সুবৃহৎ হলঘর, হলঘরের একদিকে একটি শিবলিঙ্গ আছে। এই ইমারতের চারিদিকে খালি জমী আছে। নিকটেই সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপিবার জন্য ছাপাখানা।

বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সংস্করণ এই আশ্রম হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৫৮ খানি গ্রন্থ ৮১ বালমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সমগ্র মূল্য ৩৪৫।৵০। তন্মধ্যে ২৮ খানি বেদান্ত গ্রন্থ, ৯ খানি বৈদিক, ৮ পুরাণ, ৫ চিকিৎসা, ১ পূর্ব্বমীমাংসা ১ যোগ, ১ ধর্ম্মশাস্ত্র, ২ স্মৃতি, ১ ব্যাকরণ, ১ সঙ্গীত ও ১জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। পুস্তকের মূল্য সাধারণের পক্ষে টাকায় ১০০ পৃষ্ঠা (রয়াল আট পেজী) হিসাবে। যাঁহারা আশ্রমের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে এই মূল্যের তিন-চতুর্থ অংশ।

হিন্দু বিধবা বালিকাশ্রম (Hindu Widows' Home)

প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে ফর্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধোণ্ডো কেশব কর্বে অনাথা হিন্দু বিধবাদিগের জন্য এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে অতি সামান্য ভাবে একটি সামান্য বাড়ীতে দুই চারি জন বিধবাকে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী লালন পালন করিতে ও লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পুণা সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে একটি সুবৃহৎ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তর নির্ম্মিত চতুষ্কোণ বাড়ীতে ৮০।৯০ জন ছাত্রীর স্থান আছে। ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই আশ্রমসমিতির সভাপতি। শ্রীমতী কাশীবাই দেবধর আশ্রমের প্রধান তত্ত্বাবধারক। তিনি ছাড়া আরও তিন জন স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী আছেন, এবং চারিজন পুরুষ শিক্ষক আছেন। শ্রীযুক্ত কর্বে, শ্রীমতী কাশীবাই এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ের অবকাশের সময় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সাধারণের সহানুভূতি উৎপাদন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এ অঞ্চলের রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই আশ্রমকে প্রথম প্রথম সুনজরে দেখিতেন না। কিন্তু কর্বে ও কাশীবাইএর অক্লান্ত পরিশ্রম, মহান চরিত্র ও সুব্যবস্থার গুণে ক্রমে এখন আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং স্থানাভাবে কোন কোন প্রবেশাকাঙ্ক্ষিণীকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথম তিন বৎসর কোনও আশ্রমবাসিনী ছিল না, চতুর্থ বৎসরে চারিজন, পর বৎসরে ১০ জন, ১৯০১ সালে ১৪ জন, ১৯০২ সালে ১৮ জন, ১৯০৬ সালে ৭৫ জন, ১৯০৭ সালে ৬৬ জন, আশ্রমবাসিনী ছিল। বোম্বাই প্রদেশের দূরস্থ জেলা, মধ্যপ্রদেশ এবং ইন্দোর, বড়োদা, মহীশুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিধবাগণ আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। নিম্নলিখিত নিয়মাবলী হইতে আশ্রমের উপকারিতা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সকল উচ্চ বর্ণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই সেই সকল বর্ণের বালিকা ও যুবতী বিধবাদিগকে চিত্তোৎকর্ষক ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আশ্রমবাসিনীকে গৃহকার্য্য করিতে হয়। গম ভাঙ্গা প্রভৃতি কষ্টকর কাজ দিনে সিকি ঘণ্টা হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বশুদ্ধ দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। রন্ধন সম্বন্ধে এবং তরকারি প্রভৃতির জন্য বাগানে গাছপালা জন্মাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাতে ৬টার সময় এবং অল্পবয়স্কারা ৬½টার সময় গাত্রোত্থান করে। ৭টার সময় সকলে পর্য্যায়ক্রমে স্নান করিয়া ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া পূজা করিতে বসে। পরে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠে রত হয়। আহারাদি করিয়া পাঠশালায় উপস্থিত হয়। ১১টার সময় ১৫ মিনিট কাল গীতা পাঠ প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষার পর অন্যান্য পাঠ আরম্ভ হয়। ৫টার সময় পাঠশালা বন্ধ হয়। একটু বিশ্রাম ও পাদচারণের পর ৬½টার সময় বৈকালিক আহার হয়। তৎপরে পড়িতে বসে। ছোট ছোট বালিকারা ৮½টার সময় শুইতে যায়। অপর সকলে ৯টার সময় একত্রিত হইয়া সাধুদিগের পদাবলী গান করে। ১০টার মধ্যে সকলে শয়ন করে। উপবাস ও ব্রতাদি সম্বন্ধে আশ্রমবাসীরা নিজ নিজ প্রথানুসারে চলে। সকলে এক ঘরে কিন্তু বর্ণানুযায়ী পৃথক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে। আহার ও পান ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়ে আশ্রমবাসীদের কোন তারতম্য করা হয় না। পাঠশালায় প্রথম বৎসরে লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কশিতে শিখান হয়। ৪র্থ ভাগ মারাঠী পুস্তক পড়িতে পারিলে ব্যাকরণ, পদ্য, ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরাজী শিখান হয়। ইতিহাস ও ভূগোল মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হয়, ইংরাজী শিক্ষা ইচ্ছানুযায়ী। ইংরাজী ৪র্থ শ্রেণী শেষ হইলে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজী ৪র্থ শ্রেণীর পর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা বিধান হয়। আশ্রমবাসিনীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) যাহাদের অভিভাবক সমস্ত ব্যয় বহন করেন, (২) যাহাদের অভিভাবক ব্যয়ের একাংশ বহন করেন ; (৩) যাহারা বৃত্তি পায় এবং (৪) যাহাদের সমস্ত ব্যয় আশ্রম বহন করে প্রথম শ্রেণীর আশ্রম বাসীদিগের দুধ, কাপড় চোপড় লইয়া সর্ব্ব সমেত মাসিক ৭ টাকা খরচ পড়ে। আশ্রমের সুব্যবস্থা দেখিয়া অনেকে অবিধবা বালিকাও পাঠাইতেছেন। সাধারণ গৃহকার্য্য ছাড়া সেলাই ও বুননের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই জন বালিকা মহেশ্বরে কাপড় বুননের কাজ শিখিতে গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ, ধাত্রীর কাজ এবং রোগী শুশ্রূষার কাজও শিখান হয়। আশ্রমের জন্য ১৯০৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১,২০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও ৪২,০০০ টাকা মজুত আছে। কলিকাতা অঞ্চলের শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রমে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত বিধবাশ্রম সর্ব্বপ্রথমে বরাহনগরে তাঁহা দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক বাধা ব্যতিক্রমের মধ্যে ১০ বৎসরকাল চালাইয়া উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে ইহা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সেবক সম্প্রদায়।

২০ বৎসর কাল ফর্গুসন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে Servants of India Society বা ভারতবর্ষীয় সেবকসম্প্রদায় স্থাপন করেন। যাঁহারা দেশের কার্য্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের শিক্ষার্থে এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে বিধিবৎ উপায়ে চেষ্টার জন্য এই সম্প্রদায় স্থাপিত। প্রধানতঃ (ক) দৃষ্টান্ত ও উপদেশদ্বারা স্বদেশপ্রীতি শিক্ষা, (খ)

জনৈতিক আন্দোলন ও শিক্ষা, (গ) বিভিন্ন সম্প্রদায় ধ্য সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য স্থাপন (ঘ) শিক্ষা বিধান শেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা, ইতর শ্রেণীর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষা ও (ঙ) ইতর শ্রেণীর উন্নতি, কল্পে বিশেষ মনোযোগ ওয়া হইবে। পুণাতে এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। সেবক- গের জন্য আশ্রম ও পুস্তকাগার আছে। প্রত্যেক বককে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিতে হয়— ার মধ্যে সর্ব্বসমেত তিনবৎসরকাল পুণার আশ্রমে কিয়া পাঠাভ্যাস ও দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষ ভ্রমণ- রিতে হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার সময় প্রত্যেক সেবককে ন-লিখিত ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। (১) স্বদেশ তাঁহার ন্তঃকরণে সর্ব্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিবে এবং হাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ আছে তাহা স্বদেশসেবায় নিয়োজিত করিবেন। (২) স্বদেশসেবা করিতে গিয়া ান রকমে নিজ স্বার্থ অন্বেষণ করিবেন না। (৩) সকল রতবাসীকে ভ্রাতৃবৎ দেখিবেন এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বি- ষে সকলের উন্নতিকল্পে কর্ম্ম করিবেন। (৪) তাঁহার জের ও (পরিবার থাকিলে) পরিবারের ভরণপোষণার্থে প্রদায় যেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ং নিজের জন্য অর্থোপায় করিতে কোনও পরিশ্রম রবেন না। (৫) তিনি সচ্চরিত্র থাকিবেন। (৬) কাহারও ্ত কলহ করিবেন না। (৭) সর্ব্বদা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের ার লক্ষ্য রাখিবেন এবং যৎপরোনাস্তি চেষ্টার দ্বারা ়েরের সহিত ইহার মঙ্গল সাধিবেন ; সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য- ্দ্ধ কোনও কার্য্য করিবেন না।

যাঁহারা সম্প্রদায়ের কার্য্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে ারেন না অথচ তাঁহাদের আয়ের ও পরিশ্রমের কিয়দংশ াগ করিতে প্রস্তুত, অথবা সম্প্রদায়ের অধীনে শিক্ষা াতে প্রস্তুত তাঁহারা associates এবং attaches ভুক্ত হইতে পারেন। এ পর্য্যন্ত একজন (গোপালকৃষ্ণ খলে) প্রধান সেবক, ৮ জন শিক্ষানবিশী ও চারি জন ায্যকারী সেবক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন। শীঘ্র সভ্য- ্যা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা আছে।

রানাডে ইকনমিক ইন্সটিট্যুট।

গোখলে মহাশয়ের চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যে পুণা সহরে Ranade Economic Institute স্থাপিত হইবে। ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার প্রসার করা এই ইন্সটিট্যুটের উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় মহাত্মা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থে ইহা স্থাপিত হইতেছে। Economic বিষয়ে পুস্তকাগার হইবে এবং বৎসরে দুই একজন ছাত্রকে শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানর বন্দোবস্ত করা হইবে।

উপরি উক্ত বিষয় ব্যতিরেকে পুণায় উল্লেখযোগ্য আরও কিছু আছে।

সার্ব্বজনিক সভা।

(১) সার্ব্বজনিক সভা—ইহা পুরাতন রাজনীতিক সভা এবং কিছুদিন পূর্ব্বে এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান সভা বলিয়া গণ্য হইত। প্রথম কংগ্রেস এই সভার চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে মিলিত হইয়াছিল ; পুণাতেই প্রথম বৈঠক হইবার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় মারীভয় হওয়াতে বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মহারাঠী ভাষায় প্রকাশিত কেশরী ও ইংরাজী "মহারাট্টা" সাপ্তাহিক পত্র। এখন কেশরীর ন্যায় প্রতাপশালী আর কোনও দেশীয় পত্রিকা নাই বলিতে পারা যায়।

(৩) দৈনিক মহারাঠী পত্র জ্ঞানপ্রকাশ। এ অঞ্চলে এই একখানি মাত্র দৈনিক মহারাঠী পত্র। আর একখানি দেশীয় ভাষায় লিখিত দৈনিক পত্র বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

(৪) চিত্র-শালা—ইহাতে শিশুশিক্ষার্থ নানাপ্রকার কিণ্ডারগার্টেন ছবি, মানচিত্র, বিখ্যাত লোকদিগের ছবি প্রভৃতি সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হয়।

পুণার নিকটে পণ্ডিতা রমাবাইয়ের অনাথাশ্রম, সিংহগড় (মহারাঠা বীরত্বের এক প্রধান লীলাভূমি) ও সাধু তুকারামের আশ্রম দেখিবার স্থান।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেবদূত।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাল—অপরাহ্ণ। স্থান—অযোধ্যা।

অরবিন্দ ও অজয়।

অর। জগতের গৌরবের কেন্দ্র-ভূমি কে কহিবে এবে—
এই সে অযোধ্যা!
দেখ একবার ভেবে—
সত্য-বীর দশরথ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা তরে
আপন আত্মজ সেই মহাবীরবরে
করেছিলা এইখানে নির্ব্বাসিত বিজন কান্তারে,
পুণ্যভূমি এইখানেই সে সতী-প্রিয়ারে
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আদর্শ ভূপতিবেশে রাম
আপন ইচ্ছারে দলি', পুরিবারে মনস্কাম
প্রকৃতিপুঞ্জের—দূরে পাঠাইলা গভীর গহনে।
ভ্রাতৃস্নেহে, এইখানে রাজ-সিংহাসনে
রামের পাদুকা স্থাপি', সম্ভ্রমে ভরত নৃপমণি
দীনবেশে, ম্লানমুখে রক্ষিলা আপনি
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি' রাজত্ব বিশাল। এ নগর
মরতের তীর্থ, স্বর্গ হ'তে মহত্তর।

অর। ধ্রুব কহিয়াছ, যবে সে অতীত স্মৃতি জাগে মনে,
এ মলিন মর্ত্ত্য ত্যজি', প্রাণ সেই ক্ষণে
উজ্জ্বল, পবিত্র হ'য়ে লঘু পক্ষে ঊর্দ্ধপানে ধায়।
অযোধ্যা এ মহী-ভূমে মৌন মহিমায়
মহাতীর্থ বটে।

অজ। ভাবো—এই সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রিয়,
আপনি ঈশ্বর আসি' আদর্শ, স্বর্গীয়
রাজত্ব করিলা সেই স্থানে। সেই লীলা-নিকেতন
বিস্তৃত সম্মুখে, যেথা দেব-নারায়ণ
আদর্শ মানব জন্ম করিয়া গ্রহণ উদেছিলা
রামরূপে।

অর। —অজ্ঞ আমি, অবতার-লীলা
না পারি বুঝিতে। সখা, বিধাতা কি ত্যজি' চরাচর,
এস্থানে মানবমূর্ত্তি ল'য়ে নিরন্তর
রহিলেন অবতীর্ণ? কভু এই নিখিল-সংসারে
এও কি সম্ভব?'

অজ। বৃথা বিতর্ক-বিচারে
নাহি প্রয়োজন। শোন—জগতের সর্ব্বজীব মাঝে
বিধাতার সূক্ষ্মসত্তা নিরন্তর রাজে।
সে ভাবে, প্রত্যেক জীব তাঁ'রি অংশে হ'য়ে সত্ত্ববান
অবতীর্ণ;—তারি মাঝে সে জীবন্ত প্রাণ
অবিরাম অনুভব করি' তাঁ'রে আপন জীবনে,
আজন্ম নিমগ্ন রহি' তন্ময় সাধনে
তাঁ'রি প্রিয় কার্য্যাবলী নিরন্তর করে অনুষ্ঠান—
অবতার কহি তারে। হেথা ভগবান
যা'র মাঝে যতক্ষণ করেন প্রকাশ আপনারে
ততক্ষণ সে-ই অবতার। এ ধরারে
হেনভাবে, নির্ব্বিকার অনন্তের প্রেমে উদ্ভাসিয়া,
উঠিলেন বিশ্বনাথ স্বরূপে ফুটিয়া
খৃষ্ট ও চৈতন্যরূপ জীবন-আধারে। জ্ঞানালোকে
ঘুচাইয়া অন্ধকার—সর্ব্ব দুঃখ-শোকে,
পুনঃ, প্রজ্ঞারূপে আসি' উদিলেন বুদ্ধের জীবনে
সুপ্তজীবে সঞ্জীবিয়া মহা উদ্বোধনে।
তন্ময় জীবন যেই,—কেন্দ্রীভূত যে আধার মাঝে
ঈশ্বরের শক্তি নিত্য দীপ্ত রহিয়াছে,
সেই সে জীবনে পূজে এ সংসার অবতাররূপে।
ত্রেতাযুগে তাই, সেই অযোধ্যার ভূপে
সবে কহে অবতার।

অর। বুঝিলাম যাহার জীবন
তাঁহারি সত্তার ধ্যানে রহি' নিমগন,
নিষ্কাম কল্যাণ লাগি' যতক্ষণ কর্ম্মরত রহে
ততক্ষণ সেই জনে অবতার কহে
বিশ্ববাসী।
কিন্তু, বন্ধু, সে ভাবেও রামে অবতার
কহিবারে নাহি পারি। জীবনে তাঁহার
সর্ব্বকর্ম্ম নহে ধর্ম্মাশ্রিত।

অজ। রামচন্দ্রের জীবন
আদর্শ নৃপতিভাবে চির-অতুলন!
রাজধর্ম্ম তাঁ'র মাঝে মূর্ত্তি লভি' উঠেছিল ফুটি',
সেই ভাবে তিনি অবতার। অন্য ত্রুটি
হয় ত বা তাঁ'র মাঝে রহিলেও পারে।

অর। কি বলিলে—
রামচন্দ্র আদর্শ ভূপতি? এ নিখিলে
স্মরণীয় রাজধর্ম্ম তাঁ'র! বন্ধু, ভ্রান্ত, অন্ধ তুমি।
এ ধরা হয়েছে ধন্য যাঁর' পদ চুমি'
সে বিশ্ব-জননী সীতা—যাঁ'র রূঢ় বিধানের ফলে
লাঞ্ছিতা হইয়া, হায়—উদ্দীপ্ত অনলে
হইলেন পরীক্ষিত; যাঁ'র মূর্খ, নির্ম্মম আদেশে
রাজেন্দ্রাণী বিশ্বমাতা জীর্ণ, চীর বেশে
অবমান-ম্লান মুখে, রুক্ষকেশে পশিলেন বনে;
বালীরাজে ভুলাইয়া কাপট্য-ছলনে
অতি ঘৃণ্য স্বার্থপর সম যিনি করিলা সংহার;
ছায়াসম অনুগামী লক্ষ্মণো যাঁহার
গর্হিত, নির্দ্দয়, ক্ষুব্ধ আচরণে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,

সতী।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

শীতল সরযূজলে দিল আপনায়
বিসর্জ্জিয়া ; তিনি যদি আদর্শ ভূপতি এই ভবে
নাহি জানি ধর্ম্মহীন কা'রে কহ তবে।
অজ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-ধর্ম্ম এ সংসারে—প্রজার রঞ্জন।
সেই ধর্ম্মে মহোজ্জ্বল রামের জীবন।
আদর্শ নৃপতি তিনি, সিংহাসনে—তিনি অবতার,
সেই ভাবে চিন্তা করে' দেখ একবার—
অনুপম ন্যায়বান তিনি।
অর। —বন্ধু, ক্ষান্ত, স্তব্ধ হও।
তুমি তো নির্ব্বোধ, মূঢ়, জ্ঞানহীন নও ;
তবে, কেন অকারণে এ অতথ্য করিছ প্রচার ?
রাম ন্যায়বান! হায়—এ জগতে তাঁর
রাজধর্ম্ম অনুপম!
সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রয়
সত্যের উপরে নিত্য। যেথা নাহি হয়
সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা সেথা ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে না পারে।
সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম সদা রহে একাধারে—
অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনে।
রামচন্দ্র তাঁহার জীবনে
সত্যের ন্যায়ের সদা মর্য্যাদা রক্ষণে
কৃতকার্য্য হন নাই। দেখিলাম—তাঁহারে যখন
বৃক্ষ-অন্তরালে রহি' বালীর জীবন
নীচ, কাপুরুষসম করিলা সংহার তবে তাঁ'র
বীরধর্ম্মে—রাজধর্ম্মে হইল সঞ্চার
অলোপ্য কলঙ্ক-কালি। তারপরে, লঙ্কা-যুদ্ধ-শেষে,
বিশ্বের আদর্শ সতী সীতা যবে এসে'
দাঁড়াইলা রামের সম্মুখে, সেই মিলনের ক্ষণে
যশোলিপ্সু রামচন্দ্র অকথ্য বচনে
জনাকীর্ণ সেই স্থানে সীতারে করিয়া হেয় জ্ঞান
করিলা যে ভাবে তাঁ'র ঘোর অপমান,
রামের সে আচরণে রঘুবংশ হইল মলিন!
নীচকুলে জন্ম যা'র—অতিশয় হীন
তা'রো মুখে হেন উক্তি শোভা নাহি পায়। অকারণে—
অজ। হইও না উত্তেজিত। ভেবে' দেখ মনে—
রামচন্দ্র আপনার অস্তিত্বেরে দিয়া বিসর্জ্জন,
শ্রেষ্ঠ রাজ-ধর্ম্ম—সেই প্রজার রঞ্জন
পালন করিয়াছিলা সুখ-স্বার্থে দিয়া জলাঞ্জলি।
অর। শোন বন্ধু,—তাই, বুঝি বালীরাজে ছলি'
শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম রাম করিলা পালন? তাহে কোন্
সমাপিত হয়েছিল প্রজার রঞ্জন ?
দূর হোক মিছা তর্ক। আর, তা'ও, শোন সখা, বলি—
প্রজারি রঞ্জন কভু নহে তো কেবলি
রাজধর্ম্ম। রাজধর্ম্ম ন্যায়াশ্রিত সদা ধরাতলে।
প্রকৃতির ইচ্ছা যবে স্পর্দ্ধাভরে বলে—
সত্যের মর্য্যাদা ব্যর্থ খর্ব্ব করিবারে, তবে সেই
উদ্ধত প্রজার হীন ইচ্ছা পালনেই
রাজধর্ম্ম হয় কলুষিত। সে ইচ্ছারে প্রতিহত
করি', রাজধর্ম্ম এই সংসারে সতত
সর্ব্বোপরে, ন্যায়-সত্যে রক্ষা করা অক্ষুণ্ণ প্রভাবে।
রামের রাজত্বে আর রামের স্বভাবে
এই নীতি হয়নি রক্ষিত।
অজ। কি কারণে ?
অর। যদি কেহ
মোর সাধ্বী প্রেয়সীরে করিয়া সন্দেহ
কহে মোরে—সে সতীরে অকারণে করিতে বর্জ্জন,
গর্হিত সে অনুরোধে করিলে পালন
ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হব আমি। জেনে' শুনে,' রঘুবীর রাম
সেইরূপ প্রজাদের দৃপ্ত মনস্কাম
পূরিবারে, অকারণে যবে সখা, অতি অনায়াসে
শ্বাপদ-সঙ্কুল সেই ঘোর বনবাসে
জগত-জননী সতী সীতারে করিলা নির্ব্বাসিতা,
সেই সঙ্গে অত্যাচারে হল নিগৃহীতা
রাজ-নীতি সহ এই ধরিত্রীর সতী নারী কুল!
অজ। হে মিত্র, মূলেই তুমি করিয়াছ ভুল।
যিনি রাজা, প্রজাদের সর্ব্বরূপে তিনি প্রতিনিধি,
প্রজারি লাগিয়া তাঁ'র ধর্ম্ম, রাজবিধি
নিরন্তর সচেতন। রাজধর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য তো নাই।
প্রজারে ছাড়িয়া কই—রামচন্দ্রে তাই,
খুঁজিয়া পাই না আর! প্রজাদের ইচ্ছা পালিবারে,
কোন্ অন্তরালে রাম রাখি' আপনারে,
আপনার হৃৎপিণ্ড রাজধর্ম্মে করিয়া ছেদন
প্রাণের সীতারে মরি—দিলা নির্ব্বাসন
ভীষণ গহনে।—ধন্য আদর্শ ভূপতি!
অর। কেন বৃথা
করিছ প্রশংসা তাঁ'র। যবে নিগৃহীতা
জননী সীতারে মোর হেরি—বনে স্তব্ধ, নিশ্চেতন,
রয়ে'ছেন পড়ি' রাম-ধ্যানে নিমগন ;
তখন—তখন সখা, দুঃখে, ক্ষোভে জ্বলে এ অন্তর ;
রোষ উপজয় মনে রামের উপর।
ন্যায়-দণ্ড ল'য়ে করে, সত্যেরে করিয়া অপমান
যে নৃপ নির্ব্বাহ করে বিচার-বিধান—
হোক্ না সে রামচন্দ্র, তবু তাঁ'রে করি হীন জ্ঞান ?
তাঁ'র লক্ষ্য নহে কভু বিশ্বের কল্যাণ,
লক্ষ্য তাঁর—স্বীয় স্বার্থ,—যশের কিরীট। অযোধ্যায়
এইরূপে রামচন্দ্র অকাতরে, হায়—
ন্যায় ধর্ম্মে তুচ্ছ করি,' অকারণে জননীরে মোর

পাঠাইলা বনবাসে। জগতী ভিতর
সত্য কহিতেছি বন্ধু, শুনি নাই কখনো এমন
হইয়াছে সতীত্বের ঘোর নির্য্যাতন।
বিনা দোষে, অকারণে, প্রজাপুঞ্জে তুষ্ট রাখিবারে,
কে কবে শুনেছে কহ—হেন অবিচারে
নির্ম্মম বিধান হেন ভীষণ, কঠোর ?
স্ত্রীর প্রতি
স্বামীর দায়িত্ব সখা, মনে কর যদি ;—
সে ভাবে শ্রীরামচন্দ্র গুরুতর কর্ত্তব্যে তাঁহার
উপেক্ষা করিয়াছিলা।
পুনঃ, বিধাতার
রমণীবৃন্দের প্রতি পুরুষের আছে সুমহান
যে কর্ত্তব্য, রামচন্দ্র—ক্ষত্রিয়-প্রধান—
সে কর্ত্তব্য পালনেও উদাসীন ; বিরক্ত অন্তর,
উদ্যম-বিহীন পঙ্গুসম।
তারপর,
নিন্দিত প্রজার প্রতি সে কর্ত্তব্য বিহিত রাজার—
সত্য পক্ষে নিরন্তর করা সুবিচার ;
সে পক্ষেও রামচন্দ্র সিংহাসনে রহি' অধিষ্ঠিত
ন্যায়াশ্রিত রাজধর্ম্মে হইলা পতিত
মূঢ় সম। জায়া, নারী, পরিহার করি' এ চিন্তারে,
শুদ্ধ যদি প্রজারূপে মহিষী সীতারে
কর মনে ; ভাবো যদি—সীতা শুদ্ধ রাজার সাক্ষাতে
বিচার-প্রার্থিনী প্রজা ; তবু, সে চিন্তাতে
রামের চরিত্র নাহি হয় সমর্থিত ; অকারণে,
দেবীরে নিষ্পাপ জানি' আপনার মনে,
নির্দ্দোষীরে রামচন্দ্র-শুদ্ধ অবিমিশ্র যশো-আশে
মিথ্যা অপবাদ সমর্থিয়া, বনবাসে
নির্ব্বাসিলা স্বেচ্ছাচারে।

[অ]জয়। আপনার অস্তিত্বের সনে
সীতারে অভিন্ন রাম ভাবিতেন মনে,—
এমনি নিবিড় প্রেমে চির-বদ্ধ আছিলেন দোঁহে !
তাই অন্তরের মাঝে মহা দুঃখ সহে,'
সুখ-স্বার্থে বিসর্জ্জিয়া, সীতারে পাঠায়ে নির্ব্বাসন,
আপনার অর্দ্ধাঙ্গের করিয়া ছেদন
প্রজার রঞ্জন রাম সাধিলা অতুল ধৈর্য্য ভরে।

[অ]র। এই কি প্রণয়রীতি ! প্রেম অকাতরে
চাহেগো প্রিয়ের লাগি বলিদান দিতে আপনারে ;
স্বার্থের লাগিয়া সে তো কভু নাহি পারে
প্রিয়েরে করিতে নির্ব্বাসিত। বৃথা, কোরোনা এমন
অন্ধ সংস্কারের বশে রামে সমর্থন।
সে গর্হিত আচরণ অনুমোদনেরো যোগ্য আর
নহে কভু। হয়ত বা হেন ব্যবহার
একান্ত বহুল ভাবে পুরাকালে ছিল প্রচলিত ;
কিন্তু, তবু—দেশ-কাল-পাত্রের অতীত
যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে
মানব-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত এ জগতে ;
সেই ধর্ম্মে কহে—হেন আচরণ অতীব অন্যায়।
শুদ্ধ যশোলিপ্সা আর রাজ্যের মায়ায়—
সতীর এ ঘোর অপমান, আর এই অবিচার
সমাজের চক্ষে চির-অযোগ্য ক্ষমার।

অজয়। তা' হ'লে, সত্যের লাগি বনবাসে রামেরে পাঠা'য়ে
জ্ঞান-বৃদ্ধ দশরথো করিলা অন্যায় ?
সত্য-পালনের তরে রামের সে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন,
হয় নাই ত'াও সমুচিত ?

অর। অকারণ
বাধাবন্ধহীন হেন সত্য করা—অতি দুর্ব্বলতা,
যা'র লাগি নির্দ্দোষীরে এ রূপে অযথা
সহিবারে হয় দুঃখ। মোর দুর্ব্বুদ্ধির তরে কভু
কোন মতে অপরে তো নহে দায়ী ; তবু,
কোন্ স্বত্বে করি আমি অন্যেরে কঠোর দুঃখ দান
বিনা কোন অপরাধে ? এ হেন বিধান
অসঙ্গত।
কর্ত্তৃপদে পরিবারে যে জন প্রধান
শীর্ষ দেশে করিছেন যিনি অধিষ্ঠান,
তাঁহার উচিত—শুদ্ধ সংসারেরি কল্যাণের তরে
আদেশ প্রচার করা। সেরূপ না করে'
যে জন আপন স্বার্থে উপেক্ষিয়া অস্তিত্ব সবার
করেন নিয়ত বন্ধু, অতি অবিচার ;—
পরিবার-ভুক্ত সবে মনে মানি' সম্পত্তি আপন
তৈজসাদি সম নিত্য করি' অযতন,
স্বেচ্ছাচারে, স্বার্থ-আশে করি'ছেন সদা অবহেলা—
ন'ন তিনি যোগ্য নেতা।—এ তো নহে খেলা
বিধিসৃষ্ট প্রাণ নিয়া।—হোক্ না সে পুত্র-ভ্রাতা মোর,
তবু, তাঁ'র আছে এই ধরণী ভিতর
ব্যক্তিগত জীবনের অনন্ত কর্ত্তব্য নিশি দিন ;
সে-ও জন্মিয়াছে বিশ্বে-স্বতন্ত্র, স্বাধীন,
অমৃতের পুত্র হ'য়ে। অকারণে পেষিলে তাহারে
হ'ব আমি অপরাধী বিধির বিচারে।

অজয়। কহ-শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণে তবে, তব কাছে
কোন চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ?

অর। সীতা ! সেই সতীত্বের অনুপম পুণ্য-গরিমায়
বিশ্বে যিনি চির-মহিয়সী ! যাঁ'র পায়
কল্পনা লুটায়ে পড়ি' করিছে বন্দনা অনিবার।

অজ। তিনি ভিন্ন নাহি কি গো দিব্য চিত্র আর
মহাকাব্যে ?

অর। —মহান্ চরিত্র নাই! বিশ্বে একাধাবে
মহত্তর চিত্র কভু কেহ নাহি পারে
কল্পনা করিতে!
ধৈর্য্যে, ত্যাগে, পুণ্যে ভরতের সম
কে কবে দেখেছে রাজা? চির অনুপম
ভ্রাতৃস্নেহে বীরবর লক্ষ্মণের সম আছে কেবা?
বীর হনুমান সম সখা, প্রভু-সেবা
কে কবে করেছে? কৌশল্যার মত আদর্শ গৃহিণী
ধরাতলে উদিয়াছে কোথা আর?—যিনি
স্বীয় সুত রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনের তরে
বনবাসে করিলে গমন, সমাদরে,
স্নেহভরে ভরতেরে জিজ্ঞাসিয়া কুশল-সংবাদ,
অকপটে করিলেন শুভ-আশীর্ব্বাদ
বাৎসল্যে বিস্মরি' পুত্র-শোক। পড়ে মনে-তারপরে
রামচন্দ্রের জীবন।—যিনি অকাতরে
রাজ্য আশা পরিহরি,' পিতৃ সত্য পালনের তরে
পশিলেন বনবাসে প্রশান্ত অন্তরে
নতশিরে। মানি আমি—রামের সে বিশাল জীবন
অকলঙ্ক নহে! তবু, তাঁহার মতন
ধৈর্য্যবান, সুসংযমী, জ্ঞানী, কর্ম্মী—এ মর-ধরায়
একান্ত বিরল।

পুনঃ, সেই অসহায়
সতীর সে চিত্র মনে আসে—বিনত, মলিন মুখে
দাঁড়াইয়া অগণিত জনের সম্মুখে
মা আমার, রামের সে বাক্য রাশি কুলিশকঠোর
শুনি'ছেন দুঃখ-লাজে কম্পিত অন্তর!
তারপরে, এ অনল পরীক্ষা হইলে সমাপন,
বহ্নিশুদ্ধ মহোজ্জ্বল স্বর্ণের মতন
মিলিলেন যবে আসি পতিদেব সাথে, তবে তাঁ'র
প্রেমানন্দ-উদ্বেলিত নয়ন-আসার
ধৌত করি' দিল রামচন্দ্রের চরণ।—সেই প্রেমে,
সেইক্ষণে চ্যুত হ'য়ে, স্বর্গ এল নেমে'
কলঙ্ক-মলিন এই ধরাতলে!

পরে, পড়ে মনে—
যবে রাম পাঠাইয়া লক্ষ্মণের সনে
না কহিয়া কোন কথা, জ্ঞান-হীনা জানকীরে হায়—
বিনা অপরাধে, স্বীয় যশের লিপ্সায়
ভয়ঙ্কর বনবাসে; যবে সহি' লক্ষ্মণ—অশেষ
মনোব্যথা, নিবেদিলা রামের আদেশ
মাতৃসমা জানকীরে শুষ্কমুখে, ব্যথা-কুণ্ঠ স্বরে;
তখন জানকী সেই অবিচার তরে
পতিরে ভুলেও কোন রূঢ় বাক্য চাঞ্চল্যের ভরে
কহিলা না; শুধু, স্বীয় অদৃষ্টেরি'পরে
হাহাকারে শতবার করিলা ধিক্কার।
পড়ে মনে—
পুনঃ, সেই সর্ব্বশেষ মিলনের ক্ষণে!
শুনিয়া আবার পতিদেবতার নির্ম্মম বিধান
অগ্নি-পরীক্ষার লাগি,—ত্যজিলা পরাণ
তীব্র অপমানে, মরি—প্রচণ্ড, অসহ্য নির্য্যাতনে
জননী আমার!
মাগো, তোর আজীবনে
রাজকন্যা, রাজ্ঞী হ'য়ে পূরিল না কোন আশা হায়!
এসেছিলি এ জগতে শুধু যাতনায়
ঝরে' যে'তে নিঃশেষিয়া, বৃন্তচ্যুত প্রসূনের প্রায়
ত্রিদিব-সৌরভ ঢালি' এপাপ ধারায়!
বড় যে মনের দুঃখে চলে গেলি জননী আমার
শুধু নিজ অদৃষ্টের তরে হাহাকার
করি; শুধু, বারম্বার, দেখিলি যখন—তোরি তরে
স্বামীর নাহিক শান্তি সিংহাসন'পরে,
রামের কল্যাণ লাগি,—স্বামীর পার্থিব সুখ-পথে
নিষ্কণ্টক করি,' তাই, ত্যজিয়া মরতে
চলে'গেলি অভিমানে। মাগো, তুই রামের কণ্টক!
তুই যে মা, রঘুবংশে পুণ্যের আলোক
স্নিগ্ধোজ্জ্বল-অচপল-জ্যোতি! রামাদেশে, মনস্তাপে
যবে মাগো, গেলি চলে,'—সেই মহাপাপে,
বিধাতার শাপে রাম-রাজ্য ধীরে হইল শ্মশানে
পরিণত। এ বিশ্বের লক্ষ্মী-অন্তর্দ্ধানে
সোনার অযোধ্যা পূর্ণ হ'লো হাহাকারে!
(কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হইল।)
ভগবান,
চিরদিন সতীর এ হেন অপমান
সহিতে অশক্ত ভ্রাতঃ।
অজ। বন্ধু, মনে করো একবার—
তোমারো সে অসহায়া সতী অনিবার
তব রূঢ় আচরণে সহিতেছে কি মরম-ব্যথা!
সেও পতি-প্রাণা সতী! দিওনা অযথা
তাহারে বেদনা আর। মুখপানে চাহি' ক্ষণতরে
তুমি কথা কহিলে—যে ধন্য জ্ঞান করে
আপন জীবন, তা'রে আর পেষিওনা উপেক্ষায়,
ঘৃণাভরে কর্ত্তব্যেরে নিয়ত হেলায়
কোরোনা—কোরোনা তুচ্ছ। শান্ত মনে করহ পালন
বিধাতৃ-নির্দ্দেশ মানি' কর্ত্তব্য আপন।
অর। (স্বগত) মাধবী!
মরিরে—সে যে একান্তই ভাল বাসিয়াছে
আমারে পরাণ ঢালি'। আর কেবা আছে—

এ সংসার মাঝে তা'র। আহা—সে যে বড় অসহায়!
সে ব্যথিতা কই আর কিছু তো না চায়,
চাহে-শুদ্ধ মোর কৃপা, বিন্দুমাত্র প্রেম! তবে—তবে,
এমনি কি চিরদিন সে দুঃখিনী র'বে
উপেক্ষায় চির-নিগৃহীতা!
[চিন্তিতভাবে, ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অজ। এবে এতদিন পরে,,
বুঝি—এ প্রবাসে আসি' জাগি'ছে অন্তরে
করুণা তাহার লাগি। নাই আর সেই উদ্বেলতা।
এবে আসিয়াছে চিত্তে স্নিগ্ধ ব্যাকুলতা
ধর্ম্ম পিপাসায়। ক্রমে, ঘুচিয়াছে সংশয় আঁধার,
উদ্বুদ্ধ পরাণ এবে চাহিছে সবার
সাধিতে কল্যাণ। যবে, যাই মোরা অনাথ-আশ্রমে
আতুরেরে সেবিবারে, সাথে সাথে ভ্রমে
তখনো সুহৃদ্‌বর। সাধ্য অনুসারে, সযতনে
দীন অনাথের সেবা করে কায়-মনে।
অষ্টমাস হ'লো গত আসিয়াছি মোরা এ প্রবাসে;
আজো নাহি জানি—কেন সংবাদ না আসে
মাধবীর।
(জীবনরামের প্রবেশ)
এই যে জীবন! কহ—কহ সমাচার
যদি বা নূতন কিছু থাকে।

জীবন। (প্রণামান্তর) পুত্র তাঁ'র
জন্মিয়াছে অপূর্ব্ব, সুন্দর।

অজ। (সোল্লাসে) বটে!

জীব। কিন্তু, তারপর
একান্ত পীড়িতা তিনি, অতীব কাতর।

অজয়। কি কহিলে মাধবীর পীড়া?
হা বিধাতঃ কি করিলে!
সতীর আজন্ম-সাধ নাহি পুরাইলে
কোন মতে। ওহে দেব,—
(জীবনের প্রতি) যাও তুমি—ক্লান্ত পথ-শ্রমে,—
করগে বিশ্রাম।
[জীবনের প্রস্থান]।
যাহা কোন দিন ভ্রমে
কল্পনা করিনি, হায়—হ'ল শেষে সেই পরিণাম!
সে সতীর একমাত্র ছিল মনস্কাম—
পতির চরণ-সেবা; এ জীবনে বঞ্চিত হ'বে কি
তা'হতেও কর্ম্মফলে? হা বিধাতঃ, একি
মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ।
কিছুই যে বুঝা নাহি যায়—
কি যে হ'বে ভগবান তোমার ইচ্ছায়!
[অজয়ের প্রস্থান]।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

শিবাজী ও সুন্দরী।

মহারাষ্ট্র-ভাগ্যাকাশে সমুদিত যবে ভানুসম
শিবাজী নৃপতি,
সেনাপতি স্বর্ণদেব একদিন নিবেদিলা আসি
করিয়া প্রণতি,—
"জয় হোক্ মহারাজ, সম্পাদিত এবে—যে আদেশ
ছিল ভৃত্য 'পরে,
বিজয়-পতাকা তব সগৌরবে উড়িতেছে আজি
কল্যাণ নগরে;
বন্দীকৃত আহাম্মদ—বিজাপুর-রাজ-প্রতিনিধি
সহ পরিজন।"
শিবাজী কহিলা "ধন্য স্বর্ণদেব, বীরত্ব তোমার
রহিবে স্মরণ।"

কহিলেন সেনাপতি, "মহারাজ, আরো কিছু মোর
আছে নিবেদন,
শত্রুপুরী মাঝে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যপ্রতিমা
করিনু দর্শন;—
রূপসী ষোড়শী বালা—তিলোত্তমা রমা এর কাছে
পায় বুঝি লাজ,
হেন ফুল শোভে শুধু রাজোদ্যানে; তাই আনিয়াছি
সাথে, মহারাজ।"

ইঙ্গিতে সৈনিক এক লয়ে এল রাজ সভামাঝে
লজ্জিতা যুবতী;
নিমেষে নিস্তব্ধ সভা, বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্র যত
হেরি সে মূরতি।
যেন এ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন—বিধাতার মানবী-কল্পনা
চিত্রপটে আঁকা!
শিবাজী কহিলা ধীরে—ক্ষণকাল দেখি সেইরূপ
পবিত্রতা-মাখা,—
"মাতঃ তোর গর্ভে যদি জন্মিতাম, আমরাও বুঝি
হতেম সুন্দর!
সেনাপতি, পতিপাশে সযতনে এ কুলবধূরে
পাঠাও সত্বর।"—

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কল্যাণ দুর্গ অধিকারের পর, আবাজী, কল্যাণের শাসনকর্ত্তা মৌলানা আহ্‌মদের পুত্রবধূ একটি সুন্দরী বালিকাকে বন্দী করিয়া, তাহাকে উপহারস্বরূপ শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবাজী বালিকাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমার মা যদি তোমার মত সুন্দরী হইতেন, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত! তাহা হইলে আমিও সুন্দর হইতাম।" তিনি বালিকার সহিত পিতার মত আচরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নূতন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার দিয়া, বিজাপুরে তাহার বাটীতে নিরাপদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর "শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী" নামক সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়াছেন।

শিবাজীর চরিত্রের নানা অসাধারণ গুণের মধ্যে নারীর সহিত পবিত্র ও সংযত ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত "সতী" চিত্র অতি সুন্দর ও সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ হইয়াছে। বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা সতী মহত্তম আত্মোৎসর্গের সময়ও সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতা; তিনি যে অসাধারণ কিছু করিতেছেন, তাহা তিনি মোটেই অনুভব করিতেছেন না। অগ্নিশিখা সকল ভীষণ রাক্ষসের জিহ্বার মত লক্ লক্ করিয়া ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইতেছে। তিনি সেই অগ্নিশিখা-সিংহাসনে নির্ভয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ইষ্ট দেবতার আরাধনার সহিত অশ্রুপাত বা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির সংমিশ্রণ নাই। তাঁহার চক্ষু আর কিছু দেখিতেছে না—নিম্নস্থ অগ্নিশিখা, বা যে সকল প্রিয়জনকে তিনি ছাড়িয়া যাইতেছেন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়িতেছে না—তিনি কেবল তাঁহারই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতেছেন, যাঁহার সহিত তিনি অচিরে মিলিত হইতে যাইতেছেন। তাঁহার চিত্ত স্থির, শান্তিতে প্লাবিত। ইহা মিলনের মুহূর্ত্ত। তিনি বিচ্ছেদের কথা জানেন না।

এই সম্পূর্ণ নির্ভীকতায়, আত্মগৌরবানুভূতির সম্পূর্ণ অভাবে, আমরা নারীচরিত্রের মহিমা সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য পাই! অন্যান্য দেশে, লোকে, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান-বিস্তারের অধিকার লাভ ও রক্ষার জন্য, বা এবম্বিধ অন্য কোন মহৎ ব্যাপারের জন্য, যাহা করিয়াছে, ভারতে তাহাই কুসুমকোমলা নারী দাম্পত্য প্রেমের জন্য সহস্র গুণ অধিক বার করিয়াছে! যাঁহারা এরূপ মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা পূজনীয়া। যে জাতির মধ্যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহস ও নিষ্ঠা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সহমরণ প্রথায় তাহা আর দেখা দিবে না, দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আমাদের জাতিগত এই সাহস ও নিষ্ঠা ভবিষ্যতে অনেক রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বব্যাপী ঘটনায় আবার দেখা দিবে।

বোমা-নিক্ষেপে মজঃফরপুরে দুটি নিরপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা হইয়াছে, ইহা, ও তৎপরে বোমার কারখানা আবিষ্কার, বোমা নির্ম্মাণ ও নিক্ষেপকারীর দল গ্রেপ্তার, এই সকল ব্যাপার এখন সর্ব্ব সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। সত্য বটে, স্ত্রীলোক দুটির প্রাণ বধ বোমানিক্ষেপকারীদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহারা কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে মারিবার জন্য মজঃফরপুর গিয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত হত্যা কখনও ধর্ম্মসঙ্গত বা বীরধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও তৎসংশ্লিষ্ট যুদ্ধে নরহত্যা ধর্ম্মসঙ্গত কি না, কিম্বা কোন্ কোন্ স্থলে ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা এখন বিবেচ্য নহে। ভারতে পূর্ব্বে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ছিল, গুপ্ত হত্যাও ছিল, কিন্তু বোমা ছুড়িয়া মানুষ মারার বুদ্ধিটা ইউরোপ হইতে আমদানী সর্ব্বপ্রকারের গুপ্ত হত্যাই কাপুরুষতা ও পাপকার্য্য। অধিকন্তু বোমা-নিক্ষেপে সর্ব্বত্রেই নিরপরাধ বিস্তর লোক মারা যায়। সুতরাং ইহাতে পাপ অধিক। ইহার দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন দেশকে স্বাধীন হইতে দেখা যায় নাই। অধর্ম্ম দ্বারা উন্নতি সম্ভব নয়; কারণ বিশ্বের বিধান ধর্ম্মবিধান।

আমরা বলিয়াছি, গুপ্তহত্যা কাপুরুষের কার্য্য। কিন্তু শুধু ইহা বলিলে বোমানিক্ষেপকদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। তাহাদের চরিত্র জটিল; উহাতে সদসৎগুণের দুর্বোধ্য সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। তাহাদের চরিত্রে সাহসের ও আত্মো-

সর্গের অভাব নাই। তাহাদের ব্যবহারে দেখা যাইতেছে, তাহারা নিজেদের প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। তাহারা নিজেদের লাভ, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার চরিতার্থতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই; তাহারা ভ্রান্ত হইলেও নিজেরা মনে করিয়াছিল যে দেশের মঙ্গলের জন্য এই কাজ করিতেছে। তাহাদের আত্মোৎসর্গ, অমঙ্গলকর ও বিপথচালিত হইলেও, এক-প্রকারের আত্মোৎসর্গ বটে। তাহারা নিজ নিজ স্বীকারোক্তিতে নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা কোথা হইতে বন্দুকাদি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে, নিজেদের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য টাকা পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না বলিয়া কথা দিয়াছিল বলিয়া, প্রকাশ করিতেছে না। সুতরাং তাহারা সত্য রক্ষা করিতে জানে। নিরপরাধ স্ত্রীলোক দুটির মৃত্যুতে তাহারা দুঃখিত হইয়াছে, এবং ইহাতে আপনাদের কার্য্যে বিধাতার অভিসম্পাত ও রোষের চিহ্ন দেখিয়াছে। সুতরাং, অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক তাহাদের সম্বন্ধে যেরূপ অতিশয়োক্তি করিতেছেন, তাহা ন্যায্য নহে; কারণ, ইংরাজী প্রবচন অনুসারে, শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য দেওয়া উচিত। ইহাও বলা উচিত যে বাঙ্গালী বোমাওয়ালারা এনার্কিষ্ট, বা নিহিলিষ্ট নহে, বিপ্লবকারী মাত্র।

এই ঘটনায় অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। ইহা কেন ঘটিল? ফ্রান্স স্বাধীন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীন; কিন্তু সেখানেও বোমা ছুড়ার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং কেবল রুশিয়ার মত, রাজার দ্বারা স্বেচ্ছাশাসিত এবং উৎপীড়িত দেশেই এরূপ ঘটে, এরূপ সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। সাধারণ বিধির অন্বেষণ করিবার আমাদের প্রয়োজনও নাই। আমাদের দেশে ইহার উৎপত্তির কারণ সহজেই ধরা যায়। বঙ্গবিভাগের সময় হইতে আমাদের দেশে আমাদের মত, আমাদের সুখদুঃখ, ও জাতীয় উন্নতির প্রতি, ইংরাজের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও প্রতিকূলতা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কাছে ন্যায়বিচার পাইবার আশা মরীচিকা, পাইবার ইচ্ছাটাও ভ্রমপ্রসূত এবং অনিষ্ট-কর,—ইহা এখন অনেকেরই মত। ইহাদের মধ্যে যাহারা ধীরবুদ্ধি, তাহারা আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, ও আত্মোন্নতির দিকে সাত্ত্বিক পথে, শান্তির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত। যাহাদের ধৈর্য্য ও সাত্ত্বিকতা কম, তাহারা, নিরস্ত্র দেশে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকায়, পাশ্চাত্য ভীতিউৎপাদক দলের (Terrorists) বোমানিক্ষেপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং মূলে ইংরাজই ইহার জন্য দায়ী। এখন যদি ইংরাজ অবিচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহ, আইনের বাঁধাবাঁধি ও গোয়েন্দাগিরির মাত্রা বাড়ান, এবং আমাদের যে অল্প স্বাধীনতা আছে, তাহাও হরণ করেন, তাহা হইলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। কারণ দেখা যাইতেছে, দেশে (ক্ষুদ্র হইলেও) একদল 'মরিয়া' লোক জন্মিয়াছে। ইহারা রক্তবীজের দল। রক্তপাত করিলে ইহাদের দল বাড়িয়া চলিবে। এই অনর্থের প্রতিকারের উপায়, ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে দেশশাসন, মানুষকে গায়ের রং নির্ব্বিশেষে মানুষ বলিয়া গণ্য করা, দেশের লোকের ধন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

পাশববলের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইবে না। কারণ পাশববলের বিরুদ্ধে পাশববল প্রয়োগে, ভয়ের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শনে সমর্থ ও ইচ্ছুক একদল লোক দেখা দিয়াছে। ভীরুতা-অপবাদ-কলঙ্কিত বাঙ্গালীর শাসন রুশীয় প্রথায় পরিচালিত হওয়ায়, এক ক্ষুদ্র দল তাহার রুশীয় রকমের জবাব দিতেছে। তাহারা নির্ভীক, মরিতে প্রস্তুত; সুতরাং রুশীয়-শাসন-প্রথা ভারতে প্রবলতর ও বিস্তৃততর হইলে, তাহার জবাবটাও ভীষণতর হওয়া অসম্ভব নহে।

এখন কথা এই যে, ইংরাজ এখন নরম হইয়া ধর্ম্মপথে চলিলে, তাহার "প্রেষ্টিজ্" থাকে না, ইজ্জত্ থাকে না, তাহার শক্তি ও সাহসের একটা লোক-দেখান আড়ম্বর, নির্ভীকতার ভাণ, থাকে না;—তাহার এই অপবাদ হয় যে সে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু এই অপবাদের ভয়ে, "প্রেষ্টিজ" যাইবার ভয়ে, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইতে বিরত থাকাও একটা মস্ত ভীরুতা। মুস্কিল এই যে অধর্ম্ম শাঁখারির করাতের মত দুদিকে কাটে। ইংরাজ অধর্ম্ম করায় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; অধর্ম্মের মাত্রা বাড়িলে বোমাও বাড়িতে পারে। অপরদিকে অধর্ম্মপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও ভীরুতা অপবাদের ভয় আছে। যাহা হউক, আমাদের ইংরাজকে

পরামর্শ দিবার ইচ্ছা নাই। কারণ আমাদের পরামর্শ ইংরাজ শুনিবে না। আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহাই পরে বিবেচ্য।

কোন কোন ইংরাজ সম্পাদক সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, অধিক বা অল্প মাত্রায় বোমানিক্ষেপকদিগের সহযোগী বলিতেছেন। ইহার উত্তর দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন ও অবজ্ঞার বিষয় মনে করি। কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে সমুদয় দেশবাসীই ঐ দলের সহানুভূতিকারী, তাহা হইলেই বা এই সম্পাদকেরা কি করিতে চান? সকলকে ফাঁসী দিতে, নির্ব্বাসন করিতে, জেলে পাঠাইতে কেহই পারে না। বহুসংখ্যক লোককে ঐ প্রকার সাজা দিয়াও ত রুশিয়ায় দেখা গিয়াছে। কি ফল হইয়াছে? এখন ত এ কথাও বলা চলে না যে রুশীয় চরিত্রে সাহস ও দৃঢ়তা আছে, কিন্তু সকল বাঙ্গালীরই চরিত্রে কেবল ভীরুতা ও মূঢ়তা আছে।

বেশী জোরে বাঁধিতে গেলে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। কোন সদ্গুণের বা অসদ্গুণের কল্পিত অভাবে, ভাল বা মন্দ কোন কাজই কোনও জাতির অসাধ্য থাকে না, ইহাও মনে রাখা উচিত।

পাইয়োনীয়ার, ইংলিশম্যান, প্রভৃতি কাগজে এখন কঠোর আইন, কঠোর শাস্তি, প্রভৃতির পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ১৯০৬ সালে রুশীয় প্রধান মন্ত্রী ষ্টোলিপিনের বাগান বাড়ীতে রুশীয় বিপ্লবকারীরা যখন বোমা ছুড়িয়া কতকগুলি লোককে মারিয়া ফেলে, তখন পাইয়োনীয়ার কি লিখিয়াছিলেন দেখুন।

"The horror of such crimes is too great for words, and *yet it has to be acknowledged, almost, that they are the only method of fighting left to a people who are at war with despotic rulers able to command great military forces against which it is impossible for the unarmed populace to make a stand.* When the Czar dissolved the Duma he destroyed all hope of reform being gained without violence. Against bombs his armies are powerless, and for that reason he cannot rule, as his forefathers did, by the sword. It becomes impossible for even the stoutest-hearted men to govern fairly or strongly when every moment of their lives is spent in terror of a revolting death, and they grow into craven shirkers, or sustain themselves by a frenzy of retaliation which increases the conflagration they are striving to check. *Such conditions cannot last.*"—*The Pioneer*, 29th August, 1906.

অর্থাৎ পাইয়োনীয়ারের মতে রুশিয়ায় মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।

ইংরাজকে আর একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের কোন কোন কাগজে খুব শীঘ্র বোমানিক্ষেপকদিগের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া ইংরাজ সম্পাদকেরা ভারি বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করাইবার জন্য তাগিদ দিতেছিলেন। আমরা অবশ্য নরহত্যাকারী নহি, ওরূপ কাজ ধর্ম্মসঙ্গতও মনে করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ হত্যাকারীরা যখন অকারণ নিরপরাধ দেশীয় লোকের প্রাণ বধ করে, তখন তোমাদের ক্রোধ ও ঘৃণা কোথায় থাকে? উত্তেজনা-প্রসূত রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যাও সমর্থনযোগ্য নহে; কিন্তু অকারণ অসহায় নেটিভ্ হত্যার বেলা তোমরা চুপ্ করিয়া থাক কেন? তোমরা আর যাহা কর, ভণ্ডামির মাত্রা আর বাড়াইও না।

এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচ্য। আমরা দেখিতেছি আমাদের দেশের অনেক বিপথগামী লোকদেরও চরিত্রে, সাহস আছে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে, (তাহাদের মতে) দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ আছে, দৃঢ়তা আছে, সত্য রক্ষার ক্ষমতা আছে। এই সকল সদ্গুণ অন্য অনেক লোকের চরিত্রেও নিশ্চয়ই আছে। এই সকল সদ্গুণ ও শক্তি দেশের কল্যাণকর পথে চালিত করাই দেশের নেতাদের এখন প্রধান কার্য্য।

বোমানিক্ষেপকদের কাজের সমর্থন কেন করি না, তাহা বলিতেছি। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্মের দমন হয় না, ধর্ম্মের দ্বারা হয়। কিন্তু ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে যদি মতভেদ হয়, তাহা হইলে বলি, ইহা নিষ্ফল। মনে করুন, যদি কিংস্ফোর্ড সাহেবই মারা পড়িত, যদি মিণ্টো এবং মর্লীকেও মারা যাইত, তাহাতে তাঁহাদের স্থানাভিষিক্ত হইবার লোকের অভাব হইত না। শেষোক্ত লোকদের প্রাণবধ করিলে তাহাদেরও যায়গায় অন্য লোক জুটিত। রোগের বীজ ত এই লোকগুলিতে নয়, রোগের

বীজ ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে, আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতায়। গল্প আছে যে একটি ছেলে নিজের ভাইয়ের নিকট এই বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল যে "ভাই, আমাদের গুরুমহাশয় মারা পড়িয়াছে; আর ঠেঙ্গাইবার লোক নাই।" তাহাতে তাহার অধিকতর বুদ্ধিমান্ ভাই বলিল, "দূর, বোকা, বাবা ত মরে নাই; বাবা আর একজন গুরুমহাশয় ডাকিয়া আনিবে যে।" ইংরাজের দূষিত শাসন-প্রণালী এই "বাবা"র মত। উচ্চতর ইংরাজ কর্ম্মচারীকে মারিলেও এই "বাবা" মরিবে না। যদি কেহ বলেন, অনেক ইংরাজকে এইরূপে মারিলে ইংরাজ ভয় পাইয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দিবে, স্বাধীনতা দিবে। তাহার উত্তর এই—ইংরাজ ভয় পাইয়া কোন কাজ করিবে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ সে ভয় পাইয়াছে, ইহা নিজ আচরণ দ্বারা জানিতে দেওয়াই তাহার পক্ষে বিপজ্জনক। দ্বিতীয় কথা এই, স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, উহা নিজ শক্তিতে অর্জ্জন করিতে হয়, এবং অর্জ্জন করিয়া রক্ষা করিতে হয়। তোমার যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষণের শক্তি থাকে তাহা হইলে তুমি গুপ্ত হত্যার পথে যাও কেন? আর যদি তোমার স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিও না থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ ভয়ে পলাইয়া গিয়া তোমাকে স্বাধীন করিয়া দিলেও তোমার স্বাধীনতা টিকিবে কয় দিন। ইহা পড়িয়া কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি তুমি বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিতে বল? আমরা বলি, না। বিদ্রোহের ঔচিত্যানুচিত্য, বা প্রয়োজনের বিচার না করিয়াই বলিতেছি, না; কেন না আমাদের অস্ত্রও নাই, একতাও নাই, দল বাঁধিবার যথেষ্ট ক্ষমতাও নাই। ভারতবাসী আর বিদ্রোহ করিতে পারে না। আমাদের পথ অন্য প্রকারের। ইহাতেও সাহস চাই, জীবনোৎসর্গ চাই, কঠোর সাধনা চাই। যাহা অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এক দিনে গড়িবে না। কিন্তু ভাঙ্গিতে যত দিন লাগিয়াছে, গড়িতেও তত দিন লাগিবে, ইহা বলা যায় না। আমাদের সাধনা, এবং আত্মোৎসর্গের পরিমাণ ও মাত্রা অনুসারে আমাদের জাতীয় মোক্ষলাভের দিন ঘনাইয়া আসিবে।

আমাদের অবলম্বনীয় পন্থার বিচার পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, উহা এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে আমরা আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি।

প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে বঙ্গে হাহাকার উঠে। রোড্‌সেসের টাকায় এই অভাবের অন্ততঃ আংশিক ভাবেও মোচন হইতে পারে; কিন্তু সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন, দেশের ধনিলোকগণ বিলাসব্যসনমোহে নিমগ্ন, ইংরাজের পরিতুষ্টি সাধন দ্বারা উপাধি অর্জ্জনে ব্যস্ত, ঋণগ্রস্ত, বা অন্য কোনও কারণে জলাশয়খনন দ্বারা পুণ্যলাভ হইতে বঞ্চিত। এখন জনসাধারণ সমবেত চেষ্টা দ্বারা যাহা করিতে পারেন, তাহাই ভরসা;—এবং জনসাধারণ এরূপ চেষ্টা দ্বারা না করিতে পারেন, এমন কোনই কাজ নাই। এই জন্য আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে যশোহরের বাসুন্দী নামক একটি গ্রামে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা এই বিষয়ে স্বাবলম্বনের সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীটি শুকাইয়া যাওয়ায় লোকের বড় কষ্ট হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা শুষ্ক নদীগর্ভে স্বহস্তে কূপখননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা "তন্, মন, ধন" পরার্থে উৎসর্গ করিতে পারেন।

সৈয়দ আব্দুল্লা অল্ মামুন সুহ্রাওয়ার্দী বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ, নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত বিশ্বমুসলমান-সমিতির (Pan-Islamic Society) স্থাপনকর্ত্তা। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস হইল পূর্ণিয়ায় চতুর্থ মুসলমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ উৎসাহপূর্ণ, এবং ধর্ম্মভাব, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্ম-বিষয়ক ঔদার্য্য, ও বিদ্যানুরাগের একত্র সম্মিলনে উপাদেয় হইয়াছিল। অনেকের ধারণা মুসলমানমাত্রেই অন্য ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ও ধর্ম্মান্ধ। সুহ্রাওয়ার্দী মহাশয়ের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত সুরচিত অংশ দুটি পড়িলে এই ধারণা দূর হইবে।

"Yet Islam, the very name of your religion, indicates self-abnegation, self-surrender and self-sacrifice, and that spirit pervades all the religious functions and institutions of Islam. You cannot be totally unacquainted with that interpretation of the meaning

বোমাওয়ালাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহে ধৃত
শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।

বোমাওয়ালাদিগের নেতা বলিয়া ধৃত
শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।
বাল্যের ছবি। আধুনিক ছবি নাই।

শ্রীযুক্ত আব্‌দুল্লা অল-মামুন্ সুহ্‌রাওয়ার্দী, সী. আই. এম্., পীএইচ্. ডী., এল্‌এল্. ডী., ইত্যাদি, ব্যারিষ্টার্ ;
১৯০৮ সালের মুসলমান্ আলোচনা সমিতির সভাপতি। (ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছবি)।

of Islam. But yours is a mistaken idea of self-sacrifice. At the call for Jihad a thousand Muslims would rush forth and gladly lay down their lives for the holy faith. But it is harder to live than to die for Islam In order to grasp the full meaning of life, you have only to look back and contemplate the grand and commanding personality of that Great Son of Arabia who was at once an emperor, a conqueror, a warrior, a poet, a philosopher, a prophet and a seer. Life—not death—is writ large on the dramatic history of the achievements of Muhammad, the son of Abullah. It was not by the vulgar Jihad, the holy war, with whose name and fame you are all familiar, that he established his empire in the hearts and imaginations of the faithful. It was by the Jihad ul-Akbar—the greater Jihad—the sacrifice of the self at the altar of duty. Not only he but every great man who has left his impress on the pages of Time, every one who has robbed death of its darkness and annihilation of its terrors, every man who has asserted himself above all his fellows, has done so by a supreme act of self-effacement, self-abnegation and self-denial. Prince Siddhartha abandons his royal heritage and dedicates his long life to the service of Humanity. He loses the kingdom of Kapilavastu. But wait and measure his gain. Enthroned on the hearts of countless millions, he rules to-day over a wider, vaster and more enduring empire, adored and worshipped as the Lord and Gautama, the Enlightened, the Buddha Six centuries roll by. We witness the enactment of an awful tragedy in Jerusalem, the city of peace. But the Cross, which wrung from the unwilling lips of the son of Mary the bitter cry of anguish and despair—"My Lord, my Lord, why hast thou forsaken me"--is to-day the Cross of Hope at which thousands of hopeless hands are clinging. Six centuries roll by. Once more we behold another man at Mecca, 13 years of whose ministry have been one long crucifixion, a humble fugitive from the city of his birth seeking an asylum in distant Yathrib. But to-day the name of the son of Abdullah is second only to that of Allah. The lips of his innumerable followers utter his name with reverence and respect five times a day. The cry of the Muezzin, at dawn and at sunset, wafts it from the pillars of Hercules to the Great Wall of China. Eternal life in the Hereafter is a reward of death in the Here. The Crown of Thorns is the price of the Crown of Immortality."

"I for one am proud to declare that the blood of the Aryans flows in my veins with that of the Semitics. A greater and a wider heritage becomes mine when I feel that I owe allegiance not only to Moses, Christ and Muhammad, but also that Zarathustra, Srikrishna and Gautama claim my homage. The Gita as much as the Gospel of Islam, belongs not to this race and that, but to whole humanity."

ধর্ম্মের জন্য মরা অপেক্ষা তজ্জন্য জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ব্যয় করা কঠিন, ইহা অতি সত্য কথা।

মুসলমানেরা স্বদেশপ্রেমিক নহে বলিয়া যে অপবাদ আছে, তৎসম্বন্ধে বক্তা বলেন—

"The Muslim is often reproached for lack of patriotism. Yet it was the Prophet of Islam who declared patriotism to be a part of religion It is true our sympathies travel beyond the bounds of India, that our *pati* is the whole world of Islam. But the true pan-Islamist, who dreams to unite the various sects of Islam, also longs to draw the Hindus and Muslims closer to each other; nay yearns for the dawn of a deeper and wider brotherhood of humanity existing under the ægis of the Imperialism of a universal religion."

তিনি মুসলমানদিগের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মুসলমানের অনুধাবনযোগ্য।

অনেক বৎসর হইতেই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী, মুটে মজুরের কাজ, কল কারখানায় কুলির কাজ, প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, বা নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করিতেছিল। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। তের বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, শ্রমের ক্ষেত্র হইতে, ছুতার প্রভৃতি কারিগরের কাজ হইতে, মুদিখানা, পানের দোকান, সরবতের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কারবার হইতে, বাঙ্গালী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাড়িত হইয়াছে। যাহারা বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। আমাদের বিচার্য্য এই যে বাঙ্গালী কেন দিন দিন দুর্ব্বল ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িতেছে? সাধারণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বাবুর মত কি শারীরিক শ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে?

তাহা হইলে ইহার চেয়ে জাতীয় দুর্ভাগ্য, ও অধোগতির কারণ, আর কি হইতে পারে? ভগবান্ হাত পা দিয়াছেন, যাতে পঙ্গু লোকদের মত অক্ষম হইয়া বসিয়া থাকিবার জন্য নহে,—কাজ করিবার জন্য। ধুলা মাটিতে, ময়লাতে, মানুষ কলঙ্কিত ও অপবিত্র হয় না,—অসাধুতা ও দুর্নীতিতেই কলঙ্কিত হয়। বাহিরের মলিনতা স্নানপ্রক্ষালনেই দূর হয়, দুর্নীতির দুর্গন্ধ কোনও সুগন্ধি জিনিষে দূর করিতে পারে না। মাটির সঙ্গে, শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যে জাতির যত কম সম্পর্ক, সে জাতি ততই বিনাশের নিকটবর্ত্তী।

আমরা প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য যত কবিতা পাই, তাহার অতি অল্প অংশই ছাপিতে পারি। প্রকাশযোগ্য কবিতাও অনেক সময় স্থানাভাবে বাহির হয় না। তদ্ভিন্ন আর একটি কথা আছে।

অনেক প্রেমের কবিতা আসে। লেখকগণ অনেকেই যুবা,—বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত। তাঁহাদের প্রেম কথার কথা, না সত্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। টাকার জন্য যাহারা বিবাহ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদিগকে প্রেমিক বলিতে পারি না; সুতরাং তাহাদের কবিতাও কেবল বাক্যের শ্রাদ্ধ মাত্র। এই জন্য আমাদের এইরূপ একটা নিয়ম করিবার ইচ্ছা হইতেছে:—

"১। যে সকল বিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা তৎসঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন যে বিবাহের পূর্ব্বে, তাঁহাদের, শ্বশুরের ধন ও শ্বশুরের কন্যা, কাহার প্রতি কতটা প্রেম জন্মিয়াছিল, এবং তাঁহারা কি পরিমাণে নিজের শ্বশুরকে ঋণগ্রস্ত, সর্ব্বস্বান্ত বা পথের ভিখারী করিয়াছেন।

"২। যে সকল অবিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা লিখিবেন যে তাঁহারা হৃদয়ের কতটুকু স্থান ভাবী শ্বশুরের ধনের প্রতি প্রেমে ও কতটুকু শ্বশুর-কন্যার প্রেমে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা শ্বশুরকে কি পরিমাণে ঋণগ্রস্ত, সর্ব্বস্বান্ত বা পথের ভিখারী করিতে অভিলাষী।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য। কেহ যদি বলেন যে তাঁহার (বর্ত্তমান বা ভাবী) শ্বশুরের ধনের প্রতি লোভ নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন চিন্তাপাঠকের (thought-reader এর) সার্টিফিকেট দিতে হইবে।"

যে দেশে বর ও কন্যা বিক্রী হয়, সে দেশে লোকে কেন প্রেমের নাম করে?

কয়েক মাস হইতে ডাকবিভাগ ভ্যালুপেয়েব্‌ল ডাক সম্বন্ধে যে ফারম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কাজের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা গ্রাহকদের নাম, ঠিকানা ও নম্বর যাহা লিখিয়া দিতাম, তাহাই ফেরত আসিত। এখন ডাকবিভাগ নূতন একটি ফারমে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। কাজে তাহা করিলে আমরা বাধিত হইতাম। কিন্তু এখন আমরা যে সকল ফারম পাই, তাহার অধিকাংশেই পুরা ঠিকানা ত থাকেই না, কখন কখন কেবল সহরের বা গ্রামের নামটি সংক্ষেপে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে, কখন বা অতি অস্পষ্ট অক্ষরে সংক্ষেপে কেবল গ্রাহকের নামটি মাত্র থাকে। ইহাতে আমাদের টাকা জমা করিতে, এবং যথাস্থানে কাগজ পাঠাইতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই জন্য গ্রাহকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহাদের নাম বা ঠিকানায় কোন ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাঁহারা শীঘ্র, গ্রাহক নম্বর সহ, জানাইবেন। আমাদের ঠিকানা ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সমুদয় সংবাদপত্র-পরিচালকের এবিষয়ে ডাকবিভাগে প্রমাণসহ অভিযোগ করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

বিরাম-সঙ্গীত—শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। হাবড়া, শিবপুর, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ৩০১ সংখ্যক ভবনে শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বাদশাংশিত ডিমাই ২৯ পৃষ্ঠা; আর্ট কাগজে মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। কাগজ ভালো বলিয়া বহিঃসৌষ্ঠব মন্দ হয় নাই। নতুবা ছাপার অনেক দোষ আছে। হরফের রেজিষ্টার ঠিক হয় নাই; চাপ এত বেশি হইয়াছে যে এক পৃষ্ঠার লেখা অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; কালী সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। পুস্তকখানিকে সুদৃশ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। কবিতা মোটে ২১টি; তাহাদের বিষয়াভাস 'নৈরাশ্য, উপশম, মোহ, শান্তি ও নির্দ্দেশ'। অনেক কবিতার অনেকস্থল দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে; যেখানে যেখানে প্রাঞ্জল হইয়াছে সেখানকার ছন্দের গাম্ভীর্য্য মনোহর হইয়াছে। ইহার ছন্দে চটুল তরলতা নাই, সর্ব্বত্রই একটা গাম্ভীর্য্য কবিতাগুলিকে আধুনিক কবিতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। লেখক ভাষার অর্থ আরো একটু পরিস্ফুট করিলে পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক হইত। পুস্তকের মূল্য ছয় আনা মাত্র।

আমার দেশ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বিরচিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীবসন্তকুমার দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বাদশাংশিত ডিমাই ৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা মাত্র। এই পুস্তিকার উপস্বত্ব স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ইহা কবিতাপুস্তক। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা ভাবের প্রাচুর্য্যে তরুণ হৃদয়ের আশা উৎসাহে, উৎফুল্ল। একটু উদ্দাম আবেগ আছে, তাহা কালে থিতাইয়া দানা বাঁধিলে নবীন কবির রচনা আরো উপভোগ্য হইবে। এই সামান্য মূল্যের পুস্তিকাখানি ক্রয় করিয়া পড়িলে নিজেকে পরিতৃপ্ত, নবীন কবিকে উৎসাহিত ও স্বদেশের কল্যাণে সাহায্য করা হইবে, প্রবাসীর সকল পাঠক পাঠিকা স্মরণ রাখিবেন।

সিসিদাস—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বিরচিত। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১২ পৃষ্ঠা—সূচনা ২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় আনা মাত্র। ইংরাজ কবি মিল্টনের কাব্যের অনুবাদ। বান্ধব হইতে পুনর্মুদ্রিত। এই অনুবাদ মূলানুগত হইয়াও প্রাঞ্জল হইয়াছে। বহুস্থানে কবিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। দীর্ঘপদী ছন্দ কবিতার অধিকতর সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছে। তরুণ কবির নমুনা আশাপ্রদ।

অশ্রুহার (কাব্য)—শ্রীসতীশচন্দ্র বসু প্রণীত। কুড়িগ্রাম হইতে শ্রীতারকেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৭৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। ইহাতে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ, এখানি কাব্য। আমাদের না মানিবার উপায় নাই। যদি অমন স্পষ্টাক্ষরে এই পুস্তকখানিকে 'কাব্য' বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা না থাকিত, তবে আমরা কি মনে করিতাম 'ছড়া'? হয় ত ইহা অনুমান করিয়াই সমালোচকের পথে কাঁটা দেওয়া হইয়াছে। যিনি কাব্য লেখেন তিনি সুতরাং কবি; কবি নিরঙ্কুশ। এবংবিধ কবি দেখিয়া গোবিন্দ অধিকারীর একটা গানের এক পদ মনে পড়ে, "রাজার নন্দিনী প্যারী যা করেন তাই শোভা পায়।" কবি যে কতদূর নিরঙ্কুশ তাহা "মাতৃমূর্ত্তি" নামক পদ্যের পাদটীকায় মালুম। কবি লিখিতেছেন "এই কবিতাটি কোন নির্দ্দিষ্ট ছন্দঃ অবলম্বনে রচিত হয় নাই। পাঠক ক্ষমা করিবেন।" এইটি ও আর একটি পদ্য গ্রন্থকারের সহোদরের রচিত। প্রকাশক নিবেদন করিয়াছেন, "একাদশ বর্ষ হইতেই গ্রন্থকার পিতৃমাতৃহীন। * * * তৎপরে তাঁহার সাধ্বীপত্নী * * স্বর্গধামে গমন করেন। জীবনের এই সকল নিদারুণ ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে এই "অশ্রুহার" গ্রথিত। ভরসা-করি, পবিত্র শোকাশ্রু বলিয়া এই ক্ষুদ্র কাব্যের সহস্র দোষ এবং ইহা জনসমাজে প্রকাশের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।" সমালোচককে কাবু করিবার আয়োজন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আমরা গ্রন্থকারের দুঃখে সমবেদনা দেখাইতে পারি, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সাধারণের ও সাহিত্যের এই নিগ্রহ সহ্য করিতে অক্ষম। যেগুলা নিতান্তই subjective (ব্যক্তিগত) কবিতা, তাহার মধ্যে অসাধারণ কবিত্ব না থাকিলে সাধারণের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। এরূপ পদ্য বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ চলে, সাধারণগ্রাহ্য হইবার আশা করা অন্যায়। আপনাকে বিশ্বে যিনি যত ব্যাপ্ত লুপ্ত করিতে পারিয়াছেন তিনি তত বড় কবি, তাঁহার সহিত সাধারণ হৃদয়ের সংযোগ তত প্রগাঢ়। গ্রন্থকার প্রত্যেক কবিতায় আপনাকে সুস্পষ্ট রাখিয়াছেন। যাহাই হউক এই ত্রুটি ছাড়িয়া দিয়া পদ্যগুলির নিজস্ব গুণের বিচার করিলে বলিতে হয় কবিতাগুলি প্রাঞ্জল ও সরস হইয়াছে। তথাপি বিশেষত্বের নিতান্ত অভাব।

মেঘদূত—শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত অনূদিত এবং বিবিধ টীকা টিপ্পনী সহিত সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৫১ পৃষ্ঠা, মূল্য একটাকা। এ পর্য্যন্ত মেঘদূতের অনুবাদ হইয়াছে অনেকগুলি। বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ব্বজগণ অপেক্ষা কবিত্ব ও মাধুর্য্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ না হইলেও, ইহার বিশেষত্ব আছে, যাহার গুণে ইহা আদৃত হইবে। ইহাতে মূল মেঘদূত আছে, তাহার পদ্যানুবাদ আছে। তাহা প্রাঞ্জল করিবার জন্য গদ্য ব্যাখ্যা আছে; পাদটীকায় কঠিন শব্দের অর্থ ও অন্যান্য টিপ্পনী আছে। কবিবর্ণিত মেঘের পথ অনুসরণ করিয়া মেঘাতিক্রান্ত সকল জনপদ, নদ নদী প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ও আধুনিক নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র থাকিলে আরো সুন্দর হইত। দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইলে এই ত্রুটি অপনোদন করা হইবে আশা করি। ভূমিকায় লেখক সংক্ষেপে মেঘদূতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উহা নিতান্তই সামান্য হইয়াছে। বিষয় সূচীটি উত্তম হইয়াছে। পরিশিষ্টে কালিদাসের সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের টিপ্পনী আছে। পদ্যানুবাদ মন্দ হয় নাই। কিন্তু এক একটী শ্লোকের অনুবাদ আট দশ লাইনে করিতে হইয়াছে। তাহাতে একই প্রকারের মিল পুনঃ পুনঃ ঘটায় শ্রুতিকটু বোধ হয়। অনুবাদকের নিজ হৃদয়ের ইতিহাস স্বরূপ অগ্রপশ্চাতের দুটি কবিতা সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিলেও সাধারণের কোনো ক্ষতি হইত না।

কথাকুঞ্জ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। "স্বদেশী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ষোড়শাংশিত ফুলস্ক্যাপ ১৬৯ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি গল্পের বই। আটটি গল্প আছে। সকল গুলিই সুলিখিত। সকল গল্পগুলিতেই একটি দুঃখমিশ্রভাব এমন অলক্ষ্যে হৃদয়কে জড়ায় যে গল্প শেষ করিয়াও তাহার অনুরণণ অন্তরে বাজিতে থাকে। লেখকের ভাষা ভালো, কিছু পালিস কম, প্রতি পংক্তি সরস মধুর লাগে না। এই জন্যই ঋণশোধ নামক সুন্দর গল্পটির আখ্যায়িকা নগ্নবৎ একটু শ্রীহীন বোধ হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িলেই নূতন ব্রতীর কাঁচা হাত টের পাওয়া যায়। অনুশীলন দ্বারা ভাষা মার্জ্জিত করিলে এই অভাবটুকু দূর হইবে আশা করা যায়।

চন্দ্রধর—শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত কাব্য। ১৭৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানি অমিত্রাক্ষর কাব্য, বেহুলার ভাসান অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে কিন্তু চাঁদ সদাগর নূতন নাম পাইয়াছেন "চন্দ্রধর", বেহুলা সতী হইয়াছেন "বিপুলা", লক্ষীন্দর হইয়াছেন "লক্ষীন্দ্র"। এই সব অনর্থক পরিবর্ত্তনে বা পুরাতন স্বল্পপ্রচলিত নামের পুনঃ প্রচলনে বাঙালীর অতি পরিচিত নামের সঙ্গে যে একটা মধুময় ভাব জড়িত আছে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে লেখকও পাঠকের পূর্ব্বসঞ্চিত সহানুভূতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বেহুলা ও চাঁদ বেণের চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাতে উভয় চরিত্রই প্রাচীন কাব্যবর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে মনে করি। এই কাব্যে চাঁদ সদাগর শত লাঞ্ছনায় বিপর্য্যস্ত হইয়াও অবিদ্যা বা মায়ারূপিণী মনসাকে দেবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, পূজা করা ত' দূরের কথা। তাঁহার মহেশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস খ্রীষ্টান মার্টারদিগকে স্মরণ করায়। কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—কর্ম্ম বিভাগে তাঁহারই শক্তি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হয়। সেই একের বহুরূপে প্রকাশকে পৃথক জ্ঞান করা মায়া বা অবিদ্যা। যে অবিদ্যাকে স্বীকার করিয়া বহুর মধ্যেও একেকে দেখিতে পায় সেই প্রকৃত দ্রষ্টা। আর যে একেকে বহু করিয়া দেখে তাহার ত' গতি নাইই, আর যে একই জানে, ঐশীমায়ার বহুরূপ প্রকাশ মানে না, তাহার অন্তে সদ্গতি হইলেও জীবনে দুর্ভোগ অনিবার্য্য। চাঁদ সদাগর শেষোক্ত প্রকৃতির বিশ্বাসীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যবর্ণিত বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ঠিকই হইয়াছে। বেহুলা যে আত্মত্যাগ ও স্বামী-প্রীতি দেখাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যথেষ্ট পরীক্ষা। কিন্তু বক্ষ্যমান কাব্যে কবি বেহুলাকে দিয়া দেবসভায় গান করাইয়া বেহুলার প্রতি দেবপ্রসাদ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে দেবতার দেবত্ব গিয়াছে, বেহুলারও সতীত্বগৌরব ম্লান হইয়াছে। দেবতার নিকট বেহুলার চরিত্র অপেক্ষা গানের কদর অধিক হইয়াছে। দেবতার প্রসাদ লাভ বিষয়ে বেহুলার চরিত্রই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কণ্ঠের সুপারিশ নহে। কবি মনসাকে ঐশ বিভূতিরই অংশ করিতে গিয়া একটি প্রহেলিকা রচনা করিয়াছেন। মহেশ্বরের সহিত মায়াময়ী মনসার সম্বন্ধটা বেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। এই পুস্তকখানি লেখকের কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াস বলিয়া মনে হয়; এখনো ভাব সংযত, আখ্যান বিষয়ে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতা লেখকের অনায়ত্ত রহিয়াছে। নতুবা ভাষায় বাঁধুনি, প্রকাশে কবিত্ব ও রচনায় পারিপাট্য আছে। সাধনায় সিদ্ধি মিলিবে।

উপমা গুলিতে এখনো কাঁচা হাতের দাগ বেশ টের পাওয়া যায়। প্রায় উপমাতেই পুংলিঙ্গ উপমেয়ের বা উপমানের সহিত স্ত্রীলিঙ্গ উপমান বা উপমেয়ের তুলনা বিশ্রী শ্রুতিকটু হইয়াছে। অথচ কবি ইচ্ছা করিলেই এই বৈসাদৃশ্য পরিহার করিতে পারিতেন। একটি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি—

"অভাগী অমৃত নহে, হে নাথ, বিষম
কালকূট, কাল ফণীবর কণ্ঠে তব'
কুসুমের মালা বলে' ধরেছ আদরে,—(৩১ পৃষ্ঠা)

'ফণীবর' না লিখিয়া 'ফণিনীরে' লিখিলেই 'অভাগী' ও 'মালা'র সহিত সমলিঙ্গ হইয়া উপমা সার্থক ও সুন্দর হইত। এরূপ অনবধানতা বহুবার ঘটিয়াছে। ভাষাতেও দুই এক স্থলে অত্যাচার দৃষ্ট হইল—'হ'ল অন্তর্ধান' চলিত ভাষায় চলিলেও লিখিত ভাষায় ইহা অশুদ্ধ; 'হ'ল অন্তর্হিত' বা 'কৈল (করিল) অন্তর্ধান' লেখা উচিত। 'নতুবা' শব্দের বদলে 'নতু' ব্যবহার বাংলা ভাষার প্রতি অত্যাচার; 'নতুবা' পূর্ণ আকারেই বাংলা, 'নতু' কিন্তু বাংলা নহে, সংস্কৃত। পুস্তকখানির ছাপা নির্ভুল হয় নাই।

নববোধন—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ২৮২ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধানো। মূল্য এক টাকা। পুস্তক খানির ছাপা ও কাগজ কদর্য্য। বহু স্থানে হরফ উল্টিয়া গিয়াছে, সব লাইনগুলি এক দৈর্ঘ্যের নহে, কারণ ফর্ম্মা ভালো করিয়া কষা হয় নাই। সকল ফর্ম্মার কালীও সমান হয় নাই। ভুলও মধ্যে মধ্যে আছে। আজ কাল পুস্তকের বহিঃসৌষ্ঠব একটা মস্ত সুপারিশ, খুব বড় আকর্ষণী, ইহা গ্রন্থকারগণ ভুলেন কেন? যাহাই হউক, পুস্তকখানি সুলিখিত উপন্যাস। দেশে রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসহায় দুর্ব্বল প্রজা কি করিতে পারে তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর আগে দোষে গুণে বাঙালী জাতি কি ছিল, ইহা তাহারই সুন্দর চিত্র। বাঙালীর আত্মবিবাদ ও হীন স্বার্থ দেশকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে দেয় নাই ইহাতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পাত্র পাত্রী জীবন্ত ও যথার্থ। সব চেয়ে স্পষ্ট হইয়াছে বোধ হয়, রূপনাথ, কমলা, শঙ্কর ও আবদুল—ইহারাই আখ্যায়িকার কেন্দ্র। একটু যে বৈসাদৃশ্য আছে তাহা রামরূপ, কৃষ্ণকান্ত ও পার্ব্বতীর চরিত্রে। রামরূপ ও কৃষ্ণকান্তের দেশদ্রোহিতার কার্য্যকারণ সম্পর্ক আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। পার্ব্বতীর চরিত্র চিত্র এই সুন্দর উপন্যাস খানির অমার্জ্জনীয় কলঙ্ক। পার্ব্বতীর ভ্রষ্ট চরিত্রের বর্ণনা ও তাহার অনাচার ভাষার ফেরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সামান্য ইঙ্গিতেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিত। রামরূপ ও পার্ব্বতীর ব্যবহার ও আলাপ কে আপনার স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীকে পড়িতে দিতে চাহিবে? ইহাদের উৎকট ও বীভৎস অনাচার স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত করিয়া গ্রন্থকার এমন সুন্দর উপন্যাস খানিকে ভদ্র পরিবারের অপাঠ্য করিয়াছেন। ২০৬৷২০৭ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন এই পুস্তক বাজারে দেওয়া হয়, নতুবা এই পুস্তক পাঠে উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হইবে। এই সব ঘৃণ্য চরিত্রের লোক শেষ পর্য্যন্তও অনুতপ্ত নহে, ইহাই আরো আপত্তির কারণ। পাপের সুখময় চিত্র ও ধর্ম্মের নির্য্যাতন যদি সতর্কতার সহিত না দেখাইতে পারা যায়, তবে মানুষের সহজ পাপপ্রবণ মন পাপের চিত্রের প্রতি অলক্ষ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই পুস্তক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাহিত্য সেবার প্রথম ফল। ফল সুমিষ্ট কিন্তু কীটাকুলিত; এই এক দোষ গুণরাশি-নাশী হইয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যের পরিতাপের বিষয়। প্রথম সংস্করণ নষ্ট করিয়া সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলে সাহিত্য ও সমাজ উপকৃত হইবে, গ্রন্থকারও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। প্রথম রচনার অসংযত অংশ পরিপাক না করিয়াই প্রকাশ করা বুদ্ধিমান গ্রন্থকারের উচিত হয় নাই।

কুমুদানন্দ—শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা; প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এই উপন্যাস খানির আগাগোড়া সব অস্পষ্ট। উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, বক্তব্য অস্পষ্ট, পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও ব্যবহার অস্পষ্ট, ভাষা অস্পষ্ট। এই অল্প পরিসরের ভিতর বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক গাদা পাত্রপাত্রী জড়ো করিয়াছেন, কিন্তু ফুটে নাই একটিরও চরিত্র। যদি কেহ একটু ফুটিয়া থাকে তবে সে কুমুদানন্দের মাতা জয়া ঠাকুরাণী। আর সব এক একটি প্রহেলিকা, তাহার মধ্যে বিরাট প্রহেলিকা জয়ন্তী। পাত্রপাত্রীগণ কখন কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করে, কে কখন কোথায় যায় কোথায় থাকে, কি করিয়া কি হয়, তাহা কোথাও সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত নহে। সব আবছায়া, আন্দাজি হাতড়াইয়া চলিতে হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য গ্রন্থখানিকে আরো ভীতির আস্পদ করিয়াছে। ভাষা ত' না বাংলা, না সংস্কৃত, 'কুলুপিত হস্তে' যুবক যুবতী আলাপ 'করিছে', দুঃখে 'জলধারা বৃষ্ট' 'হইছে', 'বিপদে রক্ষিতা নারায়ণ' ইহা 'দেখিছে'।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থায় পথে সুরকি না দিয়া 'ইষ্টকচূর্ণ' দিতে হইবে, বাঙালীর কুললক্ষ্মীদিগকে উনন হইতে 'বেষ্টিকা' দিয়া হাঁড়ি নামাইতে হইবে। স্থানে স্থানে ভাষা চলিত ও সংস্কৃত কথার নির্ম্মম সংমিশ্রণে গঠিত, স্থানে স্থানে সাধু সংস্কৃত উৎকট হইয়াছে—কিন্তু খাঁটি বাংলা কদাচিৎ মিলে। এই উপন্যাস পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিলে চলিলেও চলিতে পারিত, আজকাল নিতান্ত অচল। ইহা পাঠের পর কিন্তু বেশ একটা অবাচ্য কৌতুক অনুভব করিয়াছি। সেই পরম লাভ। এই পুস্তকের যাহা ভালো, যাহা সুন্দর, যাহা উপভোগ্য, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম:—

"রাজরাজেশ্বরি ভারতজননি।
আকুলমনিশং রোদিষি দুঃখিনি।
(কোরস)
মহীতল-ধন্যে, বহুধন-পূর্ণে,
সুমধুর-জলফল-শস্য-প্রসবিনি।
শ্রীরাম-লক্ষণ, ভীষ্ম-ভীমার্জ্জুন,
ব্যাস-মনু-পাণিনি-গোতম-সূতিনি।
তে তব দিবসা, বিগত বিবশা,
রিপুদল-দারুণ-বন্ধন-কম্পিনি।
দিশ সুতগণং অরাতি দলনং,
দ্বাবিংশতিকোটি সন্ততিশালিনি।"
(ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।)

মুদ্রা-রাক্ষস।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ।

যোশিও কাৎসুতা নামক জাপানী চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৫। | ৩য় সংখ্যা।

গোরা।

২৪

অভিনয়ের অভ্যাস উপলক্ষ্যে বিনয় প্রত্যহই আসে। সুচরিতা তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে, তাহার পরে হাতের বইটার দিকে মন দেয় অথবা নিজের ঘরে চলিয়া যায়। বিনয়ের একলা আসার অসম্পূর্ণতা প্রত্যহই তাহাকে আঘাত করে কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করে না। অথচ দিনের পর দিন এমনি ভাবে যতই যাইতে লাগিল, গোরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের একটা অভিযোগ প্রতিদিন যেন তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। গোরা যেন আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এম্‌নি একটা ভাব যেন সেদিন ছিল।

অবশেষে সুচরিতা যখন শুনিল গোরা নিতান্তই অকারণে কিছুদিনের জন্য কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, তখন কথাটাকে সে একটা সামান্য সংবাদের মত উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কথাটা তাহার মনে বিঁধিয়াই রহিল। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়ে,—অন্যমনস্ক হইয়া আছে, হঠাৎ দেখে এই কথাটাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল।

গোরার সঙ্গে সেদিনকার আলোচনার পর তাহার এরূপ হঠাৎ অন্তর্ধান সুচরিতা একেবারেই আশা করে নাই। গোরার মতের সঙ্গে নিজের সংস্কারের এতদূর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাহার অন্তঃকরণে বিদ্রোহের উত্তাপ হাওয়া কিছুমাত্র ছিল না, সেদিন সে গোরার মতগুলি স্পষ্ট বুঝিতেছিল কি না বলা যায় না,—কিন্তু গোরা মানুষটাকে সে যেন একরকম করিয়া বুঝিয়াছিল। গোরার মত যাহাই থাক্‌না সে মতে যে মানুষকে ক্ষুদ্র করে নাই, অবজ্ঞার যোগ্য করে নাই, বরঞ্চ তাহার চিত্তের বলিষ্ঠতাকে যেন প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া তুলিয়াছে ইহা সেদিন সে প্রবল ভাবে অনুভব করিয়াছে। এ সকল কথা আর কাহারো মুখে সে সহ্য করিতেই পারিত না, রাগ হইত, সে লোকটাকে মূঢ় মনে করিত, তাহাকে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিবার জন্য মনে চেষ্টার উত্তেজনা হইত; কিন্তু সেদিন গোরার সম্বন্ধে তাহার কিছুই হইল না; গোরার চরিত্রের সঙ্গে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে এবং মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্ম্মভেদী প্রবলতার সঙ্গে তাহার কথাগুলি মিলিত হইয়া একটা সজীব ও সত্য আকার ধারণ করিয়াছিল। এ সমস্ত মত সুচরিতা নিজে গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু আর কেহ যদি ইহাকে এমন ভাবে সমস্ত বুদ্ধি বিশ্বাস সমস্ত জীবন দিয়া

গ্রহণ করে তবে তাহাকে ধিক্কার দিবার কিছুই নাই, এমন কি, বিরুদ্ধ সংস্কার অতিক্রম করিয়াও তাহাকে শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে এই ভাবটা সুচরিতাকে সেদিন সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। মনের এই অবস্থাটা সুচরিতার পক্ষে একেবারে নূতন। মতের পার্থক্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল;—পরেশবাবুর একপ্রকার নির্লিপ্ত সমাহিত শান্ত জীবনের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বাল্যকাল হইতে বেষ্টিত ছিল বলিয়া মত জিনিষটাকে অতিশয় একান্ত করিয়া দেখিত;—সেই দিনই প্রথম সে মানুষের সঙ্গে মতের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেখিয়া একটা যেন সজীব সমগ্র পদার্থের রহস্যময় সত্তা অনুভব করিল। মানব সমাজকে কেবল আমার পক্ষ এবং অন্যপক্ষ এই দুই শাদা কালো ভাগে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি, তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল এবং ভিন্ন মতের মানুষকে মুখ্য ভাবে মানুষ বলিয়া এমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে ভিন্ন মতটা তাহার কাছে গৌণ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন সুচরিতা অনুভব করিয়াছিল যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে গোরা একটা আনন্দ বোধ করিতেছে। সে কি কেবল মাত্র নিজের মত প্রকাশ করিবারই আনন্দ! সেই আনন্দদানে সুচরিতারও কি কোনো হাত ছিল না! হয়ত ছিল না! হয়ত গোরার কাছে কোনো মানুষের কোনো মূল্য নাই—সে নিজের মত এবং উদ্দেশ্য লইয়াই একেবারে সকলের নিকট হইতে সুদূর হইয়া আছে—মানুষরা তাহার কাছে মত প্রয়োগ করিবার উপলক্ষ্য মাত্র!

সুচরিতা এ কয়দিন বিশেষ করিয়া উপাসনায় মন দিয়াছিল। সে যেন পূর্ব্বের চেয়েও পরেশবাবুকে বেশি করিয়া আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একদিন পরেশবাবু তাঁহার ঘরে একলা বসিয়া পড়িতেছিলেন এমন সময় সুচরিতা তাঁহার কাছে চুপ করিয়া গিয়া বসিল। পরেশবাবু বই টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রাধে!"

সুচরিতা কহিল—"কিছু না।" বলিয়া, তাঁহার টেবিলের উপরে যদিচ বই কাগজ প্রভৃতি গোছানোই ছিল তবু সেগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া অন্যরকম করিয়া গুছাইতে লাগিল।

একটু পরে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আগে তুমি আমাকে যে রকম পড়াতে এখন সেই রকম করে পড়াও না কেন?"

পরেশবাবু সস্নেহে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন "আমার ছাত্রী যে আমার ইস্কুল থেকে পাস্ করে বেরিয়ে গেছে! এখন্ ত তুমি নিজে পড়েই বুঝ্‌তে পার।"

সুচরিতা কহিল, "না, আমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারি নে, আমি আগের মত তোমার কাছে পড়ব।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, কাল থেকে পড়াব।"

সুচরিতা আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"বাবা, সেদিন বিনয়বাবু জাতিভেদের কথা অনেক বল্লেন, তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বল না কেন?"

পরেশবাবু কহিলেন—"মা, তুমি ত জানই, তোমরা আপনি ভেবে বুঝ্‌তে চেষ্টা করবে, আমার বা আর কারো মত কেবল অভ্যস্ত কথার মতো ব্যবহার করবে না। আমি বরাবর তোমাদের সঙ্গে সেই রকম করেই ব্যবহার করেছি। প্রশ্নটা ঠিক মত মনে জেগে ওঠবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিতে যাওয়া আর ক্ষুধা পাবার পূর্ব্বেই খাবার খেতে দেওয়া একই—তাতে কেবল অরুচি এবং অপাক হয়। তুমি আমাকে যখনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে আমি যা বুঝি বলব।"

সুচরিতা কহিল—"আমি তোমাকে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করচি, আমরা জাতিভেদকে নিন্দা করি কেন?"

পরেশ বাবু কহিলেন—"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না—অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।"

সুচরিতা গোরার মুখে শোনা কথার অনুসরণ করিয়া কহিল—"এখনকার সমাজে যে বিকার উপস্থিত হয়েচে তাতে অনেক দোষ থাক্‌তে পারে; সে দোষ ত সমাজের সকল জিনিষেই ঢুকেছে, তাই বলে আসল জিনিষটাকে দোষ দেওয়া যায় কি?"

পরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন—

"আসল জিনিষটা কোথায় আছে জান্‌লে বল্‌তে পারতুম— আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য ঘৃণা করচে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্চে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিষের কথা চিন্তা করে মন সান্ত্বনা মানে কই?"

সুচরিতা পুনশ্চ গোরাদের কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপে কহিল—"আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই ত আমাদের দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।"

পরেশ বাবু কহিলেন—"সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতর হৃদয়ধর্ম্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। সেইজন্যে আমাদের দেশে এরকম সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচজাতকে দেবালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে তবে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাক্‌লেই কি আর না থাক্‌লেই কি?"

সুচরিতা পরেশ বাবুর কথা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে কহিল—"আচ্ছা বাবা, তুমি বিনয় বাবুদের এ সব কথা বোঝাবার চেষ্টা কর না কেন?"

পরেশ বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন—"বিনয় বাবুদের বুদ্ধি কম বলে যে এ সব কথা বোঝেন না তা নয়—বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চাননা, কেবল বোঝাতেই চান। তাঁরা যখন ধর্ম্মের দিক থেকে—অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড় সত্যের দিক থেকে এসব কথা অন্তরের সঙ্গে বুঝ্‌তে চাইবেন তখন তোমার বাবার বুদ্ধির জন্যে তাদের অপেক্ষা করে থাক্‌তে হবে না। এখন তাঁরা অন্য দিক্ থেকে দেখচেন, এখন আমার কথা তাঁদের কোনো কাজেই লাগ্‌বে না।"

গোরাদের কথা যদিও সুচরিতা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছিল তবু তাহা তাহার সংস্কারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার অন্তরের মধ্যে বেদনা দিতেছিল। সে শান্তি পাইতেছিল না। আজ পরেশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিয়া সেই বিরোধ হইতে সে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল। গোরা বিনয় বা আর কেহই যে পরেশ বাবুর চেয়ে কোনো বিষয়ে ভাল বুঝে এ কথা সুচরিতা কোনো মতেই মনে স্থান দিতে চায় না। পরেশ বাবুর সঙ্গে যাহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সুচরিতা তাহার উপর রাগ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সম্প্রতি গোরার সঙ্গে আলাপের পর গোরার কথা একেবারে রাগ বা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছিল না বলিয়াই সুচরিতা এমন একটা কষ্ট বোধ করিতেছিল। সেই জন্যই আবার শিশুকালের মত করিয়া পরেশ বাবুকে তাঁহার ছায়াটির ন্যায় নিয়ত আশ্রয় করিবার জন্য তাহার হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। চৌকি হইতে উঠিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সুচরিতা পরেশ বাবুর পিছনে তাঁহার চৌকির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল- "বাবা, আজ বিকালে আমাকে নিয়ে উপাসনা কোরো।"

পরেশ বাবু কহিলেন—"আচ্ছা।"

তাহার পরে নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া সুচরিতা গোরার কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গোরার সেই বুদ্ধি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুখ তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া রহিল- তাহার মনে হইতে লাগিল, গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং;—সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে—তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা মত নয় যে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়াই চুকাইয়া দেওয়া যাইবে—তাহা যে সম্পূর্ণ মানুষ—এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে হাত ওঠে না। অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার কান্না আসিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে এত বড় একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের মত অনায়াসে দূরে চলিয়া যাইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল অথচ কষ্ট পাইতেছে বলিয়াও ধিক্কারের সীমা রহিল না।

২৫

এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ইংরেজি কবি ড্রাইডেনের রচিত সঙ্গীতবিষয়ক একটি কবিতা বিনয় ভাবব্যক্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া যাইবে এবং মেয়েরা অভিনয়মঞ্চে

উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া কাব্যলিখিত ব্যাপারের মূক অভিনয় করিতে থাকিবে। এ ছাড়া মেয়েরাও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং গান প্রভৃতি করিবে।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে অনেক ভরসা দিয়াছিলেন যে তাহাকে তাঁহারা কোনো প্রকারে তৈরি করিয়া লইবেন। তিনি নিজে ইংরেজি অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দলের দুই এক জন পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার নির্ভর ছিল।

কিন্তু যখন আখ্ড়া বসিল, বিনয় তাহার আবৃত্তির দ্বারা বরদাসুন্দরীর পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিল। তাঁহাদের মণ্ডলীবহির্ভূত এই ব্যক্তিকে গড়িয়া লইবার সুখ হইতে বরদাসুন্দরী বঞ্চিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহারা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া খাতির করে নাই, তাহারা, বিনয় এমন ভাল ইংরেজি পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি, হারান বাবুও তাঁহার কাগজে মাঝে মাঝে লিখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল। এবং সুধীর, তাহাদের ছাত্র-সভায় মাঝে মাঝে ইংরেজি বক্তৃতা করিবার জন্য বিনয়কে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

ললিতার অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত রকম হইল। বিনয়কে যে কোনো সাহায্য কাহাকেও করিতে হইল না, সে জন্য সে খুসিও হইল, আবার তাহাতে তাহার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষও জন্মিল। বিনয় যে তাহাদের কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরঞ্চ তাহাদের সকলের চেয়ে ভাল—সে যে মনে মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার শিক্ষার প্রত্যাশা করিবে না ইহাতে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কি চায়, কেমনটা হইলে তাহার মন বেশ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাঝে হইতে তাহার অপ্রসন্নতা কেবলি ছোটখাটো বিষয়ে তীব্র ভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়কেই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনয়ের প্রতি ইহা যে সুবিচার নহে এবং শিষ্টতাও নহে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া সে কষ্ট পাইল এবং নিজেকে দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল কিন্তু অকস্মাৎ অতি সামান্য উপলক্ষ্যেই কেন যে তাহার একটা অসঙ্গত অন্তর্জ্বালা সংযমের শাসন লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। পূর্ব্বে যে ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য সে বিনয়কে অবিশ্রাম উত্তেজিত করিয়াছে এখন তাহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু এখন সমস্ত আয়োজনকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিয়া বিনয় অকারণে পলাতক হইবে কি বলিয়া? সময়ও আর অধিক নাই; এবং নিজের একটা নূতন নৈপুণ্য আবিষ্কার করিয়া সে নিজেই এই কাজে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে ললিতা বরদাসুন্দরীকে কহিল, "আমি এতে থাক্‌ব না।"

বরদাসুন্দরী তাঁহার মেঝ মেয়েকে বেশ চিনিতেন, তাই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

ললিতা কহিল "আমি যে পারিনে।"

বস্তুত যখন হইতে বিনয়কে আর আনাড়ি বলিয়া গণ্য করিবার উপায় ছিল না, তখন হইতেই ললিতা বিনয়ের সম্মুখে কোনো মতেই আবৃত্তি বা অভিনয় অভ্যাস করিতে চাহিত না—সে বলিত, আমি আপনি আলাদা অভ্যাস করিব। ইহাতে সকলেরই অভ্যাসে বাধা পড়িত কিন্তু ললিতাকে কিছুতেই পারা গেল না। অবশেষে, হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।

কিন্তু যখন শেষ অবস্থায় ললিতা একেবারেই ভঙ্গ দিতে চাহিল, তখন বরদাসুন্দরীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি জানিতেন যে তাঁহার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতেই পারিবে না। তখন তিনি পরেশ বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরেশ বাবু সামান্য বিষয়ে কখনোই তাঁহার মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অনুসারে সে পক্ষেও আয়োজন করিয়াছেন, সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরেশ বাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে!"

ললিতা রুদ্ধরোদন কণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমি যে পারিনে। আমার হয় না।"

পরেশ কহিলেন, "তুমি ভাল না পারিলে তোমার অপরাধ হবে না কিন্তু না করলে অন্যায় হবে।"

ললিতা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ;—পরেশ বাবু কহিলেন, "মা, যখন তুমি ভার নিয়েছ তখন তোমাকে ত সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহংকারে ঘা লাগে বলে আর ত পালাবার সময় নেই। লাগুক্ না ঘা, সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্ত্তব্য করতে হবে। পারবে না মা ?"

ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল "পারব।"

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ করিয়া বিনয়ের সম্মুখেই সমস্ত সঙ্কোচ সম্পূর্ণ দূর করিয়া সে যেন একটা অতিরিক্ত বলের সঙ্গে যেন স্পর্দ্ধা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইল। বিনয় এত দিন তাহার আবৃত্তি শোনে নাই। আজ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। এমন সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ—কোথাও কিছুমাত্র জড়িমা নাই, এবং ভাব প্রকাশের মধ্যে এমন একটা নিঃসংশয় বল, যে, শুনিয়া বিনয় প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল। এই কণ্ঠস্বর তাহার কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল।

কবিতা আবৃত্তিতে ভাল আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে। সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে মহিমা দান করে—সেটা যেন তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার মুখশ্রী, তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয়। ফুল যেমন গাছের শাখায় তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।

ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে ব্যথা সেইখানেই কেবলি যেমন হাত পড়ে, বিনয়ও তেমনি কয়দিন ললিতার উষ্ণ বাক্য এবং তীক্ষ্ণ হাস্য ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে নাই। কেন যে ললিতা এমন করিল, তেমন বলিল, ইহাই তাহাকে বারম্বার আলোচনা করিতে হইয়াছে ;—ললিতার অসন্তোষের রহস্য যতই সে ভেদ করিতে না পারিয়াছে ততই ললিতার চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ ভোরের বেলা ঘুম হইতে জাগিয়া সে কথা তাহার মনে পড়িয়াছে ; পরেশ বাবুর বাড়িতে আসিবার সময় প্রত্যহই তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে আজ না জানি ললিতাকে কিরূপ ভাবে দেখা যাইবে। যে দিন ললিতা লেশমাত্র প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন বিনয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে এবং এই ভাবটি কি করিলে স্থায়ী হয় সেই চিন্তাই করিয়াছে কিন্তু এমন কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার আয়ত্তাধীন।

এ কয়দিনের এই মানসিক আলোড়নের পর ললিতার কাব্য আবৃত্তির মাধুর্য্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল। তাহার এত ভাল লাগিল যে কি বলিয়া প্রশংসা করিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার মুখের সাম্‌নে ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিতে তাহার সাহস হয় না—কেন না তাহাকে ভাল বলিলেই, যে, সে খুসি হইবে মনুষ্যচরিত্রের এই সাধারণ নিয়ম ললিতার সম্বন্ধে না খাটিতে পারে, এমন কি, সাধারণ নিয়ম বলিয়াই হয় ত খাটিবে না—এই কারণে, বিনয় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া বরদাসুন্দরীর নিকট ললিতার ক্ষমতার অজস্র প্রশংসা করিল। ইহাতে বিনয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হইল।

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। ললিতা যখনি নিজে অনুভব করিল তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে ; সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমনি সুন্দর করিয়া তাহার কর্ত্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়া চলিয়া গেল তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুখ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না। এই কাজটাতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল এবং রিহার্সাল্ ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল। এমন কি, আবৃত্তি অথবা অন্য কিছু সম্বন্ধে বিনয়ের কাছে উপদেশ লইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না।

ললিতার এই পরিবর্ত্তনে বিনয়ের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। এত আনন্দ হইল যে যখন তখন আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বালকের মত ছেলেমানুষি করিতে লাগিল। সুচরিতার কাছে বসিয়া

অনেক কথা বকিবার জন্য তাহার মনে কথা জমিতে থাকিল, কিন্তু আজকাল সুচরিতার সঙ্গে তাহার দেখাই হয় না। সুযোগ পাইলেই ললিতার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিত কিন্তু ললিতার কাছে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়াই কথা বলিত হইত ;—ললিতা যে মনে মনে তাহাকে এবং তাহার সকল কথাকে তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে ইহা জানিত বলিয়া ললিতার সম্মুখে তাহার কথার স্রোতে স্বাভাবিক বেগ থাকিত না। ললিতা মাঝে মাঝে তাহাকে বলিত—"আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলচেন এমন করে বলেন কেন ?"

বিনয় উত্তর করিত—"আমি যে এত বয়স পর্য্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেই জন্য মনটা ছাপার বইয়ের মত হয়ে গেছে।"

ললিতা বলিত "আপনি খুব ভাল করে বলবার চেষ্টা করবেন না—নিজের কথাটা ঠিক করে বলে যাবেন। আপনি এমন চমৎকার করে বলেন যে, আমার সন্দেহ হয় আপনি আর কারো কথা ভেবে সাজিয়ে বল্‌চেন।"

এই কারণে, স্বাভাবিক ক্ষমতাবশত একটা কথা বেশ সুসজ্জিত হইয়া বিনয়ের মনে আসিলে ললিতাকে বলিবার সময় চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহা শাদা করিয়া এবং স্বল্প করিয়া বলিতে হইত। কোনো একটা অলঙ্কৃত বাক্য তাহার মুখে হঠাৎ আসিলে সে লজ্জিত লইয়া পড়িত।

ললিতার মনের ভিতর হইতে একটা যেন অকারণ মেঘ কাটিয়া গিয়া তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরীও তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে এখন পূর্ব্বের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসে না—সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। আগামী অভিনয়ের সাজসজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহার মনে প্রত্যহ নানা প্রকার নূতন নূতন কল্পনার উদয় হইতে লাগিল, তাহাই লইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর উৎসাহ যতই বেশি হউক্ তিনি খরচের কথাটাও ভাবেন—সেইজন্য, ললিতা যখন অভিনয় ব্যাপারে বিমুখ ছিল তখনও যেমন তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়াছিল এখন তাহার উৎসাহিত অবস্থাতেও তেমনি তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিন্তু ললিতার উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তিকে আঘাত করিতেও সাহস হয় না—যে কাজে সে উৎসাহ বোধ করে সে কাজের কোথাও লেশমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিলে সে একেবারে দমিয়া যায়, তাহাতে যোগ দেওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

ললিতা তাহার মনের এই উচ্ছ্বসিত অবস্থায় সুচরিতার কাছে অনেকবার ব্যগ্র হইয়া গিয়াছে। সুচরিতা হাসিয়াছে, কথা কহিয়াছে বটে কিন্তু ললিতা তাহার মধ্যে বারম্বার এমন একটা বাধা অনুভব করিয়াছে যে সে মনে মনে রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

একদিন সে পরেশ বাবুর কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, সুচি দিদি যে কোণে বসে বসে বই পড়বে, আর আমরা অভিনয় করতে যাব সে হবে না। ওকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।"

পরেশ বাবুও কয়দিন ভাবিতেছিলেন সুচরিতা তাহার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে কেমন যেন দূরবর্ত্তিনী হইয়া পড়িতেছিল। এরূপ অবস্থা তাহার চরিত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন। ললিতার কথা শুনিয়া আজ তাঁহার মনে হইল, আমোদপ্রমোদে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারাতে সুচরিতার এইরূপ পার্থক্যের ভাব প্রশ্রয় পাইয়া উঠিতেছে। পরেশ বাবু ললিতাকে কহিলেন—"তোমার মাকে বল গে।"

ললিতা কহিল, "মাকে আমি বলব, কিন্তু সুচিদিদিকে রাজি করবার ভার তোমাকে নিতে হবে।"

পরেশ বাবু যখন বলিলেন তখন সুচরিতা আর আপত্তি করিতে পারিল না—সে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।

সুচরিতা কোণ্ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই বিনয় তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু এই কয়দিনে কি একটা হইয়াছে, ভাল করিয়া সুচরিতার যেন নাগাল পাইল না। তাহার মুখশ্রীতে, তাহার দৃষ্টিপাতে এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে তাহার কাছে অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেও মেলামেশার কাজকর্ম্মের মধ্যে সুচরিতার একটা নির্লিপ্ততা ছিল এখন সেইটে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া

উঠিয়াছে। সে যে অভিনয় কার্য্যের অভ্যাসে যোগ দিয়াছিল তাহার মধ্যেও তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই। কাজের জন্য তাহাকে যতটুকু দরকার সেইটুকু সারিয়াই সে চলিয়া যাইত। সুচরিতার এইরূপ দূরত্ব প্রথমে বিনয়কে অত্যন্ত আঘাত দিল। বিনয় মিশুক লোক, যাহাদের সঙ্গে তাহার সৌহৃদ্য তাহাদের নিকট হইতে কোনোপ্রকার বাধা পাইলে বিনয়ের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়। এই পরিবারে সুচরিতার নিকট হইতেই এতদিন সে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে, এখন হঠাৎ বিনাকারণে প্রতিহত হইয়া বড়ই বেদনা পাইল। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল এই একই কারণে সুচরিতার প্রতি ললিতার মনেও অভিমানের উদয় হইয়াছে তখন বিনয় সান্ত্বনালাভ করিল এবং ললিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ হইল। তাহার নিকট হইতে সুচরিতাকে এড়াইয়া চলিবার অবকাশও সে দিল না সে আপনিই সুচরিতার নিকটসংস্রব পরিত্যাগ করিল এবং এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে সুচরিতা বিনয়ের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল।

এদিকে সুচরিতাকে অভিনয়ে যোগ দিতে দেখিয়া হঠাৎ হারান বাবুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্যারাডাইস্ লষ্ট হইতে এক অংশ আবৃত্তি করিবেন এবং ড্রাইডেনের কাব্য আবৃত্তির ভূমিকা স্বরূপে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তিসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিবেন বলিয়া স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে বরদাসুন্দরী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ললিতাও সন্তুষ্ট হইল না। হারান বাবু নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই প্রস্তাব পূর্ব্বেই পাকা করিয়া আসিয়াছিলেন। ললিতা যখন বলিল ব্যাপারটাকে এত সুদীর্ঘ করিয়া তুলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয় ত আপত্তি করিবেন তখন হারান বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র বাহির করিয়া ললিতার হাতে দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন।

গোরা বিনা কাজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে কবে ফিরিবে তাহা কেহ জানিত না। যদিও সুচরিতা এ সম্বন্ধে কোনো কথা মনে স্থান দিবে না ভাবিয়াছিল তবু প্রতিদিনই তাহার মনের ভিতরে আশা জন্মিত যে আজ হয়ত গোরা আসিবে। এ আশা কিছুতেই সে মন হইতে দমন করিতে পারিত না। গোরার ঔদাসীন্য এবং নিজের মনের এই অবাধ্যতায় যখন সে নিরতিশয় পীড়া বোধ করিতেছিল, যখন কোনো মতে এই জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এ সময় হারানবাবু, একদিন বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের নাম করিয়া সুচরিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য পরেশবাবুকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন। পরেশবাবু কহিলেন—"এখনোত বিবাহের বিলম্ব আছে এত শীঘ্র আবদ্ধ হওয়া কি ভাল ?"

হারানবাবু কহিলেন—"বিবাহের পূর্ব্বে কিছুকাল এই আবদ্ধ অবস্থায় যাপন করা উভয়ের মনের পরিণতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক বলে মনে করি। প্রথম পরিচয় এবং বিবাহের মাঝ খানে এই রকম একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, যাতে সাংসারিক দায়িত্ব নেই অথচ বন্ধন আছে—এটা বিশেষ উপকারী।"

পরেশবাবু কহিলেন,—"আচ্ছা, সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

হারানবাবু কহিলেন—"তিনিত পূর্ব্বেই মত দিয়াছেন।"

হারান বাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব সম্বন্ধে পরেশ বাবুর এখনো সন্দেহ ছিল তাই তিনি নিজে সুচরিতাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হারান বাবুর প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সুচরিতা নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্ত ভাবে সমর্পণ করিতে পারিলে বাঁচে—তাই সে এমন অবিলম্বে এবং নিশ্চিত ভাবে সম্মতি দিল যে পরেশ বাবুর সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। বিবাহের এত পূর্ব্বে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহা তিনি ভালরূপ বিবেচনা করিবার জন্য সুচরিতাকে অনুরোধ করিলেন—তৎসত্ত্বেও সুচরিতা এ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

ব্রাউনলো সাহেবের নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিয়া একটি বিশেষ দিনে সকলকে ডাকিয়া ভাবী দম্পতির সম্বন্ধ পাকা করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

সুচরিতার ক্ষণকালের জন্য মনে হইল তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে মনে মনে স্থির করিল, হারান বাবুকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিবার জন্য সে মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করিবে। হারান বাবুর নিকট হইতেই সে প্রত্যহ খানিকটা করিয়া

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজি বই পড়িয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত চলিতে থাকিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল। তাহার পক্ষে যাহা দুরূহ, এমন কি, অপ্রিয়, তাহাই গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে মনের মধ্যে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিল। যাহা নীরস যাহা দুষ্কর আমার পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; নতুবা শৈথিল্যের আকর্ষণে আমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি এবং তাহার পরিণামফল যে কি তাহার কোনো ঠিকানা নাই এই বলিয়া সে মনে মনে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ কিছুকাল ধরিয়া সে পড়ে নাই। আজ সেই কাগজ ছাপা হইবামাত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। বোধ করি হারানবাবু বিশেষ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সুচরিতা কাগজখানি ঘরে লইয়া গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া পরম কর্ত্তব্যের মত তাহার প্রথম লাইন হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে নিজেকে ছাত্রীর মত জ্ঞান করিয়া এই পত্রিকা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

জাহাজ পালে চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ে ঠেকিয়া কাৎ হইয়া পড়িল। এই সংখ্যায় "সেকেলে বায়ুগ্রস্ত" নামক একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে, বর্ত্তমান কালের মধ্যে বাস করিয়াও যাহারা সেকালের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। যুক্তিগুলি যে অসঙ্গত তাহা নহে, বস্তুত এরূপ যুক্তি সুচরিতা সন্ধান করিতেছিল কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িবামাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে এই আক্রমণের লক্ষ্য গোরা। অথচ তাহার নাম নাই, অথবা তাহার লিখিত কোনো প্রবন্ধের উল্লেখ নাই। প্রত্যেক গুলিতে একটা করিয়া মানুষ মারিয়া সৈনিক যেমন খুসি হয় এই প্রবন্ধের প্রত্যেক বাক্যে তেমনি কোনো একটি সজীব পদার্থ বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া যেন একটা হিংসার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধ সুচরিতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যেক যুক্তি প্রতিবাদের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সে মনে মনে কহিল গৌরমোহন বাবু যদি ইচ্ছা করেন তবে এই প্রবন্ধকে তিনি ধূলায় লুটাইয়া দিতে পারেন। গোরার উজ্জ্বল মুখ তাহার চোখের সাম্‌নে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল কণ্ঠস্বর সুচরিতার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই মুখের ও বাক্যের অসামান্যতার কাছে এই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের ক্ষুদ্রতা এমনই তুচ্ছ হইয়া উঠিল যে সুচরিতা কাগজ খানাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

অনেক কাল পরে সুচরিতা আপনি সে দিন বিনয়ের কাছে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে কথায় কথায় বলিল—"আচ্ছা, আপনি যে বলেছিলেন যে সব কাগজে আপনাদের লেখা বেরিয়েছে আমাকে পড়তে এনে দেবেন, কই দিলেন না?"

বিনয় এ কথা বলিল না যে ইতিমধ্যে সুচরিতার ভাবান্তর দেখিয়া সে আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহস করে নাই—সে কহিল, "আমি সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করে রেখেছি, কালই এনে দেব।"

বিনয় পর দিন পুস্তিকা ও কাগজের এক পুঁটুলি আনিয়া সুচরিতাকে দিয়া গেল। সুচরিতা সেগুলি হাতে পাইয়া আর পড়িল না বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। পড়িতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিল বলিয়াই পড়িল না। চিত্তকে কোনো মতেই বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে পুনর্ব্বার হারানবাবুর শাসনাধীনে সমর্পণ করিয়া আর একবার সে সান্ত্বনা অনুভব করিল।

২৬

বিনয় কয়দিন গোরার কথা ভাবিবার অবকাশ মাত্র পায় নাই। একদা, মানুষের মধ্যে গোরাই বিনয়ের চিন্তা করিবার প্রধান বিষয় ছিল। ইতিপূর্ব্বে গোরার সহিত বিনয়ের এতদিনের বিচ্ছেদ কখনই ঘটে নাই; ঘটিলেও বিনয় অনায়াসে তাহা বহন করিতে পারিত না।

এবারে গোরার অনুপস্থিতি বিনয় যে কেবল অনুভব করে নাই তাহা নহে, এই অনুপস্থিতিকালে সে বিশেষ করিয়া একটা স্বাতন্ত্র্যসুখ উপভোগ করিয়াছিল। গোরা কোন্ কাজটাকে কিরূপ ভাবে দেখিবে বিনয় এপর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারেও তাহাই বিচার করিয়া কাজ করিয়াছে। বিনয়ের সঙ্গে গোরার প্রকৃতিভেদ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ইহাতে কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই। গোরার

প্রবল ইচ্ছার কাছে বিনয় অনায়াসেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে—এমন কি, সে যে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে সে কথাও সে আপনি জানিত না।

বিনয়কে গোরার অনুবর্ত্তী বলিয়া ললিতা যখন তাহাকে দুই একটা খোঁচা দিয়াছিল তখন বিনয় সেটাকে নিতান্ত অন্যায় মনে করিয়াছিল। কিন্তু তখনই গোরার সহিত নিজের সম্বন্ধ লইয়া বিনয় সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। গোরার আধিপত্য অস্বীকার করিতে গিয়াই গোরার আধিপত্য সে অনুভব করিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, গোরার ভাবনার দ্বারা নিজের ভাবনাকে বাঁধিয়া লইবার জন্য তাহার মন কখন্ যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। গোরার এই আধিপত্যে এতদিন পরে বিনয় পীড়া ও লজ্জা অনুভব করিয়াছে। এমন কি গোরার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাহার মত যে মেলে না এই কথা বলিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সে কথা বলিতে তাহার হৃদয়ে কষ্টবোধ হইতে লাগিল। গোরা যে এতদিন তাহার সম্পূর্ণ আনুগত্য পাইয়াছে সেই আনুগত্য হইতে তাহাকে সহসা আজ বঞ্চিত করিলে গোরা যে কত বড় একটা আঘাত পাইবে তাহা মনে করিলেও বিনয় বেদনা বোধ করে।

এবারে কয়দিন গোরা উপস্থিত না থাকাতে বিনয় অত্যন্ত অবাধে পরেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে সকল রকম করিয়া মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল। বিনয়ের স্বভাব এইরূপ অবারিতভাবে প্রকাশ পাওয়াতে পরেশ বাবুর বাড়ির সকলেই একটা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল। বিনয়ও নিজের এইরূপ বাধামুক্ত স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইল এমন আর কখনো পায় নাই। তাহাকে যে ইঁহাদের সকলেরই ভাল লাগিতেছে ইহাই অনুভব করিয়া তাহার ভাল লাগাইবার শক্তি আরো বাড়িয়া উঠিল। তাহার মুখে চক্ষে হাসিতে কথায় প্রফুল্লতা সর্ব্বদা বিকীর্ণ হইতে থাকিল। পরিবারের বন্ধুবর্গ যে কেহ বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে সকলেই তাহার বুদ্ধির অজস্র প্রশংসা করিল। বাস্তবিক বিনয় নিজের বুদ্ধিকেও নিজে জানিত না;—সে সর্ব্বদা গোরার অসামান্যতা অনুভব করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিবার উদ্যম প্রয়োগ করিত না। এখন চারিদিকের একটা উৎসাহের উত্তেজনায় সে নিজের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি নিজেই বোধ করিতে পারিয়াছিল। তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিপূর্ণতার জোয়ার আসিয়া তাহার বুকের ভিতরে দিন রাত্রি একটা কলধ্বনি চলিতে লাগিল। অভিনয়ের সহায়তা করা, আবৃত্তি করা, আবৃত্তি শেখানো, কাগজ লেখা, সভায় বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি নানাদিকেই তাহার আনন্দিত শক্তি যেন ছুটিয়া চলিল। এতদিন পরে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে লোককে খুসি করিতে পারে, এমন কি, শিক্ষা দিতেও পারে।

গোরার কথা বিনয়ের মনে আর তেমন করিয়া জাগিল না। বাসায় ফিরিতে তাহার রাত হইত; ফিরিয়া আসিয়া একলা ঘরে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া অন্তরের উত্তেজনাকে পরিপাক করিত। সেই অবকাশের সময়, গোরা কোথায় আছে, কি করিতেছে, এ চিন্তা তাহার মনে যদি ক্ষণকালের জন্য জাগিত তবে পরক্ষণেই পরেশ বাবুর বাড়িতে দিন-যাপনের বহুবিধ স্মৃতিতে তাহা একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই, আজ বিকালে তিনটার সময় পরেশ বাবুর বাড়িতে যাইতে হইবে, এই কথাটাই সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িত;—এই চিন্তায় তাহার প্রথম প্রভাতের সূর্য্যালোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ইতিমধ্যে কোনো কোনো দিন আনন্দময়ীর ওখানে একবার ছুটিয়া যাইত—আবার কোনোদিন বা সতীশকে তাহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহার সমবয়সীর মত তাহার সঙ্গে আনন্দ করিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দিত।

প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে, নিজেকে স্বতন্ত্র শক্তিতে অনুভব করিবার দিনে বিনয়ের কাছ হইতে সুচরিতা দূরে চলিয়া গেল। এই ক্ষতি এই আঘাত অন্য সময় হইলে দুঃসহ হইত, কিন্তু এখন সেটা সে সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, ললিতাও সুচরিতার ভাবান্তর উপলক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অভিমান প্রকাশ করে নাই। আবৃত্তি ও অভিনয়ের উৎসাহই কি তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল?

২৭

রবিবার দিন সকালে আনন্দময়ী পান সাজিতেছিলেন,

শশিমুখী তাঁহার পাশে বসিয়া সুপারি কাটিয়া স্তূপাকার করিতেছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই শশিমুখী তাহার কোলের আঁচল হইতে সুপারি ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। আনন্দময়ী একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিলেন।

বিনয় সকলেরই সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত। শশিমুখীর সঙ্গে এতদিন তাহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। উভয় পক্ষেই পরস্পরের প্রতি খুব উপদ্রব চলিত। শশিমুখী বিনয়ের জুতা লুকাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট হইতে গল্প আদায় করিবার উপায় বাহির করিয়াছিল। বিনয় শশিমুখীর জীবনের দুই একটা সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে যথেষ্ট রংফলাইয়া দুই একটা গল্প বানাইয়া রাখিয়াছিল তাহারই অবতারণা করিলে শশিমুখী বড়ই জব্দ হইত—প্রথমে সে বক্তার প্রতি মিথ্যাভাষণের অপবাদ দিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করিত; তাহাতে হার মানিলে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। সেও বিনয়ের জীবনচরিত বিকৃত করিয়া পাল্টা গল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু রচনাশক্তিতে সে বিনয়ের সমকক্ষ না হওয়াতে এসম্বন্ধে বড় একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই!

যাহা হোক, বিনয় এ বাড়িতে আসিলেই সব কাজ ফেলিয়া শশিমুখী তাহার সঙ্গে গোলমাল করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। এক একদিন এত উৎপাত করিত যে আনন্দময়ী তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন কিন্তু দোষ ত তাহার একলার ছিল না, বিনয় তাহাকে এমনি উত্তেজিত করিয়া তুলিত যে আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই শশিমুখী আজ যখন বিনয়কে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল তখন আনন্দময়ী হাসিলেন কিন্তু সে হাসি সুখের হাসি নহে।

বিনয়কেও এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এমন আঘাত করিল যে সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনয়ের পক্ষে শশিমুখীকে বিবাহ করা যে কতখানি অসঙ্গত তাহা এইরূপ ছোটখাটো ব্যাপারেই ফুটিয়া উঠে। বিনয় যখন সম্মতি দিয়াছিল তখন সে কেবল গোরার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বের কথাই চিন্তা করিয়াছিল, ব্যাপারটাকে কল্পনার দ্বারা অনুভব করে নাই। তা ছাড়া, আমাদের দেশে বিবাহটা যে প্রধানত ব্যক্তিগত নহে তাহা পারিবারি[ক] এই কথা লইয়া বিনয় গৌরব করিয়া কাগজে অনেক প্রব[ন্ধ] লিখিয়াছে; নিজেও এ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা[কে] বিতৃষ্ণাকে মনে স্থানও দেয় নাই। আজ শশিমুখী [যখন] বিনয়কে দেখিয়া আপনার বর বলিয়া জিভ্‌ কাটিয়া পলাই[য়া] গেল ইহাতে শশিমুখীর সঙ্গে তাহার ভাবী সম্বন্ধের এক[টা] চেহারা তাহার কাছে দেখা দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা[র] সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গোরা যে তাহা[র] প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাকে কতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছি[ল] ইহা মনে করিয়া গোরার উপরে তাহার রাগ হইল, নিজে[র] উপরে ধিক্কার জন্মিল, এবং আনন্দময়ী যে প্রথম হইতে এই বিবাহে নিষেধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করি[য়া] তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রি[ত] ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী বিনয়ের মনের ভাবটা বুঝিলেন। তি[নি] অন্যদিকে তাহার মনকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "কা[ল] গোরার চিঠি পেয়েছি, বিনয়।"

বিনয় একটু অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল "কি লিখেচে?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "নিজের খবর বড় একটা কি[ছু] দেয়নি। দেশের ছোট লোকদের দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ ক[রে] লিখেছে। ঘোষপাড়া বলে কোন্‌ এক গ্রামে ম্যাজি[ষ্ট্রেট] কি সব অন্যায় করেচে তারই বর্ণনা করেচে।"

গোরার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনা হইতে অসহিষ্ণু হইয়া বিনয় বলিয়া উঠিল—"গোরার ঐ পরে[র] দিকেই দৃষ্টি, আর আমরা সমাজের বুকের উপরে ব[সে] প্রতিদিন যে সব অত্যাচার করচি তা কেবলই মার্জ্জ[না] করতে হবে, আর বল্‌তে হবে এমন সৎকর্ম্ম আর কি হতে পারে না!"

হঠাৎ গোরার উপরে এই দোষারোপ করিয়া বি[নয়] যেন অন্য পক্ষ বলিয়া নিজেকে দাঁড় করাইল দেখি[য়া] আনন্দময়ী হাসিলেন।

বিনয় কহিল, "মা, তুমি হাসচ, মনে করচ হঠাৎ বি[নয়] এমন রাগ করে উঠল কেন? কেন রাগ হয় তোমা[কে] বলি। সুধীর সেদিন আমাকে তাদের নৈহাটি ষ্টে[শনে] তার এক বন্ধুর বাগানে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা শেয়া[লদ]

ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। শোদপুর ষ্টেশনে যখন গাড়ি থাম্‌ল, দেখি একটী সাহেবি কাপড় পরা বাঙালী নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটী শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনোমতে ঢেকে খোলা ষ্টেশনের একধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগ্‌ল—তার স্বামী জিনিষ পত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁক ডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল সমস্ত বাংলাদেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নির্লজ্জ ভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজচে, এই ব্যব-হারটাকে মনে মনেও নিন্দা করচে না—এবং ষ্টেশন সুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি, তাদের লক্ষ্মী বলে দেবী বলে জানি এসমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না।”

আনন্দময়ী কহিলেন—“তা হোক্ বিনয়, তাই বলে—”

বিনয় অধীর হইয়া কহিল—“না, মা, এ সব তর্কের কথা নয়—আর কিছু দিন আগে হলে আমি নিজেই কোনো-মতে এ সব কথা ভাব্‌তেই পারতুম না কিন্তু এখন আমি এটা খুবই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি যে, মেয়েদের আমরা বিশেষভাবে কেবল ঘরের প্রয়োজনের জন্যেই গড়ে তুলেছি—কেবল সেই প্রয়োজনটুকুর মধ্যেই তাদের মর্য্যাদা আছে, সেই প্রয়োজনের বাইরে মানুষ বলে তাদের প্রতি দরদ নেই, তাদের প্রতি সন্মান নেই। বিশেষ প্রয়োজনের উপযোগী করে যাকেই আমরা খর্ব্ব করব তাকেই আমরা অনাদর না করে থাক্‌তে পারব না—এটা মানুষের ধর্ম্ম। গোরা এক একদিন রাগে জলে উঠে বল্‌তে থাকে—যে, ভারত-বর্ষের লোককে ইংরেজ কেবল সেইটুকু মানুষ করে তুল্‌তে চায় যেটুকুতে এরা তাদের অধীন হয়ে বিনা আপত্তিতে এবং সুচারুরূপে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আম-রাও ঠিক ততটা পরিমাণে মানুষ হয়ে তাদের কাজ বেশ ভাল করেই চালাচ্চি; এতে মাইনে পাই, মাঝে মাঝে বাহবাও পাই কিন্তু সন্মান পাইনে; পাওয়াও অসম্ভব; কিন্তু যেই আমরা ইংরেজের প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে চাই অমনি তারা আগুন হয়ে ওঠে। তারা বলতে চায় যে তোমরা পৃথিবীর পূবদেশী লোক, স্বভাবতই তোমরা তাবেদারী ছাড়া আর কিছুর যোগ্যই নও, অতএব সে চেষ্টা করলেই মাথা ভেঙে দেব। গোরা একথা মনেও করে না আমাদের দেশের মেয়েদেরও আমরা ঠিক এই রকম করেই খাটো করে রেখেছি—তাই রেখেছি বলে আমরা সমস্ত দেশটাশুদ্ধ যে কত খাটো হয়ে গেছি তা আমরা বুঝ্‌তেও পারিনে। কিছুদিন থেকে আমার এই কথা মনে হচ্চে, মা, আমি আর কোনো কাজ করতে পারি বা না পারি, দেশের মেয়েদের অবস্থা যদি কিছুমাত্র উন্নত করতে পারি তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার আশীর্ব্বাদে এ কাজ আমি করবই। এত দিন পরে আমার মনে হয়েচে, আমার নিজের কাজ আমি খুঁজে পেয়েছি।”

আনন্দময়ী বিনয়ের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন “ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।”

বিনয়। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্ত্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি; বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্ত্তব্যবোধের ঔদার্য্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবল ভাবে আমরা না দেখি;—ঘরের মধ্যে দুর্ব্বলতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখ্‌তে পাই তা হলে কখনই দেশের উপলব্ধি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

নিজের উৎসাহে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া বিনয় স্বাভাবিক সুরে কহিল, “মা, তুমি ভাব্‌চ, বিনয় মাঝে মাঝে এই রকম বড় বড় কথায় বক্তৃতা করে থাকে—আজো তাকে বক্তৃতায় পেয়েছে। অভ্যাসবশত আমার কথা গুলো বক্তৃতার মত হয়ে পড়ে, আজ এ আমার কিন্তু বক্তৃতা নয়। দেশের মেয়েরা যে দেশের কতখানি, আগে আমি তা ভাল করে বুঝ্‌তেই পারিনি—কখনো চিন্তাও করিনি। তাঁরা কেবল ঘরের লোকের মা বোন মেয়ে এই বলেই তাঁদের জানতুম। কিন্তু তাঁরা যখন মানুষ তখন ঘরের লোকের বাইরেও তাঁদের সম্বন্ধ আছে, এবং সেই বৃহৎ আত্মীয়তাকে তাঁরা বুদ্ধির সঙ্গে,

হৃদয়ের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে পালন করলে তবেই সমস্ত দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে এ কথা আমার কাছে আজ ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মা, আমি আর বেশি বকবো না। আমি বেশি কথা কই বলে আমার কথাকে কেউ আমারই মনের কথা বলে বিশ্বাস করে না। এবার থেকে কথা কমাব।"

বলিয়া বিনয় আর বিলম্ব না করিয়া উৎসাহদীপ্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।

আনন্দময়ী মহিমকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, বিনয়ের সঙ্গে আমাদের শশিমুখীর বিবাহ হবে না।"

মহিম। কেন? তোমার অমত আছে?

আনন্দময়ী। এ সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত টিঁকবে না বলেই আমার অমত, নইলে অমত করব কেন?

মহিম। গোরা রাজি হয়েছে, বিনয়ও রাজি, তবে টিঁকবে না কেন? অবশ্য, তুমি যদি মত না দাও তা হলে বিনয় এ কাজ করবে না সে আমি জানি।

আনন্দময়ী। আমি বিনয়কে তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিম। গোরার চেয়েও?

আনন্দময়ী। হাঁ, গোরার চেয়েও ভাল জানি, সেই জন্যেই সকল দিক ভেবে আমি মত দিতে পারচি নে।

মহিম। আচ্ছা গোরা ফিরে আসুক।

আনন্দময়ী। মহিম, আমার কথা শোনো। এ নিয়ে যদি বেশী পীড়াপীড়ি কর তাহলে শেষ কালে একটা গোলমাল হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে, গোরা বিনয়কে এ নিয়ে কোনো কথা বলে।

"আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া মহিম মুখে একটা পান লইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

চক্ষু পদার্থটা কি?

১ম। তুমিও জান' তোমার চক্ষু আছে—আমিও জানি আমার চক্ষু আছে। আমি কিন্তু আমার চক্ষুটিকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও কোনো স্থানেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমার চক্ষু কোন্ স্থানে বাস করে, তাহার তুমি কোনো সন্ধান পাইয়াছ কি? সন্ধান যদি পাইয়া থাক,' তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি—বল' দেখি—পৃথিবী বিস্তীর্ণ থালে এই যে তরোবেতরো নানা বর্ণের সামগ্রী তোমার সম্মুখে নৈবেদ্য-সাজানো রহিয়াছে—ইহার মধ্যে কোন্ সামগ্রীটা তোমার চক্ষু?

২য়। (আপন চক্ষুতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই দেখ আমার চক্ষু।

১ম। তুমি আপ্নি যাহা জন্মেও দেখ নাই, আমাকে তাহা দেখাইতে আসিয়াছ বুক ফুলাইয়া—এ এক রহস্য মন্দ না! সক্রেটিস্ কি সাধে বলিয়াছিলেন "Physician heal thyself হে চিকিৎসক আপন রোগের চিকিৎসা কর"!

২য়। কে তোমাকে বলিল—আমার আপনার চক্ষু আমি জন্মেও দেখি নাই? ঐ দেখ আয়নার ভিতরে আমার দুইদুটা চক্ষুর প্রতিচ্ছবি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

১ম। আয়নাটার আধ-হাত উপরে ঐ যে একটা জাপানি ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো রহিয়াছে—না জানি ওটা কোন্ মহাত্মার ছবি! তুমি অবশ্য জান'?

২য়। কেমন করিয়া জানিব—আমি তো দৈবজ্ঞ নহি।

১ম। দৈবজ্ঞ নহ? সে কি? তবে আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল—মার্জ্জনা করিবে। তুমি আয়নাটার ভিতর একটা কিসের প্রতিচ্ছবি যেই দেখিলে—দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলে যে, সেটা তোমার চক্ষুর প্রতিচ্ছবি; অথচ তোমার চক্ষুর সঙ্গে জন্মেও তোমার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমার তাই মনে হইল যে, ঐ জাপানি ছবিখানি দেখিবামাত্রই, উহা যে কোন্ মহাত্মার ছবি, তাহা চিনিতে পারিতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; বিশেষতঃ, বর্ত্তমান অৰ্দ্ধশতাব্দে যখন জাপানে মহাত্মার অভাব নাই।

২য়। তোমাদেরই তো ন্যায়-শাস্ত্রে বলে "ধূমাৎবহ্নি"। সে যা'ই হোক্—এটা তো তুমি মানো যে, "ফলেন পরিচীয়তে?" এই দেখ আমি চক্ষু বুজিলাম—আর অম্নি আমার সম্মুখের সমস্ত বস্তু আমার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পলাইল; চক্ষু মেলিলাম—আর অম্নি আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে পলায়িত-পূর্ব্ব বস্তুগুলা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

১ম। চক্ষু পদার্থটা কি? দর্শনেন্দ্রিয় তো? দর্শনেন্দ্রিয়

বলিতে বুঝায় শুদ্ধ কেবল দেখিবার যন্ত্র। কিন্তু তুমি যাহা উন্মীলন-নিমীলন করিলে তাহা আর একতরো যন্ত্র—তাহা আলোকরশ্মিকে ঘরে ঢুকাইবার এবং ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কপাট। ঐ রকমের কপাট'কে চক্ষু বলিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে—বহ'—তোমার আর একটি ঠিক্ ঐ রকমের চক্ষু তোমাকে আমি দেখাইতেছি। পাশের ঐ কুটুরী ঘরটি'তে আলোক যাতায়াতের একটিমাত্র পথ কেবল তাহার এই প্রবেশদ্বারটি, এতদ্ভিন্ন উহার আর কোনোদিকের কোনো স্থানে দুয়ার বা জানালা বা দেয়ালের গায়ে কোনো প্রকার ফুকর নাই। ঐ কুটুরী ঘরটি'র ভিতরে আমি এই প্রবেশ করিলাম; প্রবেশ করিয়া আমি আর কিছু দেখিতেছি না—কেবল দেয়ালের এক কোণে কতকগুলা নূতন-ক্রীত চক্‌চোকে' কাঁসার ঘটকলস স্তূপাকারে সাজানো রহিয়াছে—এই যা' দেখিতেছি। একবার আইস এখানে। আসিয়াছ ? উত্তম ! এই দেখ আমি কপাট বন্ধ করিয়া আলোকের পথ আটক করিলাম, আর অম্নি তোমার দৃষ্টিপথ হইতে ঘটকলস গুলা অন্তর্ধান করিল ; এই দেখ কপাট খুলিয়া আলোক'কে ঘরে ঢুকিতে পথ ছাড়িয়া দিলাম—আর অম্নি তোমার দৃষ্টিক্ষেত্রে ঘটকলস গুলা যেথানকার সেইখানে অনাহূত আসিয়া উপস্থিত। "ফলেন পরিচীয়তে" এই না তোমার কথা ? আমারও ঐ কথা। তুমি যেমন ফলেন পরিচীয়তে'র দোহাই দিয়া বলিতেছ যে, ঐ চর্ম্ম কপাট দুটা তোমার চক্ষু ; আমিও তেম্নি ফলেন পরিচীয়তে'র দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, এই কাষ্ঠ কপাট দুটা তোমার চক্ষু। এখন কাহার কথা সত্য ? তোমার কথা সত্য—না আমার কথা সত্য ? দেবদত্ত তো আর মিথ্যা বলিবার লোক নহেন—উঁহাকে মধ্যস্থ মানিতেছি—উনি বলুন্ কোন্ কথাটা সত্য—তোমার কথা না আমার কথা ?

দেবদত্ত। যদি কাষ্ঠকপাট চক্ষু হয়, তবে চর্ম্মকপাটও চক্ষু ; আর যদি কাষ্ঠকপাট চক্ষু না হয়, তবে চর্ম্মকপাটও চক্ষু নহে। কেননা, একই রকমের প্রমাণ একটার ব্যালায় গ্রাহ্য, আর-একটার ব্যালায় অগ্রাহ্য, এরূপ হইলে একযাত্রায় পৃথক্ ফল হয়; একযাত্রায় পৃথক্ ফল হইলে—ফলদৃষ্টে মূলের পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় ; ফল দৃষ্টে মূলের পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইলে—তোমাদের উভয়সম্মত গোড়া'র কথা সেই যে "ফলেন পরিচীয়তে"—সেই গোড়া'র কথাটি একেবারেই ফাঁসিয়া যায় : বিচারস্থলে বাদীপ্রতিবাদীর উভয়সম্মত গোড়া'র কথা ফাঁসিয়া গেলে তাহার উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আর আর যত কথা অখণ্ডনীয় বেদবাক্যের ভান করে, সমস্তই নস্যাৎ হইয়া যায়।

২য়। তোমার কথার ভাবটা এতক্ষণে আমি করতলে নাগাল পাইলাম। তুমি বলিতে চাহিতেছ এই যে, আমার এই চর্ম্মচক্ষুর অন্তঃপুর-মহলে যে এক প্রকার অর্দ্ধ-মানসিক অর্দ্ধ-শারীরিক দর্শনেন্দ্রিয় লুকাইয়া আছে, সেইটিই আমার প্রকৃত চক্ষু। তা আবার বলিতে ! ও যাহা তুমি বলিতে চাহিতেছ, উহা বেদবাক্যের ন্যায় অকাট্য। আমিও তাহাই বলি। অধিকন্তু আমি বলি এই যে, এ চক্ষু (অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষু) দ্বৈতগর্ভ ; কিন্তু সে চক্ষু (অর্থাৎ খাস্ দর্শনেন্দ্রিয়) দ্বিতীয় বর্জ্জিত। দুঃখের বিষয় এই যে, অন্তঃপুরটা যেমন অসূর্য্যম্পশ্য, অন্তঃপুরের রত্নটিও তেম্নি ; চক্ষুমণিটি গৃহস্বামী ভিন্ন দোস্‌রা কোনো লোকের সাক্ষাতে প্রাণান্তেও বাহির হয় না।

১ম। সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না—তোমার গুপ্ত নিধিটিকে আমি দেখিতে চাহিতেছি না। তুমি আপ্নি তাহাকে দেখিতেছ কিরূপ—সেইটিই আমার জিজ্ঞাস্য।

২য়। আমি দেখিতেছি যে, পক্ষিশাবক যেমন নীড়ের অন্তরাকাশে নিমগ্ন থাকে, অথবা সরস্বতী নদী যেমন বালুকাস্তরের অন্তরাকাশে নিমগ্ন থাকেন, সে চক্ষুটি (প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়টি) তেম্নি এ চক্ষুর (চর্ম্মচক্ষুর) অন্তরাকাশে নিমগ্ন রহিয়াছে।

১ম। কোন্ চক্ষে দেখিতেছ ?

২য়। অবশ্য মনশ্চক্ষে।

১ম। তুমি আমার সঙ্গে বড্ড চালাকি খেলিতেছ। মনশ্চক্ষু তো কল্পনা-চক্ষু। জন্মান্ধব্যক্তি যদি বলে যে, "গত-রাত্রের স্বপ্নে আমি কল্পনাচক্ষে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছি" তবে তাহার সে কথায় তুমি বিশ্বাস কর কি ? জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন জন্মেও সূর্য্যোদয় প্রত্যক্ষ করে নাই, তুমিও তেম্নি জন্মেও তোমার চক্ষুটিকে প্রত্যক্ষ কর নাই ; তবুও যদি লজ্জায়

জলাঞ্জলি দিয়া অম্লান বদনে বল যে, এই চক্ষুর (চর্ম্মচক্ষুর) অন্তঃপুরে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত চক্ষুর ন্যায় একটা চক্ষু কল্পনা-চক্ষে দেখিতে. পাইতেছ- তাহাতেই বা কি ? কল্পনার কাল্পনিক চক্ষু তো আর জলজ্যান্ত বাস্তবিক চক্ষু নহে। আদালতের বিচারক্ষেত্রে জ্যান্ত দেবদত্তের পরিবর্ত্তে দেবদত্তের আতপচিত্রকে (ফটোগ্রাফ'কে) সাক্ষী মান্য করা'ও যা,' আর, সত্যাসত্যের বিচারক্ষেত্রে জ্যান্ত চক্ষুর পরিবর্ত্তে কল্পনা-চক্ষুকে সাক্ষী মান্য করাও তা,' দুইই সমান।

২য়। ভাঙ্‌নে-ওয়ালা তোমার মতো দোস্‌রা একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভার! আমি ব্রহ্মার অবতার, তুমি শঙ্করের অবতার। দক্ষপ্রজাপতি এবং অক্ষপ্রজাপতি বা অক্ষি-প্রজাপতি একই। অক্ষ-দক্ষের জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া যেই আমি একটা শোভন-ঢঙের পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তুলিতেছি, আর অম্নি তুমি বীরভদ্র লেলিয়া দিয়া দিব্য-মনোজ্ঞ পুরীটাকে ভাঙিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া শ্মশানে পরিণত করিতেছ। আমার বিশ্বকর্ম্মা হ'চ্চেন কল্পনা, আর, তোমার বীরভদ্র হ'চ্চে প্রখর যুক্তি। চক্ষু এ না--ও না--সে না--তা' তো বুঝিলাম! কিন্তু সে ছাই বোঝা'তে মনের বোঝা ঘোচে কই ? চক্ষু পদার্থটা তবে যে কি--সেইটিই হ'চ্চে কাজের কথা। তাহার যদি কোনো সন্ধান তুমি পাইয়া থাক,' তবে বাদ-বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া তাহাই আমাকে বল'--আমি তাহা কাণ পাতিয়া শুনিতে প্রস্তুত; আর, তাহা যদি সদ্‌যুক্তির অনুমোদিত হয়, তবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

১ম। বলি তবে শোনো :--শেষবারে এই যে একটি কথা তুমি বলিলে--যে, তোমার যেটি প্রকৃত চক্ষু সেটি তোমার এই চক্ষুর অন্তরাকাশে নীড়মগ্ন পক্ষিশাবকের ন্যায়, অথবা বালুমগ্না সরস্বতী নদীর ন্যায় নিমগ্ন রহিয়াছে, আর তা' ছাড়া, সেটি দ্বিতীয়-বর্জ্জিত;--এ যাহা তুমি বলিলে এটা খুবই ভাল কথা; আমিও তাহাই বলি; আমিও বলি এই যে, সেইটিই তোমার প্রকৃত চক্ষুই বটে, আর, তাহা দ্বিতীয় বর্জ্জিতও বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, সে যে তোমার দ্বিতীয় বর্জ্জিত প্রকৃত চক্ষু--সে চক্ষুটিকে তুমি তোমার শরীরের অন্তরাকাশের কোনোস্থানেই দেখিতে পাইতে পার' না--তাহা তোমার নিকটে একান্ত পক্ষেই অদৃশ্য। তুমি প্রে শিকা'র পরীক্ষা দিবার সময় বীজগণিত যাহা ক' করিয়াছিলে তাহা যদি ইহারই মধ্যে উদরস্থ করিয়া বসি না থাক,' তবে তোমাকে আমি বলিতেছি এই যে, তোম এই চক্ষুর অন্তরাকাশস্থিত তোমার সেই দ্বিতীয় বর্জ্জি চক্ষুটি এক প্রকার বিলাতি বীজগণিতের x, অথবা যা একই কথা--দিশী বীজগণিতের য। য কি তা' তুমি জা তো ? য হ'চ্চে "যাবত্তাবৎ"-শব্দের গোড়া'র অক্ষর "যাবত্তাবৎ" কি ? না যতটা ততটা; অর্থাৎ তাহা (কতটা--এ কথা'র উত্তর আপাতত আমার ঘটে যাহ মৌজুদ্ আছে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, তাহা যতটা--তাহ ততটা; এক কথায়--তাহা যতটা-ততটা। তবেই হইতেছে যে, যাবত্তাবৎ শব্দের গোড়া'র অক্ষর ঐযে য, উহা unknown quantity'রই নামান্তর। "এতাবৎ" শব্দের গোড়া' অক্ষর হ'চ্চে "এ"; "এতাবৎ" কিনা এতটা। মনে মনে আমার তো খুবই সাধ যায়-- পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয় যাবত্তাবৎ শব্দের য, ব এবং ত'কে বীজগণিতের x, y, এব z' এর স্থলাভিষিক্ত করিতে, তথৈব, এতাবৎ শব্দের গোড়া'র এ'র সঙ্গে ও এবং ঐ এই আর-দুইটি অক্ষর'কে এক কোটায় নিক্ষেপ করিয়া এ ও এবং ঐ এই তিনটি দিশী অক্ষরকে বীজগণিতের A, B এবং C'র স্থলাভিষিক্ত করিতে। কিন্তু আমি যদি আমার মনের সুখস্বপ্ন মনশ্চক্ষে উপভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া, বীজগণিতের গড়ের মাঠে বা ইডন্‌বাগানে x-y-z'এর দখলি গণ্ডি'র ভিতরে ধুতি চাদর পরা দিশী য-ব-ত'কে ধরিয়া-বাঁধিয়া প্রবেশ করাই, তাহা হইলে য-ব দেখিয়াই তো তুমি প্রথমে যবুথবু বনিয়া যাইবে, তাহার পরে যখন আবার ত দেখিবে. তখন একেবারেই প বনিয়া যাইবে! অতএব- তাহাতে কাজ নাই--ইংরাজ-পছন্দ x-y-z'ই ভাল। তুমি জানিতে চাহিতেছ যে, তোমার এই চক্ষুর অন্তরাকাশে দ্বিতীয় বর্জ্জিত যে একটি চক্ষু জাগিতেছে, সে চক্ষুটি পদার্থটা কি। আপাতত তাহাকে x বলিয়া তো ধরিয়া লওয়া য্যা'ক্; তাহার পরে, বিরাট্ ভবনের বৃহন্নলা যে, লোকটা কে--x'এর numerical value যে কি--তাহার তথ্য নিরূপণ না করিলে রাত্রে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে এমন যদি মনে কর,

তবে তাহা রীতিমত আঁক কসিয়া বাহির করিবার চেষ্টা দেখা'ই বিধেয়। অতএব দেখা যা'ক্ :—

এক প্রকার দৃশ্য প্রদর্শনী* যন্ত্র আছে, আর, সেই যন্ত্রের দ্বারপ্রদেশের চৌকাট জুড়িয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য কতকগুলা জোড়া-জোড়া ছবি আছে। ছবির বাণ্ডিলের মধ্য হইতে একজোড়া ছবি লইয়া সেই ছবিজোড়া যন্ত্রটার বহির্দ্বারের চৌকাটের ফ্রেমে বসাইয়া যন্ত্রটার খিড়্কি দ্বারের দুরবিন-চোঙের মধ্য দিয়া যদি সেই ছবিযুগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র ছবি-জোড়াই দর্শকের চক্ষের সম্মুখে মস্ত একটা সত্যিকের দৃশ্য-বেশে সাজিয়া বাহির হয়। ছবিজোড়া যন্ত্রের অন্তরাকাশে চৌকাটের ফ্রেমে আট্‌কানো রহিয়াছে বটে, কিন্তু দর্শক তাহা দেখিতেছেন না মূলেই; কেবল, যন্ত্রের বহিরাকাশে (অর্থাৎ যন্ত্রের বাহির অঞ্চলের আকাশে) সহসা যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, তাহারই প্রতি দর্শকের দৃষ্টি ষোলো আনা মাত্রা নিবদ্ধ। কাজেই, যন্ত্রের অন্তরাকাশস্থিত অদৃশ্য ছবি-জোড়া দর্শকের নিকটে এক প্রকার "অবিজ্ঞাত যাবত্তাবৎ" (unknown quantity), সংক্ষেপে x; আর, যন্ত্রের বহিরাকাশস্থিত সুবিস্তৃত দৃশ্যমান ছবিটি দর্শকের নিকটে একটা "সুবিজ্ঞাত এতাবৎ" (known quantity), সংক্ষেপে A।

এখন, জিজ্ঞাসা করি যে, যন্ত্রের অন্তরাকাশস্থিত সেই যে অদৃশ্য ছবি-জোড়া যাহাকে বলা হইতেছে x, আর, যন্ত্রের বহিরাকাশস্থিত সেই যে সুবিস্তৃত দৃশ্যমান ছবি যাহাকে বলা হইতেছে A, এ দুই ছবি দুই না এক? এক—তাহা আবার বলিতে? যে ছবি-জোড়া যন্ত্রের অন্তরাকাশে চৌকাটের ফ্রেমে বসানো রহিয়াছে, সেই অদৃশ্য xই যন্ত্রের বহিরাকাশে সাজিয়া বাহির হইয়াছে দৃশ্যমান A হইয়া;— তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব এটা স্থির যে, $x = A$। এ তো গেল উপমা। প্রকৃত বক্তব্য যাহা তাহা এই :—

তুমি বলিতেছ যে, তোমার এই চক্ষুর (চর্ম্ম চক্ষুর) অন্তরাকাশে তোমার প্রকৃত চক্ষু নিমগ্ন রহিয়াছে, আর, সেই সঙ্গে এটাও বলিতেছ যে, সে যে তোমার প্রকৃত চক্ষু তাহা দ্বৈতবর্জ্জিত। ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দৃশ্য বস্তু সকলের ছবি-বৈচিত্র্য এবং দৃশ্যগ্রাহী চক্ষুর একত্ব দুইই তোমার চর্ম্মচক্ষুর অন্তরাকাশে কোনো-না-কোনো আকারে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। কিন্তু, যাহাই হউক্ না কেন অন্তরাকাশের ঐ দুইটি ব্যাপারের কোনটিকেই তুমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না—অন্তরাকাশ-স্থিত ছবিবৈচিত্র্যও চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না, অন্তরাকাশ-স্থিত চক্ষুর একত্বও চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না। চক্ষে দেখিবার মধ্যে তুমি দেখিতেছ কেবল বহিরাকাশস্থিত রূপ-সকলের বৈচিত্র্য এবং বহিরাকাশস্থিত আলোকের একত্ব। অতএব বীজগণিতের বিধানানুসারে অবশ্য একথা আমি বলিতে পারি যে,

(১) অন্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্ব $= y$

(২) অন্তরাকাশস্থিত ছবিবৈচিত্র্য $= z$

(৩) অন্তরাকাশের মোট ব্যাপার $= x = yz$

তেমনি আবার

(১) বহিরাকাশস্থিত আলোকের একত্ব $= B$

(২) বহিরাকাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য $= C$

(৩) বহিরাকাশের মোট ব্যাপার $= A = BC$

এখন, দৃশ্যপ্রদর্শনী যন্ত্রের দৃশ্যাদৃশ্য ছবির ভেদ-রাহিত্য পূর্ব্বে যেরূপ প্রণালীতে দেখানো হইয়াছিল, ঠিক্ সেইরূপ প্রণালীতে দেখানো যাইতে পারে যে, $z = C$, অর্থাৎ অন্তরাকাশস্থিত ছবিবৈচিত্র $=$ বহিরাকাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য।

এইরূপে পাওয়া যাইতেছে :—

প্রথম সিদ্ধান্ত।

$Z = C$ অর্থাৎ অন্তরাকাশস্থিত ছবি-বৈচিত্র্য $=$ বহিরাকাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

চক্ষু কি? না দর্শনেন্দ্রিয়। অর্থাৎ দেখন বলিয়া যে একপ্রকার ক্রিয়া আছে, সেই ক্রিয়ার করণ বা ইন্দ্রিয়।

---

* বিদ্যাপতি শ্রেণীর কবিদিগের গ্রন্থমধ্যে "মোহিনী মন্ত্র" এই বচনটির প্রয়োগ অনেকানেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। "মোহিনী মন্ত্র" "দৃশ্যপ্রদর্শনী যন্ত্র" দুইই খাস বাঙ্গলা ভাষা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় "মোহনী মন্ত্রঃ" অজহর লিঙ্গ হিসাবে চলিতেও পারে; একেবারেই যে চলিতে পারে না তাহা নহে।

এই যে, দেখন ক্রিয়ার বীজ—দর্শনেন্দ্রিয়, যাহা চর্ম্ম চক্ষুর অন্তরাকাশে শক্তিরূপে (potential রূপে) অন্তর্নিলীন, তাহাই চর্ম্ম চক্ষুর বহিরাকাশে দৃশ্য ফলাকারে অভিব্যক্ত হয়। অন্তরাকাশের মোট ব্যাপার হ'চ্চে দৃশ্য-দেখা চক্ষু; বহিরাকাশের মোট ব্যাপার হ'চ্চে চক্ষে-দেখা দৃশ্য; এ দুইটি মোট ব্যাপারের একটিতেও যেমন আর একটিতেও তেম্নি, দুয়েতেই, চক্ষু, দেখা, এবং দৃশ্য, এই তিনটি উপাদান পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত; প্রভেদ কেবল এই যে, অন্তরাকাশে ঐ তিনটি উপাদানের সমষ্টি বীজরূপে অন্তর্নিগূঢ়; বহিরাকাশে উহা ফলরূপে অভিব্যক্ত। তবেই হইতেছে যে, $x = A$ অর্থাৎ অন্তরাকাশের মোট ব্যাপার = বহিরাকাশের মোট ব্যাপার। কিন্তু $z = yz$ (অর্থাৎ z = অন্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্ব × অন্তরাকাশস্থিত ছবি বৈচিত্র্য); তথৈব, $A = BC$ (অর্থাৎ A = বহিরাকাশস্থিত আলোকের একত্ব × বহিরাকাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য)। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, $yz = BC$

কিন্তু $z = C$ (প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব $y = B$ অর্থাৎ অন্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্ব = বহিরাকাশস্থিত আলোকের একত্ব। এইরূপ আঁক কসিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, $y = B$ দিশী ভাষায়—য = ঐ

অর্থাৎ যে চক্ষু তোমার এই চক্ষুর (চর্ম্ম চক্ষুর) অন্তরাকাশে নিমগ্ন তাহা ঐ আলোক। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে,

এক দিকে যেমন—

> আকাশ করিলে প্রকাশ বন্ধ
> নয়নের হয় নয়ন অন্ধ॥

আর একদিকে তেম্নি

> আঁখি দ্বার বন্ধ যা'র
> আলো তার অন্ধকার॥

অতএব এটা স্থির যে, অন্তরাকাশের চক্ষু = বহিরাকাশের আলোক। একই গঙ্গাজল যেমন অসংখ্য পাইপের জল, তেম্নি একই আলোক সর্ব্ব জীবের চক্ষু। চক্ষু হইতে আলোককে বাহির করিয়া দেওয়াও যা, আর, চক্ষু হইতে চক্ষুকে বাহির করিয়া দেওয়াও তা, একই; তেম্নি আবার চক্ষুতে আলোক অভ্যর্থনা করিয়া আনাও যা, আর, চক্ষুতে চক্ষু অভ্যর্থনা করিয়া আনাও তা, একই। আলোকের আবাহন বিসর্জ্জনেই চক্ষুর আবাহন বিসর্জ্জন হয়; অতএব বহিরাকাশের আলোকই অন্তরাকাশের চক্ষু। সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে বহিরাকাশ এবং অন্তরাকাশ বলিয়া দুই পৃথক্ শ্রেণীর আকাশের অবতারণা একপ্রকার—কল্পনা রাজ্যে গন্ধর্ব্ব নগরের পত্তন বই আর কিছুই না; কেননা আকাশ অখণ্ড এবং তাহা এক বই দুই নহে; আর, সেই কারণ গতিকে অন্তরাকাশ এবং বহিরাকাশ একই অখণ্ড আকাশের দুই কল্পিত খণ্ডাংশ বই আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে কথা বারান্তরে যথাসময়ে হইবে—এ যাত্রা আর না—যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টং।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা।

(পিরিউর ফরাসা হইতে)

অভিজাত বর্গের উত্তরাধিকারিগণ, যাঁহারা পার্লেমেণ্ট-শাসনতন্ত্রের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া আগ্রহের সহিত দিন গুণিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি পরামর্শ দিই, তাঁহারা একবার এসিয়া ভ্রমণ করিয়া আসুন। তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিবে। যে অস্ত্র আমাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, এসিয়িকেরা তাহাই ভক্তিভাবে কুড়াইয়া লইতেছে। আমাদের পুরাতন সেকেলে বন্দুকগুলা নিগ্রো রাজারা খুব জাঁকজমকের সহিত ব্যবহার করিতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানে শাসনকার্য্যের সার্ব্বজনিক সভা এবং ১৮৮৬ হইতে ভারতে রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে। এমনও ঘটিতে পারে, আমাদের অস্ত্রগুলা লইয়াই এসিয়া তাহার নিজের ধরণে তাহাদিগকে আরও ভাল করিয়া তুলিবে। জাপানীরা যখন সংবাদপত্রে পাঠ করে যে, ফরাসী পার্লেমেণ্টে কিংবা অষ্ট্রীয়ার পার্লেমেণ্টে সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে, তখন কি তাহারা হাসে না? কেননা, জাপানে সদস্যদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি কখনই হয় না। যখন য়ুরোপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়

৭।৮ জনের প্রাণ যায়, কিংবা ১০।১২ টার ঠ্যাং ভাঙ্গে, কিংবা কতকগুলার চোক্ ফুটা হইয়া যায়, তখন টোকিওর সংবাদ-পত্র নির্ব্বাচকদিগের এই মধুর ব্যবহার অতীব হৃষ্টচিত্তে লিপিবদ্ধ করে সন্দেহ নাই।

নব্য জাপান Petit Poucetর বুট পরিয়াছে; পুরাতন ভারত, শবের বস্ত্র গায়ে আঁটিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়াছে—হয় ত জাপান অপেক্ষা ধ্রুব পথে চলিয়াছে। ভারতে, রাষ্ট্রীয় শাসন-সভার স্থলে রাষ্ট্রীয় পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে; ইহাও কম উন্নতির কথা নহে। ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতিবৎসর চারিদিন ধরিয়া এই রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয়। প্রভুদের সরকারী মতামতের বিরুদ্ধে, প্রজাপুঞ্জের স্বাধীন মতামত এই পরিষদে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। একবার ভাবিয়া দেখ,—এটা কি অভূতপূর্ব্ব অভিনব ব্যাপার; যেখানে এতদিন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরীভাব ছিল—রুদ্ধভাব ছিল, সেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত পরস্পারের সহিত মিলিত হইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছে! একটা বৃহত্তর ভাব আসিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র ভাবগুলার স্থান অধিকার করিয়াছে। জাতীয় পতাকার তলে, এই প্রথম সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দৃশ্যটি অতীব হৃদয়গ্রাহী, স্বদেশপ্রীতি ও পার্লেমেণ্টতন্ত্র দুইটি যমজের ন্যায় এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, চাষা তাহার গ্রামের মাটির দেয়ালের পিছন হইতে সুদূরবর্ত্তী কংগ্রেসের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছে এবং স্বদেশ ও স্বাধীনতা এই দুই শব্দের অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়াও উহার মোহে মুগ্ধ হইতেছে। * * *

আরম্ভটা বহুকষ্টে সম্পন্ন হইয়াছিল। বোম্বায়ের প্রথম কংগ্রেসে শুধু ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। তাহার পরের বৎসরে, কলিকাতায়, প্রতিনিধির সংখ্যা এক লাফে ৪৩৬ পর্য্যন্ত উঠিল। বোম্বায়ের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, ২০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল, এবং এই দ্বিতীয় কংগ্রেস, সমস্ত দেশের মুখপাত্র বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারে। যদিও কংগ্রেসের সংস্থাপক হিউম একজন ইংরেজ, এবং ইহার সহকারীও কতকগুলি ইংরেজ, তথাপি কংগ্রেস ভারতীয় ইংরেজের মতামত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। একবার কল্পনা করিয়া দেখ, যাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের বাহিরে, যাহারা কোন প্রকার আঁটক সহ্য করিতে পারে না, যাহারা পদানত জনতার বুকের উপর দিয়া উন্নত মস্তকে চলিয়া যায়, সেই রাজপুরুষেরা কিরূপ বিষণ্ণভাবে জাগিয়া উঠিল! "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, নানা প্রকার অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল, কানপুরের হত্যাকূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিল! কিন্তু কংগ্রেস টলিল না। অরাজদ্রোহী মিত-বাদিতার দ্বারা, কংগ্রেস, রাজপুরুষদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও গুরুতর অপবাদগুলাকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

অধুনা, কংগ্রেস বড়লাটের সহিত গণনীয়। এক্ষণে কংগ্রেস, লোক-মতের অধিকারপ্রাপ্ত মুখপাত্র। এই স্বাধীন ও অবারিতদ্বার বিচারালয়ে আসিয়া, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারত, একজাতিতে পরিণত সমস্ত ভারত, —যাহারা ভারতকে শিক্ষা দিয়াছে, যাহারা ভারতকে শোষণ করিতেছে, সেই বিদেশী প্রভুদের নিকট চির-প্রপীড়িতের দুঃখবেদনা নিবেদন করে।

এই ১৯০০ অব্দের শেষভাগে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায়, হিমালয়ের অনতিদূরে, লাহোরে কংগ্রেস বসিবে। কাজেই একটু শীঘ্র শীঘ্র আমাকে বোম্বাই ছাড়িতে হইবে। আট দিন হইল আমি জাহাজ হইতে বোম্বায়ে নামিয়াছি। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের আফিসে কংগ্রেস-ওয়ালাদের আড্ডা। সেইখানে সবাই সমবেত হইতেছে, যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তর্কবিতর্ক করিতেছে। আমি সেই-খানে গিয়া মালাবারির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বোম্বায়ের উকীল মাননীয় চন্দাবরকারের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। ইনি উদারনৈতিক দলের প্রধান, সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছেন। ইনিই এই বৎসরের কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই শেষবার তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশানের গুরুভার গম্বুজ-তলে ও খিলান-পথে কি শ্বাসরোধী জনতা! এই কংগ্রেসের ট্রেণ, আমাদের তীর্থযাত্রী কিংবা উপনিবেশযাত্রীর ট্রেণ স্মরণ করাইয়া দেয়।

মাথার পাগ্‌ড়ীর উপর বড় বড় তোড়ঙ্গ লইয়া, নগ্নকায় কুলিরা সারি সারি চলিয়াছে এবং রেল-গাড়ীর কামরায় চড়াও করিয়া উঠিয়া পড়িতেছে। যাচ্ঞার ভাবে প্রসারিত দুই হস্তে দুই-দুই পয়সা নিঃক্ষেপ করিবা মাত্র তাহারা ধূলাচ্ছন্ন ও গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে আর একটা তোড়ঙ্গের সন্ধানে, একদৌড়ে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে আমার 'ছোক্‌রা,' গাড়ীর কাম্‌রায় উপরিতন বেঞ্চের উপর আমার বিছানা পাতিয়া দিল। কাম্‌রার চারিটা শয্যাই অধিকৃত হইয়াছে। আমার নীচের শয্যাটি একজন পার্সি অধিকার করিয়াছে। আমার সম্মুখস্থ একটা জায়গায় একজন ইংরেজ পূর্ব্ব হইতেই দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহার চুরোটের বাক্‌সটা খোলা, সে একটুকরা বরফ ভাঙ্গিল, এবং একটা রূপার গেলাস বাহির করিয়া তাহাতে হুইস্‌কি ঢালিল। এক গাদা তোড়ঙ্গ ও বাক্সে গাড়ীর কামরাটা ভরিয়া গিয়াছে। এগুলা বোধ হয় তাহারই জিনিসপত্র। পরে কাম্‌রার ঠিক্‌ মাঝখানে একটা টেবিল খাড়া করিল। এই টেবিল ও তোড়ঙ্গগুলার মাঝে একটা কুকুর ঘুমাইতেছে। এই তোড়ঙ্গগুলা তুমি যে একটু সরাইয়া রাখিবে তাহার জো নাই। পরদিন প্রত্যূষে দুম্‌দাম্‌ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,--চোখ মেলিয়া দেখি কি না,—কতকগুলা থলে, কতকগুলা খেলনার প্যাটরা, কতকগুলা অদ্ভুতধরণের বাক্স আমাদের গাড়ীতে চোরা-গোপ্তান চালান দিতেছে। সেই সঙ্গে কতকগুলা ঘর্ম্মাক্তগাত্রও উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। একজনকে গাড়ীর ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া, গাড়ীর দরজাটা ধড়াস করিয়া কে বন্ধ করিয়া দিল। লোকটি ভারতবাসী—তোড়ঙ্গাদির উপর দিয়া অতি কষ্টে প্রবেশ করিল। আবার সব নিস্তব্ধ। আর স্থান নাই—কি বেঞ্চের উপর, কি অন্যত্র, কোথাও ছিলাদ্ধ স্থান নাই। এখন হইতে আমরা নিশ্চিন্ত।

উপর হইতে আমি আমার সহযাত্রীদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি। হিন্দুটি এই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জিনিসগুলি বেশ গুছাইয়া রাখিয়াছে। প্রথমে একটি লোহার বাক্‌স খুলিল এটি লেখিবার বাক্স - আর একটি বাক্স খুলিল ;--তাহাতে চ্যাপ্‌টা 'কর্ণেটের' আকারে ভাঁজ করা এক তাড়া সবজ পাতা রহিয়াছে—এটি পানের বাক্‌স। তারপর সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। এই হিন্দুটির মুখ, ও সমস্ত মাথা কামানো, কেবল চূড়াদেশে লম্বা পাক-ধরা এক গোচ্ছা লম্বা চুলে গেরো বাঁধা···পার্শিটির ইংরেজি পরিচ্ছদ—মাথায় ধুচনী টুপী নাই -ধুচনী-টুপিটা কংগ্রেসেই পরা হইবে। এই হিন্দু ও এই পার্শি—দুজনেই প্রধান কংগ্রেস-ওয়ালা ; দশবৎসর পূর্ব্বে, লণ্ডনে হিন্দু-প্রতিবাদের পক্ষ সমর্থন করিবার ভার এই হিন্দুটির উপর প্রদত্ত হয়। ইনি অত্যন্ত বহুভাষী। ইনি উকীল, জাত্যংশে ব্রাহ্মণ। কে জানে কেন উনি প্রথমেই আমার সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন, খুব আহ্লাদের সহিত স্পেনসারের কথা পাড়িলেন। স্পেনসারের উপর তাঁর খুব ভক্তি। কিন্তু আমি কংগ্রেসের কথা পড়িলাম। তিনি কংগ্রেসের সমস্ত বিষয় আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন ;—"না, আমরা বিদ্রোহীর দল নহি, আমরা মহারাণীর নিতান্ত অনুগত ভক্ত প্রজা ; কারণ, সব দিক্‌ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদের আত্ম-শাসনের এখনও সময় হয় নাই ; আর যদি শুধু প্রভু-পরিবর্ত্তনের কথা হয়, তাহা হইলে রুস্‌ অপেক্ষা বরং আমরা ইংরেজকেই বেশী পছন্দ করিব।" এই কথা বলিয়া, তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী পার্সীর হস্তে একটা দেশী সংবাদপত্র দিলেন। উহাতে কংগ্রেসের কথা জলন্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের লেখক একজন মুসলমান। তিনি বলিলেন, "এই দেখ, লোকটা কতকগুলা জলন্ত চ্যালা কাঠ নিঃক্ষেপ করিয়া, আমাদের উপর দোষারোপ করিতেছে যে আমরাই চারিদিকে আগুন জ্বালাইতেছি···কিন্তু এখন মুসলমানদের রাগ অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাদের বিদ্বেষের আর প্রতিধ্বনি হয় না"। পার্সী ঐ সংবাদপত্র আমার হাতে দিলেন ; আরও আমাকে একটা চুরোট দান করিলেন। ইংরেজ, তাঁহার বেঞ্চের উপর নীরব ও গর্ব্বিতভাবে রহিয়াছেন ; এই কংগ্রেস-ওয়ালারা, এই বাক্‌সর্ব্বস্ব বক্তারা যাহা বলিতেছে, তাহা তাঁহার শুনিবার যোগ্য নহে ; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিকই তিনি যেন বিস্ময়ে নিমগ্ন—বিস্ময়ের আরও একটা কারণ এই যে, একজন "উচ্চতর জাতির" লোক, একজন ফরাসী, এই সকল ঘৃণিত লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে·· এই ট্রেণে কংগ্রেস-ওয়ালারা যাই-

তেছে, রাজকর্ম্মচারীরা যাইতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা যাইতেছে। ভোজনাগারে আবার সকলেই একত্র মিলিত হইল। মাদ্রাজ হইতে আগত কতকগুলি কংগ্রেসওয়ালার সহিত আমি একত্র প্রাতর্ভোজন করিলাম। উহাদের কেশহীন মস্তক গোলাকার ও তেল-চুক্‌চুকে, দেহের গঠন পরিপাটী, মুখাবয়ব গোল্‌গাল ও ভারী ভারী, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহারা তাঁহাদের হিন্দু ভৃত্যদের নিকট লুকাইয়া আহার করিতেছেন। ভৃত্যেরা যদি দেখিতে পায়, তাঁহারা গোমাংস খাইতেছেন, তাহা হইলে ভয়ানক নিন্দা রটিবে!

আমাদের ট্রেণ উত্তরাভিমুখে উঠিতেছে, হাজা-পোড়া ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে,—বুনো ময়ূর ও হরিণের পালকে ভাগাইয়া দিতেছে; একে একে অনেক গুলি পুল পার হইয়া স্রোত-পথের বিস্তৃত বালুকাময় ভূমির উপর আসিয়া পড়িতেছে—এই স্রোতপথে সূতার মত একটি সরু জলস্রোত প্রবাহিত। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, একটা দড়ির পিছনে, দেশীয় রেল-যাত্রীর দল, কখন্ পথ খুলিয়া দিবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে; এই সব লোকদিগের নগ্ন জঙ্ঘা, সূক্ষ্ম শ্মশ্রু সযত্নে কুঞ্চিত কিংবা হাত-পাখার আকারে চারি দিকে বিস্তারিত; মাথায়, সাদা, জর্দ্দা, সবুজ রঙ্গের কাপড় শোভন ভাবে জড়াইয়া বাঁধা সুন্দর শিরোবেষ্টন। স্ত্রীলোক-দিগের চিক্‌চিকে মসৃণ চুলের উপর, তাহাদের গোলাপী কিংবা বেগ্‌নী শাড়ীর কিয়দংশ টানিয়া আনা হইয়াছে গায়ে ও হাতে কাচের গহনা, নাকে একটি অলঙ্কার, কপাল—লাল ও সাদা রেখায় অঙ্কিত, কাঁকে একটি কচি শিশু... দ্বিতীয় দিনের সায়াহ্নে, দিগন্তদেশে গগনস্পর্শী হিমাচলের নীহারময় চূড়াসকল আমাকে দেখাইয়া দিল। রাত্রি দুইটার সময় সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "লাহোর"! এই সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চীনের রাস্তার মত গভীর কর্দ্দমময় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, আমার ভৃত্য গাড়ী ও হোটেলের সন্ধান করিতে লাগিল।

সেই রাত্রে, সমস্ত হোটেলই লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ...অনেক কষ্টে আমি একটা শুইবার খাট্ পাইলাম—তাহাতে গদি নাই লেপ্ কম্বল কিছুই নাই। খৃষ্টমাসের পূর্ব্বরাত্রি। এই রাত্রিটা খুব আমার মনে থাকিবে। হিমালয়ের দূরতম পর্ব্বত পর্য্যন্ত—সকল স্থান হইতেই শিঙ্গাধ্বনি শ্রুত হইতেছিল...ইংরেজ রাজপুরুষ, রাজ-কর্ম্মচারী, শুল্ক আদায়ের লোক—সকলেই আসিয়াছে। ইংরেজ রমণীরা 'বল্'-নাচের পরিচ্ছদ সঙ্গে আনিয়াছে, ইংরেজ পুরুষেরা "স্মোকিং"-পরিচ্ছদ সঙ্গে আনিয়াছে। অস্থায়ী পার্থিব জীবনের ক্ষণিক মোহে মুগ্ধ হইয়া, উহারা ছোটলাটের 'বলে'র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, ডেপুটি কমিশনারের উদ্যান-মজ্‌লিসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরেই হয় ত বিজন বিষণ্ণ কাশ্মীরে কয়েকমাস যাপন করিবে। পায়রার ঝাঁকের মত অম্লানকান্তি নব-যুবতীরা দলে দলে আসিয়াছে। এই উৎসব-আমোদে যোগ দিবার জন্য মুক্তপিঞ্জর মুগ্ধ বিহঙ্গশিশুর মত বালিকারাও একাকী আসিয়াছে।

তাহার পরদিন, একটা অপ্রত্যাশিত মনোমুগ্ধকর ঘটনা! আমার ঘরটি আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, নিবিড় মেঘের পর্দ্দাটি উত্তোলিত হইয়াছে। আমি এখন কোথায় আছি?—খোলা ময়দানের মধ্যে। যে হোটেলে দৈবক্রমে আমি আসিয়া পড়িয়াছিলাম তাহার সাদা খিলান-পথ ক্রমশ ফুলের বাগানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফুলের উপর শিশিরবিন্দুগুলি ঝলিতেছে। হিন্দু সহরটি এখান হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে। সাদা-ছিটোনা নীল আকাশে, শিকারী পাখীরা চক্রাকারে ঘুরিতেছে—টিয়ার ঝাঁক অনবরত কিচিড়্‌মিচিড় করিতেছে... আর্দ্র ভূমির মেঠো-পথগুলি আমার জন্মভূমিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই দুষ্প্রেক্ষ্য জ্বলন্ত আলোক আমাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। দুইটা রাত্রে এই পান্থশালায় আসিয়া আমি যে বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া-ছিলাম সেই মেঘ এখন কাটিয়া গিয়াছে; এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য, ঐ গোলাপী রঙ্গের ধ্বজ-স্তম্ভটি নিকট হইতে দেখিবার জন্য, শিশিরসিক্ত সাদা সাদা গাছের মধ্য হইতে বহির্গত ঐ গোলাপী বাড়ী-গুলা দেখিবার জন্য আমি খুব ত্বরা করিতেছি... কিন্তু রাস্তায় বড় কাদা, গাড়ীর চাকা নাভিদেশ পর্য্যন্ত কাদায় বসিয়া যাইতেছে। ময়লা পরিষ্কারের ভার সূর্য্যের উপর দিয়া, শিকারী পাখীদের উপর দিয়া ইংরেজরা বেশ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। ভ্রমণকারীর দল Cookএর নিকটে ভ্রমণপথের সংবাদ লইতেছে—যে প্রাচ্য সহর এখান হইতে

এক ক্রোশ দূরে তাহার কথা একবারও কেহ মনে করিতেছে না…সুন্দর একটি বাসস্থান স্থাপন করিবার জন্য মোগল সম্রাটেরা ঐ সহরটিকে সর্ব্বপ্রকার বিলাস বিভবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই মোগল সম্রাটেরা মৃত, এখন উহার সিংহদ্বার দিয়া বাদশাদিগের নগরযাত্রার জমকালো ঠাট আর বাহির হয় না। এবং এখনকার প্রভুরা এই সকল সুন্দর সিংহদ্বার দিয়া কদাচিৎ যাত্রা করেন। তাঁহারা এই দেশীয় লোকের কুষ্ঠাশ্রমে,—এই সকল সরু রাস্তায় যাইতে ভয় করেন, যেখানে পোকার মত লোক কিলবিল করিতেছে। এই সকল রাস্তা এক এক স্থানে যেন হঠাৎ উপরে চড়িয়া গিয়াছে, এবং কত ঘোরপাক করিয়া মার্ব্বেলের দুর্গপ্রাসাদ পর্য্যন্ত, স্বর্ণ মস্‌জেদ পর্য্যন্ত, চিনেমাটীর মস্‌জেদ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—রাস্তায় অসমান আকারের ঠাসা গোলাপী বাড়ীগুলা জলন্ত আলোকে পরিপ্লাত জালিকাটা গবাক্ষগুলা, নীলময়ূরের দ্বারা পরিধৃত, রং করা, খোদিত জাফ্‌রির কাজ করা জান্‌লা গুলা একটা চমৎকার দৃশ্য! এই সকল সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে কত আগ্রহপূর্ণ জলন্ত নেত্র প্রচ্ছন্ন থাকে! বাজারের ভিতর, —মুসলমান, শিখ, আফগানদের বহুমিশ্র জনতা—লাল পশমি বস্ত্রে উহাদের গাত্র আচ্ছাদিত, মাথায় উচু পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা তাম্র-কলস মাথায় বহিয়া লইয়া যাইতেছে; কলসগুলা সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে; কোথাও বা দৈন্যসূচক মলিন চীর বস্ত্র, কোথাও বা কুষ্ঠরোগীর জঘন্য ক্ষত পটী; স্বর্ণবর্ণ ধূলারাশি সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে… প্রাচ্য দেশের সমস্ত দৈন্য, জঘন্যতা ও সমস্ত জাঁকজমক একত্র মিলিত হইয়াছে।

বাদশাহী ভোজের খাদ্য সামগ্রীতেই বাজারের গুজরান চলিত। বাদ্‌শাহী ভোজের মত বহুমূল্য ও দুস্তোষ্য সূক্ষ্ম রুচির ভোজ আর কোথাও দেখা যায় না। লাহোর ও আগ্রার ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদের মধ্যে যাহারা মোগল বাদশাহদিগের উৎসবাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহাদের চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে—চিরকালের মত ঝলসিয়া গিয়াছে…কি চমৎকার এই সকল জালিকাটা সাদা মার্ব্বেলের জাফ্রি! একবার কল্পনা করিয়া দেখ, এই সকল দরবার-দালান আগাগোড়া অসংখ্য শাসি-আয়নায় মণ্ডিত, খুদিয়া ঘর-কাটা রত্নরাজির ন্যায় ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, তাহার চারিধারে নীলরঙের লতাপাতায় নক্‌সা ও মার্ব্বেলের পুষ্প-রাজি, ও তাহা হইতে সাদা সাদা পুষ্পকেশর বাহির হইয়াছে; রাজদরবারের বিবিধ পোষাক কল্পনা করিয়া দেখ এবং আলোকের ছটা কিরূপ অনন্তগুণে চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে—ঠিকরাইয়া পড়িতেছে—তাহা কল্পনা করিয়া দেখ…সমস্তই চোখের সোহাগ, চোখের বিলাস, চোখের আরাম;—শুধু তাহা নহে, দীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়া যায়!

উহা অতীতের কথা। নির্ব্বাপিত দীপ্ত-গৌরবের কতকগুলি দেদীপ্যমান অবশেষ মাত্র!…ভবিষ্যৎ, ভাবী ভারত কংগ্রেসের ক্রোড়ে লালিত হইতেছে… সেই কংগ্রেসের অধিবেশন খুব নিকটেই হইবে।

* * * * *

—"মেরি ক্রিস্‌মাস্‌, মেরি ক্রিস্‌মাস্‌, মিষ্টার ফ্রেঞ্চ-ম্যান" …

এই শুভ কামনার শুভ বাণী কাশ্মীরী মিসিবাবাদের মুখ হইতে, গোলাপী ওষ্ঠাধর হইতে নিঃক্ষিপ্ত হইল। এই শুভ কামনা আমাদের আসল ব্যাপারটা স্মরণ করাইয়া দিল। আজ ক্রিস্‌মাস; পরশ্বদিন কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিরূপে এই কংগ্রেস বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস তোমাদের নিকট এইবার বিবৃত করিব।

আমার সহভোজীদের মধ্যে কংগ্রেস সম্বন্ধে খুব কৌতূহল হইয়াছে। ভোজন-টেবিলে, আমার পাশে যে ইংরাজটি বসিয়াছিল সে আমাকে বলিল "উহাদের কেবলি কথা, কথাই সার"। দেশী কিছুই ইহাদের ভাল লাগে না…কংগ্রেসটা যে ইংরেজের কার্য্য একথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। কংগ্রেস, মেকলের মরণোত্তরজাত সন্তান। এই রাজনৈতিক পুরুষ আজ বাঁচিয়া থাকিলে একথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। যিনি সমসাময়িক ভারতের উপর একটা সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত প্রভাব প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই মেকলে আজ নিশ্চয়ই তাঁহার জাতভাইদের অন্ধ ও অযৌক্তিক প্রতিকূলতার প্রতিবাদী হইতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা তিনি ভারতকে অতীতের পথ হইতে ছিনাইয়া আনিবেন। তিনি

যদৃচ্ছা দূরদৃষ্টির দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা কাজে ঘটিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, কালেজে, মধ্য-বিদ্যালয়ে যে বিলাতী শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহারই প্রভাবে একটি শিক্ষিত উদারনৈতিক শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। তাহারা বিলাতী ধরণে চিন্তা করে, বিলাতী ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারাই নব্য ভারত; কি করিয়া ভারতকে পৃথিবীর বর্ত্তমান উন্নতির উপযোগী করিয়া লওয়া যায়, ইহাই নব্য ভারতের একমাত্র ধ্যান ও কল্পনা। যুবকেরা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছে। কি করিয়া আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন হইয়া সেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ক্রমে পার্লেমেণ্ট-পদ্ধতিতে পর্য্যবসিত হইল তাহা ঐ ইতিহাস পাঠেই জানা যায়। উহারা ফক্সের জ্বালাময়ী বক্তৃতা পাঠ করিল, আবৃত্তি করিল, অনুকরণ করিল। উহারা লক্, বেনথ্যাম ও মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কি বাগ্মী, কি ঐতিহাসিক, কি দার্শনিক—সকলেই উহাদিগকে একইরূপ শিক্ষা প্রদান করিল। উহাদের মনে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বৃহৎ কল্পনা সকল উদ্বোধিত হইল। কিন্তু যখন তাহারা চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, তখন দেখিল কি?—দেখিল এই সকল জ্বলন্ত উচ্চভাবের কথাগুলা কেবল অধ্যাপকদিগের মুখের কথামাত্র—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এখন সামান্য ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী একজন মহারাজা অপেক্ষাও স্বেচ্ছাচারী প্রভু; তাহার কোন আটক নাই; বেক্ বলেন, কর্ত্তব্যের আটকই তাহার একমাত্র আটক। এই আটকটি একটু বেশীরকম মানসিক! এই আটককে ইচ্ছামত উঠান যায়, নামানো যায়। নিমন্ত্রিত-বর্গের ঠেলা সামলাইবার পক্ষে, এ আটকটি একটু ভঙ্গুর। যে সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না তাহা উদ্বোধিত করা অদূরদর্শীর কাজ। বিদ্যালয় হইতে প্রথম বাহির হইয়া, উদারনৈতিকতা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং যাহারা সাহস করিয়া "কালাপানি" পার হয় তাহারা স্বকীয় অধ্যয়ন ও ভ্রমণ হইতে স্বাধীন চিন্তার একটা রুচি ও স্বাধীনতার একটা জ্বলন্ত অনুরাগ আনিয়াছিল।

আবার হিন্দুরা এই কথা বলে, বিলাতী শিক্ষাতেই সব হয় নাই। বিলাতী শিক্ষা, কেবল কতকগুলি গভীর স্বাভাবিক ভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরাই সর্ব্বাপেক্ষা পার্লামেণ্ট-পদ্ধতিতে আসক্ত। Anstey ও Sir Bartle Frere-রও এই মত। Anstey বলিয়াছেন যে, "প্রাচ্য ভূভাগই মুনিসিপ্যালিটির জনক।" বস্তুত একথা খুবই সত্য যে ভারতের সমস্ত ছোটখাটো বিষয় পার্লেমেণ্টি পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামের কাজ, সমবেত গ্রামসমূহের কাজ একটা স্থায়ী সমিতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। পরিবারবিশেষের ধনশালী ও প্রভাবশালী কর্ত্তারাই এই সমিতির সদস্য। পঞ্চায়ৎ নামে একটা অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে এমন সকল বিষয় সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বাদানুবাদ হয় যে সকল বিষয় আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ এক একটি প্রাচীন লোকের মণ্ডলী আছে। এই পঞ্চায়ৎ সভা জাতের বিষয়ে, সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মের বিষয়ে, চরম নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। এবং শান্তিরক্ষার এক প্রকার আদালৎ রূপে আপনাকে দাঁড় করাইয়া এই পঞ্চায়ৎ বাটোয়ারা ও সীমানা সম্বন্ধের সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া দেয়। অতএব দেখ, ইহার অধিকার কত বিস্তৃত:—সমাজসম্বন্ধীয় অধিকার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার, বিচারসম্বন্ধীয় অধিকার। উহার কোন আপীল নাই। উহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড—সমাজ হইতে বহিষ্করণ। কেহ কেহ বলেন, এই সকল গ্রাম্য সভা এই সকল পঞ্চায়ৎ, ভাবী পার্লেমেণ্টের বিস্তৃত ও পাকা বনিয়াদ হইতে পারে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সকল স্থানীয় সভা হইতে বহু দূরে একটি রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি ইহার কল্পনাটিও ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে কাহারও মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রেল-পথ, টেলিগ্রাম দূরতম প্রদেশগুলিকেও নৈকট্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, যাতায়াতের সুগমতা বিধান করিয়াছে, বৃদ্ধ ভারতের মনে একতার ভাব উদ্বোধিত করিয়াছে। ইংরেজি, দেশের সাধারণ ভাষা হইয়া এই ঐক্য আরও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এখন দেখ দক্ষিণের তামিল, পশ্চিমের মারাঠা, উত্তরের বাঙ্গালী সকলে কেমন একত্র মিলিত হইয়াছে—পরস্পর পরস্পরের

কথা বুঝিতেছে। আর একটু বেশী যাওয়া যাক; দেশ-শোষণ-কারী বিদেশীদের অবস্থান প্রযুক্তই, দেশীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি যাহারা এতদিন পরস্পরের বিরোধী ছিল সেই পার্সি, সেই শিখ, সেই হিন্দু সকলেই একত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় ভাবের নূতন কল্পনাটি, যাহা বাস্তবতায় পরিণত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে,- ভারতের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতের এই দৃষ্টান্ত সমাজতত্ত্ববেত্তাদের পক্ষে খুব ঔৎসুক্যজনক সন্দেহ নাই; কেননা, সপ্রমাণ হইতেছে যে, পার্লেমেণ্টের কল্পনা ও জাতীয়তার কল্পনা একসূত্রে গ্রথিত, উভয়ই মানব সমাজের অধিকার সমর্থন করে, এবং উভয়ই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়।

এ একটা ভারী নূতন ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকূল। সে এক সুখের দিন ছিল যখন উঁহাদিগকে ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকট কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হইত না; যে সময়ে না ছিল কংগ্রেস, না ছিল সভাসমিতি, না ছিল ব্যবস্থাপক সভা, ছিল শুধু অভ্রান্ত ও নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা! কিন্তু প্রথমে ঘরের লোকেরাই কংগ্রেসকে আক্রমণ করিল। সূচাগ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত পিরামিডের ন্যায় টলমলায়মান্ সমাজ পাছে কোন কিছুর ধাক্কা লাগিয়া ধসিয়া যায়, রক্ষণশীল হিন্দুরা এই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। বিপদগ্রস্ত সরকারকে তাহারা 'তেহারা' ঘেরের মধ্যে রাখিবার জন্য প্রস্তাব করিল। সে তিনটি ঘের;—সম্মান, ভক্তি ও ভয়। কতকগুলি লোক, - যে পক্ষই হোক, কোন এক পক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল; তাহারা আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুত ও ঠাকুরেরা এই উদীয়মান গণশাসনতন্ত্রের (democracy) আবির্ভাবে শঙ্কিত হইল। একজন রাজা—উঁহারি মধ্যে যে একটু চিন্তাশীল —সেই কাশীর রাজা তাহাদের নেতা হইল। সমস্ত ভারতের প্রচণ্ড উৎসাহের মুখে, ও সমস্ত খড়ের মত ভাসিয়া যাইত, যদি না ভারত-সমাজের আর একটি প্রধান অঙ্গ ৬ কোটি যাহাদের সংখ্যা, সেই মুসলমানেরা আসিয়া তাহাদের সমস্ত ভার তৌলদণ্ডের অন্যদিকে নিঃক্ষেপ করিত।

আজকাল ভারতবর্ষে মুসলমান-সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনো হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসল-মানেরা দেখিতেছে যে, হিন্দুরা অন্য প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, সরকারি চাকরিতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। ইংরেজের আমলে, হিন্দুদের দ্রুত উন্নতি দেখিয়া উহারা যে উদ্বিগ্ন হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি! সরকারের সমস্ত অনুগ্রহ, সমৃদ্ধি ও উচ্চ পদ হিন্দুদেরই উপর বর্ষিত হইতেছে! এই বিপদ নিবারণের একটি মাত্র উপায়—মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়া নিজের জাতভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁহার নাম সৈয়দ্ অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, আলিগড়ে তিনি একটি কালেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কালেজটি বেশ উন্নতি লাভ করিতেছিল, এমন সময় খবর আসিল, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! হিন্দুরা কেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ্ একলাফে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধংদেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানের অধিকাংশই তাঁহার অনুগামী হইলেন।

ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপ্ করিয়া গোলাটা ধরিয়া ফেলিল। বিবাদ উস্কাইয়া দিবার এমন সুযোগ তাহারা কি ছাড়িতে পারে? দেশের লোক ইংরেজকে যে দিন বুঝিবে সেই দিনই ইংরেজ বোচ্‌কা বুচ্‌কি বাঁধিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু এখনও আরম্ভ করে নাই। কিন্তু যদি অভিজ্ঞতা হইতে ইংরেজ না জানিয়া থাকে যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচণ্ড দ্বেষানল এখন শুধু ছাই-চাপা আছে মাত্র, তাহা হইলে তাহারা প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিবার ঝুঁকি স্বীকার করিয়াও, এইরূপ বিপদ বাধাইবার চেষ্টা করিবে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তাছাড়া হিন্দুরা যেরূপ দ্রুতবেগে ঠেলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে আটকানো আবশ্যক। আলিগড়-কালেজে, ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ থিওডোর

বেক্‌ সৈয়দের মনোভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি কল্পনাকে ফুৎকার দ্বারা উস্‌কাইয়া দিলেন। সৈয়দ ইংরেজি ভাল জানিতেন না; বেক্‌ সৈয়দের হইয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেন, প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি কংগ্রেসের রাজবিদ্রোহিতা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, এবং "ভারতের বিপদ আসন্ন" এই বলিয়া একটা চীৎকার তুলিলেন। সেই ধ্বনি উর্দ্দুতে, বাঙ্গলায়, মরাঠিতে প্রতিধ্বনিত হইল:—সকল প্রদেশের ও সকল জাতির অন্তর্ভূত রক্ষণশীল দল ভীত হইয়া তাঁহার লিখিত পুস্তিকাকে এক একটা প্রবন্ধের দ্বারা ফাঁপাইয়া তুলিল। অদ্ভুত ব্যাপার! দেশানুরাগ কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইল। দেশানুরাগকে এখন দেখাইতে হইবে যে কংগ্রেসওয়ালাদের অপেক্ষা উহার জাতীয় ভাব সমধিক। বেক্‌, কাশীর রাজা, সৈয়দ আহম্মদ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, "ভারতের দেশানুরাগী সভা" নামে একটা সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার একটা দোষ এই যে ইহার দুইটা মাথা—দুই মাথা দুই বিভিন্ন দিকে শরীরটাকে সবেগে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। স্কচ্‌ টেরিয়ারের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। স্কচ টেরিয়ারের গা রোঁয়ায় এরূপ আচ্ছন্ন যে উহার কোথায় মাথা, কোথায় লেজ তাহা বলা যায় না।

যে দিন সভার চোক কান ফুটিবার কথা সেই দিনই সভাটা ভাঙ্গিয়া গেল। এই সকল অভিনেতার অঙ্গভঙ্গীর পিছনে বোধ হয় বিদেশী সাহেবের মূক অভিনয়ের একটু আবছায়া দেখা যাইতেছিল।...

আসলে, এই যুদ্ধকাণ্ডের আতিশয্য ও অতি বিদ্বেষ হইতে কংগ্রেসের অনেকটা কাজ হইয়াছিল। এইরূপে নিন্দিত, অপবাদগ্রস্ত, গোয়েন্দাদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া, কংগ্রেস কণ্টকময় পথে চলিতে শিখিল। প্রতিপক্ষীয়েরা কংগ্রেসের উপর কি দোষারোপ করে?—কংগ্রেস বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন। তাই, প্রতি কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসও স্বকীয় রাজভক্তি, ও বশ্যতা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়া থাকে।

কংগ্রেস এমন কোন আন্দোলন করে না যাহা বৈধ নহে—যাহা ঠিক আইনসঙ্গত নহে।

তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা বলিতে লাগিল,—ভারতের যেরূপ ইতিহাস, ভারত যেরূপ অসংখ্য জাতি ও বর্ণে বিভক্ত, ভারতের যেরূপ প্রকৃতি, ভারতের অজ্ঞতা, তাহাতে ভারত এখনও পার্লেমেণ্টের উপযুক্ত হয় নাই। একটা পার্লেমেণ্ট এই সকল মূল বিরোধী জাতিদিগকে শাসন করিবে, তাহাদের ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবে? ইহা আকাশকুসুমের কল্পনা! যত বর্ণ, যত জাতি, যত উপজাতি, ততগুলা দলও গঠিত হইবে, আর তা যদি না হয়,—বলবানেরা আপনাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া দুর্ব্বলদিগকে উৎপীড়ন করিবে। যেখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক সেই সকল ম্যুনিসি-প্যালিটিতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অন্ততঃ একটা লোকমত থাকা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে অজ্ঞতাই একমাত্র বাধা নহে,—রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য এদেশীয় লোকের একটা প্রকৃতিসিদ্ধ রোগ। চাষা ও ব্রাহ্মণ আইন ও কংগ্রেস লইয়া মাথা বকাইবে! যদি ভারতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকিত তাহা হইলে উহাদের নির্ব্বাচিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা থাকিত?—সেই সব লোক যাহারা ধর্ম্মোৎ-সবের ব্যবস্থা করে, যাহারা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষ শোষণ করিবে; বিশেষত যাহারা কার্য্য-তালিকার শীর্ষদেশে প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে "যে কেহ গোহত্যা করিবে তাহার অচিরাৎ প্রাণদণ্ড হইবে।"...

কিন্তু একেবারেই সার্ব্বজনিক নির্ব্বাচন-অধিকার দেওয়া হউক, একথা ত এখন উপস্থিত হইতেছে না। কংগ্রেসের মিতবাদী দল অতটা এখন চাহিতেছে না। বিদেশী ও অস্থায়ী রাজপুরুষদিগের শাসনের উপর যাহাতে দেশীয় লোকের কতকটা কর্ত্তৃত্ব থাকে,—উহারা এই টুকু শুধু চাহিতেছে।

লাহোরের 'আকবারি' নামক মুসলমান সংবাদপত্রের পরিচালকের নামে মুস্তাফা-কামেল্ল আমাকে একটা পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি ও একতাড়া ফরাসী সংবাদপত্র উপহার স্বরূপ তাঁহাকে দেওয়ায়, তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এখন কিরূপ সম্বন্ধ?

—"পূর্ব্বাপেক্ষা ভালও নহে, মন্দও নহে। যদি

ইংরেজরা এখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে রক্তনদী বহিয়া যাইবে···দেখ, আমরা কংগ্রেস হইতে তফাতে আছি—কিন্তু তুমি সেখানে যাও, সেখানে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিকে তুমি দেখিতে পাইবে, দেশের মতামত জানিতে পারিবে। সেখানে পদার্পণ করিতে পারি না বলিয়া আমি নিজে (ব্যক্তিগত ভাবে) দুঃখিত; তা ছাড়া আরও বেশী, আমি কংগ্রেসের পক্ষপাতী; হিন্দুর পক্ষ হইতে, হিন্দুরা যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য।··

"কিন্তু আমরা বাস্তবিকই উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। তুমি হয়ত মনে করিতেছ, ধর্ম্মের জন্য যোগ দিতে পারি না, কিন্তু তাহা নহে। অবশ্য, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলা কুসংস্কার যে না আছে এমন নহে, কিন্তু আসলে আমাদের অনৈক্যের মূল তাহা নহে। দেখ কংগ্রেসের মধ্যে পার্সি আছে, শিখ আছে এবং কতকগুলি স্বপক্ষত্যাগী মুসলমান-ও আছে। আমি সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত, এবং হিন্দুদেরই 'পোহা-বারো।' হিন্দুরা বুদ্ধিমান, আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, কেন না তাহারা ভয় পাইয়া ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ ছাড়ে নাই। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছে, তাহারা বি-এ, তাহারা এম এ। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞতা বশতই হউক, কুসংস্কার বশতই হউক, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। আমি একটু ইংরেজি বলিতে পারি; একলা আমিই এই কুসংস্কার-জাল হইতে মুক্ত···হিন্দুরা সকল বিষয়েই কিছু কিছু জানে। আর বাঙ্গালীদের কিছুই অজ্ঞাত নাই, তাহারা যে কোন বিষয় উপস্থিত হোক না কেন, সেই সম্বন্ধে কথা কহিতে পারে। আমরা ইংরেজী ভাল বলিতে পারি না। মনে করিয়া দেখ, ভাল বক্তাদের মধ্যে আমাদের কিরূপ অবস্থা হইবে; আমাদের বক্তৃতা "আহা! ওহো! বাহবা" এইরূপ কতকগুলি উচ্ছ্বাস বাক্যেই পরিণত হইবে।

"আর একটা পরিণাম:—হিন্দুরা অধিক শিক্ষিত, সরকারী কাজকর্ম্ম উহারাই পাইবে, এবং বরাবর যদি এই ভাবে চলে; ক্রমে উহারাই আমাদের শাসনকর্ত্তা হইবে। হিন্দুরা উহাদের সংবাদপত্রে, উহাদের কংগ্রেসে কিসের দাবী করিতেছে? তাহারা চাহিতেছে—সরকারী নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতার পরীক্ষা উন্মুক্ত হউক এবং যাহাতে কোন প্রকার বিড়ম্বনা না ঘটে এই জন্য এই পরীক্ষা ভারত ও লণ্ডন উভয় স্থানেই হউক···আমি শতবার বলিব, উহারা যাহা বলিতেছে তাহা খুবই ন্যায্য···কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র:—আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি, ভোজের স্থানে আমরা হিন্দুদের পরে আসিব, সরকারের প্রসাদটুক্‌রা যাও দুই একটা আমাদের ভাগ্যে পড়িবে, তাও আমাদের হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবে · ।"

"আমার শেষ কথা কি তুমি শুনিতে চাও? হিন্দুরা ধনী, আমরা দরিদ্র। উহারা যে আমাদের অপেক্ষা কর্ম্মদক্ষ তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু কোরাণ আমাদিগকে সুদে টাকা ধার দিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং তাছাড়া, টাকা কড়ি সম্বন্ধে আমাদের দক্ষতা মোটেই নাই ··· এ বিষয়ে হিন্দুদের কোন সঙ্কোচ নাই। উহারা ভারতবর্ষের ইহুদী।"

যদি আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি—জাতি, ধর্ম্ম, অহংকার, ঈর্ষা, বিশেষতঃ ক্ষণিক স্বার্থবিরোধ,—এই সমস্ত কারণেই উহারা কংগ্রেসে যোগ দিতে বিরত হইয়াছে। অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্য্যয়! এখন মুসলমানেরাই ভয় করিতেছে পাছে হিন্দুরা তাহাদের প্রতি "পারিয়ার" মত ব্যবহার করে। কিন্তু এ কথা শুধু লাহোর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের পক্ষেই খাটে, যেখানে মুসলমানমণ্ডলী বেশ জমাট্ ভাবে অবস্থিত হইলেও সংখ্যায় অনেক কম। আলীগড়ের কালেজে এই অনৈক্য পোষণ করিতেছে। যখন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, বেক্-সাহেবের উত্তরাধিকারী কালেজের প্রধানাধ্যক্ষের আর কোন কাজ ছিল না—তিনি শুধু ঐ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। বোম্বায়ে, মাদ্রাজে কতকগুলি মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে।

কংগ্রেসের গঠন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ কি দস্তর মত নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসে আইসেন? উহাদিগকে কে নির্ব্বাচন করে? উহারা কি কোন আদেশবাক্য, কোন ক্ষমতাপত্র লইয়া আইসে?

উহাদের শত্রুরা বলে উহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আন্দোলনকারী, উহারা আপনারাই আপনাদের প্রতিনিধি, দেশের প্রতিনিধি মোটেই নহে। উহাদের শুধু কলম আছে, সেই কলম

আস্ফালন করিয়াই সরকারকে ভয় দেখায়। দেশের আসল নেতা তারাই যাদের তলোয়ার আছে ... কিন্তু খাপের মধ্যে থাকিয়া সে তলোয়ারে যে মর্চ্চ্যা ধরিয়া গিয়াছে কিংবা কৌতূহলের জিনিস বলিয়া জাদুঘরের দেয়ালে লট্‌কানো রহিয়াছে ...।

আসল কথা, প্রতিনিধিরা হিন্দু রায়ৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় না। ভোট্ দেওয়া জিনিসটা যে কি—হিন্দু রায়ৎ তাহা কিছুই বোঝে না। উহারা মিতবাদী ও শিক্ষিত ভারতেরই প্রতিনিধি। যাহারা মিলের প্রবন্ধ ও ফক্‌সের বক্তৃতা মন্থন করিয়া স্বকীয় বিশ্বাসের বীজমন্ত্র পাইয়াছে, ইহারা সেই নব্যভারতেরই প্রতিনিধি। নির্ব্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে ব্যানর্জি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"আমাদের প্রতিনিধিরা দস্তুর মত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তোমাদের পার্লেমেণ্টের মেম্বরেরা যে প্রণালীতে নির্ব্বাচিত হয়, আমাদের প্রতিনিধিরাও সেই প্রণালীতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক এই সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। গত বৎসরে বোম্বাই নগরে যে কংগ্রেস বসিয়াছিল, সেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন কার্য্যে প্রায় তিন কোটি লোক যোগ দিয়াছিল।" বস্তুত, এই বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান কেন্দ্রে কংগ্রেসের এক একটি স্থায়ী সমিতি আছে। প্রাদেশিক সমিতিগুলা, একটা কেন্দ্রগত সমিতির সহিত সংযুক্ত;—সেগুলাও স্থায়ী সমিতি। বিভিন্ন সভার সহিত একযোগে ঐ সকল সমিতি নির্ব্বাচনকার্য্য পরিচালনা করে। কংগ্রেসে আর একটি সমিতি আছে, লণ্ডনে তাহার কার্য্যালয়; এই সমিতির অধীনে "ইণ্ডিয়া" নামে একটি সংবাদপত্র আছে; পার্লেমেণ্টের অনেকগুলি মেম্বর এই সমিতির সদস্য। এই সমিতির দ্বারাই কংগ্রেসের গঠন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূত নামানো।

আমরা কিছুদিন ভূত নামাইয়াছিলাম। আমাদের ভূত-নামানো ব্যাপারটা প্রধানতঃ হিপ্‌নটিজ্‌মের সাহায্যেই হইত, এই হিপ্‌নটিজ্‌মে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতুড়ে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকাংশ 'ভারতী' পত্রিকায় 'সম্মোহন-বিদ্যা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ত্রিপাদ টেবিল লইয়াও ভূত নামানো হইত; সত্যই ভূত কি না তাহা জানি না। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে নিশ্চল টেবিলটা বাহ্য কোন শক্তির সাহায্য না লইয়া প্রাণবিশিষ্ট জীবের ন্যায় নড়িতে থাকে। তাহার ঘাড়ে ভূত না চাপিলেও, তাহার মধ্যে একটা আত্মার—একটা শক্তির যে আবির্ভাব হয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের মধ্যে প্রথম প্রথম কেহ সন্দেহ করিতেন যে আমাদেরই কেহ দুষ্টামী করিয়া টেবিল নড়াইতেছে, কিন্তু সে ভ্রম শীঘ্রই ঘুচিল। একদিন টেবিলের একদিকটা একটু উঁচু হইবা-মাত্রই আমরা সকলেই প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া তাহাকে দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই অজ্ঞাত শক্তি সকলকার বল খর্ব্ব করিয়া টেবিলের এক পায়া স্বচ্ছন্দে তুলিয়া ধরিল। আমরা অবাক!

চৈত্রের প্রবাসীতে প্রভাত বাবুর ভূত নামানোর বিবরণ আমাদের ভূত নামানোর সঙ্গে অনেকটা মেলে। আমাদেরও চক্রপ্রণালী তাঁহাদের প্রায় অনুরূপ, তবে আমরা চারিজন ব্যক্তি লইয়া বসিতাম, তাহার কম বা বেশী লইতাম না। ঐ চারিজনের মধ্যে দুইজন স্থূলকায়, দুইজন সূক্ষ্ম, দুইজন সুন্দর দুইজন কালো কিম্বা দুইজন উদ্ধত প্রকৃতির ও দুইজন নম্র প্রকৃতির লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইতাম এবং স্থূলের বিপরীতে সূক্ষ্ম সুন্দরের বিপরীতে কালো এবং উগ্রের বিপরীতে নম্র এই ভাবে সাজাইয়া বসাইতাম।

চক্রে বসিয়া আমরা সকলেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় একমনে চিন্তা করিতাম। সাধারণত কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি আমরা চিন্তার জন্য স্থির করিয়া লইতাম। প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত, পরে দশ পনের মিনিটের মধ্যেই টেবিল নড়িয়া উঠিত. তখন বুঝিতাম ভূত আসিয়াছে। তার পরে প্রশ্ন করা আরম্ভ হইত। প্রশ্নের জবাব হাঁ কি না বুঝিবার জন্য প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইত, উত্তর 'হাঁ' হইলে টেবিল একবার মাত্র শব্দ করিবে, 'না' হইলে দুইবার। ভূতের নাম ও তাহার বাসস্থান প্রভৃতি স্থির করিবার জন্য আমরা

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। 'অ' 'আ' হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জনের সমস্ত বর্ণগুলি ঠিক পরে পরে আবৃত্তি করিয়া যাইতাম, যে বর্ণ উচ্চারণ করিবা-মাত্রই টেবিলের প্রথম শব্দ পাওয়া যাইত তাহাই আমাদের প্রশ্নের উত্তরের আদ্য অক্ষর বুঝিয়া লইতাম, আবার 'অ' 'আ' হইতে আরম্ভ করিয়া যে বর্ণ উচ্চারণে পুনরায় শব্দ হইত তাহা দ্বিতীয় অক্ষর বুঝিতাম, এই ভাবে সমস্ত কথাটা ঠিক হইত। পুরা কথাটা পাওয়া গেলে সেই কথাটা উচ্চারণ করিয়া তাহা ঠিক হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইত। ঠিক না হইলে প্রথম অক্ষর ভুল, কি দ্বিতীয় অক্ষর ভুল ইত্যাদি জিজ্ঞসা করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইত। এই ভাবে কত প্রেতাত্মা আমাদের নিকট তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। অনেক রকমের ভূত আসিত, ইংরাজ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। প্রথমে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করিয়া জবাব না পাইলে ইংরাজীতে বা হিন্দু-স্থানীতে প্রশ্ন করিতাম। ইংরাজ ভূতকে ইংরাজীতে প্রশ্ন না করিলে জবাব পাওয়া যাইত না।

একবার একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে দিন প্রেতাত্মাকে যতই প্রশ্ন করি তার একটাবও ঠিক জবাব পাই না। বলিলাম এ প্রশ্নের জবাব 'হাঁ' হইলে একবার শব্দ করিও, 'না' হইলে দুইবার করিও, কিন্তু টেবিল আমাদের সে নিয়মে বাধ্য রহিল না, অনবরত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রশ্নের উত্তর কি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। নাম জনিবার জন্য ইংরাজী ও বাংলা ভাষার সকল অক্ষরগুলি আবৃত্তি করিয়া গেলাম কিন্তু কোন অক্ষরেরই উপর টেবিল কোন শব্দ করিল না। আমরা তখন এই বুঝিয়া নিরস্ত হইলাম যে প্রেতাত্মা যে দেশীয় লোক সে দেশের ভাষা আমরা জানি না।

টেবিলে ভূত আসিলে আমাদের পরিদর্শকদিগের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ক নানা রকমের প্রশ্ন করিবার ধুম পড়িয়া যাইত। টেবিল ঠকাঠক্ করিয়া সব প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইত। অনেকে অতীত ঘটনা ঠিক মিলিয়াছে বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, কেহ বা ভবিষ্যদ্বাণী ধ্রুব সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন; কেহ বা আশায় উৎফুল্ল কেহ বা নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন; প্রশ্ন করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া সব বসিয়া আছেন,—টেবিলের পায়ের দিকে লক্ষ্য! যাঁহার উত্তর 'না' হইলে ভাল হয় তিনি একটা শব্দ শুনিয়া আর একটা শুনিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতেছেন ঐ বুঝি টেবিল উঠিতেছে। পরিশেষে যখন দেখিলেন টেবিল অচল, তখন তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া যাইত! ভূতের সব কথা যে ঠিক হইত তাহা নহে, কিন্তু এক একটা ভবিষ্যদ্বাণী খুব আশ্চর্য্য রকমের মিলিয়া-ছিল। চক্রস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে বিষয় জানা আছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে তাহার জবাব নির্ভুল হয়।

হিপ্‌নটাইজ করিয়া মিডিয়মের দেহে প্রেতাত্মার আবি-র্ভাব হইলে আমরা তাহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"আপনারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব বলিতে পারেন?" তাহাতে জবাব পাই,—"ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারময় আমাদের কাছেও তেমনি,—আমাদের এমন কোন শক্তি নাই যাহার সাহায্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালাইয়া তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারি। তবে আমাদের দেহ জড়বস্তু বিবর্জ্জিত বলিয়া আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সব স্থানে গিয়া—সে যত দূরদেশই হউক—বর্ত্তমান ঘটনা জানিয়া আসিতে পারি। আপনাদিগকে কোন প্রেতাত্মা যদি ভবিষ্যতের কোন কথা বলে, বুঝিবেন সে মিথ্যা বলিতেছে, না জানিয়া আন্দাজে বলিতেছে। মানুষের মনের কথা আমরা জানিতে পারি, জড় দেহ হইতে মুক্ত বলিয়া আমরা মানুষের অন্তরটা চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই—তাহাদের মনের মধ্যে যে ভাব উঠিতেছে, লয় পাইতেছে একটু মনোযোগ করিলেই তাহা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই জন্য অতীত ঘটনা অনেক সময় আমরা ঠিক বলিতে পারি—যখন আপনারা আমাদিগকে অতীত ঘটনা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন করেন তখন তাহার জবাব আমরা আপনাদের মন-মধ্যেই অন্বেষণ করি, আপনারা যাহা জানেন না, আমরা তাহার জবাব দিতে পারি না। আপনাদের যদি তাহার জবাব ভুল জানা থাকে, আমরাও ভুল বলিয়া দিই।"

বর্ত্তমান ঘটনা প্রেতাত্মারা ঠিক বলিয়া দিত। আমরা একবার আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু তখন কোথায়

আছেন তাহা আমাদের মিডিয়মকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি উত্তরে বলেন বোম্বায়ের পথে রেলগাড়ীতে আছেন। আমরা পরে অনুসন্ধান করিয়া জানি তিনি সত্যই সে সময়ে ট্রেণে ছিলেন, বোম্বাই হইতে ফিরিতেছিলেন।

একদিন টেবিল নাচিয়া উঠিলে আমরা প্রেতাত্মার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে নাম বাহির হইল তা—ন—সে ন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিই সেই জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ তানসেন কি, না। টেবিল ঠক্ করিয়া কেবল একটা শব্দ করিল, জবাব হইল হাঁ। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—আচ্ছা, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যদি কেহ গান করেন তবে আপনি টেবিলের পায়ের শব্দে 'তাল' দিতে পারেন কি, না। উত্তর হইল 'হাঁ'। আমাদের একজন সঙ্গী তখন গাহিতে আরম্ভ করিলেন, ঠিক তালে তালে টেবিল উঠিতে, নামিতে লাগিল—কখন ধীরে ধীরে, কখন দ্রুতভাবে, কখন জোরে, কখন আস্তে আস্তে শব্দ করিয়া নানা ভঙ্গিতে টেবিল 'তাল' দিতে লাগিল—সে শুধু একটা নীরস, কেঠো ঠক্ ঠক্ শব্দ নয় মনে হইতেছিল সত্যই যেন কি একটা গুরু গম্ভীর বাদ্য বাজিতেছে! অল্প ক্ষণের মধ্যেই এই টেবিল-বাদ্যে গানটা রীতিমত জমিয়া উঠিল। আমাদের মধ্যে একজন বাদ্যনিপুণ ছিলেন। তিনি বলিলেন আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি কোথাও তালের ভুল হয় নাই।

টেবিলে একদিন ভূত আসিলে আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা আপনি এমন কোন ব্যাপার আমাদিগকে দেখাইতে পারেন যাহাতে আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়,—যেমন ধরুন আমরা এই ঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ করিব, আর আপনি তাহা খুলিয়া দিবেন। উত্তর হইল—হাঁ। আমরা অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলাম, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম দেখা যাউক কি হয়,—দুই মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনই। আমরা প্রশ্ন করিলাম—কি হ'ল? কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন টেবিলের ঘাড় হইতে ভূত নামিয়া গিয়াছে। ইহার পরে আর একজন ভূতকে ঠিক ঐরূপ করিতে বলা হইয়াছিল, সে জবাব দিয়াছিল—"পারিব না।"

ভূত-নামাবার টেবিলে একদিন একটা নূতন রকমের ঘটনা ঘটিল। সে দিন চক্র করিয়া বসিবার খানিকক্ষণ পরে আমাদের দলের একজন শিথিলাঙ্গ হইয়া ঢুলিয়া পড়িল,—অল্পক্ষণ পরেই একেবারে অজ্ঞান। আমরা ধরাধরি করিয়া চেয়ার হইতে নামাইয়া এক খাটের উপর তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। সে অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পরে দেখা গেল, তাহার দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। আমরা মনে করিলাম, ভূত সেদিন টেবিলের ঘাড়ে না চাপিয়া, সেদিন দয়া করিয়া বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়াছে। আমরা তাহার হাতে একটা পেন্সিল গুঁজিয়া দিয়া, একখানা সাদা খাতা এগাইয়া দিলাম। তারপর প্রশ্ন করা সুরু হইল। কাগজের উপর লিখিয়া ভূত তাহার জবাব দিতে লাগিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম।

শাক্যসিংহের জীবদ্দশায় কিম্বা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। যে কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন তাহা নেপালের অন্তর্গত ছিল ইহাও অনেকে প্রমাণ করিতে আয়াস করিয়াছেন। কুশীনগর নেপালের অন্তর্গত ছিল কি না তাহা নিশ্চিত প্রমাণীকৃত না হইলেও শুদ্ধোদনের রাজ্য যে নেপালের পাদদেশ পর্য্যন্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হন তথা হইতে নেপাল বহুদূর নয় সুতরাং নেওয়ারদিগের কিম্বদন্তী অনুসারে শাক্যসিংহ সে রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালের অধিবাসীদিগের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ, অবশিষ্ট হিন্দু। হিমাচলের ক্রোড়স্থ অধিকাংশ পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে—যথা নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মই লৌকিক ধর্ম্ম। কিন্তু নেপালের বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি অপর কোন দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ইহার তেমন সৌসাদৃশ্য নাই। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ইহা এক

অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নেপালে ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ সম্প্রদায়ের লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে অনেক ধর্ম্মমত অনেক প্রকার আচার ব্যবহার এই দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সুধু প্রচারিত হওয়া নয় সর্ব্বধর্ম্মের এবং সর্ব্বজাতির এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ নেওয়ারগণের সাহিত নেপালের আশ্রিত হিন্দুগণ বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধগণ অজ্ঞাতসারে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নেওয়ারদিগের ভিতর দুইটী সম্প্রদায় আছে, বৌদ্ধমার্গী এবং শিবমার্গী। শিবমার্গীগণ প্রকৃত পক্ষে হিন্দু। গুর্খাগণের আগমনের পূর্ব্বেই নেপালে এই উভয় সম্প্রদায় ছিল। নেওয়ার রাজাগণ সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ প্রজাদিগের ধর্ম্মে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং অনেক সাহায্য করিতেন। তথাপি হিন্দু প্রজাগণই যে অধিকতর অনুগ্রহ এবং সহায়তা লাভ করিতেন তাহাতে সংশয় নাই। বর্ত্তমান গুর্খারাজগণ বৌদ্ধ প্রজাদিগের ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না বটে কিন্তু তাঁহারা তাহাদের ধর্ম্ম অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন; সুতরাং কি পুরাকালে কি বর্ত্তমান সময়ে নেপালের বৌদ্ধগণ কখনই বিশেষভাবে রাজপ্রসাদ লাভে সমর্থ হয় নাই। কেবল এই কারণেই নয় নেপালের বৌদ্ধগণের দোষেই ঐ ধর্ম্ম এখন তথায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় শীঘ্রই লুপ্তধর্ম্ম হইবে।

বৌদ্ধদিগের ভিতর দুইটী প্রধান শাখা আছে; মহায়ান বা উত্তরদেশীয়, হীনয়ান বা দক্ষিণদেশীয়। মহায়ান সম্প্রদায়ই বোধ হয় এই নামের গৌরব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন নতুবা হীনয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। নেপালের বৌদ্ধগণকে মহায়ান বলিব কি হীনয়ান আখ্যা দিব তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অশোকের মহিমা এখনও তথায় ঘোষিত হয়, অশোকের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমন্দির সকল এখনও তথায় দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু তিব্বতের সহিত নেপালের ধর্ম্মগত এবং বংশগত সৌহৃদ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের আর এক বিশেষত্ব যাহা কুত্রাপি নাই তাহা এখানে আছে। নেপালের বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। এইরূপ জাতিভেদ তিব্বতেও নাই, চীনেও নাই, জাপানেও নাই, সিংহলেও নাই। ইহা নেপালের নেওয়ারগণের মধ্যেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণেই নেপালের বৌদ্ধগণকে মহায়ান বা হীনয়ান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে পারিতেছি না।—নেপালের বৌদ্ধদিগের ভিতর প্রচলিত বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি :—

বর্ণ বিভাগ।

পূর্ব্বে যাহারা ভিক্ষু সন্ন্যাসী—বিহারবাসী ছিল, এখন নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাহারা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়াছে; তাহারা "বাঁহরা" নামে অভিহিত হয়। "বন্দ্য" হইতে "বাঁহরা" নামের উৎপত্তি। বৌদ্ধদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বাঁহরাগণ অনেক স্থলে বংশানুক্রমে বিহারবাসী বটে কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভোগাসক্ত গৃহী হইয়াছে। তাহারা অধিকাংশই আমাদের দেশের সুবর্ণবণিকের কর্ম্মে নিযুক্ত। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বাদী বৌদ্ধগণের ভিতর ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিবার কোন জাতি নাই। বৈশ্যদিগের স্থানে দ্বিতীয় জাতি "উদাসী"—ইহারা সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও ইহারা বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়া থাকে। উদাসীগণ নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ।

৩।—"জাপু"—ইহারা শূদ্রদিগের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম, দাসবৃত্তি এবং নীচ কার্য্যে লিপ্ত থাকে।

নেওয়ারদিগের ভিতর এই প্রধান তিন বর্ণ আবার নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের সহিত আহার বিহার আদান প্রদান করে না। করিলে জাতিচ্যুত হয়। এই প্রধান তিন জাতি ভিন্ন আট প্রকার অস্পৃশ্য জাতি আছে। তাহাদিগকে নচুনি জাত বলে অর্থাৎ তাহাদিগের জল গ্রহণ করা যায় না।

বাঁহরাগণ ১। আরহান ২। ভিক্ষু ৩। শ্রবক ৪। চৈলাক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

উদাসীদিগের ভিতর ৭টী শ্রেণী আছে। জাপুগণ ৩০টী শাখায় বিভক্ত।

নেওয়ারদিগের এই বর্ণবিভাগ যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন এবং নিষ্প্রভ করিয়াছে এমন আর কিছুই নয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের ইহাই প্রধান কারণ।

ধর্ম্মমত।

বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত, আস্তিক এবং নাস্তিক। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায় আদি বুদ্ধ এই নামে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা পুরুষকে অভিহিত করে। আদি বুদ্ধ অনাদিকাল হইতে শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অনন্তকাল এই ভাবেই স্থিতি করিবেন। আদি বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ ভগবান "আদি ধর্ম্ম" বা আদি প্রজ্ঞার (জড়শক্তির) সহিত মিলিত হইয়া এই বিচিত্র জগত রচনা করিয়াছেন। ইহাই নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ধর্ম্মমত। ইহারা মানবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহা আদি বুদ্ধের অংশ এবং সেই সত্তায় বিলীন হওয়াই মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে।

আদি বুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চ বুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আস্তিক নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই আদিশক্তির ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা ত্রিরত্ন নামে অভিহিত, যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। এই ত্রিরত্নের মধ্যে আস্তিকেরা বুদ্ধের এবং নাস্তিকেরা ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বুদ্ধ প্রাণশক্তি অথবা চিৎ—ধর্ম্ম জড়শক্তি—এবং সঙ্ঘ উভয়ের মিলন সম্ভূত এই দৃশ্যমান জগৎ কিন্তু অন্য এক অর্থে সকল সম্প্রদায়ই এই ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা—বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, ধর্ম্ম—তাঁহার বিধি বা শাস্ত্র, সঙ্ঘ অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সাধকদল। এই ত্রিরত্নের সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে নেপালে এবং বৌদ্ধজগতে সর্ব্বত্রই একটী মধ্যবিন্দু সমন্বিত ত্রিকোণ ব্যবহৃত হয়। এই ত্রিকোণের অনেক প্রকার গুহ্যার্থ আছে। সাঙ্কেতিক "ওম্" শব্দে এই ত্রিরত্ন বৌদ্ধজগতে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদিগের নিকট "ওম্" এই বাক্যের অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। সমুদায় বৌদ্ধজগতে "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" বাক্যটী পদ্মপাণির পূজার মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নেপালের পূর্ব্বতন রেসিডেণ্ট সুবিখ্যাত হডসন সাহেব (Hodson) ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:— "সেই ত্রিরত্নের অন্তরে পদ্ম এবং মণি নিহিত আছে।" পদ্মের মধ্যস্থানে একটী মণি পদ্মপাণির চিহ্ন। পদ্মপাণি বৌদ্ধ সঙ্ঘেরই মূর্ত্তি। এই মন্ত্র মহায়ান সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব। সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ এ মন্ত্র ব্যবহার করে না। নেপালে এই মন্ত্র সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। আস্তিক বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে একজন্মে না হউক জন্ম জন্মান্তরের পর বিশুদ্ধাত্মা ও নিষ্কাম হইয়া মানবাত্মা পরমাত্মা বা আদিবুদ্ধে বিলীন হইবে। এই জন্মান্তর বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের একটী মূলভাব। এই বিশ্বাসই "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বাক্যের প্রণোদক। এই হেতু জীবহিংসা বৌদ্ধশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কি হইতে পারে যে নেপালের বৌদ্ধগণ অতি নৃশংস উপায়ে সর্ব্বদা জীবহিংসা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভাব কিরূপে এরূপভাবে পদদলিত হয় ইহাও এক আশ্চর্য্য কথা। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে পরলোকে স্বর্গভোগের ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধের স্বর্গ নির্ব্বাণ বা পরমাত্মায় বিলীন হওয়া। এই প্রকার মুক্ত জীব বৌদ্ধশাস্ত্রে "বুদ্ধ" নামে অভিহিত হয়।

বৌদ্ধ দেবদেবীগণ।

যে ধর্ম্মে কোন প্রকার পূজা অর্চনা স্তব স্তুতির ব্যবস্থা নাই সেই সাধনশীল ধর্ম্মেও অনেক দেবদেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। আদিবুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চ বুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদিগের সহিত আদিবুদ্ধের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। ইহারা "অমরবুদ্ধ" বা "দেববুদ্ধ"। যে সকল মানবাত্মা স্বীয় চেষ্টায় জন্ম জন্মান্তরের পর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও মানবীয় বুদ্ধ। ইঁহারা পূজার্হ বটেন কিন্তু দেবতা নন। মহায়ান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের মতে শাক্যসিংহ স্বয়ং মানবীয় বুদ্ধদিগের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। সেই অবধি অন্য কেহ বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হন নাই। নিম্নে আদিবুদ্ধ হইতে যে পঞ্চ বুদ্ধ প্রসূত হইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল:--

আদিবুদ্ধ।

বৈরচন	অক্ষোভ	রত্নসম্ভব	অমিতাভ	অমোঘসিদ্ধ

আদি বুদ্ধের সহিত এই পঞ্চবুদ্ধের পিতাপুত্র সম্বন্ধ।

বৈরচন যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা—সেই হেতু তিনি এবং চতুর্থ ভ্রাতা অমিতাভ পদ্মপাণির পিতা বলিয়া অধিক পূজা লাভ করেন। এই পঞ্চবুদ্ধ হইতে আবার বোধিসত্বগণ প্রসূত হইয়াছেন। এখানেও পঞ্চবুদ্ধের সহিত বোধিসত্বগণের পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এই বোধিসত্বগণকে জন্ম দিয়া পঞ্চবুদ্ধ আদিবুদ্ধে লীন হইয়াছেন। এই বোধিসত্বগণই দৃশ্যমান জগতের সাক্ষাৎ কর্ত্তা। পঞ্চবুদ্ধের সহিত পত্নীভাবে পঞ্চবুদ্ধ-শক্তি মিলিত হইয়া পঞ্চ বোধিসত্বের জন্ম দিয়াছেন। নিম্নে পঞ্চবুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি এবং পঞ্চ বোধিসত্বের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। বৈরচন+বজ্রদন্তেশ্বরী—সামন্তভদ্র
২। অখোভ+লোচনী বজ্রপাণি
৩। রত্নসম্ভব+মামুখী—রত্নপাণি
৪। অমিতাভ+পানদারা—পদ্মপাণি
৫। অমোঘসিদ্ধ+তারা—বিশ্বপাণি
৬। বজ্রসত্ব+বজ্রসত্বামিকা—ঘণ্টাপাণি

নেপালে যে সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা পঞ্চবুদ্ধের সহিত বজ্রসত্ব যুক্ত করিয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিক সাধন গ্রহণ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের অন্যতম প্রমাণ। তান্ত্রিক সাধনের সর্ব্বপ্রকার কুৎসিৎ অশ্লীলভাবও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু গোপন ভাবে এ সাধন সম্পন্ন হয় বলিয়া কদাচ কাহারো চক্ষে পড়ে না।

এই পঞ্চবুদ্ধ ভিন্ন ৭ জন মানবীয় বুদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে শাক্যসিংহ শেষ।

নেপালের বৌদ্ধদিগের মতে প্রথম তিন দেববুদ্ধ কার্য্য সমাধান করিয়া আদিবুদ্ধে বিলীন হইয়াছেন। চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভের পুত্র পদ্মপাণি মৎস্যেন্দ্রনাথের উপর বর্ত্তমান জগতের ভার পড়িয়াছে। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেব দেবীগণের সাহায্যে জগতের তাবৎ কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। এইজন্য পদ্মপাণি মৎস্যেন্দ্রনাথের নেপালের নেওয়ারদিগের নিকট এতাদৃশ সম্মান। অন্য সকল বুদ্ধ কেবল নাম মাত্রে আছেন; পদ্মপাণিই সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। পদ্মপাণির কার্য্য সমাধা হইলে তিনিও আদিবুদ্ধে লীন হইবেন!

নেপালের নেওয়ারগণ মানবীয় বুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য মানবীয় বোধিসত্বের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল মানবীয় বোধিসত্বের মানবীয় বুদ্ধের সহিত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ না হইয়া গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ। যে মহাত্মা চীন হইতে আগমন করিয়া নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই মাঞ্জুশ্রী এই শ্রেণীর বোধিসত্ব। নেপালে মাঞ্জুশ্রীর অনেক মন্দির আছে; এবং পদ্মপাণির পরেই নেওয়ার-দিগের হৃদয়ে ইঁহার আসন। এই সকল মানবীয় বোধি-সত্বের নিম্নে আবার এক শ্রেণীর মানব আছেন যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান কঠোর সাধনা এবং পবিত্র জীবন দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা জীবিত আছেন কেহ বা গতাসু হইয়াছেন। তিব্বতের লামাগণ এই শ্রেণীভূক্ত। তাঁহারা বুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজিত হয়েন, কিন্তু লামা-দিগের অবতারবাদ প্রকৃত বৌদ্ধশাস্ত্রমতে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রকৃত বুদ্ধত্ব লাভ করিলে বা আদিবুদ্ধে লীন হইলে আর জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ অন্যভাবে লামাদিগের বুদ্ধত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন মানব জাতির উপকারের জন্য যে সকল বোধিসত্ব বারম্বার জন্মপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন লামাগণ সেই শ্রেণীর অবতার। নেপালে তিব্বতের লামার বিশেষ সম্মান আছে বটে কিন্তু তাঁহার সহিত ঐ দেশের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

নেপালের বৌদ্ধশাস্ত্র।

তিব্বতের ন্যায় নেপালে বিস্তর প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাওয়া যায়। হডসন সাহেব বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। নেপালের নেওয়ারদিগের দ্বারা এ সকল গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তিব্বত হইতে আগত কোন লামা বা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ সমাগত সাধু মহাত্মাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় শঙ্করাচার্য্য বিস্তর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ নেপালে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে নেপালের চতুর্দ্দিকে এই সকল গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়। গৃহস্থ এই সকল গ্রন্থ অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করে। গৃহে অগ্নি লাগিলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ

করিয়া গ্রন্থ বুকে করিয়া পলাইয়া যায়। এবং এই কারণেই এখনও নেপালে বৌদ্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্ম শাসন।

তিব্বতের লামার ন্যায় নেপালের বৌদ্ধদিগের উপর কোন ব্যক্তিবিশেষের অপ্রতিহত শক্তি নাই। গুর্খা রাজগুরু তাহাদিগের বর্ণসম্বন্ধীয় সমুদায় বিবাদবিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় মীমাংসা বাহরাগণ সম্মিলিত ভাবে করিয়া থাকেন। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামাজিক ভাবে তাহার প্রতিবিধান হইয়া থাকে, ইহাকে নেওয়ারগণ "গতি" বলে। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে ইহারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

১। প্রত্যেক গৃহস্থকে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বজাতীয়গণকে ভোজ দিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইলেও ইহার অন্যথা হইবার নহে।

২। স্বজাতি কাহারও মৃত্যু হইলে প্রত্যেক পরিবার হইতে এক একজন ব্যক্তিকে মৃতের সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদিতে যোগদান করিতে হয়।

গতির নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। গুরুতর সামাজিক অপরাধ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। জাতিচ্যুতকে আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। তাহার মৃত দেহের সৎকার কেহ করে না। ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কি হইতে পারে? সুতরাং নেওয়ারদিগের ভিতর সামাজিক শাসনের নিয়ম নিতান্ত শিথিল নহে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা।

বিগত মাঘ মাসের প্রবাসীতে "বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কাল এ বিষয়ে যতই অধিক আলোচনা হয় ততই আমাদের পক্ষে হিতকর, কিন্তু অধিক আলোচনা যেরূপ হিতকর, ভ্রমপূর্ণ সংবাদ আবার তদপেক্ষা অধিক অহিতকর। কেদার নাথ বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা হইতে পারে যে দেশী চিনি সস্তা প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন; এই ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের মন হইতে দূর করিবার জন্যই আমরা তাঁহার প্রবন্ধের ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম।

গত ২০শে ও ২৩শে কার্ত্তিকের "দৈনিক হিতবাদী"তে প্রথমে কেদার নাথ বাবু এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করেন। আমরা ৩রা অগ্রহায়ণের হিতবাদীতে তাঁহার ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি প্রবন্ধটী সংশোধন না করিয়াই হিতবাদী হইতে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

আমরা এ কথা বলি না যে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষু আবাদ করিয়া নূতন ও উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে ইক্ষুরস হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে; বরং আমাদের স্থির বিশ্বাস যে তাহাতে লাভ থাকিবারই সম্ভাবনা; কিন্তু কেদার নাথ বাবু ৩০।৩৫ হাজার টাকার কলে ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭৲ টাকা দরে চিনি বিক্রয় করিয়াও যে ৫০ হাজার টাকা লাভ দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা নিম্নে একে একে তাঁহার ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিতেছি।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে "প্রধানতঃ steam পরিচালিত—crushing plant (মাড়াই কল) একটী এবং vacuum pan একটী, বিশেষ আবশ্যক, এই দুইটী অধিক মূল্যবান। তদ্ব্যতীত turbine (তুরপিন) ২।১টী ও অন্যান্য খুচরা কয়েকটী জিনিষ অল্প ব্যয়েই হইতে পারে।" তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই খুচরা জিনিষগুলির তালিকা ও মূল্য লিখিয়া দিতেন তবে বড়ই উপকার হইত। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি boiler, centrifugal machine, filters, double or triple effect evaporating pan, প্রভৃতিও বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এই সমস্ত খুচরা জিনিষের মূল্যও কম নয়। আশা করি তিনি কলগুলির একটী তালিকা ও মূল্য প্রকাশ করিবেন।

রিফাইন—ইক্ষু মাড়াই করিয়া রস হইতে একেবারে চিনি তৈয়ার করিতে হইবে অথচ শেওলার দ্বারা রিফাইন করিতে হইবে লিখিয়াছেন, এ কথার কোন অর্থই বুঝিতে

পারিলাম না। শেওলা রসে দেওয়া যায় না, গুড়ের উপরে দিলে গুড় ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হয়। ইক্ষু মাড়াই করিয়া রস বাহির করার পর হইতে centrifugal machine হইতে চিনি বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কোন স্থানে শেওলা দিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আশা করি শেওলা দ্বারা কি প্রকারে ইক্ষুরস পরিষ্কৃত হইতে পারে কেদার বাবু তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি যে ইক্ষুরস হইতে একেবারে চিনি তৈয়ার করিলে যদি উপযুক্ত দক্ষ ব্যক্তির হস্তে রস পরিষ্কার করার এবং চিনি প্রস্তুত করার ভার থাকে তবে তাহা স্বতঃই সাদা হইবে, কোন জিনিষ দিয়া পরিষ্কার করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে "গত পৌষ মাসে আমরা উপরোক্ত প্রণালীতে experiment করিয়া বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছি। অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির অভাবে সাধারণ নিয়মে বলদের সাহায্যে ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল এবং কড়া পাকে রস জাল দিতে হইয়াছিল।" পাঠক দেখিবেন যে তিনি "উপরি উক্ত" প্রণালীতে কিরূপ experiment করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত প্রণালী দ্বারা আমরা—

১। নিজ আয়ত্তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা।

২। ষ্টীম পরিচালিত কলে মাড়াই কার্য্য সম্পন্ন করা।

৩। ষ্টীমের আঁচে vacuumএ রস পাক করা।

৪। শেওলা দ্বারা রিফাইন করা।

বুঝিয়াছি। কিন্তু এই চারি প্রকার প্রণালীর মধ্যে তিনি যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই তাহা তাঁহার কথাতেই জানা যাইতেছে। অতএব তিনি ২নং ও ৩নং উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই, মাত্র ১নং ও ৪নং প্রণালীতে experiment করিয়া থাকিবেন বলিয়া বোধ হয়। এই সামান্য অভিজ্ঞতাতেই যে তিনি একটী ফ্যাক্টরির লাভালাভের হিসাব বাহির করিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

লাভালাভ:—১০০/০ মণ ইক্ষুতে ৬৷০ মণ চিনি তৈয়ার হইবে এই হিসাবে তিনি আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছেন। এখন দেখা যাউক যে তিনি আয়ের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহা কতদূর ঠিক। তাঁহার মতে প্রতি বিঘায় ৫০/০ মন হিসাবে চিনি উৎপন্ন হইবে। যদি ৬৷০ মন চিনি তৈয়ার করিতে ১০০/০ মন ইক্ষুর প্রয়োজন হয় তবে বিঘা প্রতি ৫০/০ মন চিনি করিতে ৮০০/০ মন ইক্ষুর প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এক বিঘায় এত অধিক ইক্ষু হওয়া সম্ভবপর নয়। যে জাভার চিনিতে আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে সেই জাভাতেই বিশেষ যত্ন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়াও একার প্রতি ৩৯ টনের অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হয় নাই।

"Judging by the results,—the method adopted must be of the most perfect kind. In 1905 the average yield of cane per acre, obtained from the whole island was 87118 lbs. or nearly 39 tons. (*The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer, Sept. 1907 PP. 171*).

মহীশূরে (Mysore) experiment করিয়াও ২৮ টনের অধিক একার প্রতি পাওয়া যায় নাই (Vide *Capital* of 16th December 1906—Indian Sugar Manufacture)

যদি একার প্রতি ৩৯ টন বা ২৮ টন উৎপন্ন হয় তবে বিঘা প্রতি প্রায় ৩৫০/০ বা ২৫০/০ মন মাত্র ইক্ষু হওয়া সম্ভব। যদি বিঘা প্রতি ৮০০/০ মন না হইয়া মাত্র ২৫০/০ ৩০০/০ মন ইক্ষু হয় তবে ১০০/০ মনে ৬৷০ মন হিসাবে বিঘা প্রতি প্রায় ১৬/০ হইতে ১৯/০ মন মাত্র চিনি হইবে ও তাহা হইলে যে হিসাব দিয়াছেন তদনুযায়ী ৭৲ টাকা মন দরে চিনি বিক্রয় করিলে লোকসান পড়িবে।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে এ বিষয়ে কেহ কোন বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিলে তিনি তাহা জানাইবেন। এই বাক্যে আশান্বিত হইয়া নিম্নে কয়েকটী প্রশ্ন করিলাম। আশা করি তিনি তৎ সমস্তের উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

১। তিনি যে experiment করিয়াছিলেন তাহা Mr. Hadiর প্রদর্শিত নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে?

২। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবাদ করিয়াছিলেন কি না?

৩। বিঘা প্রতি ৮০০/০ মন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে ইহা তিনি কি উপায়ে জ্ঞাত হইয়াছেন?

৪। বিঘা প্রতি আবাদী খরচা ৭৫৲ টাকা ও চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা ১০০৲ টাকা ধরিয়াছেন। তাহা কি উপায়ে অবগত হইয়াছেন?

আমরা পরিশেষে পুনরায় বলিতেছি যে নিজের আয়ত্তাধীনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিয়া নূতন যন্ত্রাদির সাহায্যে ইক্ষু হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহাতে লোকসান হইবে না। তবে কেদার নাথ বাবু যেরূপ ছোট কল করিয়া অল্প মূলধন লাগাইয়া বেশী লাভ দেখাইয়াছেন তাহাই অসম্ভব জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

শ্রীকালিপদ দাস।
কোটচাঁদপুর।

দেবদূত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নৈনিতাল।
কাল—প্রভাত।
(অরবিন্দ একাকী।)

অর। উজ্জ্বল, মধুর, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, এই অমল উষায়
অতুল সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি হেথায়!
পরিপূর্ণতার সনে তারুণ্যের হেন সম্মিলন
চির-অভিনব। স্নিগ্ধ রবির কিরণ
শিশিরের হার-পরা এ ধরারে করি' আলিঙ্গন,
মরি—তা'রে বিবাহের বধূর মতন
সাজায়েছে! ধীরে ধীরে, তরুশাখে তুলিয়া স্পন্দন,
মোর দেহে আসি' মৃদু, শীতল পবন
পরশিছে --অদৃশ্য সে দিগ্বধূর অঞ্চলের মত
প্রাণোন্মাদী। চতুর্দ্দিকে জাগে সমুন্নত,
স্তরে স্তরে তরঙ্গিত, সুশ্যামল, যত সংখ্যাতীত
শৈল-শৃঙ্গগুলি। তা'রি মাঝারে বিস্তৃত
সুগভীর হ্রদ খানি—বিমল, নিবিড়, স্বচ্ছ, শ্যাম,
নিটোল লাবণ্যভরা!—নয়নাভিরাম
যেন কোন সুর-বালা খেলিতে খেলিতে শ্রান্তিভরে
এলায়ে পড়ে'ছে হেথা বিশ্রামের তরে;
নির্ব্বাক্ সম্ভ্রমে তাই, সারি সারি ঘিরি' তারে—মরি,
দাঁড়াইয়া মহাকায় অগণ্য প্রহরী!
লতিকা-বেষ্টনে বৃক্ষ-পত্র-অন্তরালে গুপ্ত রহি',
ছায়ায় ছায়ায় বেগে চলিয়াছে বহি',
"ঝর-ঝর-ছল-কল"-স্বরে গাহি' ত্রিদিব-রাগিণী,
শত শত, সুনির্ম্মল গিরি-নির্ঝরিণী—
মর্ত্ত্য-জনে সঞ্জীবনী সুধা-ধারা করাইতে পান!
এ স্থান যেন বা কোন নন্দন-উদ্যান
অমর বৃন্দের হেথা। সুধা-গন্ধি সমীর-হিল্লোলে,
উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের 'ছল-কল'-রোলে,
হ্রদ-সলিলের মৃদু উল্লাস-কম্পনে অনিবার,
মর্ম্মরিত বনানীর—তরু-লতিকার
প্রত্যেক স্পন্দনে,—নাহি জানি কেন, করে অন্যমনা
আর্ত্তজনে! যেন কোন সুখের বেদনা
জেগে' ওঠে মন-মাঝে, কর্ণে যেন বেজে' ওঠে কোন্
অস্পষ্ট, সুদূর-শ্রুত, বিস্মৃত, মোহন
অতীতের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা! হেথা প্রকৃতি-সুন্দরী
আপন সৌন্দর্য্য দেখি' যেনরে শিহরি'
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে! হেরি' এবে মোহিনী প্রকৃতি
সুধু, জাগে মনে-- কোন্ অজানিত স্মৃতি
অনির্দ্দিষ্ট অতীতের শুধু যেন বেদনায় হিয়া
কি এক বিরহ ভরে ওঠে গো কাঁপিয়া
নিশি দিন! যবে ধীরে স্পর্শে তনু মন্থর, অলস
সমীর-হিল্লোল, যেন হারাণ পরশ
কা'র করি' অনুভব—অপূর্ব্ব বিরহে কেঁপে উঠি!
নিভৃত কানন মাঝে হেরি যবে—দু'টি
নির্ম্মল কুসুম ফুটে' আছে—গন্ধে করিয়া বিহ্বল
জন-শূন্য, সে নিবিড়, স্তব্ধ বন-স্থল,—
তখন সে পুষ্প হেরি,' লভিয়া সে সুমধুর বাস
জানিনা কিসের তরে ওঠে দীর্ঘশ্বাস
এ অন্তর হ'তে! যবে অজ্ঞাত কুলায় হ'তে পিক
অকুণ্ঠ আবেগে, মৌন, সুপ্ত দশ-দিক
কাঁপাইয়া, সুমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ওঠে গাহি';
—সে স্বর-তরঙ্গ মাঝে ধীরে অবগাহি'
প্রাণ মোর কেঁপে' ওঠে, রোমাঞ্চিত হয় তনু মোর।
নেহারিলে প্রকৃতির রূপ মনোহর;
শুনিলে তাহার গান বিহঙ্গ ও তটিনীর স্বরে;
হেরিলে তাহার নৃত্য তরু-পত্র' পরে,
তরঙ্গিনী-মাঝে, হ্রদ-সমুদ্রের দোলন-কম্পনে;
শুনিলে তাহার দৃপ্ত, প্রচণ্ড গর্জ্জনে—
বজ্র-রবে, মেঘ-মন্দ্রে, সাগরের স্বনে সুগম্ভীর;
হেরিলে ভ্রূকুটি তা'র উদ্দাম, অধীর
জলদ-সংঘর্ষে ক্রুদ্ধ দামিনীর চকিত চমকে;
হেরিলে তাহার প্রেম জ্যোছনা আলোকে,
হিল্লোলিত, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্রে, নীরদ-বর্ষণে;

—নিরন্তর নাহি জানি—কি গুপ্ত কারণে
ভাবের সংঘাতে নিত্য আন্দোলিত হয় মোর প্রাণ ;
কি গুপ্ত বিরহে সদা হয় কম্পমান
নাহি জানি এ অশান্ত হিয়া! যেন কবি উপভোগ
মূক প্রকৃতির সনে অন্তরের যোগ
অবিরাম। মনে হয়—যেন রহে কোন চিরন্তন,
বিরাট্ ঐক্যের সূত্র, নাড়ীর বন্ধন
মোর সনে প্রকৃতির।
তবু, আজো কেনরে আমার
বিন্দু শান্তি নাহি প্রাণে? হেরি' এ অপার
অনুপম শোভারাশি, কেন মোর এ অন্তর-মাঝ
তবু জাগে হাহাকার? ওগো বিশ্ব-রাজ,
বলো, বলো - কোন পাপে অহরহ সহি এ দারুণ
তুষানল-জ্বালা। কভু দুঃখের আগুন
নির্ব্বাপিত হ'বে নাকি? ডুবি' এ সৌন্দর্য্যে চাহি যত
ভুলিতে অন্তর-জ্বালা—আরো অবিরত
ততই যেনরে মোর বেড়ে ওঠে বেদনা দুঃসহ
জীবনের ;—যেন আরো নবীন বিরহ
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে হাহাকারে এ হিয়া আমার !
কোথা যা'ব? এ বিশাল বিশ্বে বিধাতার—
কোথা, কোথা আছে মোর স্থান!
এই অতি দূর দেশে
স্বজন-ভবন ছেড়ে', এতদিনে, এসে
কিবা ফল লভিলাম!
[নীরবে, চিন্তিতভাবে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন।]
শুধু আর বৃথা কতদিন
অস্থির, উদ্দামভাবে, হেন লক্ষ্যহীন
কাটা'ব জীবন মোর? পড়ে'ছে শৃঙ্খল যা'র পায়ে,
সে অবোধ, হতভাগ্য কেন আর চায়—
মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের সম, এই সংসারের মাঝে
করিবারে বিচরণ? বন্দীর না সাজে
স্বাধীন জীবন হেরে ক্ষুণ্ণ মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা
—অকারণে, অবিরাম! করি' অবহেলা
আপন কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, জীবনের সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ি,'
উদাসীন হ'য়ে, শুদ্ধ অদৃষ্টে ধিক্কারি'—
এ হেন জীবনে আর কিবা প্রয়োজন?
কে কোথায়
লভিয়াছে কাম্য কভু বিনা সাধনায়?
কর্ম্ম বিনা লভ্য বস্তু কা'র কবে মিলেছে নিখিলে?
চাহি শান্তি : কিন্তু, কর্ম্ম-স্রোতে না নামিলে,
না করিলে স্বীয় প্রাণ বিশ্বের কল্যাণে বিসর্জ্জন,
কেমনে লভিব আমি তাহা? এ জীবন
নিস্তেজ ঔদাস্যে, আর অক্ষুণ্ণ আলস্যে,—সুখ-আশে,
যদি সদা স্বার্থ লাগি', ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে
জীর্ণ করি নিরন্তর গৃহ-কোণে বসি', তবে আর
কেমনে লভিব আমি শান্তি-সুধা-ধার
সিক্ত, স্নিগ্ধ করিবারে এ জীবন-মরু? স্বার্থে কবে
পেয়েছে পরম তৃপ্তি এ বিশাল ভবে
সঙ্কীর্ণ মানব? যদি নাহি পারি একান্তে সঁপিতে
স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ-কণা এ ধরার হিতে ;
যদি পরার্থেরি মাঝে বিসর্জ্জিয়া অস্তিত্ব আপন,
পরার্থে না পারি নিতে করিয়া বরণ
নিজেরি স্বার্থের মত কায়-মনে একান্ত সহজে—
তবে বৃথা জন্ম মম, বৃথা তবে খোঁজে
ফিরিতেছি শান্তি তবে হাহাকার করি'! শান্তি কোথা
অন্বেষিছ ওরে অন্ধ, নিয়ত অযথা
সঙ্কীর্ণ, তিমিরাবৃত, রন্ধ্রহীন বাসনা-কারায়?
[করতল-ন্যস্ত-গণ্ড হইয়া শিলাসনে উপবেশন করিলেন।]
অজয়ের সুমহান আদর্শ আমায়
আজো নাহি করিল চেতন! কিবা অনুপম তা'র
স্বার্থ ত্যাগ, কর্ম্ম-নিষ্ঠা। নিয়ত সবার
শুভার্থে, সেবায় দিল কাটাইয়া নশ্বর জীবন
আপনারে একান্তেই হ'য়ে বিস্মরণ
কর্ম্ম-মোহে! আজন্ম কুমার-ব্রত করিয়া গ্রহণ
মন-প্রাণে স্বদেশেরি কল্যাণ সাধন
করিতেছে মৌনভাবে! যশোলিপ্সা, মান-অভিমান
তুচ্ছ করি', অকাতরে দে'ছে বলিদান
আপনারে আর্ত্ত-শুভ-আশে। ত্যজি' সর্ব্ব স্বার্থ-স্পৃহা
স্বেচ্ছায় এ সেবা-ব্রত,—অতুল ইহা
এ মরতে! কেবা আমি অজয়ের? তবু, মোর তরে
কি অতুল স্বার্থ-ত্যাগ! মৌন প্রীতি-ভরে
ফিরিতেছে সাথে সাথে ছায়ার মতন।
আর, আমি?
—সদা স্বীয় চিন্তা-মগ্ন, স্বার্থ-অনুগামী!
হেন ঘৃণ্য স্বার্থপর জীবের কি কভু তৃপ্তি আছে?
বেদনায়—অশ্রু-জলে, শূন্য গৃহ-মাঝে
ভগিনী-কলত্র মোর করিতেছে নিত্য হাহাকার
নব-জাত শিশুটিরে বক্ষে ধরি', আর,
হেথায় কলঙ্কী আমি শবসম রয়েছি পড়িয়া
—গাঢ় আলস্যের ভরে নিরুদ্বেগ-হিয়া!
[উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]
বিধির নির্দ্দিষ্ট মোর জীবনের কর্ত্তব্য সকল
তুচ্ছ করি', নাহি জানি—কি আশে, কেবল
হেনভাবে যাপিতেছি জীবন আমার। গৃহে মোর
পতি-প্রাণা, সাধ্বী সতী একান্ত কাতর,
শুদ্ধ মৌন বেদনায় চাহিতেছে আমার দর্শন ;

আর, হেথা প্রাণহীন পশুর মতন
আমি শুধু পড়ে' আছি উদাসীন, অনাসক্ত-মন;
হেরি সুখে—তিলে তিলে সতীর মরণ
নয়ন-সম্মুখে! সেই অকলঙ্ক, নবীন শিশুরে
কোন্ প্রাণে ত্যজি', আজো রহিয়াছি দূরে—
এ প্রবাসে! কোন্ দোষে অপরাধী হ'ল মরি—সে-ও
মোর কাছে। আমা' হেন স্বার্থপর, হেয়,
কাপুরুষ জীব আর আছে কিরে এভুবনে! মোর
উপেক্ষায়, আর সেই একান্ত কঠোর
ব্যবহারে—সে লতিকা গিয়াছে শুকায়ে ধীরে, ধীরে!
এ জীবনে সে সতারে কভু আর কিরে
দেখিতে পা'ব না? হায়, আমারি লাগিয়া—

[অজয়ের প্রবেশ]

অজয়। সমাচার
এইমাত্র আসিয়াছে—শঙ্কা নাহি আর
মাধবীর জীবনের। কিন্তু, দেবতার ইচ্ছা কভু
পারিনা বুঝিতে! পুনঃ—(নীরব হইলেন।)

অরবিন্দ। অকারণে, তবু
এমন কুণ্ঠিত ভাব কেন তব?

অজয়। তব তনয়ের
সাংঘাতিক পীড়া; নাহি আর জীবনের
আশা তা'র!

অর। (শূন্য দৃষ্টিতে, শুষ্ক কণ্ঠে, অর্দ্ধ-স্বগত)
—দেখিতেও পা'ব নাকি?

অজ। (হস্ত-ধারণ করিয়া) চল চল গৃহে।
স্বীয় কর্ম্ম-ফলে সখা, কহ- আজো কিহে
জাগিছে না অনুতাপ কর্ত্তব্যেরে করি' অনাদর?
সে কল্যাণী রমণীর তরে বন্ধুবর,
আজো কি অন্তরে তব বিন্দুমাত্র জাগেনি করুণা?
—একি মনুষ্যত্ব? ভ্রাতঃ, এ বিশ্বে কভু না
লভে শান্তি সেই জন তমোময় জীবন যাহার।
আজীবন উপার্জ্জিয়া পাণ্ডিত্য অপার
কোথা তব হিতাহিত-জ্ঞান? কিবা ফল প্রিয়তম,
সেই জ্ঞানে যাহে মনে না আনে সংযম,
নিদ্রিত বিবেক-শক্তি যাহে নাহি হয়হে জাগ্রত?

অর। (করে কর সংঘর্ষণ করিয়া)
আমি মূর্খ, অতি হীন!

অজ। —হও কর্ম্ম-রত।
দূর কর হে সুহৃৎ, স্বেচ্ছা-স্ফূর্ত্ত, নিষ্ফল আক্ষেপ।
হৃদয়ের ক্ষত-মুখে কর্ম্মের প্রলেপ
দেহ লেপি';—নির্ব্বাপিত হ'বে জ্বালারাশি। এভুবনে
এসেছ করিতে কর্ম্ম। কর্ত্তব্য-পালনে
হও অবহিতচিত্ত। জ্ঞানী তমি, জীবনের ধ্রুব
কর্ত্তব্যেরে লহ বুঝি; আপনার শুভ
সুবিচারে করি' স্থির- সাধো বীরসম অবিরাম।
এ জগতে চলিয়াছে যে মহাসংগ্রাম
জয়ী হও তাহে।
গৃহে দেবীসমা ভগিনী ও জায়া
প'ড়ে আছে; আর তুমি তেয়াগিয়া মায়া
তাহাদের, সদা হেথা কাটাইছ তামস জীবন।
চিত্রাঙ্কিত, মনোহর মূরতি যেমন
নিজ্জীব আঁখির তারা বিনা; তুমি হে বন্ধু আমার,
তেমনি অপূর্ণ সদা সংসার-মাঝার
সে কল্যাণী মাধবীরে ছাড়া! বিবেক কবহ মনে—
কোন্ দোষে নব-জাত সে পুত্র-রতনে
এমন নির্দ্দয়ভাবে অবহেলা করিছ নিয়ত!
চলহ তাঁদের কাছে। তব হৃদ-ক্ষত
ধৌত করি' দিবে সেথা সতী ধীরে, মৌন অশ্রুনীরে
নিরন্তর সখা।

অর। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) চল—চল গৃহে ফিরে'।

জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া।

কপিলি নদী পার হইলেই জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জয়ন্তিয়া জেলার পার্ব্বত্য ভূভাগের অধিবাসীদিগকেও সমতলের অধিবাসীরা খাসিয়া বলে; ইহারা যে খাসিয়া তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা আপনাদিগকে 'খা' বলে। ইহারা সুশ্রী, পেশীপুষ্ট-শরীর, কর্ম্মঠ, এবং বীরোচিতক্রীড়াপ্রিয়। ইহারা সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকে, ইহাদের অস্ত্র ধনুর্বাণ, দীর্ঘ নগ্ন তরবার, ও খুব বড় ঢাল যাহা বৃষ্টি বাদলের দিনে ছাতার কাজও করে।

জয়ন্তিয়ার রাজা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সে নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহার নিজস্ব সম্পত্তির মূল্য লক্ষমুদ্রা ছিল, সে সকল নির্ব্বাসন কালে তাহাকে লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। রাজার বংশীয়গণ এক্ষণে হিন্দু আচারপদ্ধতি পালন করিয়া সৎ-শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। রাজার উত্তরাধিকার রাজার বংশে সংক্রমিত হয় না; রাজার পরে রাজার ভগ্নী যাহাকে কুঁয়ারী বা কুমারী বলে সেই রাজ্যাধিকারিণী হয় এবং সম্ভ্রান্ত পার্ব্বত্য খাসিয়া হইতে তাহার বর মনোনীত

হয়। এইরূপে রাজ্যাধিকার শুদ্ধ খাসিয়া শোণিতেই আবদ্ধ রাখা হয়। খাসিয়ারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাদের শারীর বিশেষত্ব অবিকৃত রাখিয়াছে।

১৮২৬ সালে খাসিয়াদিগকে তাহাদের তিরুতজিংহ নামক এক রাজার সাহায্যে প্রথম বশীভূত করিয়া শ্রীহট্ট ও আসামের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালের ৪ঠা এপ্রেল অজ্ঞাত কারণে (ইংরাজের মতে অ-কারণে) সানুচর লেপ্টেনেন্ট বেডিংফিল্ড ও লেপ্টেনেণ্ট বার্টন নিহত হন। ইহার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধাবসানে ১৮৩৩ সালে সমগ্র খাসিয়া পর্ব্বত ইংরাজ-অধিকৃত হয় এবং খাসিয়াদের রাজা তিরুতসিংহ আত্মসমর্পণ করে! তখন খাসিয়া পর্ব্বতে বংশানুক্রমিক রাজার অধীনে কতকগুলি অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছিল; এক এক রাজার অধীনে ২০ হইতে ৭০ খানা গ্রাম। সমগ্র জাতি একজন প্রধানের অধীনে থাকে অথচ প্রত্যেক লোকই অপরের কর্ত্তব্য নিয়মিত করিয়া সাধারণ-তন্ত্রের মত ব্যবহার করে। তিরুতসিংহ সকলের অভিপ্রায় না জানিয়াই ইংরাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

এতদ্দেশের এক একটা পর্ব্বত ৬০০০ ফুট পর্যান্ত উচ্চ। নিম্নভূমি হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি আছে। তাহাতে কমলা ও পাতিলেবু, আনারস, কাঁঠাল, আম, সুপারী, কলা ও টেপারী প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে। খাসিয়া পর্ব্বতের স্বাভাবিক সংস্থান ও দৃশ্য ভিন্ন আর একটি বিশেষত্ব আছে; নানা আকারের স্মরণপ্রস্তর সকল দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রস্তর বোধ হয় মৃতব্যক্তির স্মরণচিহ্নরূপে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। এই-সকল স্মারকচিহ্ন এইরূপঃ—বড়, চেপ্টা, গোলাকার একখণ্ড প্রস্তর ছোট বড় নানা আকারের খাড়া পাথরের অগঠিত খুঁটির উপর বসানো থাকে যেন নানা আকারের বসিবার টুল স্থাপিত হইয়াছে; এই সকলের উপর গ্রামবৃদ্ধদিগকে বসিয়া গল্প গুজব করিতে দেখা যায়। এই টুলের মত স্মরণচিহ্ন ব্যতীত পথের ধারে বিচিত্র গঠনের চৌকা স্তম্ভও দেখা যায়। খাসিয়াদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেন এত কষ্ট করিয়া এই সকল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিল, তাহা হইলে তাহারা উত্তর করে, আপনাদের নাম রক্ষার জন্য। ঠিক এই প্রথা উত্তর সিংভূমের হো জাতির মধ্যে পাওয়া যায়; হয়ত ইহারা এককালে একই জাতি ছিল।

খাসিয়াদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এইরূপে অনুষ্ঠিত হয়ঃ— শব ৪।৫ দিন কখনো বা ৪।৫ মাস গৃহে রাখা হয়; অধিক দিন রাখিতে হইলে শব খোঙ্গোলো গাছের গুঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ধোঁয়া দিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সকল আয়োজন শেষ হইলে শব পোড়াইয়া ফেলা হয়। একটা মাচা করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত চারি জনে শব বহন করিয়া দাহস্থানে লইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে বিষাদ সঙ্গীত হয় এবং দুঃখার্ত্ত বন্ধুবর্গ ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে করিতে যায়। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া শবটিকে ঢাকিয়া সকলের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া চারি-পায়া একটা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বাক্সের নীচে কাঠ ধরাইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়; কখনো কখনো বাড়ী হইতেই এই বাক্সে করিয়াই শব দাহস্থানে আনিয়া অগ্নি সংযোগ করে। শব দাহ হইবার সময় সুপারী, ফল প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। চারিদিকে চারিটা তীর নিক্ষিপ্ত হয়। দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে ভস্মরাশি মৃৎভাণ্ডে ভরিয়া গৃহে লইয়া যায় ও এক শুভদিনে ভস্মভাণ্ড প্রোথিত করিয়া সেই স্থানে প্রস্তরচিহ্ন স্থাপন করে; এই কবর দেওয়ার দিন বিপুল ভোজ ও নৃত্যোৎসব হয়। এই নৃত্যে কুমারীগণ দলের মধ্য স্থলে ভূমিসন্নদ্ধ দৃষ্টি হইয়া দুই তিন সারিতে নৃত্য করে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই আপন আপন সর্ব্বোত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে। পুরুষেরা ধুতি, রেশমী পাগড়ী, প্রচুর সূচিশিল্পভূষিত জামা, রূপার ভারি শিকল, সোণার হার, ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ কারুশোভিত তূণ ধারণ করে; স্ত্রীলোকেরা লম্বা ঘাঘরার উপর একখানা কাপড় ডান বগলের নীচে দিয়া আল্‌গাভাবে লইয়া সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ডান কাঁধের উপর গিঁট বাঁধিয়া পরে; মাথায় রূপার বেষ্টনীর সঙ্গে পশ্চাৎ দিকে লম্বা বর্ষাফলকের মত একটা গহনা উঁচু হইয়া থাকে। এক জাতির ভস্ম এক শিলাতলে বা এক কবরস্থানে থাকে। স্বামী স্ত্রীর ভস্ম কখন মিলিত করা হয় না, কারণ উভয়ে পৃথক জাতীয়। স্ত্রী ও তাহার সন্তানেরা স্ত্রীর মাতার গোত্রীয়; স্ত্রী ও সন্তানদিগের

চিতাভস্ম স্ত্রীর মাতার চিতাভস্মের সহিত রক্ষিত হয়, স্বামীর চিতাভস্ম তাহার গোত্রীয় সমাধিক্ষেত্রে থাকে। এই জন্য সন্তানেরা মাতৃকুলের দায়াধিকারী হয়।

বিবাহবন্ধন ইহাদের অত্যন্ত শিথিল। বিবাহ অনুষ্ঠান-হীন। কোনো যুবকের প্রস্তাব যুবতী ও তাহার পিতামাতার অনুমোদিত হইলে বর কন্যার পরিবারভুক্ত হয় অথবা মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ী আসে। দাম্পত্যভঙ্গও সচরাচর ঘটে, যাহার খুসি সে ভঙ্গ করে; যথন উভয়ের অভিমতে ভঙ্গ হয়, তখন পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে গোটা কয়েক করিয়া কড়ি লইয়া প্রকাশ্য সভায় ফেলিয়া দেয়। সন্তানেরা মাতার নিকটেই থাকে।

খাসিয়ারা পুষ্ট পেশীর জন্য বিখ্যাত; স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পেশী খুব পুষ্ট ও দৃঢ়। ইহাদের বর্ণ গৌরলাল; যুবজনের হাস্যদীপ্ত মুখশ্রী দেখিতে প্রীতিকর; কিন্তু চেপ্টামুখে বাঁকা চোখে সৌন্দর্য্য বড় বিরল, অধিকন্তু সর্ব্বদা পান চিবাইয়া বড় নোংরা হইয়া থাকে, মুখ হইতে পানের ছোপ কখন পরিষ্কার করে না। তাহাদের পরিচ্ছদ প্রায়ই সুন্দর রঙীন হয়, কিন্তু তাহা ধূলিমলিন হইয়া থাকে, দেহও কখনো স্নানের আস্বাদ জানে না। ইহারা খুব বিশ্বাসী সৎ ভৃত্য হয়, কিন্তু বড় অলসপ্রকৃতি। ইহারা বস্ত্রবয়ন করিতে জানে।

চাল, জোয়ার, বাজরা, কচু প্রভৃতি মূল, সর্ব্বপ্রকার মাংস ও শুঁটকী মাছ ইহাদের খাদ্য। এক এক দলের এক এক দ্রব্য নিষিদ্ধ অস্পৃশ্য খাদ্য।

খাসিয়াদের পরমেশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেও বনপর্ব্বতের উপদেবতার উপরই আস্থা অধিক। ইহাদের কোনো মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নাই। ইহারা ডিম ভাঙিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহারা আপনাদের ইচ্ছামত চিহ্ন দেখিতে পায় ততক্ষণ ডিম ভাঙিতে থাকে, এ জন্য প্রায়ই শুভফলই নির্ণীত হয়। সুরাপান করিবার পূর্ব্বে ইহারা দেবতাকে নিবেদন করে; তর্জ্জনী তিনবার সুরামধ্যে ডুবাইয়া সেকেলে লোকের অশ্বত্থামাকে তেল দিবার উপায়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে অঙ্গুলিলগ্ন সুরা উভয় স্কন্ধে ও পার্শ্বে ছিটাইয়া দেয়।

রাজদরবারে সাধারণ দণ্ড ছিল জরিমানা; কখনো কখনো সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দোষীকে সপরিবারে রাজার দাস করা হইত। কখনো বা জলবিচার হইত—বাদী প্রতিবাদী একসঙ্গে কোনো পবিত্র সরোবরের দুই ধারে ডুব দিত এবং যে অধিক ক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারিত তাহারই জিত হইত। এই বিচার উকিল প্রতিনিধি দ্বারাও হইতে পারিত। এই জন্য দীর্ঘশ্বাস, অধিকদমওলা উকিলের দরকার খাসিয়াদেরো ছিল।

খাসিয়ারা শিশ দিতে খুব ভালো বাসে। বালকদের আমোদ লাটিম ঘুরানো ও চর্ব্বি মাপানো বাঁশে উঠা।

কাছাড়ের অধিবাসীরা খাসিয়াদিগকে মিকি বলে।*

মুদ্রা-রাক্ষস।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

তাপ ও আলোকের চাপ।

আজ পঞ্চাশ বৎসর গত হইল জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাপ আলোক বিদ্যুৎ ও চুম্বক প্রভৃতির শক্তিকে এক ঈথরেরই তরঙ্গ-আবর্ত্তনাদির ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক সাধারণ এই সিদ্ধান্তে সেই সময় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত হেলম্‌হোজ্‌ স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ম্যাক্সওয়েলের কথারই অভ্রান্ততা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বৈজ্ঞানিকগণ নব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্জ সাহেব, এবং আমাদেরি স্বদেশবাসী মহাপণ্ডিত ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় কিপ্রকারে নানা পরীক্ষায় ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

ম্যাক্সওয়েল সাহেব যখন আলোক ও বিদ্যুতের পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ঘটনাক্রমে জানিয়াছিলেন, যদি ঈথরেরই স্পন্দন ও আবর্ত্তনাদি আলোক, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির কারণ হয়, তবে কোন লঘুপদার্থের উপর আলোকপাত হইলে,

---

* Col. Dalton প্রণীত Descriptive Ethnology of Bengal হইতে সঙ্কলিত।

পদার্থের উপর একটা মৃদু ধাক্কা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। সময়াভাব প্রযুক্ত এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি হাতের গোড়ায় না পাইয়া ম্যাক্সওয়েল সাহেব এই ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু গবেষণা শেষ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ঈথরদ্বারা তাপালোকাদির উৎপত্তির কথা যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন তাপালোকের চাপ বা ধাক্কার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ধরা পড়িবে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ম্যাক্সওয়েলের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকলস্ সাহেব, আজ কয়েকমাস হইল রয়াল ইনষ্টিটিউশনের এক বিশেষ অধিবেশনে আলোক-চাপের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

কাচ পাত্র হইতে কতকটা বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া যদি তাহার মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্র পক্ষবিশিষ্ট চর্‌কি রাখা যায়, এবং প্রত্যেক পাখার এক এক দিক কোনপ্রকার কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা যায়, তবে কাচ ভেদ করিয়া তাপ বা আলোকের রশ্মি পাখায় আসিয়া পড়িলেই চর্‌কি আপনা হইতেই ঘুরিতে আরম্ভ করে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এবং ইহার কার্য্য দেখিয়া মনে হইয়াছিল বুঝি বা এটা আলোক-চাপেরই কাজ। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল, ইহা তাপেরই সাধারণ কার্য্য; পাত্রের স্বল্পাবশিষ্ট বায়ুর উপর তাপই কার্য্য করিয়া চর্‌কির লঘু পক্ষগুলিকে ঘুরাইয়া থাকে। ইহার পর এপর্য্যন্ত আলোকের চাপ সম্বন্ধে আর কোন নূতন কথা শুনা যায় নাই। সুতরাং এই আবিষ্কারের সমগ্র গৌরব একক নিকলস্ সাহেবেরই প্রাপ্য বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক নিকলস্ যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ম্যাক্সওয়েলের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার গঠন খুব সরল হইলেও যন্ত্র ব্যবহারে অত্যন্ত কৌশলের আবশ্যকতা দেখা যায়। আলোক-চাপের পরিমাণ এত অল্প যে পরীক্ষকের অতি সামান্য ত্রুটিতে সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। নিকলস্ সাহেব একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নলে (capillary tube) দুই খানি লঘু দর্পণ বসাইয়া, নলটিকে ঝুলাইয়া রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সূর্য্যের তীব্র কিরণ বা বৈদ্যুতিক আলোকের রশ্মি দর্পণদ্বারে পড়িয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট ঘুরাইয়া দিয়াছিল। কি পরিমাণ চাপে দর্পণ ঘুরিল, নিকলস্ সাহেব তাহাও হিসাব করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন।

সূর্য্যের আকার পরিবর্ত্তন।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ রদারফোর্ড সাহেব চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া সূর্য্যের অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছবি উঠাইয়াছিলেন। এগুলি এখন আমেরিকার কলম্বিয়া মানমন্দিরে রহিয়াছে। সূর্য্যের আধুনিক ছবির সহিত সেই প্রাচীন ছবিগুলির তুলনা করায় সম্প্রতি অনেক অনৈক্য দেখা গিয়াছে।

মোট ১৩৯ খানি ছবি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং এ গুলিকে বৎসর অনুসারে পর পর সজ্জিত করিয়া চিত্রস্থ সূর্য্যবিম্বের ব্যাস পরিমাপ করা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় একই বৎসরের গৃহীত নানা ছবির ব্যাসের মধ্যে কোন অনৈক্য দেখা যায় নাই। কিন্তু দুই তিন বৎসরের পূর্ব্ব বা পরের ছবির সহিত তুলনা করায় ব্যাসের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়িয়াছিল।

রদারফোর্ড যখন ছবি তুলিয়াছিলেন তখন এখনকার মত নির্ভুলপ্রথার ফোটোগ্রাফ লইবার কৌশল জানা ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ছবিতে ভুলভ্রান্তি আছে মনে করিয়া, সূর্য্যের এই আকার পরিবর্ত্তনের প্রমাণে সহসা কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে নাই। অপর দেশের প্রাচীন মানমন্দির হইতে সূর্য্যের পুরাতন ছবি বাহির করিবার জন্য সেই সময় হইতে অনুসন্ধান চলিতেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাচীন ছবি কোন স্থানেই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গত ১৮৭৪ এবং ১৮৮২ সালের শুক্রোপগ্রহণ (Transit of Venus) পরীক্ষার জন্য জর্ম্মাণ জ্যোতিষিগণ হেলিয়োমিটর যন্ত্র সাহায্যে সূর্য্যবিম্বের যে পরিমাপ লইয়াছিলেন, তাহার কাগজপত্র সম্প্রতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ দুই বৎসরের মাপের অনৈক্য রদারফোর্ডের ছবির অনৈক্যের সহিত অবিকল একই দেখা গিয়াছে। সুতরাং গভীর বাষ্পমণ্ডিত সূর্য্য নিজের বাষ্পাবরণখানিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া যে আকার পরিবর্ত্তন করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে উইলসন নামক জনৈক মার্কিন জ্যোতিষী নর্থফিলড

নমন্দিরে বসিয়া সূর্য্যের যে সকল ছবি উঠাইয়াছিলেন, াহাতেও ঐপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে।

সূর্য্যের আকার পরিবর্ত্তন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলে, কান্ সময়ে পরিবর্ত্তনের মাত্রা অধিক হয় জানিবার জন্য ন্সুসন্ধান চলিয়াছিল। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, র্য্যমণ্ডলে যে সকল সৌরকলঙ্ক (Sun-spots) দেখা যায় াহার সংখ্যা সকল সময়ে সমান থাকে না। কেবল াতি এগারো বৎসর অন্তর কিছুদিন ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডল বহু লঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, াই কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যকালেই সৌরদেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন টে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ যেমন সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ চাপা, সূর্য্যের আকারও কতকটা তদ্রূপ। কিন্তু লঙ্কের প্রাচুর্য্য হইলে সূর্য্যের আর এই আকার থাকে না। খন অক্ষ-ব্যাস (Polar-diameter) অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া র্য্যকে লম্বাটে আকার প্রদান করে। সূর্য্যের এই আকার-রিবর্ত্তনের সহিত সৌরকলঙ্কের কি সম্বন্ধ আছে অদ্যাপি ানা যায় নাই।

মঙ্গল বুধ ও শুক্র এই তিনটি গ্রহ সূর্য্যের খুব নিকটবর্ত্তী, াজেই আমাদেরো খুব নিকটবর্ত্তী। ইহাদের গতিবিধি ানা দেশের পণ্ডিতগণ নানা সময়ে অতি সূক্ষ্মরূপে গণনা রিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি গণনালব্ধপথ হইতে গ্রহগণকে খন কখন বিচলিত হইতে দেখা যায়। জ্যোতিষিগণ অদ্যাপি এই গতিবিভ্রাটের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন াই। সূর্য্যের আকার পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

কৃত্রিম হীরক।

ফরাসী পণ্ডিত ময়সনের (Moisson) নাম আজ গদ্বিখ্যাত। কয়লা ও হীরক এক অঙ্গার হইতেই উৎপন্ন য় জানা ছিল, কিন্তু কিপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া ষ্ণ অঙ্গার উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হীরকে পরিণত হয় তাহা জানা হল না। ময়সন্ সাহেব তাঁহার পরীক্ষাগারে অঙ্গার লইয়া ানা পরীক্ষা করিয়া যে পদ্ধতিতে কয়লা স্বভাবতঃ হীরকে রিণত হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং পরীক্ষাগারে উৎকৃষ্ট কৃত্রিম হীরকও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হিসাবে দেখা গয়াছিল, নানা আয়োজন করিয়া রতিপ্রমাণ হীরক প্রস্তুত করিতে যত অর্থব্যয় হয়, আকরিক হীরক সংগ্রহ করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প খরচ পড়ে। কাজেই হীরক প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় আকরিক হীরককে স্থানচ্যুত করা যায় নাই। কৃত্রিম হীরককে অগত্যা নিছক্ পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া থাকিতে হইয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন আমাদের পৃথিবী প্রতিদিনই শত শত উল্কাপিণ্ড (meteors) টানিয়া নিজের কুক্ষিগত করে। ইহাদের অধিকাংশই বায়ুর ভিতর দিয়া আসিবার সময় বায়ুর সংঘর্ষণে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তাই কিছুদূর নামিয়া আসার পরই আমরা উল্কাপিণ্ডগুলিকে অদৃশ্য হইতে দেখি। কিন্তু বড় বড় উল্কাপিণ্ডগুলি পড়িবার সময় নিঃশেষে পুড়িয়া যায় না। এ জন্য কতকগুলি পিণ্ড পুড়িতে পুড়িতে ভীমবেগে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে উল্কাপিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একটি অদ্ভুত রকমের উল্কাপিণ্ড ময়সন্ সাহেবের হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষায় ইহাতে লৌহ, গন্ধক ও ফস্‌ফরস্ ছাড়া সাধারণ অঙ্গার এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণিকা পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল উল্কাপিণ্ড লইয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে, তাহার কোনটিতেই হীরকের চিহ্ন দেখা যায় নাই, এবং তাহাতে লৌহ, গন্ধক ও ফস্‌ফরসের পরিমাণও এ প্রকার ছিল না। ময়সন্ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ লৌহগন্ধকাদি পদার্থ উল্কাপিণ্ডস্থ সাধারণ অঙ্গারকে দানা বিশিষ্ট করিয়া হীরকে পরিণত করার সহায়তা করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ময়সন্ সাহেব বৈদ্যুতিক চুল্লীতে লৌহ গলাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। চিনির অঙ্গার লৌহের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। তা'র পর তাহাতে গন্ধকযুক্ত লৌহ (iron sulphide) মিশাইয়া গলিত অবস্থাতেই জিনিসটাকে শীতল জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় অঙ্গারকে আর তাহার সাধারণ আকারে দেখা যায় নাই, অধিকাংশ অঙ্গারই উজ্জ্বল হীরকের ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হইয়াছিল। লৌহ ও গন্ধক অঙ্গারকে দানাদার করিয়া হীরকে পরিণত করিতে যে এত সাহায্য করে, তাহা অদ্যাপি

কোন পরীক্ষাতেই দেখা যায় নাই। ময়সন্ সাহেব ইহাতে হীরক প্রস্তুতের এক নূতন উপায় পাইয়াছিলেন। অল্পব্যয়ে কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইনি বহুকাল ধরিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই নূতন তথ্যটি তাঁহার কার্য্যকে অগ্রসর করিয়া দিবে বলিয়া মনে হয়।

জনসমাগম অস্বাস্থ্যকর কেন ?

বহুজনপূর্ণ সভাগৃহাদিতে অনেকক্ষণ থাকিলে শরীর নানাপ্রকারে অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলেন, প্রশ্বাসের সহিত এবং লোমকূপ দিয়া শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা দ্বারা জনপূর্ণ আবদ্ধ স্থানের বাতাস কলুষিত হইয়া পড়ে। কাজেই আমরা যখন এই অবিশুদ্ধ বাতাস নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তখন তাহা অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়।

ব্রেস্লা স্বাস্থ্যরক্ষা-সভার (Breslau Hygienic Institute) প্রধান সভ্য ডাক্তার পল সাহেব এই ব্যাপারটি লইয়া কিছুকাল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা শেষে জানা গিয়াছিল, জনপূর্ণ আবদ্ধস্থানে থাকিলে দেহের উত্তাপ রীতিমত বাহির হইতে পারে না। কাজেই শরীরে নানাপ্রকার পীড়ার উপদ্রব দেখা দেয়। মুক্ত স্থানে থাকিলে পার্শ্বের বায়ুকে গরম করিতে এবং গাত্রনির্গত ঘর্ম্ম প্রভৃতি জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করিতে শরীর হইতে অনেকটা তাপ বাহির হইয়া যায়। তা' ছাড়া প্রশ্বাসের সহিত অনেকটা তাপ নির্গত হয়। এই প্রকার তাপ নির্গমন স্বাস্থ্যরক্ষার একটা প্রধান সহায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কেবল বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকিলেই শরীর সুস্থ থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তাপ পরিত্যাগের সুব্যবস্থা থাকা চাই। সুশীতল গৃহের শতকরা ১৫ ভাগ অঙ্গারকবাষ্পমিশ্র বায়ু ব্যবহার করিয়া বহুলোককে সুস্থ থাকিতে দেখা গিয়াছে। অথচ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া কেবল যথোপযুক্ত তাপ নির্গমের অভাবে কেহই সুস্থ থাকে নাই। সুতরাং আবদ্ধ স্থানের বায়ুর উষ্ণতা যখন দেহের উষ্ণতার সহিত সমান হইয়া শারীরিক স্বাভাবিক তাপ নির্গমন রোধ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীর যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পরীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ডাক্তার পল সাহেব বড় বড় সভাগৃহের অধ্যক্ষ এবং নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদিগকে বলিতেছেন যে, গৃহে বায়ুর গমনাগমনের জন্য বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া তাঁহারা যদি গৃহগুলিকে আবশ্যকমত শীতল করিবার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে লোকসমাগম প্রচুর হইলেও আবদ্ধস্থানে শ্রোতৃ ও দর্শকগণের স্বাস্থ্যহানির আর কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রীতি।

১

নিত্য মর্ত্ত্যপুরবাসিগণ
যেতেছে মৃত্যুভবনে ?
যাক্ যাক্, তবু উপেখি মরণ
রহিব ফুল্ল বদনে।

২

হইব সিদ্ধ শবসাধনায়
প্রেতবেষ্টিত শ্মশানে।
বিভাতিবে প্রেম হেম-দ্যোতনায়
সন্তাপে শোক-রসানে।

৩

দ্রুতধারে দূরে চলিছে জীবন ;
যাক্ তবু প্রীতি বহিব।
নিমেষে যাহারা তেজিবে ভবন
তাদেরি সেবায় রহিব।

৪

পারে কি নাশিতে প্রীতির বীরতা
জরা মরণের দৃশ্য ?
আমি কিরে ভবে হারাব ধীরতা
চঞ্চল বলি বিশ্ব ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমস্যা।

আমি "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোনটা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কি তাহা লইয়া ত কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর এক দিক্ দিয়া বারম্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াই রূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মত ছড়াইয়াছে, আগুনের মত জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্নভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালঙ্কারের ঝঙ্কার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেই জন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে আমি অসঙ্গত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু, তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হোক্, যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছি কি ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয়ত প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে একথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এই টুকু মাত্র ভূমিকা করিয়া "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোট কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হোক্ এবং যতই ভাল হোক্ বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না? কোন্ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সঙ্কটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে ভাল করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যত বড় কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কি সে কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা যদি তাহার বর্ত্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মত সে কথার কোনো মূল্য নাই: তাহা উপস্থিত-মত ঋণের দাবী শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার আদালতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড বিখণ্ড করাই কর্ত্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মত তাহা মানুষকে অকর্ম্মণ্য এবং উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেই জন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড় বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নীচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন ইলিয়ড কাব্য অধিকতর human, অর্থাৎ মানবচরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে,—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন। আর, রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানবচরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ কথা মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করিতে পারে না; এই জন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হোক্, এ কথা সত্য, যে, মানব ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্ত্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়,—রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, "রেখে দাও তোমার ধর্ম্মকথা!" বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্ম্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। ম্যুটিনির পর যে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নির্দ্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানব-চরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এই প্রকার সঙ্কীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগন্তিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক্ দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃত ভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্ অর্থাৎ বাস্তববর্জ্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞা-পূর্ব্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হোন্ এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আসুন্ তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে একথা আমরা স্বীকার করিব না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিত ব্যাপারটা কি? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা, বা ইংরেজ তাড়ানো, বা আর কিছু? দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্ব্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলা দেশের একজন ভূতপূর্ব্ব হর্ত্তাকর্ত্তা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যত কিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারত-বাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলাকে উচ্ছেদ কর, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে বিপিন পালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মত ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্তগরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য-নিবারণের পক্ষে ভারতের পেন্সনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম, শমদম নিয়মসংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুনদিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। বলদর্পে অন্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্দ্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষম যখন অস্থি-মজ্জায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্ম্মের আর কোনো উচ্চতর দাবী তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোডই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাতে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড় বলিয়া জ্ঞান করে তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্দ্ধা-মাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসঙ্গত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য্য প্রতিকারচেষ্টা মানব হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্য্যকেও ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না

করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাতই নাই তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদের দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ আমাদের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে সেই মিথ্যা বাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলিমেলের সংবাদ-রচয়িতা এবং পায়োনিয়র ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জ্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবেনা। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাধিতে পারিবেনা।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্ব্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন একথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্ব্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের গুরুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; একথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্ম্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য;— যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারেই না দুর্ব্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;— স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহা কি কোথাও কোনই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্ত্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্ব্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে, কেবল দুর্ব্বলের দিকেই চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে, সমস্ত কল্পনাকে, সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড় কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড় বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ঙ্কর ভ্রমে পড়িয়া থাকি—সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে একথা আরো অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

"আচ্ছা, ভাল কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর" এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে কিন্তু সেই সমস্যাটি যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূর দেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবেনা।

ভারতবর্ষের পর্ব্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্য্যন্ত যে জিনিষটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কি? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিম দেশের যে সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিলনা;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজতত্ত্ব ছিল যে যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যান্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক্ রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষা দীক্ষার পার্থক্য যতই থাক্ তাহারা প্রকৃতই এক জাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনি মিলিয়া গেছে তখনি বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাক্‌সন, নর্ম্যান ও কেল্‌টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতাজাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সঙ্গত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে কোনো জাতি হোক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এসিয়াবাসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সে জন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মত ফোঁস্ করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনি সুরু হইল সেই মুহূর্ত্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্য্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যে দিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যে দিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজাকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে মানুষের যে সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোন মতেই মিলিতে চাহে না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলি চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কি উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কি উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানব প্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অর্থাৎ কি করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্ত্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্ব্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এত বড় অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডী দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া; পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক্ হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহু বিচিত্রকে একত্রে অবস্থানের সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো

একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনো মতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্ত্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে-অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনো দেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার; ইঁট কাঠ চুণ সুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এই জন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্ম্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমস্তের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার কটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক দল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে, ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যে দিন এই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সে দিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিও একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পরে সম অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশলাভ করে, তাহা কেবল আইন আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে কোনো পদার্থে সজীব সর্ব্বাঙ্গীনতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই;—তাহাকে কি জিনিষ দেওয়া গেল, সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড় হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা

উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস আদালত এবং নিতান্তই আইন কানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলি কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কর্ত্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলি রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের একটা মিল আছে সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়া পরা বিলাস বিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্ম্মাবসানে বিলাতী অবকাশের আরামের আয়োজন এ সমস্তই আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পূরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ঐ দেখ এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে সব কেরাণী ১৫।২০ টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড় সাহেব ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া তাহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। একথা যখন নিশ্চিত যে অন্নে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কি খায় পরে, কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনই করিতে পারে না। বিশেষতঃ এক আধজন লোক ত নয় - কেবল ত একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, একপক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা পেন্সন এবং লম্বা চাল—অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ;—অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানের লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য ; এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয় পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিঁকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্ত্তমান ছিল—অর্থাৎ যে সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না ;—

তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয় ত ছোট না হইতে পাবে।

একথা বলাই বাহুল্য, যেদেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সেদেশে স্বাধীনতা হইতেই পাবে না। কারণ, স্বাধীনতার "স্ব" জিনিষটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্ব্বপ্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলা দেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক্‌ হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিষটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে সকল বড় বড় কাজ করিতে করিতে পরস্পর মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। একথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনো দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্ব্বলতা নানা মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে বিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সেদেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজরাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজরাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজরাজত্ব কি করিলে আমাদের আত্ম-সম্মানকে পীড়িত না করে, কি করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, "না আমরা চাই না" তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজরাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা যে কি, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতী বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতর আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হোক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। একথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, যে, আজও আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাইনা কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির

ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউল।

যাজপুরে বরাহাবতার।

ভুবনেশ্বরে বিন্দুসাগর।

উড়িষ্যায় ঢেঁকিতে ধানভানা।

সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে— দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মত না বিচার করিয়াই দেশের বড় বড় কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্ব্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হৌক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে;—কোনো মতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বললাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ এবং কেবল মাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না। তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজরাজের সকল প্রকার সুশাসন সত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে ঘটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দু জাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য যোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত সহযোগিতা, হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক একটী সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মত ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীন হীনের মত বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরাজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া

বসিয়া আছি ;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না, আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত শত শত অন্ধ সংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে,—আমরা আমাদের অন্তর বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে আমাদের মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনো মতেই বড় হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব; ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্ম্মে বিচিত্র; নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট্; সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্ব্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা; উচ্চ নীচ আত্মীয় পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভ চেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও! যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কর, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধদ্বারে আঘাত কর, বারম্বার আঘাত কর; কোনো নৈরাশ্যে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদ পত্রের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ একথা আমরা স্বীকার করিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্ম্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজন-কালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্ত্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে,—পরের সহায়তায় আমরা উচ্চ নীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব আছে তাহার পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়া আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, বজ্রের গর্জ্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুইচক্ষু জুড়াইয়া দিবে।

মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এইকথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার

জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠাকুমার ঝুলি।

এই নামের একখানি উপকথার বহির ভূমিকায় কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'তিনি (গ্রন্থকার) ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।'

এই ভূমিকা পড়িয়া উপকথার বহিখানির ভাষা দেখিতে কৌতূহল হয়। কেন না, প্রাচীন কালের ঠাকুরমাএর মুখের উপকথা অক্ষরে বসানা যেমন-তেমন কর্ম নয়। মুখে মুখে যে কথা যেমন শুনি, সে কথা তেমন বানান করিয়া অন্যের বোধগম্য করা অল্প নৈপুণ্যের পরিচয় নয়। স্থানভেদে ভাষার ইতর বিশেষ হয়; স্থানভেদে উপকথার ভাষার প্রভেদ হয়। অন্যের, বিশেষতঃ সকল স্থানের বালক-বালিকাদের বোধগম্য হইবে, অথচ গ্রাম্যতা বা ভাষার দোষ থাকিবে না; লেখার ভাষার বাঁধন পড়িবে, অথচ রস-ভংগ হইবে না; এমন ভাষা-চালনা যে-সে লোকের কর্ম নয়। কাজটা এত কঠিন যে, শিশুদের নিমিত্ত হাসি-তামাসা, হাসি-খুসির যত বহি বাংগলায় ছাপা হইয়াছে, তাহাদের কদাচিৎ এক আধ খানা নির্দোষ হইয়াছে। যিনি বুড়া হইয়াও ছেলে সাজিতে পারেন, যিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান-পরিধি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মনোযোগ করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্যে ছেলে-ভুলানা গল্প লিখিয়া সফল-কাম হইতে পারেন না। বোধ হয়, উপকথায় ছেলেকে শিখাইবার কিছু থাকে না। ছেলে উপকথা বুঝিতে পারিবে, উপকথার কল্পনায় নিজের কল্পনা জাগাইতে পারিবে, এবং সংগে সংগে প্রচুর আনন্দ পাইবে,—ইহাই উপকথার উদ্দেশ্য।

এখানে আমি উপকথার আলোচনা না করিয়া 'ঠাকুরমার ঝুলির' ভাষা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বহিতে বাংগলা ভাষা শিখিবার প্রচুর উপাদান আছে।

কিন্তু প্রথমে বহির নামেই খটকা লাগিতেছে। বহির মলাটে আছে, 'ঠাকু'মার ঝুলি,' ভিতরে আছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'। ঠাকুমা, ঠাকুমার বুঝি; কিন্তু ঠাকুরমাএর না হইয়া ঠাকুরমার কেন হইল? 'কোন' 'কোন' স্থানে মার, ঠাকুরমার পদ আছে বটে; কিন্তু যাঁহারা এরূপ সম্বন্ধ পদ শুনিতে পান না, তাঁহাদের কানে মার, ঠাকুরমার পদ কটু শোনায়, অনাদর বুঝায়। 'ঝুলির' ভিতরে দুই এক স্থানে মায়ের ভাইয়ের পদও আছে।

সে যাহা হউক, রূপকথা কি? ইহা কি উপকথার গ্রাম্য রূপ? কোন কোন স্থানে গ্রাম্য লোকেরা উইকে বলে রুই, আশু নামের লোককে ডাকে রাশু। কিন্তু এই প্রমাণেও 'রূপকথা' পাই না, পাই রূপকথা। বহির নাম 'বাংগলার রূপকথা'। আমরা ছেলেবেলায় গল্প ও উপকথা শুনিতাম।

'নিবেদনে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, উপকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার "চোক 'বুঁজিয়া' আসিত," "আমার মত দুরন্ত শিশু, শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া 'পড়িতাম।'" "মা আমার 'অফুরণ' রূপকথা বলিতেন," "আজ মনে হয়, আজ ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না, তেমন করিয়া ঘুম 'পাড়ে' না।"

নিবেদনে গ্রন্থকার এমন করিয়া কলম ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন? কেবল এই খানেই চোক বুঁজে নাই, আর এক স্থানেও (১৩৪ পৃঃ) বুঁজিয়াছে। লেখক অন্য কএকটা শব্দেও অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু দিয়াছেন। দুই তিন স্থানে পাই 'উঁই'। 'হেঁটে কাঁটা উপরে কঁাটা'—হেটে—অধোভাগে—যেমন হেট-মাথা শুনি। 'ঘোমটার আঁড়ে' (১০২ পৃঃ), 'দৃষ্টির আঁড়ালে' (১৩৩ পৃঃ)। আড় ও আড়াল শব্দের মূল সংস্কৃত অন্তরাল শব্দে যদিও অনুনাসিকবর্ণ আছে, বাংগলায় আঁড়, আঁড়াল শুনি না। সংস্কৃত অনুনাসিক শব্দ মাত্রেই বাংগলা রূপান্তরে অনুনাসিকত্ব পায় নাই।

প্রমাণ, সংস্কৃত শৃংখল বাংগলায় শিকল, সং তণ্ডুল বাং চাউল। ফুলের পাঁপড়ী (৩২ পৃঃ), শেঁওলা (১৭১ পৃঃ) হুলো বেড়াল (২২২ পৃঃ), ইত্যাদি পড়িয়া নদীয়া জেলার অংশ বিশেষের গ্রাম্য পঁইঠা, বোঁচকা, হিসাঁব, ছেঁকল, হাঁসি শব্দ মনে আসে।

এক স্থানে আছে, এক কামার 'কাস্তে গড়াইতেছে' (২১৩ পৃঃ),—সেখানে গড়িতেছে হইবার কথা। 'নাক যোড়াইয়া দে' (১৭৭ পৃঃ),—জুড়িয়া দে? 'অত পণ্ডিতী চুলিয়ে কাজ নাই' (১৯৮ পৃঃ)—চলাইয়া? ফলাইয়া? 'নিবেদনে,' 'জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটছে, মার মুখের এক একটী কথায় সেই আকাশ-নিখিল-ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে, * * * কত অছিন্ অভিন্ বাজপুরী, কত চির সুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুর সামনে সত্যকারটার মত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।'—এখানে বোধ হয় 'ফুটেছে' করিলে পরের সংগে মিল থাইত। জোচ্ছনা ফুল ফোটে, না, জোচ্ছনায় ফুল ফোটে? বোধ হয় জোচ্ছনায় ঠিক। এমন জোচ্ছনা যেন বোধ হয় চারিদিকে (শাদা) ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। জোচ্ছনায় ফিনও ফোটে। ফুট্ ফুটে জোচ্ছনা, কিন্তু জোছনায় ফুল ফোটে। লেখক জানাইয়াছেন, কেহ কেহ 'ভিন ফোটা' কেহ বা 'ফটিক ফোটা' বলে। ফল ফোটা আর ফটিক ফোটার মূলভাব এক। ফিন ও ভিন এক বোধ হয়। ভিন্ন শব্দ হইতে ভিন আসিয়াছে। জোছনায় ফিন ফোটে—গাছপালা ভিন্ন ভিন্ন, স্পষ্ট স্পষ্ট দেখায়। কিংবা সং স্ফুলিংগ শব্দ হইতে ফিন আসিয়াছে। স্ফুলিংগ শব্দের চলিত রূপ ফিনকি শব্দ আছে। কিন্তু অছিন্ অভিন্ পুরী নিশ্চয়ই অছিন্ন, অভিন্ন।

বাংগালায় কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি বসে। ইহাই সাধারণ রীতি। কোন কোন স্থানে 'রে', এবং সর্ব্বনামে 'য়'ও বসে। আমাকে, আমারে, আমায়,—এই তিন রূপ। আমাকে শব্দের 'কে' বিভক্তির 'ক' লুপ্ত হইয়া 'য়'। সুতরাং 'আমাকে' ও আমা'এ' বা আমা'য়' মূলে এক। আমা'এ' পদের 'এ' স্থানে 'রে', 'র' আগম। কোন কোন স্থানে কর্মকারকে 'আমার' পদেরও প্রয়োগ আছে। হয়ত তাহা মূলে ষষ্ঠীপদ, কিংবা কর্মকারকে 'রে' হইতে উৎপন্ন। বংগের স্থানাস্থানে কর্মকারকে নানাবিধ বিভক্তি আছে। একবচনে আমা'কে', আমা'য়' আমা'রে', আমা'ক', আমা'র'; এবং বহুবচনে আমা'ঘরক', আমা'দের ঘরে' আমার'গে' ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন পদের মধ্যে লেখার ভাষা আমাকে, আমায়, আমাদিগকে লইয়াছে; অন্যগুলির প্রশ্রয় দেয় না। আমাদিগকে স্থলে আমাদিকে কবাও চলে। 'ঠাকুমার ঝুলি'তে যেন বাছিয়া বাছিয়া কর্মকারকে 'র' এবং 'দেরকে' পোরা হইয়াছে। 'আমরা উহাদের পুষিব' (৬ পৃঃ); 'আমাদেরকে আনিয়াছ, মাদেরকেও আন' (৭ পৃঃ); 'তাঁহাদেরকে খেদাইয়া দেন (৮ পৃঃ); 'রাজপুত্রদেরকে থলের মধ্যে পুরিয়া' (১৫ পৃঃ); ইত্যাদি। 'তাহাদেরকে দিয়া তিন বুড়ী তিন সন্ধ্যা জল থাইয়া' (১৫ পৃঃ),—সহজে অর্থ পাই না।

ঝুলির কোন কোন স্থানে ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। 'খোকন নাচতে লেগেছে', 'নাচতে নেগেছে'; 'বিছানা নিলেন' (৩৫); 'মাথার চুল জটা দিয়াছে' (৩৯ পৃঃ); 'যোগাড়-যাগাড় দিক্' (৪২ পৃঃ); 'টান দিল' (৪৯ পৃঃ); 'আসন নিল' (৯৮ পৃঃ); 'নেমন্তন্ দিতিস্' (১৯৫ পৃঃ) ইত্যাদি। স্থান ভেদে রান্না করা (রাঁধা), টান দেওয়া (টানা), নাচিতে লাগা (নাচা), ইত্যাদি আছে। চুলে জটা ধরে; যোগার-যাগাড় করা; নেমন্তন্ন করা, ইত্যাদিও আছে।

ঝুলিতে কোন কোন স্থলে এক এক শব্দের অনুচর শব্দ যোজিত হইয়াছে। কাপড়-চোপড় শব্দের চোপড়কে অনুচর বলিতেছি। অনুচর স্বাধীন নয় বটে, কিন্তু অর্থহীন নয়। সাড়া-শব্দ, কুণ্ডলী-মণ্ডলী পাকাইয়া, চটিয়া-মটিয়া, বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া, ঝুলি হইতে লইলাম। কিন্তু পরিষ্কার ঝরিষ্কার, বঁটি মটি, কুলো মুলো, ভাবিয়া টাবিয়া, প্রভৃতির নিরর্থক অনুচর বা প্রচর শব্দ না থাকিলে ভাল হইত। কারণ ইহারা বৃথা ধোঁকা জন্মায়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া আছে; টাবিয়া না আসিলেও চলিত। অন্যগুলির গোড়ায় ট দিয়া আরম্ভ করা সাধারণ নিয়ম। কএকটি অনুচরের রূপ দেখিলে অর্থহীন বোধ হয় না, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। 'তাড়াতাড়ি হাতিয়া-পিতিয়া' (৮১ পৃঃ); 'হাঁপিয়া-জাপিয়া' (৮৫ পৃঃ); 'জন-জৌলুষ'

(১৪৯ পৃঃ); 'কাবু-জাবু' (১৭৬ পৃঃ); 'উবড়ো-থুবড়ো প'ড়ে আছে মস্ত গাধাটা' (১৯৯ পৃঃ); 'ভেংগে যায় সব ভূড়ি-ভাঁড়' (১৯৭ পৃঃ); 'তা'তে কেন গড়ি-মড়ি' (২২০ পৃঃ); ইত্যাদি।

বাংগলা দ্বিরুক্ত শব্দ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। (মাছি) ভন্-ভন্, (ফোড়া) টন্-টন্ ইত্যাদিকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলিতেছি। এইরূপ শব্দের আলোচনা স্থান এ নহে। মোটা-মোটি বলিতে পারা যায়, ইহাদের অর্থ স্পষ্ট। ঝুলিতে এরূপ শব্দের ছড়া ছড়ি। জানি না, লেখক শব্দগুলি বিশিষ্ট লোকের মুখে শুনিয়াছেন, কি নিরক্ষর গ্রাম্য লোকের শিশুভাষা অনুকরণ করিয়াছেন। লেখক অনুপ্রাসের লোভে পড়িয়া কতকগুলিকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রশংসার বিষয়, অনেক স্থলে দ্বিরুক্ত শব্দ ঠিক বসিয়াছে। কিন্তু এক স্থানে দেখিতেছি ; 'মন ছন্-ছন (১০৫ পৃঃ), অন্য স্থানে সেই 'মন ছব্-ছব্' (১৩১ পৃঃ) ; অন্য স্থানে 'শ্বেত মাণিক ছব্-ছব্' (৮৭ পৃঃ), করিতেছে। যদি শ্বেত মাণিক ছব্-ছব্ করে,—ছবি-- দীপ্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে মন ছব্-ছব্ করিতে পারে না। হয় ত ছম্-ছম শব্দ কোথাও ছন্-ছন্, কোথাও কোথাও ছব্-ছব্ হইয়া পড়িয়াছে। 'ম' স্থানে 'ব' আসা আশ্চর্য্য নয়। ঝুলিতেই পাই, 'ভিটে বাতির নির্শ্বন' (২০৬ পৃঃ) ;—ইহা ভিটামাটির নিদর্শন বোধ হয়। ভয়ে গা ছম্-ছম করে ; ঘরও ছম্-ছম (১০৪ পৃঃ) করিতে পারে, কিন্তু শোনা যায় না। মনের চাংচল্য বুঝাইতে ছম্-ছম বলা যায় না। 'পুরী যেন দুধে ধোয়া—দব্দব্ ধব্-ধব্ করিতেছে' (৩০ পৃঃ)। ধব্-ধব যথেষ্ট ; উহার অপভ্রংশে দব্-দব্ আনিবার প্রয়োজন ছিল না। 'গজ-মোতির টল্-টলে আলো' (৬৮ পৃঃ) ; 'টুল্-টুলে চাঁপা' ফুল (৫০ পৃঃ), 'মুখখানি পাঁপড়ীর মধ্যে টুল-টুল্ করিতেছে' (৩২ পৃঃ), ইত্যাদি অনেক টল্-টল, টুল্-টুল্ আছে। ভারতচন্দ্র টলটল্ কলকল্ তরংগা লিখিয়া টল্-টল্ শব্দের ঠিক প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, গজ-মতির ঢল্-ঢলা বা ঢলঢলে আলো, তুল-তুলা চাঁপাফুল, এবং মুখখানি টল্-টল বা টুল্-টুল হইবে। বিড়াল গড়্-মড়্ করিয়া ইঁদুরকে ধরিয়া' (১৩৬ পৃঃ) ; 'অজিত ধড়্-মড়্ করিয়া উঠিয়া দেখে' (১০৪ পৃঃ)। ধড়্-মড়্ বরং বুঝিতে পারি, গড়্-মড় বুঝিলাম না। 'পচায়, গলায়, পুরী দগ্-দগ্, থক্-থক্' (১১৯ পৃঃ),—দ্বিরুক্ত শব্দদ্বয়ের অপ-প্রয়োগ। 'কড়্-কড়া ভাত' বুঝি, কিন্তু 'সড়-সড়া চাল' (চা'ল) (৫৪ পৃঃ) বুঝি না ; ডরে লোককে থর-থর করিয়া কাঁপিতে দেখি, কিন্তু 'ঠি-ঠি' (২১৩ পৃঃ) করিতে দেখি না ; ঝাঁ ঝাঁ রোদ জানি, 'ঠা ঠা রৌদ্র' (২১০ পৃঃ) জানি না। 'দেশে দেশে বিস্তার টি টি পড়িয়া গেল' (১৯৬ পৃঃ)—নিন্দাপ্রচার না হইলে টি টি (ধিক্ ধিক্) বলা যায় না।

কতকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিলাম না। "রাণীর পা উছল, চোক উখর (১০৫ পৃঃ); 'চিড়িক দিয়া ঘরে চমক জ্বলিয়া উঠিল' (১৩১ পৃঃ); 'হাপুস নয়ন' (১৭২ পৃঃ) ; 'তুলাটুক তেনিয়া যায়' (১৮৩ পৃঃ) ; 'খোনা, খুস্তি, পোলো, থোলো' (২১২ পৃঃ) ইত্যাদি। 'কাঠুরে' বউ তো ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল' (২০৯ পৃঃ)। ভারত-চন্দ্রে পাই, 'ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে।' কিন্তু ডুকরিয়া কাঁদা কি কহা কি রকম, তাহা জানি না। পাখী-পাখালী আছে, কিন্তু তেমনই গাছ গাছালী (৯১ পৃঃ) না বলিয়া গাছ-গাছড়া বলা যায়। কোন কোন স্থানে গাছ-গাছালী আছে বটে, কিন্তু বোধ হয় গাছ-গাছড়া ভাল। পাখা আছে যার, তাহা পাখালী ; পাখী-পাখালী — পাখী এবং পাখীর ন্যায় প্রাণী বা পাখী। এই হেতু পাখী-পাখালী বহুত্বজ্ঞাপক। ঝুলির লেখক পাখ (পাখা), মাথে (মাথায়), ডাঁট (ডাঁটা), ইত্যাদি শব্দের শেষের আ লোপ করিয়াছেন। 'পুরী নিভাঁজ নিঝুম' (৩০ পৃঃ)। নিঝ্ঝুম কিংবা নিঝুম বুঝি, কিন্তু ভংগশূন্য পুরী অনুমান করিতে পারি না। 'ডিমের খোলস' (১০৭ পৃঃ), 'লাউয়ের খোলস' (২১৪ পৃঃ), যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে খোলা শব্দ রাখিবার প্রয়োজন থাকে না। খোলার সদৃশ যাহা, তাহা খোলস। এক জায়গায় 'প্রিদীম' (প্রদীপ) দেখিলাম। বোধ হয় লেখক পিদিম বা পিদ্দিম শব্দকে শুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। প্র উচ্চারণ করিতে পারিলে শেষের প তে আটকায় না।

লেখক মিঠা কবিতা ও ছড়া লিখিতে পারেন। উৎসর্গে

'ফুলে ফুলে বয় হাওয়া ঘুমে ঘুমে চোখ ঢুলে,
কাজগুনো সব লুটুপুটি খায় আপন কথায় ভুলে।
এমন সময় খুটে' স্নুটে' এনে হাজার যুগের ধূলি
চাঁদের হাটের মাঝখানে,—মা!—ধুপুস্ করা ঝুলি!!

কবিতাটী লেখকের রচিত। তবে কাজ 'গুনো' কেন? গুনো শব্দ কলিকাতা ও নদীয়ার স্ত্রীলোকেরা বলে। লেখক ল অপেক্ষা নকারের অধিক পক্ষপাতী, এবং বাংগলা ল ধাতু তাড়াইয়া দিয়া সর্ব্বত্র নি ধাতু আনিয়াছেন। খুঁটিয়া-লুঠিয়া স্থানে খুঁটিয়া-স্নুটিয়া হইয়াছে। লুট-পটির স্থানে লুটু-পুটি গ্রাম্য বোধ হয়। 'ধুপুস করা ঝুলি'—ধুপস শব্দে ফেলা ঝুলি? 'হাজার যুগের ধূলি' ঝুলির ভিতরে, না বাহিরে?

আজকাল ঠাকুরমায়েরা উপকথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা এই বই পড়িয়া উপকথা শিখিতে পারিবেন। ঠাকুরমায়ের মুখে শিশু যাহা শুনিতে ভাল বাসে, যাহা শুনিলে বুঝিতে পারে, তাহা এই বহিতে পাইবে, এমন আশা করিতে পারি না। অন্ততঃ ছোট ছেলে মেয়েরা পাইবে না। ঝুলির ভাষা সরল বটে, কিন্তু গ্রাম্য শব্দ এত অধিক প্রবেশ না করাইলেও চলিত। শিশুরা সূক্ষ্ম উপমা বুঝিতে পারে না। 'চাঁদের হাট' যে তাহারা, একথা পাকা জেঠা ছেলে মেয়ে ছাড়া অন্যে বুঝিতে পারিবে না। বোধ হয় এই সব কারণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকার শেষে প্রস্তাব করিয়াছেন, 'বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্ব্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।'

অনেকে কিন্তু ঘরের ছেলেমেয়েদের হাতেই এই বইখানি দিতে চাহিবেন। ৺ লালবেহারী-দে মহাশয় ইংরেজীতে উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বাংগলায় কেহ লেখেন নাই। এই হেতু আশা করি এই বইখানি দ্বারা দেশের একটা অভাব পূরণ হইবে। লেখকের উৎসাহ ও ক্ষমতা আছে। ঠাকুমার ঝুলি 'স্বদেশী' বলিয়াই তাহা নিখুঁত দেখিতে [illegible]ই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
কটক।

প্রার্থনা।

ওগো!
এখনো পরাণ কেন,
সুখের হিল্লোলে দোলে,
হৃদয় চমকি উঠে,
দুঃখ কথা মনে হলে।

এখনো সুখের আশে,
বাসনা জাগিছে প্রাণে,
এখনো রয়েছে সাধ,
সংসারের ধনে মানে।

লোকের অপ্রিয় বাক্যে,
অবহেলা উপেক্ষায়,
এখনো অন্তর মাঝে,
ব্যথা কেন লাগে হায়?

এখনো শত্রুর প্রতি,
জিঘাংসা রয়েছে প্রাণে,
নিন্দায় বিরাগ আছে,
সন্তোষ প্রশংসা-গানে।

ধনীরে আদর আর,
দরিদ্রে উপেক্ষা হেন,
উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান,
এখনো রয়েছে কেন?

এখনো জনমে রোষ,
লোকে যদি কটু ভাষে,
ব্যথা লাগে প্রিয় জন,
যদি নাহি ভাল বাসে।

এখনো রয়েছে মম,
আত্ম পর ভেদ জ্ঞান,
সুখে গর্ব্ব—দুঃখে ক্লেশ,
দানে চাহি প্রতিদান।

মনের বিকার এই,
সকলি ঘুচিবে যবে,
বলেছিলে, তব সাথে,
তখন মিলন হবে।

ধ্যানে, জ্ঞানে, নিদ্রা স্বপ্নে,
বিশ্বময় একাকার,
যবে দেখিবে না আঁখি,
তোমা বিনা কিছু আর;

তখনি আমার হবে,
বলেছিলে, প্রিয়তম !
সে অবধি দীর্ঘ কাল,
সাধনা করিছে মন ;

এখনো হয়নি সিদ্ধি,
পূরে নাই মনস্কাম,
দিনে দিনে শক্তিহীন,
ক্ষুদ্র দুরবল প্রাণ।

বাসনা বিফল হবে,
শুধু আশা মাত্র সার,
এ রূপে কি যাবে দিন ?
দেখা কি দিবে না আর ?

জ্ঞান দিয়ে শক্তি দিয়ে,
হে দেব ! সহায় হও,
পদসেবা যোগ্য করি,
হাত ধরে তুলে লও।

"হিন্দু বিধবা।"

ধূপ।

ওহে ধূপ, কোন্ উগ্র তপস্যার ফলে
শিখিলে এ আত্মত্যাগ সংযম অটল,
কোন মহাতীর্থে, কোন সাগরের জলে
ভাসাইলে স্বার্থরাশি সাধিতে মঙ্গল ?
কোন দধিচির কাছে মন্ত্রশিষ্য হয়ে,
ধরিলে এ মহাব্রত ? হে ক্ষুদ্র মহান্ ;
কোন্ নবদ্বীপ ধামে পুণ্য ভেক্ লয়ে
বিশ্বে বিলাইয়া দিলে আপন পরাণ ?
শিখিয়াছ কোন্ হিন্দু বিধবার কাছে,
পোড়াইতে দেবোদ্দেশে তনু আপনার ?
ওহে আত্মভোলা, আর মনে কিহে আছে
আপনারে দিলে কবে করিয়া সবার ?
হে সংযমী, হে বৈষ্ণব, ওহে দেবপ্রিয়,
তব আত্মত্যাগকণা মোরে শিখাইয়ো।

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক, বি,এ,।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা।

১। হেমেন্দ্রলাল—শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৮৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য এক টাকা বারো আনা। এখানি উপন্যাস। ইহাতে ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে, কিন্তু গ্রন্থকার সর্ব্বত্র ইতিহাস সম্পূর্ণ মানিয়া চলেন নাই, তাহা তিনি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব ইহাকে শুধু উপন্যাস হিসাবে বিচার করিতে হইবে। অল্প দিনেই ভবানী বাবু উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন ; তাঁহার এই উপন্যাস তাঁহার যশোবৃদ্ধির সহায় হইবে। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। কবিত্বময় ভাষায় প্রাচীন বঙ্গের একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গের নবাবি দরবার, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহার একটি চমৎকার চিত্র পাঠকের চিত্তের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তখনকার কালের দরবারি মজলিস, বিলাসিতা খামখেয়াল ষড়যন্ত্র পর্দ্দায় পর্দ্দায় উদ্ঘাটিত হইয়া পতাকাবৎ হইয়াছে ; প্রাচীন কালের যুবকদিগের সঙ্গীতানুরাগ ও বলচর্চ্চা, একান্নবর্ত্তী পরিবারের শৃঙ্খলা, বধূর সলজ্জ সরল ব্যবহার ও বিরক্তিহীন বশ্যতা, সমাজে ভদ্র ইতরের একতা ও অকপট সখ্য, হিন্দু মুসলমানে প্রগাঢ় প্রীতি পরম মনোরম চিত্রপরম্পরায় অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার চরিত্রগুলিও সজীব - তাহাদের প্রাণস্পন্দন, পাঠক পদে পদে অনুভব করিবেন। রায় মহাশয় ও খাঁ সাহেব, হেমেন্দ্রলাল ও রামমোহন, মহামায়া ও কল্যাণী, লক্ষ্মী ও সুরত, পিয়ার ও পান্না, সিরাজ ও ফৈজী- সকলেই নিজের নিজের দিক দিয়া পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়াছে। খাঁ সাহেবের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্নেহ, হেমেন্দ্রলালের নিষ্ঠা ও চরিত্র-বল, নির্বোধ ও বলবান রামমোহনের সরল বিশ্বাস ও সাহস, মহামায়ার বাৎসল্য, লক্ষ্মীর অনাবিল নীরব প্রীতি, ফৈজীর নারীত্বের প্রকাশ ও বাসনার সহিত দুর্বার সংগ্রাম, আর সর্ব্বোপরি বালিকা সুরতের অনাঘ্রাত যূথীটির মত সৌরভভরা নিষ্কলঙ্ক প্রাণ ও দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পরম পবিত্রতা— চক্ষের সমক্ষে আনন্দ-অমরা সৃষ্টি করে। ফৈজীর করুণ অবসান, সুরত বিবির করুণ বিদায় ও প্রবাসী হিমুরায়ের আপনার স্নেহরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের কারুণ্য চিত্তকে বেদনাতুর করিয়া তুলে, নির্ম্মল প্রেমের পূজার জন্য সহৃদয় পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ করে। হায় আমাদের সেই প্রাচীন সমাজ। বলে দৃপ্ত, উদারতায় অপরিমেয়, সখ্যে প্রগাঢ়, ধর্ম্মে নিষ্ঠান্বিত, আবার আমুক সিরিয়া, আমুক হিন্দু মুসলমান, ইতর ভদ্রের মধ্যে তেমনি করিয়া সখ্য ঐক্যের রাখী বাঁধিয়া দিক।

এমন সুন্দর বইখানির বর্ণাশুদ্ধি বড় অন্যায় রকমের হইয়াছে পুস্তকের মধ্যে হিমুরায়ের দৌত্য-সম্বন্ধীয় দুইটি পরিচ্ছেদ আখ্যায়িকার একটু লাঘিকতা ভঙ্গ করিয়াছে। এই দুই পরিচ্ছেদে ইতিহাসের বিবৃতি একটু দীর্ঘ হইয়াছে।

২। ছেলেদের রামায়ণ শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশেষরূপে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা ; উৎকৃষ্ট সংস্করণ বারো আনা। এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য পুস্তকের অন্যতম। ইহাতে সরল সুন্দর ভাবে, শিশুবোধ্য সরস ভাষায় রামায়ণের মূল আখ্যায়িকাটি বিবৃত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে শিশুর কোমল মনের উপর রামায়ণের সুনীতি সকল মুদ্রিত করিয়া দিবার কৌশল আছে। ইহা শিশুদিগকে রামায়ণের আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত করিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে অনেকগুলি কলাসঙ্গত সুচিত্রিত ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একখানি রঙীন। এই পুস্তক আবালবৃদ্ধবনিতার সুখপাঠ্য ও সুখদৃশ্য হইয়াছে। মূল্য যথাসম্ভব অল্পই রাখা হইয়াছে। আমাদের বালকবালিকাগণ কুশিক্ষার ফলে রামচরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমাদের দেশের এমন একটি বিরাট মহান চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যথিত চিত্তে উপায় চিন্তা করিয়াছি। উপেন্দ্রবাবুর এই প্রয়াস আমাদের চিত্তক্ষোভ নিবারণ করিবে আশা করি। ইহা সকল শিশুর সহচর হোক, ইহা হইতে শিশুরা আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ করিবে।

৩। উচ্ছ্বাস—শ্রীগৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তি কাব্যরত্ন প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ৩৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে তিনটি উচ্ছ্বাস আছে—(১) জাহ্নবী তীরে; (২) উর্ণনাভ; ও (৩) অস্ফুট স্মৃতি। কবিত্ব ও দার্শনিকতার একত্র সম্মিলন। যে জাহ্নবী মহাতাপস হিমালয়ের হৃদয়-নিঃসৃত প্রেমপ্রবাহ, যাঁহার তীরে তীরে মুগ্ধ মনস্বিগণ "কত জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী" প্রচার করিয়াছেন, যাঁহার তীরে তীরে কত জনপদ শস্য স্বাস্থ্য সম্পদে পূর্ণ ছিল, সেই জাহ্নবী শুধু জড় নহেন, তিনি চিন্ময়ী, তিনি চিন্ময় পুরুষের পবিত্র আশীর্ব্বাদ। জড়বাদী ভিন্ন ইহা কে অস্বীকার করিবে? কবির এই স্মৃতি প্রথম উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উর্ণনাভকে জাল পাতিতে দেখিয়া দার্শনিকের সংসারজালের সাদৃশ্য মনে আসিল, তাহাই দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের বিষয়। মানুষ ভুলিয়া যায়, "বস্তু তাহার লক্ষ্য নহে, কিন্তু বস্তুমধ্যগত সৌন্দর্য্যই তাহার লক্ষ্য"। একদিন ত' মানুষেই এই অমৃত বাণী ঘোষণা করিয়াছিল "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্"? আবার কবে মানুষ সেই অমৃতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতিধ্বনি করিয়া লেখক বলিতেছেন, আমরা যত শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হই, তত আমরা অমরা ও আনন্দ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকি। শৈশবে বিশ্বের মধ্যে এক ও একের মধ্যে বিশ্ব দেখিতে পাইয়া কি আনন্দ! আর বয়সে বিশ্ব ভুলিয়া, ক্ষুদ্রত্বে মজিয়া কি দুর্নিবার দুঃখ! মাঝে মাঝে একের দেখা পাই বটে, কিন্তু আগের মত চিরদিন কেন পাই না? স্মৃতি অস্ফুট, পরিস্ফুট রহে কেমন করিয়া, ইহা বহু ধর্ম্ম মীমাংসার ভার লইয়াছে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু সেই বিবদমান সিদ্ধান্তের সমন্বয় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে হায় কয়জন? পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কেবল লেখকের সংসারের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখবাদ আমাদের ভালো লাগে নাই। স্বাস্থ্যের পাশে রোগ, প্রেমের পাশে কলহ, স্বাচ্ছন্দ্যের পাশে অভাব কত অল্প! তাহা ত' শুধু মঙ্গলময়ের কল্যাণকরুণা সুস্পষ্ট করিবার উপায় মাত্র। যে ব্যক্তি চিত্রের মূল বিষয় ছাড়িয়া তাহার পারিপার্শিকটাকেই বড় করিয়া দেখে, সে বঞ্চিত, সে সমঝদার নহে।

৪। হুঙ্কার- শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি, বাংলার জল" সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব, চিন্তা ও দেশপ্রীতি আছে। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও যুগান্তরসম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। চাষার গান দুটি বেশ হইয়াছে; চাষার ভাষায় চাষার প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই তাহারা শীঘ্র উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।

৫। প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি—"আসাম প্রবাসী" প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি, ১৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। আসামে অবস্থান সময়ে গ্রন্থকার অসমীয়াদিগের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহারই সমষ্টি এই পুস্তক। পুস্তক বহু পুরাতন, ১৩০১ সালে ছাপা। আমরা নূতন করিয়া সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এই পুস্তকে আসাম দেশের প্রাকৃতিক ও নরনারী-সমাজের, সামাজিক পর্ব্ব ও ভাষা প্রভৃতির তত্ত্ব এবং পরিশিষ্ট দিনলিপিতে মণিপুর যুদ্ধের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানিতে ত্রুটি মানব-তত্ত্বের এক কোণ একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হই । মানবতত্ত্ব মানবের নিকট চির কৌতুককর, বইখানি এজন্য কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। প্রবাসী য়ুরোপীয়গণ যে দেশে যে জাতির মধ্যে থাকেন, প্রচুর গবেষণায় তাহার এত তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন যে দেশবাসীদিগের অনেকের নিকটেই অনেকাংশে নূতন হয়। বক্ষ্যমান পুস্তক তদ্রূপ না হইলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ।

৬। হোমিওপ্যাথি মতে গৃহচিকিৎসা—ডাক্তার ৺ জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত। রয়াল ১৬ পেজি ২৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ের বাঁধাই বারো আনা। এই পুস্তকের ইহা ষষ্ঠ সংস্করণ, অতএব ইহার গুণব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্ত ও বৈজ্ঞানিকত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষার স্থূল স্থূল নিয়ম, ঔষধের ক্রম ও মাত্রা নির্দ্দেশ প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণানুক্রমে রোগ সাজাইয়া তাহার নিদান ও চিকিৎসা সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আকস্মিক অসুখের চিকিৎসাবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঔষধ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য প্রধান কয়েকটি ঔষধের সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টটিও পাঠকের সাহায্যকারী হইয়াছে। অল্পমূল্যের গৃহ-চিকিৎসার পুস্তকের মধ্যে ইহা অন্যতম উপাদেয় পুস্তক। ইহা গৃহস্থের বন্ধুর মত সহচর হইবার যোগ্য।

মুদ্রা-রাক্ষস।

চিত্র-পরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম চিত্র "বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ," ইহা যোশিও কাৎসুতা নামক জাপানী চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। বুদ্ধদেবের মুখে শান্ত বিষাদ-পূর্ণভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ব্রতের তুলনায় সংসারের সমুদয় বস্তু যেমন তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল, চিত্রেও তেমনি তাঁহার মূর্ত্তিরই প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আমরা পাঁচ খানি উড়িষ্যার ছবি দিলাম। ইহার ফোটগ্রাফগুলি অনেক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কোন দেশকে জানিতে হইলে তাহার পুরাতত্ত্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা উভয়ই জানা দরকার। প্রাচীন মন্দিরাদির চিত্র পুরাতত্ত্ব জানিবার পক্ষে সহায়তা করে। বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে হইলে সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-প্রণালী জানা দরকার। তজ্জন্য "উড়িষ্যার ঢেঁকিতে ধান ভানা"র মত ছবি ও তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু, এরূপ চিত্র দ্বারা সামান্য ভাষাভেদ সত্ত্বেও ভারতের কোন কোন প্রদেশের একত্ব প্রতিপাদিত হয়। কারণ তত্তৎপ্রদেশে মানুষের জীবন মূলতঃ এক। ধান-ভানার ফোটোটি ১৬ বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত।

বিন্দুসাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৩০০ এবং ৭০০ ফুট। পদ্মপুরাণের মতে সকল তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করা হইয়াছিল বলিয়া, মহর্ষিগণ ইহার নাম বিন্দু-সাগর রাখিয়াছিলেন।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাবক্রমুনি জনকরাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

" নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৫। | ৪র্থ সংখ্যা।

গোরা।

২৮

গোরা যখন ভ্রমণে বাহির হইল তখন তাহার সঙ্গে অবিনাশ, মতিলাল, বসন্ত এবং রমাপতি এই চারজন সঙ্গী ছিল। কিন্তু গোরার নির্দ্দয় উৎসাহের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিতে পারিলনা। অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের ছুতা করিয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। নিতান্তই গোরার প্রতি ভক্তি বশত মতিলাল ও রমাপতি তাহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিলনা। কিন্তু তাহাদের কষ্টের সীমা ছিলনা; কারণ, গোরা চলিয়াও শ্রান্ত হয় না আবার কোথাও স্থির হইয়া বাস করিতেও তাহার বিরক্তি নাই। গ্রামের যে কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহারের যতই অসুবিধা হোক দিনের পর দিন কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের লোক তাহার চারিদিকে সমাগত হইত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

ভদ্রসমাজ, শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের [illegible] যে কিরূপ [illegible] তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সঙ্কীর্ণ, কত দুর্ব্বল, সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত, পৃথিবীর বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত, তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড় করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন, তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ, তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা করিতে পারিতনা। গোরা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল—এত বড় একটা সঙ্কটেও সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি, কান্নাকাটি করিতে লাগিল কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকটে জলাশয় ছিল না; মেয়েরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায়; অথচ প্রতিদিনেরই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য ঘরে একটা স্বল্পব্যয়ে

কূপ খনন করিয়া রাখে সঙ্গতিপন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্ব্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে, তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুদ্যম হইয়া আছে, নিকটে কোনো প্রকার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোনোরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের অভাবের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে গোরার কাছে আশ্চর্য্য এই লাগিল যে, মতিলাল ও রমাপতি এই সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না--বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিত। ছোটলোকরাত এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না; ছোটলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা, জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড—এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

মতিলাল বাড়ি হইতে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে বলিয়া বিদায় লইল; গোরার সঙ্গে কেবল রমাপতি অবশিষ্ট রহিল।

উভয়ে চলিতে চলিতে একজায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সেত ব্যাকুল হইয়া উঠি । গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করিতে সে কহিল, "ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাৎ নেই।"

তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে—বিস্তীর্ণ বালুচর, নদী বহুদূর। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল,—"হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?"

নাপিতের ঘরে একটা কাঁচা কূপ আছে—কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সে কূপ হইতে রমাপতি জল খাইতে না পারিয়া মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলের কি মা বাপ নেই?"

নাপিত কহিল, "দুই আছে, কিন্তু না থাকারই মত।"

গোরা কহিল, "সে কি রকম?"

নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই:—

যে জমিদারীতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমী লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে কেবল এই চর ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান, এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দ্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষ্যে দুই বার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয় কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরোধান পাইয়াছিল, —আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুট করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দ্দার সাহেবের ডানহাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিষের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মত লাগিয়াছে;—প্রজাদের কাহারো ঘরে কিছুই রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জৎ আর থাকে না; ফরুসর্দ্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতকা হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন; এমন কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছিল যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালকপুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসী বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে

পায়না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশদেড়েক তফাতে আছে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে; তদন্ত উপলক্ষ্যে গ্রামে যে কখন আসে এবং কি করে তাহার ঠিকানা নাই। গত কল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে "বেটা ত জোয়ান কম নয়, দেখেচ বেটার বুকের ছাতি"— বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন একটা খোচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। পূর্ব্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতর উপদ্রব করিতে সহসা সাহস করিত না কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ মাত্রই হয় গ্রেফ্তার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ্য করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।

গোরা ত উঠিতে চায় না, ওদিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে। সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে?

নাপিত কহিল—"ক্রোশ দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি আছে, তাহার তহশিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব-চাটুয্যে।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল—"স্বভাবটা?"

নাপিত কহিল "যমদূত বল্লেই হয়। এত বড় নির্দ্দয় অথচ কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। এই যে ক'দিন দারোগাকে ঘরে পুষ্‌চে, তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে—তাতে কিছু মুনফাও থাকবে।"

রমাপতি কহিল—"গৌর বাবু চলুন, আর ত পারা যায় না।" বিশেষত নাপিতবৌ যখন মুসলমান ছেলেটিকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।

গোরা যাইবার সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিকে আছ? আর কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই?"

নাপিত কহিল—"অনেক দিন আছি এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না। আজ এ পাড়ায় পুরুষ বলতে আর বড় কেউ নেই, আমি যদি যাই তা'হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া করে আবার আমি আসব?"

দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটিয়া গেল। বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায় ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইলেই যে ভাল হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে এবং ঘটিতেই বাধ্য এবং ইহারাই সে জন্য প্রধানত দোষী এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিট্‌মাট্ করিয়া লইলেইত হয়, ফেসাদ্ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়? বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।

মধ্যাহ্নরৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি কথাও বলিল না। অবশেষে গাছপালার ভিতর হইতে কাছারিবাড়ির চালা যখন কিছু-দূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোরা আসিয়া কহিল, "রমাপতি তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চল্লুম।"

রমাপতি কহিল, "সে কি কথা? আপনি খাবেন না? চাটুজ্জের ওখানে খাওয়াদাওয়া করে তার পরে যাবেন।"

গোরা কহিল, "আমার কর্ত্তব্য আমি করব এখন। তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যেয়ো—ঐ ঘোষপুর চরে আমাকে বোধ হয় কিছু দিন থেকে যেতে হবে—তুমি সে পারবে না।"

রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোরার মত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ঐ ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পান ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়াছে তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় নহে, এক এক মুহূর্ত্ত তাহার কাছে এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; গোরার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের জন্য তাহাকে অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধবচাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে এ কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে কহিল পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা একি ভয়ঙ্কর অধর্ম্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হোক্ এই আচার বিচারের ভাল মন্দের কথা পরে ভাবিব কিন্তু এখন ত পারিলাম না।

নাপিত গোরাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গোরা প্রথমে আসিয়া নাপিতের ঘটী নিজের হাতে ভাল করিয়া মাজিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইল এবং কহিল ঘরে যদি কিছু চাল ডাল থাকে ত দাও আমি রাঁধিয়া খাইব। নাপিত ব্যস্ত হইয়া রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিল। গোরা আহার সারিয়া কহিল, "আমি তোমার এখানে দু'চার দিন থাকব।"

নাপিত ভয় পাইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল—"আপনি এই অধমের এখানে থাক্‌বেন তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু দেখুন আমাদের উপরে পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, আপনি থাক্‌লে কি ফেসাদ্ ঘট্‌বে তা ত বলা যায় না।"

গোরা কহিল, "আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিস কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

নাপিত কহিল—"দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাক্‌বে না। ও বেটারা ভাব্‌বে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে দিয়েছি। এত দিন কোনো প্রকারে টি্ঁকে ছিলুম, আর টি্ঁক্‌তে পারব না। আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠ্‌তে হয় তাহলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।"

গোরা চিরদিন সহরে থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে, নাপিত কেন যে এত ভয় পাইতেছে তাহা তাহার পক্ষে বুঝিতে পারাই শক্ত। সে জানিত ন্যায়ের পক্ষে জোর করিয়া দাঁড়াইলেই অন্যায়ের প্রতিকার হয়। বিপন্ন গ্রামকে অসহায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সম্মত হইল না। তখন নাপিত তাহার পায়ে ধরিয়া কহিল, "দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পুণ্যবলে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন, আপনাকে যেতে বল্‌চি এতে আমার অপরাধ হচ্চে। কিন্তু আমাদের প্রতি আপনার দয়া আছে জেনেই বল্‌চি, আপনি আমার এই বাড়িতে বসে পুলিসের অত্যাচারে যদি কোনো বাধা দেন তাহলে আমাকে বড়ই বিপদে ফেল্‌বেন।"

নাপিতের এই ভয়কে অমূলক কাপুরুষতা মনে করিয়া গোরা কিছু বিরক্ত হইয়াই অপরাহ্ণে তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। এই ম্লেচ্ছাচারীর ঘরে আহারাদি করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা অপ্রসন্নতাও জন্মিতে লাগিল। ক্লান্ত শরীরে এবং উত্যক্তচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে সে নীলকুঠির কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহার

সারিয়া রমাপতি কলিকাতায় রওনা হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই, তাই সেখানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না। মাধবচাটুজ্জে বিশেষ খাতির করিয়া গোরাকে আতিথ্যে আহ্বান করিল। গোরা একেবারেই আগুন হইয়া উঠিয়া কহিল, "আপনার এখানে আমি জলগ্রহণও করব না।"

মাধব বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গোরা তাহাকে অন্যায়কারী অত্যাচারী বলিয়া কটূক্তি করিল, এবং আসন গ্রহণ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা তক্তপোষে বসিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানিতেছিল। সে খাড়া হইয়া বসিল এবং রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেহে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?"

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া কহিল, "তুমি দারোগা বুঝি? তুমি ঘোষপুরের চরে যে সমস্ত উৎপাত করেছ আমি তার সমস্ত খবর নিয়েছি। এখনো যদি সাবধান না হও তাহলে—"

দারোগা। ফাঁসি দেবে না কি? তাইত লোকটা কম নয়ত দেখ্‌চি! ভেবেছিলেম ভিক্ষা নিতে এসেছে, এযে চোখ রাঙায়! ওরে তেওয়ারি!

মাধব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দারোগার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আরে কর কি, ভদ্রলোক, অপমান কোরো না।"

দারোগা গরম হইয়া কহিল, "কিসের ভদ্রলোক! উনি যে তোমাকে যাখুসি তাই বল্লেন, সেটা বুঝি অপমান নয়?"

মাধব কহিল—"যা বলেচেন সে ত মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চল্‌বে কি করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর ত কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বল্লে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে ত জানা কথা। কি করবে, তাকে ত খেতে হবে।"

বিনা প্রয়োজনে মাধবকে রাগ প্রকাশ করিতে কেহ কোনো দিন দেখে নাই। কোন্ মানুষের দ্বারা কখন্ কি কাজ পাওয়া যায়, অথবা বক্র হইলে কাহার দ্বারা কি অপকার হইতে পারে তাহা বলা যায় কি? কাহারো অনিষ্ট বা অপমান সে খুব হিসাব করিয়াই করিত—রাগ করিয়া পরকে আঘাত করিবার ক্ষমতার বাজে খরচ করিত না।

দারোগা তখন গোরাকে কহিল—"দেখ বাপু, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি—এতে যদি কোনো কথা বল বা গোলমাল কর তাহলে মুস্কিলে পড়বে!"

গোরা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল—"মশায়, যা বলেচেন সে কথাটা ঠিক—আমাদের এ কসাইয়ের কাজ—আর ঐ যে বেটা দারোগা দেখ্‌চেন ওর সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌লে পাপ হয়—ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারিনি। আর বেশি দিন নয়—বছর দুতিন কাজ করলেই মেয়ে কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে স্ত্রী পুরুষে কাশীবাসী হব। আর ভাল লাগে না মশায়, এক এক সময় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। যা হোক, আজ রাত্রে যাবেন কোথায়? এইখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্যে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।"

গোরার ক্ষুধা সাধারণের অপেক্ষা অধিক—আজ প্রাতে ভাল করিয়া খাওয়াও হয় নাই—কিন্তু তাহার সর্ব্ব শরীর যেন জ্বলিতেছিল—সে কোনো মতেই এখানে থাকিতে পারিল না—কহিল "আমার বিশেষ কাজ আছে।"

মাধব কহিল—"তা বসুন্ একটা লণ্ঠন সঙ্গে দিই।"

গোরা তাহার কোনো জবাব না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মাধব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, ওলোকটা সদরে গেল। এই বেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা লোক পাঠাও।"

দারোগা কহিল—"কেন, কি করতে হবে?"

মাধব কহিল—"আর কিছু নয়, একবার কেবল জানিয়ে আসুক্ একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্চে।"

২৯

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্রাউন্‌লো সাহেব দিবাবসানে নদীর ধারের রাস্তায় পদব্রজে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে হারানবাবু রহিয়াছেন।

কিছু দূরে গাড়িতে তাঁহার মেম পরেশবাবুর মেয়েদের লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।

ব্রাউন্‌লো সাহেব গার্ডন্ পার্টিতে মাঝে মাঝে বাঙালী ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিতেন। জিলার এণ্ট্রেন্স স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষ্যে তিনিই সভাপতির কাজ করিতেন। কোনো সম্পন্ন লোকের বাড়িতে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি গৃহকর্ত্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন। এমন কি, যাত্রাগানের মজলিষে আহূত হইয়া তিনি একটা বড় কেদারায় বসিয়া কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্যসহকারে গান শুনিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আদালতের গভর্মেণ্ট-প্লীডারের বাড়িতে গত পূজার দিন যাত্রা দেখিয়া, যে দুই ছোকরা ভিস্তি ও মেথরাণী সাজিয়াছিল, তাহাদের অভিনয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে একাধিকবার তাহাদের অংশ তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার স্ত্রী মিশনরির কন্যা ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে মাঝে মাঝে মিশনরি মেয়েদের চা-পান সভা বসিত। জেলায় তিনি একটি মেয়ে ইস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সেই স্কুলে ছাত্রীর অভাব না হয় সে জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পরেশবাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষার চর্চ্চা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন; দূরে থাকিলেও মাঝে মাঝে চিঠি পত্র চালাইতেন ও ক্রিষ্টমাসের সময় তাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইতেন।

মেলা বসিয়াছে। তদুপলক্ষ্যে হারানবাবু, সুধীর ও বিনয়ের সঙ্গে বরদাসুন্দরী ও মেয়েরা সকলেই আসিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। পরেশবাবু এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে কোনোমতেই থাকিতে পারেন না এই জন্য তিনি একলা কলিকাতাতেই রহিয়া গিয়াছে ।। সুচরিতা তাঁহার সঙ্গরক্ষার জন্য তাঁহার কাছে থাকি অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পরেশ, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে কর্ত্তব্যপালনের জন্য, সুচরিতাকে বিশেষ উপদেশ দিয়াই পাঠাইয়া দিলেন। আগামী পরশ্ব কমিশনার সাহেব ও সস্ত্রীক ছোট লাটের সম্মুখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে ডিনারের পরে ঈভ্‌নিং পার্টিতে পরেশবাবুর মেয়েদের দ্বারা অভিনয় আবৃত্তি প্রভৃতি হইবার কথা স্থির হইয়াছে—সে জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অনেক ইংরেজ বন্ধু জেলা ও কলিকাতা হইতে আহূত হইয়াছেন। কয়েকজন বাছা বাছা বাঙালী ভদ্রলোকেরও উপস্থিত হইবার আয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য বাগানে একটি তাঁবুতে ব্রাহ্মণ পাচক কর্ত্তৃক প্রস্তুত জলযোগেরও ব্যবস্থা হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

হারানবাবু অতি অল্পকালের মধ্যেই উচ্চভাবের আলাপে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে হারানবাবুর অসামান্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে তিনি অল্প একটু মাত্র বাধা কেন রাখিয়াছেন এই প্রশ্নও হারানবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আজ অপরাহ্ণে নদীতীরের পথে হারানবাবুর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী ও হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় গোরা "গুড্ ঈভ্‌নিং স্যর" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাল সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে যে সাহেবের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইতে গেলে তাঁহার পেয়াদার মাশুল জোগাইতে হয়। এরূপ দণ্ড ও অপমান স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া আজ সাহেবের হাওয়া খাইবার অবকাশে সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। এই সাক্ষাৎকালে হারানবাবু ও গোরা, উভয় পক্ষ হইতেই পরিচয়ের কোনো লক্ষণ প্রকাশ হইল না।

লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মোটা, মজবুৎ মানুষ তিনি বাংলা দেশে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালীর মত নহে। গায়ে একখানা খাকী রঙের পাঞ্জাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, চাদর খানাকে মাথায় পাগ্‌ড়ির মত বাঁধিয়াছে।

গোরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কহিল—"আমি চর ঘোষপুর হইতে আসিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট একপ্রকার বিস্ময়সূচক শিষ্ দিলেন। ঘোষ-

পুরের তদন্ত কার্য্যে একজন বিদেশী বাধা দিতে আসিয়াছে সে সংবাদ তিনি গত কল্যই পাইয়াছিলেন। তবে এই লোকটাই সে! গোরাকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ ভাবে একবার নিরীক্ষণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ জাত?"

গোরা কহিল, "আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ।"

সাহেব কহিলেন, "ও! খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার যোগ আছে বুঝি?"

গোরা কহিল—"না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "তবে ঘোষপুর চরে তুমি কি করতে এসেছ?"

গোরা কহিল, "ভ্রমণ করতে করতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম—পুলিশের অত্যাচারে গ্রামের দুর্গতির চিহ্ন দেখে এবং আরো উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে জেনে প্রতিকারের জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"চর ঘোষপুরের লোক গুলো অত্যন্ত বদ্‌মায়েস সে কথা তুমি জান?"

গোরা কহিল,—"তারা বদ্‌মায়েস্ নয়, তারা নির্ভীক স্বাধীনচেতা—তারা অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট চটিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন নব্য বাঙালী ইতিহাসের পুঁথি পড়িয়া কতকগুলা বুলি শিখিয়াছে—Insufferable!

"এখানকার অবস্থা তুমি কিছুই জান না" বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গোরাকে খুব একটা ধমক দিলেন।

"আপনি এখানকার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক কম জানেন" গোরা মেঘমন্দ্র স্বরে জবাব করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি তুমি যদি ঘোষপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ কর তাহলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।"

গোরা কহিল—"আপনি যখন অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন্ না বলে মনস্থির করেছেন এবং গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে আপনার ধারণা যখন বদ্ধমূল, তখন আমার আর কোনো উপায় নেই—আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের মত গোরার দিকে ফিরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"কি! এত চড় স্পর্দ্ধা!"

গোরা দ্বিতীয় কোনো কথা না বলিয়া ধীরগমনে চলিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ কহিলেন, "হারানবাবু, আপনাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে?"

হারানবাবু কহিলেন, "লেখাপড়া তেমন গভীরভাবে হইতেছে না, বিশেষত দেশে আধ্যাত্মিক ও চারিত্র-নৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। ইংরেজি বিদ্যার যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা গ্রহণ করিবার অধিকার ইহাদের হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব যে ঈশ্বরের বিধান এই অকৃতজ্ঞরা এখনো তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না তাহার একমাত্র কারণ ইহারা কেবল পড়ামুখস্থ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মবোধ নিতান্তই অপরিণত।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ কহিলেন, "খৃষ্টকে স্বীকার না করিলে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মবোধ কখনই পূর্ণতালাভ করিবে না।"

হারানবাবু কহিলেন, "সে কথা এক হিসাবে সত্য।" এই বলিয়া খৃষ্টকে স্বীকার করা সম্বন্ধে একজন খৃষ্টানের সঙ্গে হারানবাবুর মতের কোন্ অংশে কতটুকু ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য তাহাই লইয়া হারানবাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সূক্ষ্মভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে এই কথাপ্রসঙ্গে এতই নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মেমসাহেব যখন পরেশবাবুর মেয়েদিগকে গাড়ি করিয়া ডাকবাংলায় পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে তাহার স্বামীকে কহিলেন, "হ্যারি, ঘরে ফিরিতে হইবে" তিনি চমকিয়া উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, "বাই জোভ্, আটটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট!" গাড়িতে উঠিবার সময় হারানবাবুর কর নিপীড়ন করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমার সন্ধ্যা খুব সুখে কাটিয়াছে।

হারানবাবু ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার আলাপের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। কিন্তু গোরার সহিত সাক্ষাতের কোনো উল্লেখমাত্র করিলেন না।

অদ্ভুত শক্তি।

"অদ্ভুত" শব্দের অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই অদ্ভুত। কোনও বিষয় "অদ্ভুত" হইলেই যে তাহা অমানুষিক হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে এরূপ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তদ্রূপ শক্তিকেও "অদ্ভুত শক্তি" বলা যাইতে পারে।

এইরূপ "অদ্ভুত শক্তি"ই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, আমি একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। কেহ কোনও "অদ্ভুত" বিষয়ের গল্প করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রোতৃবর্গ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয়, এই ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? না, ইহার বৃত্তান্ত কাহারও মুখে শুনিয়াছেন?" শ্রোতৃবর্গের পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন করা অতিশয় স্বাভাবিক। শোনা কথা, মূলতঃ সত্য হইলেও, মুখে মুখে এত রূপান্তরিত হইয়া পড়ে যে, সহজে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এই কারণে, শোনা কথা, দৃষ্ট বস্তুর বৃত্তান্তের ন্যায়, যথার্থ এবং অবিকৃত হইলেও, লোকের মনে সহসা প্রত্যয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

"অদ্ভুত শক্তি" সম্বন্ধে অদ্য আমি যাহা বলিব, তাহা আমি কাহারও মুখে শুনি নাই; তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং আমার ন্যায় আরও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আমার দেখার প্রণালীর মধ্যে কোনও দোষ ছিল না। পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে, আমার পিতাঠাকুর মহাশয় চক্ষুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার চক্ষুতে ছানি পড়িতেছিল; তাই ছানি কাটাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ছানি তখনও কাটাইবার উপযুক্ত হয় নাই বলি ডাক্তারেরা তখন তাহা কাটাইতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। অগত্যা, তিনি কলিকাতার বাসাতেই কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্রও কলিকাতার বাসাতে থাকিয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেছিল। চারুচন্দ্রের শ্বশুর কলিকাতায় থাকেন। চারুর শাশুড়ীর কোনও কঠিন পীড়া হওয়ায়, সে প্রায়ই শ্বশুর-বাড়ী যাইত। একদিন সে বাসায় আসিয়া আমার পিতাঠাকুর মহাশয়কে বলিল, "দাদামহাশয়, একটী সন্ন্যাসী আসিয়া আমার শাশুড়ীর চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসার গুণে, আমার শাশুড়ী অনেকটা ভাল আছেন। শুনিতেছি, তিনি অনেক লোকের চক্ষু-চিকিৎসা করিয়াও চক্ষু ভাল করিয়াছেন। আপনি কি একবার তাঁহাকে আপনার চক্ষু দেখাইবেন?" পিতাঠাকুর মহাশয় পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত হইলেও, আমি তাঁহাকে কোনও দিন সাধুসন্ন্যাসীর উপর আস্থাশূন্য হইতে দেখি নাই। সুতরাং তিনি চারুর কথা শুনিয়াই বলিলেন, "বেশ তো! তাঁহাকে একদিন এখানে নিয়ে এসো।"

আমি পার্শ্বস্থ গৃহে বসিয়া কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছিলাম। চারুর প্রস্তাব ও সেই প্রস্তাবে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সম্মতি-প্রকাশ, এই দুইটীই আমার কর্ণগোচর হইল। আমি বিরক্ত হইয়া চারুকে নিকটে ডাকিলাম এবং ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি ডাক্তারী পড়িতেছ; আর একটা হাতুড়ের দ্বারা বাবার চক্ষু-চিকিৎসা করাইতে চাও? চমৎকার তোমার বুদ্ধি!" চারু আমার ভর্ৎসনায় কিছু যেন অপ্রতিভ হইল। পরে সে বলিল, "সন্ন্যাসীটি নেহাৎ হাতুড়ে নয়। আমি শুনিয়াছি, তিনি অনেকের চক্ষু ভাল করিয়াছেন। দাদামহাশয় তাঁহার দ্বারা চক্ষু-চিকিৎসা নাই বা করাইলেন। তাঁহাকে একবার চক্ষু দেখাইতে দোষ কি?" আমি কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।"

পরদিন প্রাতে, চারুচন্দ্র সেই সন্ন্যাসীটিকে সঙ্গে লইয়া বাসায় উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার আকার প্রকার বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। তাঁহার পরিধানে একটী রক্তবর্ণের চেলী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; বামহস্তে পিত্তলের একটী কমণ্ডলু; দক্ষিণ হস্তে একটী দীর্ঘ ত্রিশূল। পদদ্বয়ে কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম)। মস্তকের কেশরাশি দীর্ঘ ও পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। কপালে সিন্দূরের কতিপয় উজ্জ্বল রেখা। মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুশোভিত।

তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসরের অনধিক বিবেচিত হইল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে ভীতি-ভক্তি-মিশ্রিত কেমন একটী ভাবের উদয় হইল।

পিতাঠাকুর মহাশয় এবং আমিও তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলাম। তিনি উপবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি বলিলেন "আমি পদ্মমধু ও ভীমসেনী কর্প্পূরের সহযোগে একটী অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে লাগাইতে দিই। তদ্দ্বারা অনেকের চক্ষুর উপকার হইয়াছে। আপনারও উপকার হইতে পারে। কিন্তু আপনার চক্ষু যে নিশ্চিত ভাল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আপনি ইচ্ছা করিলে, সেই অঞ্জন লাগাইতে পারেন।" পিতৃদেব ইতঃপূর্ব্বে পদ্মমধু ও ভীমসেনী কর্প্পূর ব্যবহার করিয়া কিছু উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসীর প্রস্তুত অঞ্জন ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন না। অঞ্জন প্রস্তুত করিতে যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসীর ত্রিশূলে কতিপয় স্বর্ণময় চক্ষু খচিত রহিয়াছে দেখিয়া, আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন "যাঁহাদের চক্ষু ভাল হইয়াছে, তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই ত্রিশূলের ফলকে স্বর্ণময় চক্ষু খচিত করিয়া দিয়াছেন।"

সন্ন্যাসীঠাকুর তামাক খাইতে খাইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে ইহার পূর্ব্বে যেন আর কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি কি কখনও মেদিনীপুরে ছিলেন?"

পিতৃদেব বলিলেন, "মেদিনীপুরে ছিলাম বটে; কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা! প্রায় ২৭।২৮ বৎসর হইবে। আমি সেখানে স্কুলের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার ছিলাম।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "ঠিক্ কথা! আপনার নাম কি হরিবাবু? আপনি প্রত্যহই হেড্মাষ্টার গঙ্গাধর বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। আমি তখন তাঁহারই বাসাতে থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সে অনেক দিনের কথা বটে। কিন্তু আপনার চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

পিতাঠাকুর মহাশয় তখন আনন্দিত হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সেই কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিলাম যে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম দুর্গাচরণ ছিল এবং তিনি প্রথম যৌবনেই সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও সহিত তাঁহার কিরূপ দূর আত্মীয়তা ছিল, ইত্যাদি।

এইরূপ আলাপ পরিচয়ের পর, সন্ন্যাসী ঠাকুর দুই তিন দিন অন্তর পিতৃদেবকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। এস্থলে আমি বলা কর্ত্তব্য মনে করি যে, তিনি অর্থের প্রতি কোনও দিন কোনও লোভ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ের ন্যায় মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় আসিতেন এবং পিতৃদেবের সহিত কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

একদিন পিতৃদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কলিকাতায় অনেক দিন রহিয়াছি। মনে করিতেছি, আগামী পরশ্ব বাড়ী যাইব।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনি এত শীঘ্রই বাড়ী যাইবেন? আচ্ছা যদি যান, তাহা হইলে সেখানেও এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। এবং ঔষধ ব্যবহার করিয়া কেমন থাকেন, তাহা আমাকে জানাইবেন।" কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, একদিন আপনাদের বাসায় মা'র পূজা করিব। কিন্তু আপনি চলিয়া যাইতেছেন। আগামী কল্য শনিবার। বেশ দিন। যদি বলেন তাহা হইলে কালই মা'র পূজা করি।"

পিতৃদেব চিরকালই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু। সুতরাং তিনি মা'র পূজায় অমত করিবেন কি রূপে? তথাপি বোধ হয়, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিয়া, তিনি আমাকে আহ্বান করিলেন।

আমি পার্শ্বের গৃহ হইতে পিতৃদেব ও সন্ন্যাসীঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। পিতৃদেবের আহ্বান শুনিয়াই আমি তাঁহার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সন্ন্যাসীঠাকুরের প্রস্তাব শুনিয়া আমার মনে কেমন একটী খট্কা লাগিল। আমি ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই একটী সন্ন্যাসীর সংসর্গে আসিয়াছিলাম।

প্রথমে তাঁহারা অর্থের প্রতি কোনও লোভ প্রদর্শন না করিলেও শেষে পাকে চক্রে কিছু অর্থ বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ সন্ন্যাসীদলের প্রতি আমার তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। অর্থের প্রতি এই সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কোনও লোভ না দেখিয়া আমি তৎপ্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা মা'র পূজা করিবার প্রস্তাব শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসীঠাকুর নিশ্চয়ই আজ নিজ মুখোস খুলিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি পিতৃদেবের সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, "ইনি কাল আমাদের বাসায় পূজা করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।"

আমি বলিলাম, "আমি সে প্রস্তাব শুনিয়াছি।"

সন্ন্যাসীঠাকুর আমার কথা শুনিয়া সহসা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, এই পূজার জন্য তোমাদিগকে কোনও অর্থব্যয় করিতে হইবে না। তোমার পিতা আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এই জন্য, ইঁহার ও তোমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য তোমাদের এই বাসায় মা'র পূজা করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাকে এই পূজার জন্য বিশেষ কিছু আয়োজনও করিতে হইবে না। কেবলমাত্র তোমাদের ঐ ঠাকুরদালানটি গঙ্গাজল দিয়া ধোয়াইবে ও একঘটী গঙ্গাজল আনাইয়া রাখিবে। একটী কম্বলের আসন, একটী প্রদীপ ও কিছু ধূপ ধূনার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, তোমাদের দুই খানা পশ্মী আলোয়ান ও একখানা রেশমী কাপড় হইলে ভাল হয়। এই দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিলেই চলিবে। আর কিছু চাই না। আমি আগামী কল্য ঠিক্ সন্ধ্যার সময় আসিব।"

আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ এবং বিস্মিতও হইলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসী-ঠাকুর আমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন কি ?

চারু স্কুল হইতে প্রত্যাগত হইলে, আমি তাহাকে সন্ন্যাসীর প্রস্তাবের বিষয় বলিলাম। চারু তাহা শুনিয়াই কিছু আ ন্দিত হইল। সে বলিল, "ভালই হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার সময় বোধ হয় কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইবে। আমি আমার শ্বশুর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, ইনি বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না। কাল বিশেষ সাবধান ও মনোযোগী হইয়া পূজার ব্যাপার দেখিতে হইবে।"

চারুর কথা শুনিয়া আমারও কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। ঠাকুর দালান হইতে আমি সকল দ্রব্য সরাইলাম এবং পরদিন গঙ্গা হইতে জল আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলাম। বাড়ীর মেয়েরা চারুর মুখে পূজার সময় অদ্ভুত ব্যাপার দেখা'র কথা শুনিয়াছিল। সুতরাং তাহারাও পূজা দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। পরদিন, আমার স্ত্রী ও কন্যারা গঙ্গাজল দিয়া স্বহস্তে ঠাকুরদালান ধুইয়া রাখিল এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানে একটী আসন বিছাইয়া, তাহার সম্মুখে এক ঘটী গঙ্গাজল রাখিয়া দিল। যথাসময়ে একটা তৈলের প্রদীপও প্রজ্বালিত হইল এবং ঠাকুর দালানটি ধূপ ও ধূনার গন্ধে আমোদিত হইল। দুইখানি পশ্মী আলোয়ান এবং একখানি রেশমের বস্ত্রও যথা স্থানে রক্ষিত হইল।

ঠিক্ সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীঠাকুর খড়মের শব্দ করিতে করিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বেশভূষা পূর্ব্ববৎ ছিল। আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলাম। আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার বেশভূষা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার বস্ত্রের মধ্যে, কিম্বা অন্য কোথাও কিছু লুকাইয়া রাখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল পিত্তলের কমণ্ডলুর মুখে একটী পিত্তলের ঢাক্‌না ছিল। সেই ঢাক্‌নার নীচে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর বৈঠকখানায় বসিয়া পিতৃদেবের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন ও তামাক খাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, আমি ঠাকুরদালানে আরও দুই তিনটি হারি-কেন্ লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিলাম। ঠাকুরদালানটির সর্ব্বত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল। সেখানে সেই প্রদীপটি, হারিকেন্ লণ্ঠনগুলি, আসন, এক ঘটী গঙ্গাজল, ধুনুচি, আলোয়ান দুইটী, ও রেশমী বস্ত্রখানি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। স্ত্রীলোকেরাও পূজা দেখিবার জন্য উৎসুক হওয়ায়, আমি সদর দ্বার রুদ্ধ করাইয়া দিলাম।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন "যদি সব ঠিক্ হইয়া থাকে, চল, পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।" তিনি ত্রিশূল ও কমণ্ডলু হস্তে ঠাকুর দালানে প্রবিষ্ট হইলেন; আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবাজি আজ কালীঘাটে আমি মা'র পূজা করিতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে মা'র স্নানজল লইয়া আসিয়াছি। এই কমণ্ডলুর মধ্যে তাহা আছে। তোমরা সকলেই সেই স্নানজল গ্রহণ কর।" এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে কমণ্ডলুটি দিলেন। আমি সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া ঢাকনা উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিলাম, তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ স্নানজল, একটী বিল্বপত্র ও একটী পুষ্প পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে আমরা সকলেই স্নানজল গ্রহণ করিলাম।

সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার পরিহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, আমি স্বয়ং তাঁহাকে আমাদের রেশমী বস্ত্রখানি দিলাম। তিনি আমাদের সকলের সাক্ষাতেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি অন্যত্র উঠাইয়া রাখিলাম। তৎপরে, তিনি আলোয়ান চাহিলে, আমি স্বহস্তে তাঁহাকে দুইখানি আলোয়ান দিলাম। একটীর দ্বারা তিনি নিজ দেহ আবৃত করিলেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি সম্মুখস্থ গঙ্গাজলের ঘটী ও কটীদেশ হইতে নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত আবৃত করিলেন। তৎপরে তিনি বামহস্ত দ্বারা ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া, সেই ত্রিশূলের ফলকের উপর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, আবৃত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা যেন কিছু জপ করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীঠাকুরের সম্মুখে তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে ধুনুচি হইতে সুরভি ধূম নির্গত হইতেছিল। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে হ্যারিকেন্ লণ্ঠনগুলি জ্বলিতেছিল। পিতৃদেব ও আমি তাঁহার অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে বসিয়াছিলাম। চারু ও আমার অপর একটী ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বামদিকে উপবিষ্ট ছিল। মেয়েরা তাহাদের নিকটেই বসিয়াছিল। পশ্চাতে ভৃত্য, ঝী ও পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল। আমার পুত্র আমার নিকটেই বসিয়াছিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর ত্রিশূলের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রায় ১৫ মিনিট্ কাল জপ করিলেন। সহসা আলোয়ানের ভিতর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ সঞ্চালন দৃষ্ট হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ এইরূপ সামান্য শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল। তৎপরে ঠং ঠাং এইরূপ ধাতব শব্দ, এবং ঠক্ ঠাক্ এইরূপ কঠিন বস্তুর অভিঘাত শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া ক্রমশঃ যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—অর্থাৎ, আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন কতকগুলি দ্রব্যকে দক্ষিণহস্ত দ্বারা সরাইয়া, বা সাজাইয়া, রাখিতেছেন। এস্থলে, ইহা বলা উচিত মনে করি যে, এই সময়ে তাঁহার বামহস্তটি পূর্ব্ববৎ ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিল এবং তাঁহার চক্ষু দুটীও ত্রিশূলের উপরেই স্থাপিত ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি গায়ের আলোয়ানটি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। তৎপরেই, তিনি যে আলোয়ান দ্বারা গঙ্গাজলের ঘটী আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তাহাও তুলিয়া ফেলিলেন। সেই আলোয়ান তুলিবা মাত্র, আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে সকলেই একান্ত বিস্মিত হইলাম। আমি প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু সত্য সত্যই দেখিলাম, অদ্ভুত ব্যাপার! দেখিলাম, গঙ্গাজলের ঘটীর উপরে প্রায় এক ফুট উচ্চ একটী মাটীর ঘট স্থাপিত রহিয়াছে। তাহার উপরে একটী আম্রপল্লব ও গলদেশে একটী সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্পের মালা। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ দিকে, একটী আস্ত কলাপাতার উপর কতকগুলি সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প—তন্মধ্যে দোপাটী পুষ্পই অধিক—এবং কতকগুলি বিল্বপত্র। বামদিকে, আর একখানি কলাপাতার উপর আতপ-চাউলের একটী সুসজ্জিত নৈবেদ্য। তাহার পার্শ্বে খোশা-ছাড়ানো কলা, শঁসা ও অন্যান্য ফল রহিয়াছে এবং উপরিভাগে এক জোড়া মণ্ডাও রহিয়াছে। নৈবেদ্যটি এরূপ সুসজ্জিত যে পার্শ্বে বা কোথাও একটীও চাউল পড়িয়া নাই এবং চাউলগুলি সমস্তই সিক্ত। এই নৈবেদ্যের পার্শ্বে একছড়া আস্ত কলা (তাহাতে অন্যূন ১০।১৫ টী কলা ছিল) এবং একটী আস্ত মধ্যমাকৃতির শঁসা পড়িয়া আছে। সম্মুখে কোশা, কুশী, শঙ্খ ও ঘণ্টা বিদ্যমান। একখণ্ড ক্ষুদ্র কলাপাতার উপর খানিকটা মাড়া সিন্দূরও রহিয়াছে। অর্থাৎ পূজা করিবার জন্য যে যে বস্তু বা উপকরণের প্রয়োজন, সমস্তই প্রস্তুত বা উপস্থিত! মনে বড় ধাঁধা লাগিল। কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

পারিলাম না। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই মাটীর ঘটটি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পূজা শেষ হইয়া গেলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "বাবাজি, মা'র পূজা শেষ হইল। এক্ষণে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেই তাহা সাঙ্গ হয়।" আমি দক্ষিণা আনয়নের জন্য উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "উঠিবার প্রয়োজন নাই; তোমার সঙ্গে যাহা আছে, তাহাই দাও।" আমি পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে একটী আধুলি রহিয়াছে। এই আধুলিটি পূর্ব্ব হইতেই পকেটে ছিল। সুতরাং তাহাই দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া প্রণাম করিলাম।

পূজার পর বালকবালিকাগণের মধ্যে ফলের প্রসাদ বিতরিত হইল। আমরাও প্রসাদ খাইলাম। বালক বালিকারা আস্ত কলার ছড়াটি ও শঁসাটি লইয়া গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুর নৈবেদ্যের চাউলগুলি সযত্নে রক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন অথবা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। আমার সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এই ঘটটি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিবে এবং প্রত্যহ স্নানান্তে ইহাতে সিন্দূর লেপন করিবে।" আমার স্ত্রী তাহাই করিতেন। ঘটটি এখনও আমার কাছে আছে। কেহ দেখিতে চাহিলে, আমি তাহা দেখাইতে পারি।

যাইবার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের রেশমী বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া আপনার চেলী পরিধান করিলেন এবং ত্রিশূল ও কমণ্ডলু এবং পূর্ব্বোক্ত কোশা, কুশী, শঙ্খ ও ঘণ্টা—এই দ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি এবং আমার পিতাঠাকুর মহাশয়, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও পরিবারবর্গ সকলে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর ত্রিশূল ও কমণ্ডলু ব্যতীত আর কোনও দ্রব্যই সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। তিনি আমাদের সাক্ষাতেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আ স্বহস্তে তাঁহাকে আলোয়ানগুলি দিয়াছিলাম; তাঁহার গাত্রে উত্তরীয় বা অন্য কোনও বস্ত্র ছিল না। আর এতগুলি দ্রব্য—অর্থাৎ একফুট উচ্চ একটী মৃণ্ময় ঘট, শঙ্খ, ঘণ্টা, কোশা, কুশী, একরাশি পুষ্প ও বিল্বপত্র, প্রায় অর্দ্ধসের পরিমিত চাউলের সুসজ্জিত নৈবেদ্য, কর্ত্তিত ফলাদি, আস্ত একছড়া কলা, আস্ত একটী শঁসা এবং দুইটী বড় কলাপাতা—নগ্নদেহের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখা একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তৎপরে, নৈবেদ্যটি সুসজ্জিত হইল কিরূপে? এবং কলাপাতার মধ্যেও কোথাও মুড়িয়া যাওয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না কেন?

বলা বাহুল্য যে, সন্ন্যাসীর পূজা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি তাদৃশ বিস্মিত হই নাই। এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী পঞ্জাবী মুসলমানকে এইরূপ একটী অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই মুসলমানটি দিনের বেলায়, দ্বিতলের ছাদে, প্রায় ত্রিশ জন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে একটী উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই উদ্যানে পেস্তার গাছ, ফল ও ফুল, বাদামের গাছ, ফল ও ফুল, আতার গাছ, ফল ও ফুল, বাতাপি নেবুর গাছ, ফল ও ফুল, পেয়ারার গাছ, ফলও ফুল, এবং অন্যান্য ক'একটী ফলের গাছ এবং ফল ও ফুল—সমস্তই অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সেই ফলগুলি তুলিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন এবং আমি কতিপয় কর্ত্তিত ফল গৃহেও লইয়া আসিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম। সেগুলি বহুদিন সেখানে ছিল। পরে শুকাইয়া গেলে, ভৃত্যেরা তৎসমুদায় ফেলিয়া দেয়। এই মুসলমানের কার্য্যের মধ্যে আরও কিছু অদ্ভুত ছিল। তাঁহার সৃষ্ট বৃক্ষগুলি প্রায় তিন চারি হাত উচ্চ হইয়াছিল এবং ফলফুলে সুশোভিত ছিল। কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে সহসা সেইগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। কেবল বৃক্ষ হইতে উত্তোলিত ও কর্ত্তিত ফলগুলি ও ভগ্ন শাখাগুলিই আমাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক মনে করি, যে পূর্ব্বোক্ত মুসলমানটি যেখানে পেস্তার গাছ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখান হইতে বোধ হয় চারিশত ক্রোশের মধ্যে কোথাও পেস্তার গাছ ছিল না।

পূর্ব্বে এইরূপ একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম বলিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কার্য্যে আমার তাদৃশ বিস্ময় হয় নাই। আমার মনে হইয়াছিল, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

এরূপ কোনও শক্তি আছে, যাহা বিকশিত হইলে, সে অনায়াসেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে পারে। সে শক্তি যে কি, অবশ্য আমি তাহা জানি না। সুধীবর্গ তৎসম্বন্ধে কোন রহস্যের বিবৃতি করিলে, আমরা আনন্দিত হইব।

এস্থলে, ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর যেদিন পূজা করেন, তৎপর দিন, আমি কোনও কার্য্য বশতঃ "ইণ্ডিয়ান্ মিরার"-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত পূজার কথা বলি। তিনিও সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। পরে তিনিও একদিন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা তাঁহার বাটীতে পূজা করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, আমার বাসায় যেরূপ তাঁহার বাটীতেও তদ্রূপ পূজার সমস্ত দ্রব্যই স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমার জনৈক বন্ধুও* সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা তাঁহার বাড়ীতে আর একদিন পূজা করাইয়াছিলেন। সেখানেও পূজার সমস্ত দ্রব্য স্বতঃই আসিয়াছিল; অধিকন্তু পত্রপল্লবসমন্বিত বিল্ববৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র শাখাও উপস্থিত হইয়াছিল।

এই পূজার পর, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আমার ক'একবার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার এই শক্তি সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, মানুষের শক্তি দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। সন্ন্যাসীর কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, মানুষের সেই শক্তিটি কি?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

হাতে হাতে ফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালার বাবুকে বলিতেছিলেন—"তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিক্শ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়ান।"

সিগনালার বাবু বলিতেছিলেন—"আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হ'লাম। ঐ একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগনালার বাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ীভাড়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ও কি ও? না—না— রাখুন, রাখুন।"

সিগনালার বাবু বলিলেন—"তা হলে যে বড়ই অন্যায় হয়!"

"না—না। কিছু অন্যায় হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম করে দিই—তারপর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমতন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন,—তার আর কি?"—বলিয়া ডাক্তার বাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনা গেল। ডাক্তার বাবু বলিলেন— "ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।"

উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত "বীরভারত" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তার বাবু সরকারী চাকর হইলেও অন্যান্য সরকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কাণাঘুষা করিয়া থাকে। বিনয় বাবুর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেনও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোক্তার এবং ছাত্রগণ পরিবৃত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট

---

* শ্রীযুক্ত আশুতোষ নাগ, ১১নং মীরজাফস লেন, কলিকাতা।

একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যাই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল—"এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন—"কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয়শ্রেণীর টিকিট আছে।" বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, "বাদশাহ-কা-দোস্ত" আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ-রেশমীচাদরধারী মূর্ত্তিমান রাজদ্রোহকে এক ধাক্কা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয়বাবু "বীর-ভারত" পত্রের সম্পাদক হইলেও, অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একযোড়া সোনার চশমা,—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চূরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার সহচরগণ বন্দেমাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুঁসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেই দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন্ বিনয় বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;—পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়া, "বীর-ভারতে" এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরগোবিন্দ বাবু স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন;—নেটিব ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহরে দুইজন এম্,বি,—কয়েকজন এল,এম্,এস্, থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দ বাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইবেট্ কল্ তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দ বাবুর দুই পুত্র;—একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি,এ, পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল, স্থানীয় জেলা-স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল,—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দ বাবু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল—"বাবা সাহেবটা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা, বেচারীকে বড্ড মেরেছে।"

অজয় বলিল—"তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট। বেশ হয়েছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"দেখ, সে অন্যায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা লোককে পাঁচজনে পড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না!"

অজয় বলিল—"ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর কখনও ন্যায়যুদ্ধ হতে পারে?"

"কেন?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকদ্দমা হয়, তবে হাকিম কি ন্যায়বিচার করবে?"

ডাক্তার বাবু হাসিলেন। বলিলেন—"তোমার যুক্তিটে ত বেশ দেখছি! অন্যে অন্যায় করে সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায়

ন্যায় অন্যায় স্থির হতে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে ?"

অজয় বলিল-- "গায়ের জোর না পাক্, মনের জোর পাচ্ছে। মনের জোরেই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তার বাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন---"তা ঠিক বটে। মনের জোরেই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ্য করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ ভাব কিছু নেই ? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজের প্রতি বল প্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না ?"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে, সাহেব-মারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিসকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভার কোতোয়ালার দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগা বাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ছোকরা দলের কয়েকজন উকীল ও মোক্তারকে গেরেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককেও ধৃত করিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর ছয়টার সময়, সেই মাত্র ডাক্তার বাবু শয্যাত্যাগ করিয়া, বারান্দায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্র বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগা বাবু বলিলেন— "আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তার বাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন---"কি হয়েছে ?"

"পরশুকার সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন ? আসামী ত অনেক গুলি ধরেছেন শুনলাম।" বলিয়া ডাক্তার বাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদু হাস্য করিলেন।

দারোগা বাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন— "আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্চে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কি করে ?" বলিয়া ডাক্তার বাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

"গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দ্দান্ত। এক একটা গুণ্ডো। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাস্তা দিয়ে টমটম হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টোদিক থেকে আসছে, সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন ?"

"না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্চে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলে গুলোকে হাজতে পূরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগা বাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ !

তা হলে কি চাকরি থাকবে ? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন- "আমার কাছে ? আমি কি করব ?"

"আজ্ঞে হেঁ হেঁ আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম,—সাক্ষীটে দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগা বাবু সুপ্রচুর দাড়ি গোপের মধ্যে হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তার বাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে কিন্তু ঘটনাস্থানে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাই নি।"

দারোগা বাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"তাই ত! বড় মুস্কিল হল যে! আহা, একথা যদি আগে জানতাম!"

"কেন, হয়েছে কি ?"

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন "না জেনে বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদ্ গ্রস্ত করেছি।"

"কি, খুলে বলুন না।"

"কাল বিকাল বেলা ক্লবঘরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হল ?'—আমি বল্লাম—'হুজুর, একজন কনেষ্টবল দুজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।'—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—'ননসেন্স!—কনেষ্টবল আর চৌকিদার ? কোনও ভাল সাক্ষী নেই ?'—সাহেবের চোখ-রাঙানি দেখে ভয়ে বল্লাম—'হাঁ হুজুর আছে বৈকি। সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ বাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন।'—সাহেব বল্লেন—'অলরাইট।'—বলে টেনিস্ খেলতে গেলেন।"

ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন —"না জেনে শুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বল্লেন কেন ?"

"বিলক্ষণ! আমি কি করে জানব মহাশয় ? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাঁসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেন নি তা আমি জানব কেমন করে ?"

"তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে বলে আসুন।"

দারোগা বাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"তাও কি হয় ? এক মুখে দুকথা বলব কেমন করে ? আমার তেমন স্বভাবই নয়।"

"তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।"

দারোগা বাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন "আপনি কি ক্ষেপেছেন ? ওকথা বল্লে সাহেব বিশ্বাস করবে ? মনে করবে আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ আমারও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কাণে গেছে আপনি করকচ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।"

বিরক্তির সহিত ডাক্তার বাবু বলিলেন—"করকচ খাই দেশী কাপড় পরি বলে কি আমি রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম না কি ?"

দারোগা বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আহা আহা চটেন কেন ? আজ কাল কি রকম দিন সময় পড়েছে তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।"

ডাক্তার বাবু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তবে এখন উপায় ? বেশ কাযটি করে বসেছেন যা হোক!"

"উপায় আর কি ? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার দিকে। আসামী গুলোকে বসিয়ে রেখেছি দেখবেন। সব গুলোকে কোর্টে সেনাক্ত না করতে পারেন, গোটা কতক করলেও হবে। পুলিস ডায়েরি থেকে অন্য অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দি গুলোও পড়ে শোনাব।"

এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দ বাবুর চক্ষু জলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে

কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—"কী! যত বড় মুখ তত বড় কথা! মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াবার আর লোক পেলে না? বেরো—দুরহ—এখান থেকে। কোই হায় রে? দে ত বেটাকে কাণ ধরে উঠিয়ে।"

বদনচন্দ্র বাবু উঠিলেন। চাদর খানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন—"মহাশয়, এর ফলভোগ করতে হবে।"

হরগোবিন্দ বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"যা তোর বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলগে যা। যা পারিস্ তা কর্।"

দারোগা বাবু তখন ত্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে, দারোগা বাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেডকনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিলেন—"জমাদার সাহেব, ডাক্তারের ছেলে দুটোর নাম কি জানেন?"

"কোন্ ডাক্তার?"

"হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেণ্টের নিমক খেয়ে যে নিমক-হারামী করে।"

"না—তা ত জানি না।"

"শীঘ্র সন্ধান করে আসুন।"

"কেন?"

"তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় তারাও ছিল প্রমাণ পেয়েছি।"

"যে আজ্ঞে।" বলিয়া জমাদার প্রস্থান করিল। তখন দারোগা বাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানার বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অপমান! চাকরে কান ধরিয়া উঠাইয়া দিবে? দারোগাকে তুই তোকারি! কেন, হরগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি?

দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন—"ছেলে দুটোকেত এমনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করতেই হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অর্দ্ধ মূল্যে চোরাই মাল কেনে। থানা তল্লাসী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের করে ফেলব এখন—তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত? হবে না আবার? দারোগারা হল ডেপুটি বাবুদের গুরুপুত্তুর! ছেড়ে দেবেন? সাধ্য কি! পুলিস সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করাব—অমনি ডেপ্‌টি বাছাধনের তিন বছর প্রোমোশন ষ্টপ্। দারোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে? এই জন্যেই ত! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয়? যদি বলে এত বড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোরাই মাল রাখে, এও কি সম্ভব হয়? তার চেয়ে ইয়ে করা যাক্।—বরং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই। এই যে সেদিন হাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে, ডাক্তারবাবু সামান্য জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারই একটাকে দিয়ে নালিশ করাই যে তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামী-দের কাছে তিনটি শো টাকা ঘুষ নিয়ে সামান্য জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হলে আর যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নালিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধরে ১১০ ধারায় চালান করে দেব সে ভয় রাখে না?"

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ডাক্তারের বড় ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোট ছেলের নাম সুশীলচন্দ্র।"

দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, কোর্ট বাবুর নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর
সমীপেসু—

বিচারপতী!

হুজুরের হুকুম মোতাবেক সাহেব মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত করিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুসীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবীন্দ চট্টোপাধ্যায় হয় অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতায় সুরেন্দ্র বাবুর কালেজে অধ্যায়ন করে প্রকাশ তাহারই হুকুম সুত্রে অন্যন্য আসামীগন সাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্যই ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডিন স্কোয়ার হাঙ্গামাতেও লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটী লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীল চন্দ্র অল্প বয় হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় সাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠী প্রভিতী লুক্কাইত আছে লাঠি খেলা সমিতির চাঁদার খাতা মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পাবে বিধায় প্রার্থনা ফৌ: কা: বি: ৯৬ ধাবা অনুসারে উক্ত হবগোবীন্দ ডাক্তাবের বাটী থানা তল্লাসী করিতে ছার্চ্চওয়ারেণ্ট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগাধীন
শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ,
এছাই।*

১ দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস স্বপক্ষ দেশী চিণী ও করকচ নবন সব্বদা আহার করে স্নিব বেনামীতে ভারত কটন মীলে ৫ শত্ত টাকার সেয়ার খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগণ আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাটাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাশ থাকে পরম্প্রায় সুনিলাম উক্ত হরগোবীন্দ বলিয়াছে আমি জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

ইতি মধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন কিন্তু দারোগা বলিলেন —"সাহেবের হুকুম নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানায় দারোগা বাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরু চুরির আসামীর সঙ্গে দারোগাবাবুর দরদস্তুর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল হাল গরু বিক্রয় করিয়া দারোগাবাবুর পান খাইবার জন্য অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে আসামীকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছিলেন দুইশত টাকার এক কাণা কড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না এমন সময় সার্চ্চওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া, একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন "তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দোশী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধিকার প্রবেশ করতঃ জাব খাইতেছিল তদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।"

গোরু চোরকে বিদায় দিয়া বদন বাবু সাবধানে সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পরিধান করিয়া দশ বার জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগা বাবু বীরদর্পে ডাক্তার বাবুর বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তার বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁক ডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দ বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া, স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। দারোগা কনেষ্টবলগণকে বলিলেন—"সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়।"—যে গুলির চাবি ছিল, সে গুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া, উঠানের মধ্যে ধুলার উপর সমস্ত জিনিষ পত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগা বাবু জুতার ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া, সে গুলা বিক্ষিপ্ত করিয়া, "তল্লাস" করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস্, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার ঠোক্করে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজ পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে

* S. I.—Sub Inspector.

এক খানি আনন্দ-মঠ পুস্তক বাহির হইল,—তাহা দেখিয়া দারোগা বাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া অনেক "তল্লাসী" হইল। ডাক্তার বাবুর প্রেস্কৃপ্সন বহি, দুই তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, সুরেন্দ্র বাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় প্রভৃতির ছবি যুক্ত একখানি মাসিক পত্র,—সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া, এক স্থান হইতে তারের জাল মোড়া একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধবোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র ছিল। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগা বাবু একবার ঘ্রাণ করিলেন। পরে সাক্ষীদ্বয়কে বলিলেন—"ডাক্তার তয়ের লোক। - একটু হবে ?"

সাক্ষী দুইটি বলিলেন—"না মশায়, আমরা মদ খাইনে।"

দারোগা বাবু তখন একটি মেজার গ্লাসে খানিক ঢালিয়া, এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পর মুহূর্ত্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন—"এটা কি ? ব্র্যাণ্ডি বটে ত ?"

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন—"হাঁ ব্র্যাণ্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—"গদি বালিস গুলো কাট ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবলগণ তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানা পত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তুলা বাহির করিয়া ফেলিল। তুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদন বাবু বলিয়া উঠিলেন —"হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কিনা দেখ।"

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমা ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি মজঃফরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগা বাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—"বৃহৎ বাশের লাঠী দুইটী রক্তের চিহ্ন পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।"

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দ বাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া, সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার বাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তার বাবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে, হরগোবিন্দ বাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু গিয়া বলিলেন—"মশায় দেখলেন ?"

বাবু দুইটি বলিলেন—"দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন ?"

একটি বাবু বলিলেন—"কি হবে ?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু অধীর হইয়া বলিলেন—"কি বল্লেন ? আসবেন আপনারা ?"

একজন বলিলেন—"তার চাইতে এক কায করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—" অপর বাবুটি স্পষ্টবক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী

চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাত কড়া লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— "আচ্ছা তবে থাক্।"

"প্রণাম হই মশায়।" বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব সে সময় টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেট খানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দ বাবু সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবু?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। থানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না?"

"আজ্ঞা হাঁ। দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare you! দুই দিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তার বাবু স্ত্রী কন্যাগণের নিকট বসিয়াছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান, লাঞ্ছনা,—সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তার বাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে বসিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল—"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল—"এক্ঠো রোগী আছে—বোলাহাট এসেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"

শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তার বাবু ডাক্তার বাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল—"ঐ লোকঠো আবার এসেছে। বলে ডাংদার বাবুর সাথ ভেট না করে হামি যাব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমি ত উঠতে পারি নে—আচ্ছা বাবুকে এইখানে নিয়ে আয়।"

বধূ, কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করিল। বলিল—"বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে? কি ব্যারাম?"

"সে আর কি বলব! কোন্ মুখেই বা বলি?"

ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আপনি কে?"

"আমি থানার রাইটার কনেষ্টবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগা বাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্যে তিনি লজ্জায় মরে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম?"

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমাকে কেন? আর কি ডাক্তার নেই?"

মুন্সী বাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তাব বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন—বলিলেন—"দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তার বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সী বাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন—"একটু গরম দুধ এনে দেব?" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন—"গিন্নীমা কোথা?"

"কে গা তোমরা?"

ঝি বলিল—"উনি বদন দারোগার পরিবার।" সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"কেন—কেন?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন—"এমন ব্যারাম?"

"হাঁ মা। ডাক্তার বাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা,—তাঁর ব্যারাম অন্য ডাক্তারে বুঝবে না ত বাঁচাবে কেমন করে। এইখানে কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"এখানে কি খেলেন? এখানে ত কিছু খান নি।"

যুবতী বলিলেন—"আমায় একবার ডাক্তার বাবুর কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ—এ সময় আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইহাঁকে হরগোবিন্দ বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। যুবতী ডাক্তার বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"বাবা আমায় রক্ষা করুন।"

গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন—"তিনি বলছিলেন খানাতল্লাসী করবার সময় ঔষধের আলমারিতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল ছিল, ব্রাণ্ডি মনে করে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্চে সেটা ব্রাণ্ডি নয়, কোনও বিষ টিষ।"

একথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ঔষধের আলমারিতে ব্রাণ্ডির বোতল?"

শুনিবামাত্র ডাক্তার বাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন?"

"হাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চল্লাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন—"বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"সে ঈশ্বরেব হাত মা।" বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তেব মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারা রাত্রি জাগিয়া ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদ্‌গুলা'র নামও আমরা জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্ জন্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত—আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রামরাজ্যে বাস করিতেছি; যখন, যে দিকে চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকেই দেখিতাম প্রসন্নবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন—সে এক দিন ছিল! তখন, আমার রঘুবংশের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, কুমার-সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারবী না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ—তাহা পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা ঢঙের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও আমি ভুলি নাই; সেটা এই:—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতও যেমন মনোহারিও তেম্নি, এরূপ বচন দুর্লভ।" ইহার খোলাসা তাৎপর্য্য এই:—অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও সুলভ; প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে?

॥ ২ ॥ আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোক কাণ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল; যে শোনে সে শুনিবে, যে না-শোনে না শুনিবে; তুমি তো বলিয়া খালাস্! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক' যে গঙ্গার ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না; তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতা'র অনুগ্রহে ভর করিয়া; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে জায়গা না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া সুড়্‌সুড়্ করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যে'কার একজন'কেও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে "ঠেকিয়া শেখে" কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে;—ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গাম্‌ছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ "জলে নাবিও না—গঙ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে।" পাঁচজন তোমার সেকথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে নাবিল, আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল;—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা! হাঁটু-জলের অৰ্দ্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙ্গায় উঠিল;—ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

॥ ১ ॥ শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন?

॥ ২ ॥ লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।

॥ ১ ॥ বেস্ যা হো'ক্ তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান' না যে, কচি বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য? সত্য বলিতে কি—তোমার মতো লোকের মুখে "মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে" এরূপ একটা আগা-পাছুতলা রহিত বেথাপ কথা শুনিলে আমার কেমন কেমন ঠ্যাকে!

॥ ২ ॥ বলিলাম অ্যাক—শুনিলে আর! আমি বলিলাম "লোকের বয়স", তুমি শুনিলে "মনুষ্যের বয়স?"

॥ ১ ॥ আমি তো জানি—মনুষ্য নামাই লোক।

॥ ২ ॥ সে দিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল যে, "সকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, আবার এখন

রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ! অতবার ক'রে পড়া মুখস্থ ক'ল্লে লোকে পাগল হ'য়ে যায়", এ কথার প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাঁহাকে বলিলে তাহা তো আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি! তুমি বলিলে "তোর এখনো গোঁপ দাড়ি ওঠে নি—তুই আবার লোক হ'লি কবে? যা'—প'ড়্‌গে যা'!" লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামা'ই লোক—একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালকও লোক!

॥১॥ তুমিতো ঘর-সন্ধানী—(Detective) মন্দ না! বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়াছ! তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ্! তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর—বড্ড ভাল হয়; আশ পাশের ফ্যাকড়া কথার চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল,' তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

॥২॥ বলি তবে শোন' :—এটা তুমি তো জান'ই যে, ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীরা সেদিনকার ছেলে'কে বড় হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলেন "আমি উঁহাকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি!" ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া হয়, গোরু পেট থেকে পড়িয়াই গোরু হয়; কিন্তু মানুষের একি বিপরীত কাণ্ড—অন্যে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না। কচি বয়সে মনুষ্য যখন পিতামাতা'র নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অর্দ্ধ মানুষ হয়; তাহার পরে পঠদ্দশায় যখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে চরিয়া খাইতে শেখে, তখনই সে পূরা-মানুষ হয়। কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যের জীবন-ক্ষেত্র; এই জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-প্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে। মনুষ্যের এইরূপ কচি বয়সের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে, কিন্তু, শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে; কেননা এ বয়সে মনুষ্য-সন্তান শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না; তাহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীরা যাহা তাহাকে গিলাইয়া দ্যায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে। বাচ্ছা-মনুষ্যের শিক্ষা একপ্রকার অযাচিত দান-গ্রহণ। আদিম জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য ঐরূপ অযাচিত দান-গ্রহণের পথ দিয়া জীবন-নির্ব্বাহের নানাবিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-কার্য্যে অশিক্ষিত-পটুতা উপার্জ্জন করে। জীবন-ক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয়। মানস ক্ষেত্র কি? না বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে মানস-ক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষাপ্রণালী। মনুষ্যের পঠদ্দশায় শিক্ষকের বাক্য মন-দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা অন্য কোনো উপায়ে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবে না। পঠদ্দশার বয়সই প্রধানতঃ মনুষ্যের শুনিয়া-শিখিবার বয়স। মনুষ্যের পঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া-শেখার বয়স অতীত হইয়া যায়। মানস-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জ্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্য-সন্তান, শিক্ষক যাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে; বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পরে—বুদ্ধি যাহা বলে তাহাই শুনিয়া চলে। বুদ্ধি-বিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা—বিদ্যালয় হইতে লোক সমাজে ভর্ত্তি হয়, তখনই সে লোক হয়। মনুষ্য যত দিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে, বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডার্বিনের শাস্ত্রানুসারে—বানর যখন নর হইয়া ওঠে) তখন গোঁপ দাড়ির প্রাদুর্ভাবে তাহার মুখের চেহারাও যেমন ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেম্নি ফিরিয়া যায়; মন তখন বলে—"অন্যের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।" এতগুলা কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে "শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন", আমি তাহার

উত্তর দিলাম এই যে, লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।"

॥১॥ তুমি যাহা বলিলে—সবই সত্য; কিন্তু তথাপি ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে একটা বিষম ধন্দ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—সেটা'র একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়; কথাটা এই:—মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, কচি বয়সে মাতা কিম্বা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; পঠদ্দশায় শিক্ষক তাহাকে সদুপদেশ দিয়া বিপদ্ হইতে রক্ষা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের সৎপরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে?

॥২॥ আমাদের দেশের একটি পুরাতন শাস্ত্রবচন এই যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের জীবনের নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মনের নিয়ামক, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের কর্ম্মের নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেমি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেমি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্ম্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। কর্ম্ম, করিবার বস্তু; ধর্ম্ম, ধরিয়া থাকিবার বস্তু। কর্ম্ম, বুদ্ধির দাঁড়; ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল। কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, তাহারা আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারে—কেবল যদি তাহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে; তাহা যদি না করে, তবে আর নিস্তার নাই।

॥১॥ ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক্ বাগে? কূল বাগে অবশ্য। তবেই হইতেছে যে, কূলের ঠিকানা-নির্দ্দেশ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্ম্মকে, হাল বলিতেছ ধর্ম্মকে, ইহা শুনিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম; কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য।

॥২॥ কূল, আমি বলি, পুরুষার্থ। পুরুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা—কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য-পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে, উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনার নেতা হয়; তখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে, আর, কুব্জা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ-পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধি-দেবতার আহ্বান শুনিয়া মুক্তির মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে চলে। মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যা-বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেইতো-আর স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতা'র যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাঁহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর, যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ-যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফল-লাভে কৃতকার্য্য হ'ন। বিপথ-যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি'র জন্য আগ্রহান্বিত হ'ন, কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হ'ন। পুরুষার্থের কূলে পৌছিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি—তাহা বলি শোন':—

(১) কূলের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই।

(২) রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা, স্বারাজ্যও তা, একই; তা'র সাক্ষী—স্বাধীন=স্ব+অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ=স্ব+রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা

য়ের ভাবার্থ অবিকল সমান। যাঁহারা স্বাধীনতা এবং স্বারাজ্যের কাঙ্গালী, তাঁহাদের, দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য।

(১) ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতা'র সোপান; সৌরাজ্য অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বারাজ্যের সোপান; ধর্ম্মবন্ধন মুক্তির সোপান।

(২) স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈরাজ্য অর্থাৎ অরাজকতা) স্বারাজ্যের বিপরীত পথ, উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্তির বিপরীত পথ।

এই দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের পোষা কুকুর নহে যে, তাহাকে আমরা ডাক দি'বা মাত্র তৎক্ষণাৎ অম্নি সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে! স্বারাজ্য লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্য-ভোগের যোগ্যতা লাভ করা, আর একদিকে চাই রীতিমত জ্ঞান এবং কাজ শিক্ষা করিয়া বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা। সৌভাগ্যশালী জাপানীরা তাহাই করিয়াছে; আর সেই জন্য—তাহারা যে কার্য্যে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোণা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি অন্তর্দাহের উত্তেজনায় অথবা দুষ্ট সরস্বতীর কুমন্ত্রণায় ঐরূপ যোগ্যতা এবং উপযোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই ইউরোপীয় ভল্লুকের প্রতি গুলিগোলা চালাইতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানীরা তাহাদের এই নিজ-বুদ্ধিসম্ভূত নূতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে কেমন অপরাজিত-চিত্তে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই! তাহারা রাগের মাথায় চীন রাজ্যকে ছারখার করিয়া দিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই; উল্টা আরো তাহারা চীনদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করিতেছে না। তাহারা কন্‌গ্রেস্‌বীরদিগের ন্যায় আপনা-আপনি'র মধ্যে কাম্ড়াকাম্ড়ি, আঁচ্ড়া-আঁচ্ড়ি এবং চুসাচুসি করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একটা জমকালো সোপান গাঁথিয়া তুলিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই; উল্টা আরো তাহারা প্রভূত ধন ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া, আপনাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদের চিহ্নমাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। রুষীয় বন্দীদিগের প্রতি শত্রুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধূচিত যত্ন সমাদর এবং সম্মানপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ভারবোধ করে নাই। এরূপ জাতির জয় হইবে না তো আর কাহার জয় হইবে? আমাদের দেশের এই যে একটি পুরাতন বাক্য "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য। ধর্ম্মই যোগ্যতা'র নিদান; আর ডারুইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগ্যতাই জয়ের নিদান। ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ জনসাধারণই স্বারাজ্য-লাভের যোগ্যপাত্র। জাপানের অধিবাসীরা ধর্ম্মকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হস্তে জাপানের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন "চিরজীবী হও" আশীর্ব্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি—"দেখিয়া শেখো! নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে!" ঠেকিয়া শেখা যে কিরূপ সর্ব্বনেশে শেখা তাহা যে জানে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে দাঁড়াইতে, ঘা খাইয়া খাইয়া চৈতন্য লাভ করে, তখন সে বিপদে পড়িয়া বলিবার সময় বলে "এ পথে বাপ-মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই" অথচ চলিবার সময় চলে—কি সর্ব্বনাশ—সেই পথেরই আলেয়া'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ! ফল কথা এই যে, বিপথে চলা যখন যাহার প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়—নূতন-লব্ধ জ্ঞানের নূতন পথে চলা তখন তাহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য। একে তো এই দশা—তাহার উপরে যদি আবার বিপথ-যাত্রীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন সে হিতবক্তার মুখপানে খট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দম্ভ সহকারে বলে—"আমি বিনাশের পথে যাইব—আমার খুসী! তুমি বলিবার কে? আমি তোমার হিতবাক্য শুনিতে চাহি না!" ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি কিই-আর তাহাকে বলিবে—"খুব তুমি বাহাদুর" বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকে।

॥ ১ ॥ সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না—তাহার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! পক্ষান্তরে সুসভ্য ইউরোপের বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশী বই কম না। দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রণালী-পদ্ধতিই আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইবার উপযুক্ত, তা বই একটা অকালপক্ক কচিছেলে'র কাণ্ডকারখানা দেখিয়া-শিখিবার জিনিস্ই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ইতিহাস-লেখকের অভাব নাই; তাঁহাদের লিখিত তরো-বেতরো স্বারাজ্যের তরো-বেতরো অভ্যুদয়-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-বর্জ্জিত নৈরাজ্যের মধ্য হইতেই স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।*

॥ ২ ॥ ফরাসীস্ দেশের অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দীয় নৈরাজ্যের মধ্য হইতে কিরূপ স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই! সেটা যে একটা সর্ব্বনেশে কালসর্প! তেমন বিষাত্মা কাল-সর্প কোথাও আর দেখা যায় না! ইংরাজিতে তাহার নাম Revolution, আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। সেই সহস্রশিরা সর্পটাকে সুদুরদর্শী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালমতেই চিনিতেন, আর, চিনিতেন বলিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু হইলে হইবে কি ধর্ম্মের নামে নহে পরন্তু গর্ব্বস্ফীত ফরাসীস্ জাতীয় গৌরবের নামে তিনি তাহার বিষ দাঁত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই হিতে বিপরীত হইল। ঐ দুরন্ত কালসর্পটার কোপে পড়িয়া অবধি, তাহার বিষশ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ফরাসীস্ দেশের অধিবাসীরা একদিনের জন্যও সৌরাজ্যসুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিল না। স্বারাজ্যের যোগাড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনেরাই বা কেন (জাপানী-দিগের মতো) অত্যল্প কালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আশাতীত ফল-লাভ করিল, আর ফরাসীসেরাই বা কেন আজও পর্য্যন্ত তাহাদের হেঁট মস্তক উত্তোলন করিতে পরাভব মানিতেছে? ইহার গোড়ার কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতগত উচ্ছৃঙ্খলতা'র ভূতগত ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্য-বসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ; ফরাসীস্‌দিগের রাজ-নৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল অবিদ্যা দম্ভ মাৎসর্য্য এবং অধর্ম্মের উপরে তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন। পুরাকালের একটি শাস্ত্র বচন শ্রবণ কর:—

"অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ—অধর্ম্ম দ্বারা দুরাত্মাজনের সমস্তই হস্তায়ত্ত হয়," "ততো ভদ্রানি পশ্যতি—তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা যায়," "ততঃ সপত্নান্ জয়তি—তাহার পরে শত্রুদিগের উপরে জয় লাভ হয়," "সমূলস্তু বিনশ্যতি—তাহার কপালে কিন্তু লেখা আছে 'সমূলে বিনাশ'"। ধর্ম্মনষ্ট ফরাসীস্ জাতির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তা'র সাক্ষী:—

(১) অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ।

অধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ফরাসীস্ রাজ্য চকিতের মধ্যে বিপ্লব কর্ত্তাদিগের হস্তায়ত্ত হইল।

(২) ততো ভদ্রানি পশ্যতি।

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের সুখস্বপ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল, আর, সেই সুখ-স্বপ্নের আবেশে ফ্রান্স্, ইংলণ্ড আইরলণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ বিদেশের ভ্রাতায় ভ্রাতায় কোলাকুলির ধূম পড়িয়া গেল।

(৩) ততঃ সপত্নান্ জয়তি।

তাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধ্য হইতে প্রথম নেপোলিয়ন মাথা তুলিয়া উঠিয়া তোপের ধমকে অর্দ্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে আনয়ন করিলেন।

(৪) সমূলস্তু বিনশ্যতি।

তাহার পরে ফরাসীস্‌দিগের স্বারাজ্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাজারাজড়া'রা একযোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত স্বারাজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত করিল।

ফরাসীস্ দেশীয় ধর্ম্মদ্বেষী আদিম বিপ্লব-কর্ত্তারা যেরূপ একটা বিশাল যজ্ঞ-যজ্ঞের ফাঁদ ফাঁদিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া-ছিলেন, তাহা দক্ষযজ্ঞেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সে মহাযজ্ঞে বড় বড় দেবতাদের সবাইকেই বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সাম্যদেব'কে (Equalityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternity কে)

* নিঃ + রাজ = নীরাজ = রাজ-বর্জ্জিত। নৈরাজ্য = অরাজকতা।

মন্ত্রণ করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা দেবীকে (Liberty কে) মন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কেবল শিব'কে (মঙ্গল'কে) ...বং সতীকে (সদ্ধর্ম্মকে) অপমানিত করিয়া ঠেলিয়া রাখা ...য়াছিল। কুহকিনী অবিদ্যা-দেবীর ভানুমতী (enlighnment) নামের ভেল্কি বাজিতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতৃ...ব এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে—এই ছিল যজ্ঞ...গাদিগের প্রাণগত সংকল্প। এত বড় একটা বৃহৎ ...পারের প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায়—...নবে? ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শ্রীসমৃদ্ধির সমস্ত আশা...সা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেণ্ট্ হেলেনায় গোর ...প্ত হইল; তাহার পরে তাহার ছটা ফোঁটা যৎকিঞ্চিৎ ...া বাকি ছিল, তাহা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডে ...র প্রাপ্ত হইল। গড়াইল আসিয়া এইখানে!

পক্ষান্তরে মার্কিন্ দেশীয় স্বারাজ্য পন্থীরা ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন ...রিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই—একটি ...য়েও হস্ত প্রসারণ করে নাই, অপর কোনো জাতির ...য় অধিকারের অন্তঃপাতী সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও ...প্রসারণ করে নাই; আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ...শিঙটন্ তাঁহার তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ...তার ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের ...-পতাকায় "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়:" স্বর্ণাক্ষরে জ্বল জ্বল্ ...রিতেছে তারকা-বেশে।

॥ ১ ॥ তোমার ওকথা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি...ম—যদি ইংরাজের নিকটে বুয়ারেরা যুদ্ধে পরাজিত না ...ত।

॥ ১ ॥ কে বলিল বুয়ারেরা পরাজিত হইয়াছে—পরাজিত ...তে তাহাদের শত্রুপক্ষেরাই পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজি ...বাদপত্রের সম্পাদক যিনিই যাহা বলুন্ না কেন, যাঁহাদের ... আছে তাঁহারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে ...ইতেছেন যে, বিগত বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজদিগের লাঞ্ছনা, ...না, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ ...য়াছে। কিন্তু বুয়ারদের কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই! ...২ তাহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা জাতীয় গৌরব...পানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই একধাপও নীচে ...ব নাই;—আর-যে-এখন কোনো বলবান্ জাতি তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মের মতো অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বুয়ারদিগকে ধর্ম্মপুস্তক হাতে করিয়া রণে অবগাহণ করিতে দেখিয়া ইংরাজ বণিকেরা মৃদুমন্দ হাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরেরা হাসির চোটে ভূত ভাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সহস্র হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও টলিবে না যে, বুয়ারেরা যে, পরাজিত হইয়াও জয়ী হইয়াছে, তাহার কারণই ঐ—কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

বৃথা আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি! বুয়ারদের, জাপানিদের এবং মার্কিনদের প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট বিপথপন্থীদিগের মনের এক কোণেও স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর আমাদের ভাবনা ছিল না! আমরা এতদিন ঠেকিয়া শিখিয়াও এখনো আমাদের ঠেকিয়া শিখিবার আশ মিটিতেছে না। নৈরাজ্যই আমাদের স্বারাজ্যের আদর্শ; পিপীলিকার পক্ষই আমাদের জয়পতাকা'র আদর্শ; আর আমাদের রাজনৈতিক গোরা-গুরুদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা এই:—"ঈশ্বর চাহিনা—ধর্ম্ম চাহিনা—কেবল চাই স্বারাজ্য —খাটি স্বারাজ্য—যাহার গাত্রে ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই সেইরূপ নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য!"

॥ ১ ॥ তুমি এই যে সকল শক্ত শক্ত কথাগুলি বলিলে, তাহা হিতবাক্য হইতে পারে, কিন্তু মনোহারী একটুও না!

"হিতং মনোহারিচ দুর্ল্লভং বচ:।"

আমি তাই বলি যে, তোমার ব্যবস্থানুযায়ী তিক্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারি বচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সুখসেব্য করিয়া লইলে ভাল হয়। আমি একটা অনুপানের জোগাড় করিয়াছি—বোধ করি তাহা চলিতে পারে; তাহা এই:—

স্বারাজ্য-পথের আমরা নূতন ব্রতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের যে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ঘটিবে, তাহা ঘটিবারই কথা। পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেমনি আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীরা কোমর বাঁধিয়া

কাজ করিতে করিতেই ক্রমে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক্ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পথের মাঝখানে তাহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া নিরুদ্যম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

॥ ২ ॥ কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, "লিখিতে লিখিতেই আমার হাত পাকিয়া উঠিবে; 'এটা ঠিক্ হয় নাই' 'ওটা ঠিক্ হয় নাই' বলিয়া লোককে "বিরক্ত করিও না" তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, 'তোমার হাত পাকিবে তাহা তো জানি; কিন্তু চাও তুমি কি? ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও সেই কথাটি আমাকে ভাঙ্গিয়া বল।' যদি ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে যথেচ্ছা মতে লেখনী যেমন চালাইতেছ তেমি চালাইতে থাকো,' তাহা হইলেই ইজিবিজি লেখায় তোমার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, যত্নের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে লেখনী চালনা করিতে থাক,' তাহা হইলেই ক্রমে তোমার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে।' আমি তাই বলি যে, স্বারাজ্য-পন্থীরা যদি বিধিপূর্ব্বক অভীষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালো'র দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধি'র দিকে, তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে দেখিতে দেখিতে - তা'র সাক্ষী জাপান; আর, তাহার পরিবর্ত্তে যদি অবিধিপূর্ব্বক স্বাভিমত কার্য্যে গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় চোক কান বুজিয়া অগ্রসর হ'ন, তাহা হইলে অনিষ্টসিদ্ধির দিকে তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তরতর করিয়া; তার সাক্ষী—ফরাসীস্ রাষ্ট্র বিপ্লব। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি, আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর:—

অবিধি।

(১) গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি'র প্রত্যাশা।

(২) স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম্ম তেমি পিতা, ইহা ভুলিয়া-বসিয়া-থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা'র দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া মাতাকে "সুজলা, শ্যামলা" প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান।

বিধি।

(১) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্যের যোগ্যতা-উপার্জ্জন।

(২) রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা এবং কাজ-শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অভীষ্ট-সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা উপার্জ্জন।

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদ্গীতা প্রভৃতি লোক-পূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া নব্য ভারতের হিতার্থে কাজের মতো কাজ করিয়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া।*

* সংক্ষেপে বলিলাম, "গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া"—কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথাটির ভিতরে ভাব-একটি যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাণ্ড বিশাল; এম্নি বিশাল যে, তাহা রীতিমত বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলে একটা বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার যৎস্বল্প ইঙ্গিত-আভাস জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত-আভাস এই:—

খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল আছে, মুসলমানদিগের কোরাণ আছে; ভারতবাসীদিগের তেমন-তরো কোনো একটা ধর্ম্মশাস্ত্র কি নাই? অবশ্যই আছে:—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! গীতা যেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র; অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত গীতাশাস্ত্রের প্রভেদও তেমি আশ্চর্য্য প্রভেদ। তার সাক্ষী:—বাইবেলের পুরাতন বিধান ইহুদীজাতির ঐকান্তিক পক্ষপাতী; বাইবেলের নববিধান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী; কোরাণ মুসলমানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাফেরদিগের প্রতি খড়্গহস্ত; কিন্তু গীতাশাস্ত্রে পক্ষপাতের নামগন্ধও নাই উল্টা আরো জগৎসুদ্ধ সর্ব্বপক্ষের সমন্বয় তাহার পাতায় পাতায় গাঁথা রহিয়াছে। গীতাশাস্ত্র দেশ-কাল-জাত-নির্বিশেষে পৃথিবীসুদ্ধ মনুষ্য-মণ্ডলীর মহাশাস্ত্র। তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তের ভক্তি-শাস্ত্র, কর্ম্মীর কর্ম্মশাস্ত্র। এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি—A word to the wise is sufficient। তা বই, সবিস্তরে গীতাশাস্ত্রের গুণ-কীর্ত্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্ঘ্য প্রদান। ঈশ্বরারাধনার অমৃতরস, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি, যোগের তেজোময় অধ্যাত্ম-শক্তি, ধর্ম্মের ধৃতি, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের পুরুষার্থ সাধনোপযোগী যত কিছু পাথেয় সম্বল আছে—ভগবদ্গীতা পাঠে সমস্তই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র জাতিবিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র—আত্মার ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই তাহার বাক্যামৃতপানে আত্মা পবিত্র হয়—ভগবদ্ভক্ত হয়—বিশ্বপ্রেমী হয়—কর্ত্তব্যকর্ম্মে উৎসাহী হয়—সদানন্দচিত্ত হয়—অকুতোভয় হয়—তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় এবং মধুময় হয়। ভগবদ্গীতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মনুষ্য হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না, খ্রীষ্টান হয় না, ইহুদী হয় না, প্রটেষ্টাণ্ট হয় না, কাথালিক হয় না; হয় তবে কি? না মনুষ্য! অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য—মানুষের মতো মানুষ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)।

২

২৭ ডিসেম্বর, মধ্যাহ্নে রাষ্ট্রীয় মহাসভার ষোড়শ অধিবেশন। মণ্ডপ-শালাটি কৃত্রিম-গথিক্-ধরণের একটা বিশাল দালান, এন্‌জিনিয়ারবা এইরূপ মিশ্র-ধরণেব ইমারৎ বেলওএ ষ্টেশানেব জন্য, ক্যাথিড্রাল-গির্জাব জন্য, আদালতের জন্য, গুদোম ঘরের জন্য নির্ব্বিশেষভাবে নিম্মাণ করে। মালা ও পতাকায় বিভূষিত হওয়ায় মণ্ডপটি উৎসবের ভাব ধাবণ করিয়াছে। ইহার পার্শ্বদেশে চট্‌চটে ভিজা ময়দানেব উপর, প্রতিনিধিগণ তাবু পাতিয়া রহিয়াছেন। উহাঁবা তাঁবুতেই আহার করেন, তাঁবুতেই শয়ন করেন। একটা ঔষধেব দোকানের পাশে, অনেকগুলা পুস্তকের দোকান বসিয়াছে, উহাবা উদ্দেশ্য-পত্র (prospectus) বিলি করিতেছে, মোক্ষমূলবের গ্রন্থাবলী, বেদ, স্পেন্‌সারেব "First Principles", লোকদিগকে দেখাইতেছে। কেহ বা য়্যানি বেসান্তের থিয়সফি-সংক্রান্ত পুস্তিকা সকল বিক্রয়ার্থ চারিদিকে ঘুবিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা মণ্ডপের অভ্যন্তরে স্থান পায় নাই—কতকগুলি বক্তা তাহাদের সম্মুখে খোলা জায়গায় বক্তৃতা করিতেছে। এই শীতকালের দিনে, ধূসর বস্ত্রাধারী প্রকাণ্ড সাদা পাগ্‌ড়ীওয়ালা জনতার মধ্যে, লম্বা ও পাত্‌লা পাঞ্জাবীরা সকলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

যে পার্সি-প্রতিনিধির সহিত আমি একত্র ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে 'কমিটির' পাশে সম্মানের আসন-মঞ্চের উপর বসাইলেন। আমার পাশে দুইটি হিন্দু মহিলা ছিলেন; তাহার মধ্যে একটি বিধবা, পুনর্বিবাহ করিয়া অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং আজ তিনি পুরুষদের সম্মুখে কথা কহিবেন। এইবার অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইল: আসন-শ্রেণীর উচ্চ হইতে নিম্নধাপ পর্য্যন্ত, বন্দুকের দেউড়ের মত করতালি ধ্বনিত হইল, এবং যখন নির্ব্বাচিত সভাপতির নাম সকলের কাণে পৌছিল তখন যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—এরূপ সজোরে করতালি হইতে লাগিল। সভাপতি—বোম্বায়ের উকীল চন্দাবর্কার। যেরূপ ভীষণ শব্দ কোলাহল—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম জনতা বুঝি মাতাল হইয়াছে।......কিন্তু তাহা নহে, "ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে", তাই এই উৎসব। চন্দাবর্কার গোড়াকাব একজন কর্ম্মী। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত কাবণে, এই দশ বৎসবকাল তিনি কংগ্রেস্ হইতে তফাৎ ছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিবাব সময় যখন তাঁহাব সেই হিন্দু যোগী-সুলভ প্রশান্ত, সংসার-বন্ধনমুক্ত, সুন্দর মুখখানি, উত্তোলন করিলেন, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী একজন ধর্ম্ম-নেতার ন্যায় তাঁহাব কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল; আজ সন্ধ্যাতেও একটা ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ লোকে শ্রবণ করিবে। কি হৃদয়গ্রাহী চিত্রবৎ দৃশ্য! শ্রোতৃমণ্ডলী যখন চন্দাবর্কারকে দেখিয়া জয়ধ্বনি করিতেছিল এবং পার্সি দাদাভাই ও বাঙ্গালী কেশবেব নামে সিংহনাদ করিতেছিল, তখন ভাবত-সন্তান-দিগের মনে, তাহাদেব সাধাবণ জননী ভারতভূমিই যেন স্পন্দিত হইতেছিল।

সভাপতি, "প্রতিনিধি-ভাইদিগকে" সম্বোধন করিয়া, জলন্ত অনুবাগ ও আদবেব স্বরে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি য়ুরোপীয়ধবণে পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন; একটা আঁটসাট্ লম্বা 'ফ্রক্ কোট্', কিন্তু মাথার পাগড়ীটা বজায় বাখিয়াছিলেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সকল সভ্যেরই মাথায়, দেশীয় শিবোবেষ্টন, কাহারও মলমলের, কাহারও রেশমের, গোলাপী, জর্দ্দা, বেগ্‌নি প্রভৃতি নানা রঙ্গেব; এবং তাহাদের শ্মশ্রুরাজিও কৃষ্ণ ও উজ্জ্বলকান্তি; পার্সি প্রতিনিধিটির মাথায় সাদা ধুচ্‌নী-টুপী, এবং বাঙ্গালী বাবুদের মাথায়, গ্রীক্-পোপ্-দেব মত কালো কিনারাহীন টুপী...... যে পার্সিটি আমার পাশে বসিয়াছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন;—"জাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত একটা 'মিউজিয়ম' তোমার সম্মুখে উপস্থিত।" বাস্তবিক, মাথার-খুলী-পরীক্ষকের পক্ষে কি নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য! শিখেবা লম্বা ও পাত্‌লা, উহারা খাড়া হইয়া দাঁড়ায়; বাঙ্গালীদের মুখ স্থূল ও কোমল; পার্সিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখের এক পাশের অবয়ব-রেখা শকুনির মত; মাদ্রাজিদের চাঁচা পোঁচা, চ্যাপ্‌টা, ফোঁটাকাটা তিলক-চর্চ্চিত মুখ,—পশমি-গলাবন্দে খানিকটা আচ্ছাদিত। আশ্চর্য্য রকম সরু ও অস্থিসার হাত, গায়ের চামড়া রৌদ্রপোড়া, শ্যামল, সাদা ও কালোর অন্তবর্ত্তী সকল প্রকার রং; চাপ্‌কান, আচ্‌কান, অস্পষ্ট ধরণের য়ুরোপীয় ফ্রক্-

কোট, কাশ্মীরি কাপড়, সাদা মলমল—এই সমস্তই রংবেরং আধা-বিলাতী ভারতের বহিরাবরণ; ভারতের এই সকল লোকই সভাস্থলে সমাসীন।

চন্দাবর্কার বিপ্লবকারী দলের লোক নহেন। "ইনি মিতবাদী, রাজভক্ত প্রজা, আমাদের একজন মিত্র"—এই কথা, Times of Indiaর পরিচালক আমাকে বলিলেন। কিন্তু দেখিবে, এই মিত্রটী খুব স্পষ্টবক্তা। আশাময় সুখের ছবি আঁকিবার এ সময় নহে। দুর্ভিক্ষ ত ভারতের একটা পুরাতন রোগের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এবার আরও ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে; এরূপ মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্ব্ব। বাগ্মী বলিলেন;—"তোমাদের বিগত অধিবেশনের পর হইতে ভারতের উপর দিয়া একটা ভয়ানক বিপদ চলিতেছে··· ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষ ভারতে আর কখন হয় নাই·· বর্ত্তমান সময়ের এখন যেটি মহাসমস্যা, সেই সমস্যাটি কতটা গুরুতর ও জরুরী,—এই দুর্ভিক্ষ, দায়ী কর্ত্তৃপক্ষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইল; ইহাতে আর কিছু না হউক, সরকারের একটা শিক্ষা হইয়াছে।" স্থূল কথাঃ- ভারত অনাহারে মরিতেছে; তাহার অন্ন চাই। অতএব এ সমস্যাটি এমন নহে, যাহার আলোচনা অন্য দিনের জন্য স্থগিদ রাখা যাইতে পারে। আজই এবিষয়ের একটা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। ত্রিশকোটি ভারতবাসীর পক্ষে ইহা একটা জীবন-মরণের সমস্যা।

দেখ, কেমন সময়ে ১৯০০ অব্দের কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ বিষাদ-অন্ধকার ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। তার পর ভাবিয়া দেখ, শাসন-কার্য্যে যে জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত সেই জাতির দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে-- আর, ১৫০ বৎসর হইতে এই শাসনকার্য্য চলিতেছে; ভাবিয়া দেখ, ভারতে কত খাল আছে, কত রেল-পথ আছে···ইহার গূঢ় রহস্যটা এইখানেই, এই রহস্যটি উদ্ভেদ করা আবশ্যক।

চন্দাবর্কার বলিলেন, এস্থলে ইংরাজের রাষ্ট্রনীতিই ঘোরতর অপরাধী। এই রাষ্ট্রনীতি সমস্তই উপেক্ষা করিতেছে, সমস্তই ঘটিতে দিতেছে, ইহা একেবারেই উদাসীন: একি কখন কল্পনা করা যায় যে, আপনা-আপনিই সব দুরস্ত হইয়া আসিবে? যখন উঁহারা প্রতিবিধানকল্পে কোন কাজে হাত দেন, তখন কি ভাবে কাজ করেন? এখানে একটা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দেন, ওখানে একটু ফাটার মুখে কাঠ গুঁজিয়া দেন, যেখানে একটু চীর খাইয়াছে, যেখানে একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপস্থিত মত সেই সেই স্থানে টুকি টাকি মেরামৎ করেন। এ সমস্ত টুক্‌রোটাক্‌রা মেরামৎ না করিয়া, শুধু প্রশমনকারী ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া, একটা সর্ব্বতঃ-প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা, অনিষ্টের সমস্ত কারণ নিরীক্ষণ করিয়া, উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করা আবশ্যক···ইহাদের এই শাসন যন্ত্রটা অত্যন্ত গুরুভার ও মন্থরগামী; কমিসন্ বসে, পরামর্শ সভা বসে, রিপোর্ট গাদা করা হয়, কিন্তু কাজে কিছুই হয় না এই কথাটা আমার কানে বাজিল; ইহার পূর্ব্বেও এই কথা আমি অন্যত্র শুনিয়াছি। অসন্তুষ্ট লোকেরা আমাদের সরকারী কর্মচারীবর্গের কার্য্যসম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজের এমন নিয়ম-পদ্ধতি, এমন চমৎকার সিভিল সার্ভিস্,—যাঁহারা সমস্ত উন্নতি-জনক কার্য্যের স্বতঃপ্রবর্ত্তক,—এমন "বাদ্‌শাই-জাতি"?— এ সমস্তই আকাশ-কুসুম!

দুই তিনটি সুবিধাজনক অলস কুসংস্কার---এই জড়বৎ রাজপুরুষবর্গের দুইটি কাণ। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য, কেন না ফসল জন্মায় না, বৃষ্টি হয় না" পূর্ব্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি হয়, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? M. De Buelowর ন্যায় কেহ কেহ আবার বলেনঃ—ইহা হিন্দুদেরই দোষ, উহারা "খর্গোসের ন্যায় বংশবৃদ্ধি করে।" আরও একটা বলবৎ কারণ,—উহারা উৎসবে, ভোজে, বিবাহে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে·· চন্দাবর্কার বলেন, যে সকল কথা উহাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক, সেই সকল অযুক্তিপূর্ণ কারণের উল্লেখ করিয়া উহাঁরা চোখ্ বুজিয়া থাকেন; চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেও উহাঁরা দেখেন না যে, দুর্ভিক্ষের দারুণতা ও ব্যাপকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে. কারণ সর্ব্বস্বান্ত চাষা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না, তাই অগত্যা প্লেগের কবলে পতিত হয়! ইহাই প্রকৃত কথা, এবং পাছে নিজের উৎসব-আমোদের ব্যাঘাত

হয় তাই এই দারুণ সত্যটি রাজপুরুষেরা একপাশে সরাইয়া রাখেন। চন্দাবর্কার বলেন, ভাইস্‌রয়ের প্রদত্ত তথ্য-তালিকা হইতে আমি এই সকল সংখ্যাঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভায় সম্ভাষণকালে বড়লাট নিজেই চাষার আয়ের অঙ্ক ১৭৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। ইহাই সুবৃষ্টি ও সুজন্মা বৎসরের আয়। এই অবস্থায় চাষাকে কি বলা যাইতে পারে, তোমাদের এই মুখের গ্রাস দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ দুর্বৎসরের জন্য রাখিয়া দেও ?

ইংরাজসরকার এক একবার হঠাৎ জাগিয়া ওঠেন, হঠাৎ এক একবার তাঁহাদের মনে দয়ার আবেশ উপস্থিত হয়, তাঁহাদের প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি জ্বরবিকারের রাষ্ট্রনীতি, মৃগীরোগের রাষ্ট্রনীতি! মহাজনের উপর আড়ী করিয়া উহাঁরা তাড়াতাড়ি চাষার সাহায্যে ধাবিত হয়েন। উঁহারা এইভাবে কতকটা কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজ-সরকারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা শুধু একটা চোখ্ ভুলানো জিনিস্। এটা বেশ জেনো, যাতে সরকারের বিরুদ্ধে চাষা আত্মরক্ষা করিতে না পারে সে বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আছে,—সরকার মহাজন অপেক্ষাও অধিক অর্থলোলুপ! এদিকে চাষা, এত বেশী খাজনা দিতে পারে না বলিয়া চীৎকার করিতেছে, ওদিকে রাজস্বের কর্ম্মচারী খাজনা আদায়ের জন্য ঘাটিদিয়া বসিয়া আছেন। মনে কর, কোন চাষা,—সুজন্মার দরুণই হউক, খাল-কাটার দরুণই হউক, রেল আসার দরুণই হউক—ফসলের কিছু বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে; অমনি রাজস্ব-কর্ম্মচারী তাহার খাজনার হার বৃদ্ধি করিলেন। উৎসাহ দিবার চমৎকার পদ্ধতি! আর একটা দৃষ্টান্ত:—লর্ড মেয়ো কৃষি-সচিবের পদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—সে পদটা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইল। একদিন তাঁহাদের মনে হইল, চাষাদের কার্য্যপদ্ধতি সমস্ত উল্টাইতে হইবে;—এই মনে করিয়া যাঁহারা আপনার ব্যবসাই বোঝেন না তাঁহারা চাষাকে চাষার ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। আবার পরদিনই তাঁহাদের হঠাৎ মনে হইল,—না, পুরাতন পদ্ধতিটাই ঠিক্। চাষাদের কাজে চাষারা পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছে; উহাদিগকে নূতন শিক্ষা দিবার কিছুই নাই। ফলত, এতদিনের মধ্যে আসল কাজ কিছুই হয় নাই।

তাহার পর বাগ্মী, সরকারের শিল্পসম্বন্ধীয় নীতির কথা উপস্থিত করিলেন। এই রাজভক্ত ইংরাজের মিত্র,—যে বিষয়ে বলিতে খুবই সঙ্কোচ হয় সেই বিষয় সম্বন্ধেও কতকগুলা স্পষ্ট স্পষ্ট কথা তাঁহার মিত্রদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন। আরও কতকগুলা বলবত্তর স্বার্থ যদি তাঁহার মিত্রদিগকে অন্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তাঁহার ঐ উত্তেজনা-বাক্য তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিশ্চয়ই উদ্বোধিত করিতে পারিত। প্রথমে, যাহা সর্ব্বসাধারণের মনোগত ভাব তাহাই বাক্যে ব্যক্ত করিয়া তিনি বলিলেন, যাহাতে আমাদের যুবকেরা হাতের কাজ কিছু শিক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশে কতকগুলি ব্যবহারিক-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্তই আবশ্যক। আমি ভারতে আসিয়া অবধি সংবাদপত্রে সভাসমিতিতে, এই বিষয়েরই কথা সর্ব্বত্র শুনিতেছি। একথা খুবই ঠিক্, যে দেশে ধ্যানের দিকেই লোকের বেশী ঝোক্ সে দেশে মিস্ত্রিকর্ম্মের শিক্ষানবীসী নিতান্তই আবশ্যক। পর বৎসরে, যখন আবার চন্দা-বর্করের সহিত ফ্রান্সে আমার সাক্ষাৎ হইল, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয়টা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। "একই ভাবে আছে, কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এবিষয়ের কথা অনেক হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সরকার এই বিষয়ে কোন সাহায্য করিলেন না, কোন ভারই গ্রহণ করিলেন না। তাহারা ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা ও যত্নের উপরেই নির্ভর করিয়া আছেন।" এই সমস্যার আর এক দিক্ আছে, বাগ্মী সেটি বেশ বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সাদা কথাটা এই: ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিবে, ইহা ইংলণ্ড মোটেই চাহে না; ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কাট্‌তির জন্যই ভারত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বড় বড় কারখানাওয়ালারা বড়লাটের হাত আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইংরাজের বিধিব্যবস্থা যতই স্বার্থপর ও গর্হিত হউক না কেন, কোন প্রতিবাদই সেই সকল বিধিব্যবস্থাকে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। প্রথমত, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের শতকরা ৫ টাকা যে প্রবেশ শুল্ক ছিল তাহা রহিত হইল। তাহাতেও যখন প্রকৃত অভিপ্রায়

সিদ্ধ হইল না, তখন বড়লাট দেশীয় কলের কাপড়ের উপর আভ্যন্তরিক (excise) শুল্ক স্থাপন করিলেন—যাহাতে দেশীয় কাপড় ক্রয় করা ক্রেতাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারত অনাহারে মরিতেছে; কিন্তু বড় বড় কারখানাওয়ালাদের বেশ উদর পূর্ত্তি হইতেছে। এই স্বার্থপরতাকে, উচ্চভাবের বড় বড় কথা দিয়া ঢাকিবার আবশ্যক কি? Lord Salisbury শতকরা ৫ টাকা হারের প্রবেশ শুল্ক রহিত করিবার সময় যে চমৎকার হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ স্মরণ হয়। "ভারতের কল-কারখানার তরুণ শিল্প বড় শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতেছে, উহার এই অতিদ্রুত বৃদ্ধি নিবারণ করা আবশ্যক।" এই আশীর্ব্বাদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই তিনি দেশীয় কারখানাগুলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এ যেন একজন দস্যু কোন পথিককে রাস্তায় পাক্‌ড়াও করিয়া বলিতেছেঃ—"ভাই আমি দেখ্‌ছি, তুমি বড় মোটাচ্চ—তোমার ভুঁড়ি বাড়িয়া যাইতেছে—এ বড়ই দুঃখের বিষয়···আমি নির্ম্মূল করিয়া তোমার রোগটা সারাইয়া দিব—এস তোমার ভুঁড়ী গালিয়া দিই—আর তোমার ঐ টাকার থলিয়াটা··"

কিন্তু তবু ভারত কিছুই বেশী দাবী করিতেছে না। ভারত শুধু নম্রভাবে বলিতেছে,—ইংরাজ তুমি যে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভাণ করিতেছ এ মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া দেও, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের ন্যায়, ভারতে ভারতীয় দ্রব্যজাতকেও নিঃশুল্ক করিয়া বিক্রয়ের পথ মুক্ত করিয়া দেও। বাগ্মী আরও চাহেন যে, রুড়কী ও লণ্ডনের এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ যাহা ভারতের অর্থে পরিপোষিত হইতেছে তাহার দ্বার দেশীয়দের জন্যও মুক্ত রাখা হয়। এ কথা কি গ্রাহ্য হইবে? না। এ সকল মোটা মোটা বেতনের কাজ, ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার, ইংরাজ কার্য্য পরিচালকদের জন্য রক্ষিত; এই সকল মোটা বেতনের কাজ পাইবার জন্য ইংলণ্ডের লোক দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে! এই সকল কাজের গুপ্ত ভিক্ষুক অনেক, কিন্তু অল্প লোকই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাচনের কত প্রার্থী, কত ক্ষুধিত লোক, কত উমেদার কাজ পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই!

তারপর, ভারত, শাসন-ব্যয় ও সামরিক-ব্যয়ের ভারে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে! ভারতের তহবিল—ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ভাণ্ডার; ভারতের গড়খাই ছাউনি হইতেই ইংলণ্ড, আফগানিস্থানের উপর, তিব্বতের উপর, চীনের উপর, ব্রহ্মদেশের উপর, এমন কি ঈজিপ্টের উপর আক্রমণ করিয়া থাকেন। যে ভারত চীরবসন পরিধান করিয়া আছে, অনাহারে মরিতেছে, সেই ভারতকে এই সকল আমীরী-চালের রাজপুরুষদের জন্য, —এই সকল রাজপুরুষদের বিলাসসামগ্রীর জন্য, অর্থ যোগাইতে হইবে ····· উহারা প্লেগের অছিলা করিয়াও কি ভারতকে শোষণ করিতেছে না? উহারা ভারতের ব্যয়ে, ইংলণ্ড হইতে ডাক্তার আনিতেছে, রোগ-সেবকদিগকে আনিতেছে—

দেশের এই ভীষণ অবস্থায়, প্রতিবিধানের উপায় কি? একটুও কালবিলম্ব না করিয়া, উদ্যমের সহিত ইহার একটা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, শুধু ভাসা-ভাসা উপায় না—এমন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যাহা মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে। খাজনা কমাইতে হইবে, কৃষিবিভাগে একজন সচিব নিযুক্ত করিতে হইবে, অধিক পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে, দেশীয় পণ্যকে অন্তত দেশের মধ্যে অবাধ করিয়া দিতে হইবে!

এই বক্তৃতাটি একটা দলিল বিশেষ। তাই এই বক্তৃতাটিকে আমি এত প্রাধান্য দিতেছি। বর্ত্তমানকালে দেশের যে সকল দাবী দাওয়া আছে, বাগ্মী সংক্ষেপে সেই সমস্তের উল্লেখ করিলেন। তিনি বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমালোচনা করিলেন, এবং কোন প্রকার উগ্রতা প্রচণ্ডতা কিম্বা উত্তেজনা প্রদর্শন না করিয়া বেশ শান্তভাবে ঐ সকল সমস্যা সম্বন্ধে দেশীয় লোকের কি অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতাটি রাজভক্ত মিতবাদী ভারতের মনের কথা।

সভাপতি সভার কার্য্য-তালিকা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং সভার নির্দ্ধারিত প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। সভায় বক্তা অনেক, শ্রোতাও অসংখ্য। প্রতিনিধির সংখ্যা এক সহস্রের অধিক। সভার বিচিত্র উপাদান, সময় সংক্ষিপ্ত; সভ্যগণ বৎসরের মধ্যে শুধু একবার সকল বিষয় ছুঁইয়া যান মাত্র

ক্রন্ত এলোমেলো ভাবে নহে, অস্পষ্ট ভাবে নহে ;—
াামাদের পার্লেমেণ্ট-অঙ্গনে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণের যোগ্য।
ারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাদ হইবে, বিচ্ছেদ
টিবে, ঝগড়া বাধিবে বলিয়া যাঁহারা ভবিষ্যৎবাণী করিয়া-
ছলেন, তাঁহাবা তাঁহাদের ভবিষ্যৎবাণীর মূল্য আদায়
রিবার জন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনার ভাব হইতেই হউক, কিম্বা
াাত্মমর্য্যাদার ভাব হইতেই হউক, বক্তাবা নাটকীয় ধরণের
াঙ্গভঙ্গী, রাজা-উজীর মারার ভঙ্গী, বিরক্তিজনক ভঙ্গী
যত্নে পরিহার করিয়া ছদ্মবেশী বিপক্ষদলের সকল চেষ্টা
ও মৎলব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটা
ঐকমত্য ছিল। তবে, এই সভার মধ্যে কোন্ দল বেশী
বশী দাবী করে, কোন্ দল একটু বেশী ভীরু, উহাদের
ধ্যে কাহারা "দক্ষিণ পক্ষ" কাহারা "বাম পক্ষ"—উহাদের
ধ্যে প্রকৃতিগত তারতম্য কিরূপ, তাহা বোঝা কঠিন
াহে।

নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলা ঐকমত্য-সহকারে গৃহীত হইল ;
ভাসমিতিতে এরূপ ব্যাপার অনন্যসাধারণ। সকল
ক্তাই প্রস্তাবের সমর্থন কিংবা পোষকতা করিতে লাগি-
লন। তবে কি, অনুকুলবাদীদিগকে বাছাই করিয়া
াইয়া প্রতিকূলবাদীদিগকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল ?—
া, তাহাও নহে। দ্বার অবারিত ছিল। সমস্ত ভারতের
লাক, এক পরিবারের মত, দ্বার রুদ্ধ না করিয়া, আপনাদের
ার্থসম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছিল। ভারত কথা
হিতেছেন—আর সমস্ত রাখাল-বালক যেমন কৃষ্ণের
ংশীধ্বনি শুনিয়া চারিদিক হইতে আসিয়া জোটে, সেইরূপ
ারতের সমস্ত প্রতিনিধি এখানে সমবেত হইয়াছেন।
এই সভায় অনেকগুলি বাগ্মী আছেন, ভাল ভাল বক্তা
াাছেন, ভাল কথা-কহিয়ে লোক আছেন, তাঁহারা
অতীব দক্ষতার সহিত ইংরাজি বলেন। একজন
ইংরাজ আমাকে বলিতেছিলেন ;—"উহারা বেশ ইংরাজি
বলে, আমাদের অপেক্ষাও ভাল বলে ; আমাদের ভাষা,
উহাদের মুখে, একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করে।"
াঁ, উহাদের ইংরাজিতে কেমন একটা তরলতা, কেমন একটা
প্রাচ্যধরণের জলন্ত উচ্ছ্বাসের ভাব আছে। তবে, উহাদের
ইংরাজি উচ্চারণে একটু বৈদেশিক 'টান্' আছে। বক্তাদের
মধ্যে, চন্দাবর্কারের বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও তাঁহার
বক্তৃতায় হিন্দুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পায়।
তবে, বাঙ্গালীরা তাঁহারও উপর টেক্কা দিয়াছে ; 'র‍্যাডি-
ক্যাল্' বক্তা ব্যানর্জি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিলেন।
তাঁহার বক্তৃতায় লাহোরের ছাত্রবৃন্দ খুব হাততালি দিতে
লাগিল। ব্যানর্জি খুব উৎসাহের সহিত 'দাঙ্গার' মধ্যে
প্রবেশ করিলেন, একবার বামে, একবার দক্ষিণে, গবর্ণ-
মেণ্টের জঙ্গলে, অনবরত কুড়ালীর ঘা মারিতে লাগিলেন।
ইনি ইংরাজসরকারেব একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী—ইংরাজ-
সরকার অন্যায় করিয়া ইহঁাকে কর্ম্মচ্যুত করে। পুণার
সংবাদপত্র-পরিচালক তিলক্,—একজন পণ্ডিতলোক, কাজের
লোক, একজন উৎসাহী "জাতীয়-পন্থী," (nation-
alist) ইনি সম্প্রতি জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন,
ইঁহার তীব্র লেখনীই ইঁহাকে কাবাগারে নিঃক্ষেপ করিয়া-
ছিল। এখন ইনি লোকের পূজার পাত্র। এই সকল
প্রবীণ বথীদের পাশে ছেলেব দল, শিক্ষানবীসের দল।
ইঁহাদের গায়ে এখনও দুধের গন্ধ ছাড়ে। ইহারা আলঙ্কা-
রিক ধরণে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় 'মরিয়া' হইয়া লোকদিগকে
উদ্বোধিত করিতে লাগিল। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ কোন কোন
ব্যক্তি স্বদেশী ভাষায় বক্তৃতা কবিল। এই বক্তৃতার ভাষা
সকলেরই খুব পরিচিত, ইহাতে হাস্যরস আছে, চলিত
প্রবাদ ও প্রবচনে ইহা পরিপূর্ণ,—এই বক্তৃতায় সভাশুদ্ধ
লোক প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল ; কেহবা উর্দ্দুতে, কেহবা
গুজরাটীতে, কেহবা বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিল ; এই ভাষা-
বৈচিত্রের মধ্যে ইংরাজ, ভারতেব অদ্ভুত ঐক্য উপলব্ধি
করিতে পারেন।

যে সকল প্রস্তাব ঐকমত্য-অনুসারে সভায় গৃহীত
হইল তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। বুঝিতেই পারিতেছ,
এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অশরীরী প্রেমের ভাব
(platonic) কিছুই নাই। কোথায় কে ফুস্ ফুস্ করিল,
কোথায় কে টু-শব্দ করিল, বাতাসের গতি কোন্ দিকে,
লোকমতের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে,—ইংরাজ সজাগ-
ভাবে সর্ব্বদাই কাণ পাতিয়া রহিয়াছেন। ইংরাজের অনেক
বিধিব্যবস্থাই এই কথা সপ্রমাণ করিয়াছে। ইহা বেশ

জানাই আছে, ইংরাজ-সিংহ সিংহ-গ্রাসটা আপনার জন্যই রাখিয়া দেন। যে সকল দুঃখ কখনই ঘোচে না—সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—সেই সকল দুঃখের কথা, অদম্য জিদের সহিত, কংগ্রেসে, প্রতি বৎসর পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইয়া থাকে :—এই আশায় যে বড়লাটের দরবারে ইহার আলোচনা ও বিচার হইবে।

কংগ্রেসের এই সকল প্রস্তাব বিবৃত করিলে, ভারতের অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস বলা হইবে। সম্প্রতি যে সব প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইল এক্ষণে আমি তাহাই বিবৃত করিব।

প্রথম প্রস্তাব দেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। একটা ফসলের ক্ষতি হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ চাউলের অভাবে, কিংবা বাজরার অভাবে উৎপন্ন হয় না—কেননা, এই সকল শস্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ব্যবসাদাররা সর্ব্বদাই উহার আমদানী করিতেছে;—চাষা যে এক মুষ্টি বাজরার অভাবে মরে, সে শুধু অর্থের অভাবে। সরকার বাহাদুর উত্তর করেন :—"বৃষ্টি হয় না", এবং এই কথা বলিয়া হতাশভাবে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু একেবারে অন্ধ কিংবা বধির না হইলে, একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না যে (কংগ্রেসের প্রত্যেক বক্তাই এই বিষয়ে পোষকতা করেন) জলপ্লাবন কিংবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত, ইহা একটা ব্যোম-তাত্ত্বিক ব্যাপার—কিংবা অনিবার্য্য দুর্ঘটনা। ইহা কি শুধু একটা মৌসম-বায়ুর খেয়াল?—হাস্যজনক কথা। আসল কথাটা এই, ক্ষুদ্র কৃষক,—দৈন্য-দায়ে একেবারে রিক্তহস্ত,—দুর্ভিক্ষের দুই অঙ্গুলী ব্যবধানে সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কেননা, সে রোজ আনে রোজ খায়; ফসল জন্মিলে সে বাজরার রুটি একটু খাইতে পায়, অজন্মা হইলে, আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে, সঞ্চয়ের অভাবে, খাদ্য ক্রয় করিবার অর্থের অভাবে, সে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। তাহাকে অর্থ সঞ্চয় করিবার অবসর দেও—দেখিবে, তাহার ভাল অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার পর কংগ্রেসে একটা অনুসন্ধান-সমিতির প্রস্তাব হইল, যে সমিতি স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা সকল বিষয়ের উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। অবশেষে সরকার বাহাদুরের জানা উচিত,—যদি রোগ গুরুতর হইয়া থাকে, তাহার ঔষধ সরকার বাহাদুরেরই হাতেই আছে, সরকার বাহাদুরই তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন। দেশের ধন-উৎস কোথায়, অবশ্য সরকারবাহাদুর তাহা জানেন, এবং ইহাও জানেন সেই সকল ধন-উৎস পর-হস্তগত হওয়ায়, ও তাহার স্রোত-মুখ উল্টা দিকে ফিরাইয়া দেওয়ায় তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। এখন এই উল্টা স্রোতের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য কতকটা বীরত্ব চাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব শাসনকার্য্য সম্বন্ধে। যাহাতে সরকার বাহাদুর বিচারশক্তিকে শাসনশক্তি হইতে পৃথক্ রাখেন, কংগ্রেস এই বিষয়ে খুব জোর করিয়া বলিয়াছেন। এই বিষয়ের সংস্কারটি হইবে বলিয়া অনেকবার অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ক্রমাগত স্থগিদ রাখা হইতেছে; কিন্তু এখন ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার পরিপক্ক সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতের কতকগুলি রাজপুরুষ ও কতকগুলি বেসরকারী স্বাধীন ব্যক্তি ইহার পোষকতা করিয়াছেন। লর্ড হব্‌হৌস্, সার ডাব্লিউ ওয়েডারবর্ণ, ইহার অনুকূলে একটা আবেদন স্বাক্ষর করিয়া সেই আবেদন ষ্টেট্ সেক্রেটারীর যোগে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংস্কারে ভারতের কতটা স্বার্থ আছে তাহা একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। একজন ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনকর্ত্তার হাতে, জেলা মেজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা, উকীল মোক্তারের ক্ষমতা, আপীল-বর্জ্জিত বিচারকের ক্ষমতা একত্র সম্মিলিত। তিনিই নালীস দায়ের করেন, তিনিই অপরাধ সাব্যস্ত করেন, তিনিই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। ইহা যেন চিরন্তন "অবরোধের অবস্থা"। কোন বাধা আটক না থাকায়, কোন প্রাচ্য নবাব যেমন যথেচ্ছাচার করিতে পারেন, আমি সেইরূপ খাম্‌খেয়ালী যথেচ্ছাচারের কথা বলিতেছি না। এখানকার বিপদ—ইংরাজ রাজ-পুরুষের ক্ষমতা। তাঁহার এতটা অবজ্ঞা,—নেটিভ্‌কে তিনি মানুষের মধ্যেই গণনা করেন না, তাহার কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন না—তিনি তাহার সংস্রব সযত্নে বর্জ্জন করেন। তিনি তাহার পরিচয় পান শুধু পুলিসের দ্বারা! অধস্তন কর্ম্মচারীরা যে রিপোর্ট দেয়, যে সংবাদ দেয়, তাহারা যে অদক্ষতা প্রকাশ করে,

তাহাতেই তিনি একেবারে "হাত-পা-বাঁধা" হইয়া পড়েন!

কংগ্রেস হইতে ৮ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া, সেই প্রতিনিধিগণ এই দুই প্রস্তাব বড়লাটের দরবারে অর্পণ করিবে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবে কতকগুলি বিষয়ের দাবীদাওয়া করা হইয়াছে, এই দাবীদাওয়াগুলি প্রত্যেক কংগ্রেসেই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে "নেটিভেরা" শাসন বিভাগের ও সামরিক বিভাগের কাজ পায়, এবং কতকগুলি বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়, তাহাই এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে।

হিন্দুদের অর্থে সরকারের তহবিল পুষ্টি হইতেছে, অথচ হিন্দুদের নিজের দেশেই হিন্দুদিগকে সরকারী উচ্চপদ হইতে "একগুঁয়েমি"-সহকারে তফাৎ রাখা হইতেছে। ১৮৩৩ অব্দে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং "জন্ম জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতীয় প্রজামাত্রই সরকারী কার্য্যের অধিকারী" এই সাম্যনীতিসূচক সনন্দটি রাণী কর্তৃক ১৮৫০ অব্দে অঙ্গীকৃত হওয়ায় ও ১৮৫৫ অব্দে আবার গম্ভীরভাবে পরিপোষিত হওয়ায়, দেশের লোকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই সেই সকল আশা উন্মূলিত হইল। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ পর্য্যন্ত ভারতের "স্বর্ণযুগ" কিংবা উদারনীতির যুগ। এই উদারনীতি, ইংরাজের উপনিবেশ-রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল··· তাহার পর হইতে আবার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। "সাম্রাজ্যিক-নীতি" বলবতী হওয়ায় আবার উল্টা স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উপনিবেশরাজ্যে "নেটিবের" বিরুদ্ধে, বিদেশীর বিরুদ্ধে—ইংরাজ "রক্ষিত শ্রেণী"দের আক্রমণ চলিতেছে। দেশীয় লোকেরা যে সব ছিদ্র দিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সেই সব ছিদ্র এখন সযত্নে বুজাইয়া দেওয়া হইতেছে। সিভিল-সার্ভিসের পরীক্ষা, লণ্ডনে হইয়া থাকে; সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহাতে যোগ দেওয়া ভারতীয় যুবকদের পক্ষে কতটা সহজ তা বুঝিতেই পারিতেছ···ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের দ্বার তাহাদের প্রতি রুদ্ধ; তাহারা সৈন্যবিভাগের, পুলিস্-বিভাগের, পূর্ত্ত-বিভাগের, ষ্টেট্-রেলওএ-বিভাগের, আফিম-বিভাগের, পর্মিট্-বিভাগের, টেলিগ্রাফ্-বিভাগের বড় বড় কাজে প্রবেশ করিতে পায় না মাসিক ৩০৲, ৪০৲ টাকার ছোট ছোট কাজ, খুব উদারভাবে উহাদিগের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডনে, কোন হিতকারী সভার নাম খুদিয়া দিলেও উহা অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়। বানার্জি বলেন, মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর, তাঁহার সৈন্যের মধ্যে ও তাঁহার দরবারে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতেন। ন্যায়-বিচারের কথা আমরা বলিতেছি না, ইহা রাষ্ট্রনীতির অনুমোদিত। যাঁহারা দূরদেশে থাকিয়া উচ্চ আসন হইতে ভারত শাসন করিতেছেন, তাহারা যদি দেশীয়দিগকে উচ্চ-পদে নিযুক্ত করেন,—তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইয়া, তাঁহাদের সর্ব্বাংশেই লাভ হইবার কথা। ইংরাজকে যে বেতন দিতে হয় তাহার বিশ অংশের এক অংশ দিলেই, একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান, সেই কাজ অনায়াসেই করিতে পারে।

কংগ্রেস একটা নূতন কথা বলিয়া শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শিল্পশিক্ষা,—আজকালের আলোচনার একটা প্রধান বিষয়। লর্ড কর্জ্জন মাদ্রাজে বলিয়াছিলেন, এই শিল্পশিক্ষার কথা শুনিয়া শুনিয়া তাঁর কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। এই শিল্পশিক্ষার সাধারণ ভূমিতে সকল দলই একত্র মিলিত হইতে পারেন। দেশের পুরাতন শিল্পের অবনতি হইতেছে, কল-কারখানা ছোট ছোট ব্যবসায় ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন সেই রক্ষণশীল দল, এবং যাঁহারা আশা করেন, আমাদের কারিগরেরা, বিলাতী কলকৌশলে একবার দক্ষতা লাভ করিলে, আমাদের দেশের অনেক অনুৎপন্ন জিনিস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, সেই সংস্কারের দল—এই উভয় দলই একত্র সমবেত হইতে পারেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্য, বম্বের একজন ধনকুবের পার্সি,—কার্ণেজির একজন প্রতিদ্বন্দ্বী,—বহু লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কংগ্রেস এই জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। কংগ্রেস স্থির করিলেন, এখন হইতে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে, ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শিল্পের আলোচনায় অন্ততঃ দিনের অর্দ্ধভাগ

নিয়োগ করা হইবে। তখনই এই বিষয়ের আলোচনা ও ইহা কার্য্যে পরিণত ক'রবার জন্য দুইটি বিশেষ কমিটি নির্দ্ধারিত হইল।

সমাজসংস্কারের আলোচনার জন্য কংগ্রেসের শেষ দিনটি রাখা হইয়াছিল। এই বিষয়ে ভারতের অনেক করিবার আছে। যদি ভারত আপনার গৃহ-সংস্কারে সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে ভারত আবার গৃহের কর্ত্তৃত্ব ফিরিয়া পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভাপতি বলিলেন, "সমস্ত হিন্দু-সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বেশ অনুভব করা যায়।" কথাটা সত্য। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশব এই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সময়ে, কত লৌকিক সভা—বিশেষত কত ধর্ম্ম-সভা যে স্থাপিত হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই;—আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, পরামর্শ-সমিতি গঠন করিতেছে, প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠাইতেছে, পুস্তিকা বিতরণ করিতেছে। সভাপতি বলিলেন, পাঁচ বৎসর হইল, বর্ণগত কুসংস্কার সত্ত্বেও, তিনি তাঁর বাল-বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে ভয় পান নাই। তিনি এই বিষয়ে আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিয়াছিলেন; তিনি কাশীর পণ্ডিতদের মত আনাইয়াছিলেন। ইহার পর, আর ৫ জন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। ৫ জন মাত্র—তুমি বলিবে, ইহাত তুচ্ছ ব্যাপার! হাঁ, কিন্তু মনে থাকে যেন, ইহা আন্দোলনের আরম্ভ কাল মাত্র, এই সবে—সে দিন হিন্দু বিধবারা পতির চিতায় পুড়িয়া মরিত। এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে কংগ্রেসে কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ হয় নাই; আমার ভুল হইয়াছে। একজন ভীষণ-দর্শন ধর্ম্মোন্মাদ স্বস্থানে দাঁড়াইয়া সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে লাগিল, তারপর তাড়াতাড়ি বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট বেদীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে উহাকে কেহ কথা কহিতে দিতেছিল না। কিন্তু সে কোন প্রকারে আপনার বক্তব্য শুনাইয়া দিল; সে মৃগী-রোগীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বুঝাইয়া বলিল যে, সভাপতির কথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই কদাকার ভীষণ লোককে দেখিয়া ও তাহার উন্মাদবৎ অঙ্গবিক্ষেপ নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ মনে হয় যে এ লোকটা তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার সহিত যাহাদের মতের মিল নাই তাহাদিগকে অনায়াসে আগুনে পুড়াইতে পারে—তাহার জন্য উহার কিছুমাত্র পশ্চাত্তাপ হয় না। কিন্তু সভার লোকেরা কি করিল?—তাহাদের ভয়ানক আমোদ হইল। এ একটা শুভ চিহ্ন। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ভারতের রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা এই দেশাচারকে বেশী আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। অতএব অগ্রে উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য, সমাজ-পরিষদ পরামর্শ দিলেন। বিবাহের বৈধ বয়ঃক্রম ১২ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া একটি প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

সমাজ সংস্কারের সমস্ত চেষ্টা একস্থানে যাহাতে কেন্দ্রীভূত হয়, ইহাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই পরিষদের প্রভূত প্রতিপত্তি। এই পরিষৎ নিষেধ-আজ্ঞা কিংবা সমাজ-চ্যুতির আদেশ প্রচার করেন না। কিন্তু পরিষদের বক্তৃতা কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া সমাজ-দিগন্তে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করে।

এই বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে সকল ছোট ছোট মন্দির উঠিয়াছে এখন সেই সকল মন্দিরগুলি দেখিতে আমার বাকী আছে। একটা খোলা জায়গায় আর্য্য সমাজের একজন প্রচারক ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিল, আমি সেইখানে গেলাম। যে দিন কংগ্রেসের কাজ শেষ হইয়া গেল সেই দিন সন্ধ্যাকালে চন্দাবর্কার তাঁহার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের সহিত লাহোর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মিলিত হইলেন। আমি সেখানকার মাদুরের উপর একটা স্থান অধিকার করিয়া-ছিলাম। সেখানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক ছিল, আমিও তাঁহাদের সহিত, অনন্ত অসীম নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পুরুষের গূঢ় রহস্যের উচ্চ আকাশে "উত্থান" করিলাম।

আমার স্মরণ হয়, দক্ষিণ-দেশে বেজওয়াদায় (Bez-wada) একবার আমি দেখিয়াছিলাম, দুইটি যুবক হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছে,—একটি তামিল, আর একটি মারাঠা; ভাষা ও ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও, ইংরাজি-বিদ্যালয় উভয়কে একসূত্রে বাঁধিয়াছে,—ইংরাজিই উভয়ের সাধারণ ভাষা। এইরূপে ধর্ম্ম ও বর্ণঘটিত কুসংস্কার দিন দিন হ্রাস হইতেছে। এই সংকীর্ণ ও প্রাচীর-বদ্ধ সমাজমণ্ডলী,

বর্ণের স্থানে, একটা অপেক্ষাকৃত উদার ও স্বাধীন সভা স্থাপন করিয়াছে,—জাতীয় সভা স্থাপন করিয়াছে। এই জাতীয়তার ভাব হইতেই কংগ্রেস প্রসূত হইয়া, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, জাতীয়ভাবের বীজ দু-হাতে ছড়াইতেছে।

সমসাময়িক ভারতের মধ্যে, এই ন্যাশানাল কংগ্রেস যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের জিনিস, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-প্রকৃতি পার্লেমেণ্টী-শাসনতন্ত্রের বিরোধী নহে: তার সাক্ষী, এখানকার গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহ ও সেই সব ক্ষুদ্রাকারের পার্লেমেণ্ট যাহারা "জাতের" উপর কর্তৃত্ব করে। এই সকল পঞ্চায়ৎ-সভার দোষ এই যে উহারা বড়ই সংকীর্ণভাবাপন্ন, "একল-ষেঁড়ে", পর-প্রবেশরোধী, ও সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ-- তাই, উহারাই দেশের দুর্ব্বলতার একটা প্রধান কারণ হইয়াছিল। প্রত্যেক মণ্ডলীই, সমবেত গ্রামশাসনের পক্ষপাতী না হইয়া, নিজ গ্রামের স্বতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী ছিল: উহারা জাতিচ্যুতির দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিত, এবং পুরুষানুক্রমিক প্রাধান্য বজায় রাখিত। মাটীর প্রাচীরে ঘেরা গণ্ডগ্রামগুলি, স্বাতন্ত্র্য সুখ উপভোগ করিত। ভারত, অনন্ত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। আজ ভারতে খুব একটা নূতনভাব দেখা দিয়াছে;—ইহা জাতীয়তার ভাব। এই জাতীয় ভাবের স্রোত,—জটিল বর্ণভেদ প্রথার বন্ধন একটু শিথিল করিয়াছে, প্রাদেশিক কুসংস্কারকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং শুধু বিভিন্ন বর্ণ নয়— সমস্ত সম্প্রদায়কে, সমস্ত জাতিকে, সমস্ত গ্রামকে, সমস্ত প্রদেশকে এক কার্য্যের ছাঁচে আনিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ, মাদ্রাজ ও কলিকাতা, বাঙ্গালী ও শিখ, এমন কি মুসলমানেরাও কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। যদি একবার ভাবিয়া দেখ, এখানকার কত ভৌগোলিক বাধা, ঐতিহাসিক বাধা, ধর্ম্মঘটিত বাধা, সামাজিক বাধা,—এই প্রবাহকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, আটকাইবার জন্য কত, "বাঁধ" বাঁধিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই কংগ্রেসের কতটা শক্তি ও কতটা বিস্তার। আমি জানি, এমন লোকও আছে যাহারা চোখ থাকিতেও অন্ধ; এমন লোকও আছে, যাহারা বালিসের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভূতের ভয় এড়াইতে চাহে। ইহারাই ইংরাজ আমলাবর্গ।

এদেশে দেশভক্তির উদয় হইয়াছে—ইহা যে একটা বৃহৎ সত্য—একটা নূতন ব্যাপার,—ব্রাহ্মণ্যিক আমলে যাহার অস্তিত্বই ছিল না—ইহা ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেখিয়াও দেখিবে না। ব্রাহ্মণ্যিক সমাজ এ ভাবের ভাবুক ছিল না, তাহারা এ ভাবটা আদৌ বুঝিত না। কত বিদেশী জাতি ক্রমান্বয়ে আসিয়া ভারত রাজ্য অধিকার করিয়াছে, বন্যার মত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। যেমন যেমন প্রবাহের জল সরিয়া যাইতে লাগিল, নূতন পলি-মাটিগুলা পুরাতন "পলি"গুলাকে আচ্ছন্ন করিল, পরস্পরের পাশাপাশি হইয়া রহিল, কিন্তু মিশিল না, কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল না। ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতা হইতে,—আর্য্যগণের আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে জাতি যখন আসিয়াছে, তাহারা দেশের লোকের সহিত মিশিয়া যায় নাই, একটা নূতন বর্ণরূপে পৃথক্‌ভাবেই এখানে অবস্থিতি করিয়াছে; আজিকার দিনেও, যাহারা নিছক্ সেকেলে ভাবের রক্ষণশীল লোক, যাহারা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসভাবের ভাবুক, যাহারা পুরুষানুক্রমে ও চিরপ্রথানুসারে, ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থের প্রতি উদাসীন, তাহারা এই দেশপ্রীতিকে একটা সংকীর্ণ ও অবিশুদ্ধ ভাব বলিয়া মনে করে। ইহা বিস্তৃত আকারে আত্মম্ভরিতা ও বিষয়সুখের তৃষা ভিন্ন আর কিছুই নহে; স্বতন্ত্র-শাসনের আকাঙ্ক্ষা,—"ভারতের জন্য ভারত" এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি—তাহারা অন্তরে অনুভব করে না। সংস্কৃত ভাষার একজন অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন;—"ইংরাজই আমাদের শাসন করুক, কিংবা আমরা আপনারাই আপনাদের শাসন করি, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না—শাসন কার্য্যটা চলিলেই হইল!" আর আমার বোধ হয়, একথাটাও তিনি বলিতে পারিতেন, "শাসনকার্য্য চলুক বা না চলুক তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়?"

ইংরাজের উপনিবেশে, এই জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় পার্লেমেণ্টের নজির আছে। কিন্তু তবু কতটা প্রভেদ! ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার যে সব লোক ইংলণ্ডের

শাসন-তন্ত্র স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহারা জাতিতে ইংরাজ; ভারত শুধু শিক্ষাবিষয়ে ইংরাজ। এইবারকার অভিজ্ঞতা নূতন, ক্ষেত্র অসীম, কার্য্যপরিসর অশেষ। এইবার প্রাচ্য লোকদিগের সহিত ইংরাজের কারবার,—এমন দেশের সহিত কারবার যেখানে নানা প্রকার ভাষা প্রচলিত; এক দেশের মধ্যে এত ভাষা আর কোথাও দেখা যায় না। এইবার কার্য্যক্ষেত্রে এমন সব লোক আনিতে হইবে যাহারা সাংসারিক বিষয়ে নিঃস্বার্থ; এইবার স্বাধীন আলোচনার শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া, যে দেশে ত্রিশকোটী লোক সাগরতটের বালু-কণার মত পরিব্যাপ্ত, সেই দেশের লোকের চিত্তত্তুষ্টি সম্পাদন করিতে হইবে। এই সকল বালুকণা এখন জমাট বাঁধিতেছে। এই জাতীয় আন্দোলনটা এরূপ প্রবল ও এরূপ সংক্রামক,—একদিন হয়ত ইহা প্রান্তসীমা পার হইয়া যাইবে। লাহোরের একটি ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন:—"সরকার বাহাদুর চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখান হইতে শিখসৈন্য পাঠাইতেছেন—এ কাজটা ভাল হইতেছে না। চীনেরা যে আমাদেরই ভাই-বেরাদর, আমাদেরই লোক!"

কথাটা নূতন। যদি জাপান কিংবা চীন, কোন দিন য়ুরোপের বিরুদ্ধে সমস্ত এসিয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধন করে—সেই দূর-ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখ!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি রামকুমার নন্দী।

কবি রামকুমার নন্দীর জন্মভূমি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বেজুরা নামক স্থানে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল সপ্ততিবর্ষদেশীয় কবি রামকুমার নন্দী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার যখন শৈশবকাল তখন পূর্ব্ববঙ্গে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের ছেলেরা চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত; কায়স্থ বৈদ্যের ছেলেরাও কদাচিৎ কেহিৎ টোলে পড়িত কিন্তু অধিকাংশেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িত। দুর্ভাগ্য বশতঃ রামকুমার টোলেও পড়েন নাই—পাঠশালায়ও যে বিশেষ পড়িতে আসিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। পিতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিত; গ্রামে পাঠশালা ছিল না—পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইয়া পড়াব নিমিত্ত অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। পরিবারস্থ লোকেরাই রামকুমারকে অক্ষর পরিচয়ে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন। অধ্যবসায়শীল বালক রামকুমার নিজচেষ্টায় যাহা কিছু তাৎকালিক বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; কিয়দ্দিন এক মুন্সীর নিকট পারসীও কতকটা পড়িয়াছিলেন। যত্নের সহিত হস্তাক্ষরটি সুন্দর করিয়াছিলেন এবং কাশীদাসের মহাভারতখানি প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাল্যকালেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল; গ্রামস্থ জনৈক কলাবিৎ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেন। রামকুমারের যখন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র তখনই তিনি "দাতাকর্ণ" নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একজন অল্পশিক্ষিত পল্লীগ্রামস্থ বালকের পক্ষে ইহা কম প্রতিভার পরিচায়ক নহে।

অবস্থা ভাল না হইলেও রামকুমারের বংশীয়েরা—বেজুরার নন্দী মজুমদারগণ, আভিজাত্যে পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাংশে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারা যদিও নিজেদের কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তথাপি উঁহারা মূলতঃ বৈদ্য। এই অঞ্চলে বৈদ্য-কায়স্থের স্বাতন্ত্র্য নাই—উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ অবাধে চলিয়া থাকে—এই নিমিত্তই বোধ হয় ঈদৃশ জাতি-বিভ্রম। যাহা হউক, নন্দীদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ়-দেশ হইতে প্রথমতঃ ময়মনসিংহ গচিহাটা-বনগ্রামে আইসেন, তৎপর রামচন্দ্র নন্দী নামক তাঁহাদের একজন বেজুরা আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। প্রাগুক্ত বনগ্রামে এখনও এই নন্দী বংশের শাখা বিরাজমান এবং সহর সেরপুরস্থিত এই বংশেরই জমিদারগণ "নন্দীগুপ্ত" এই উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতদঞ্চলে বেজুরার নন্দীদিগকে "কাউয়া" নন্দী বলে, ইহাও উহাদের বৈদ্যত্বের এক প্রমাণ; কেননা বৈদ্যের সাত শ্রেণীর মধ্যে "তুহি সেন" "ত্রিপুর গুপ্ত" "কাউ নন্দী" ইত্যাদি সংজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধ।

এই প্রসিদ্ধ নন্দীবংশের অনেকেই কাছাড় শিলচরে রাজকার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেন। রামকুমারের

শিক্ষাদীক্ষা অল্প হইলেও দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহাকে সত্বরই কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল এবং আত্মীয়বহুল শিলচরের দিকেই তদর্থে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি প্রথমতঃ তিনটাকা মাত্র বেতনে তত্রত্য ডিপুটি কমিশনরের আফিসে ঢুকিয়া, অবশেষে স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে নিজে নিজে কার্য্যোপযোগী ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ঐ আফিসের একাউণ্টেণ্ট্‌গিরি ও সর্ব্বশেষে ৮০৲ বেতনে খাজাঞ্চির কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

আজি কালি যেমন যে সে লোকেই লেখনীধারণ করিয়া প্রবন্ধ লিখে, কবিতা করে, গল্প সাজায়, তখন অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন রামকুমার নন্দী কার্য্যজীবনে প্রবিষ্ট হন, তেমনটা ছিল না। বিদ্যাসাগর মদনমোহন অক্ষয়কুমার প্যারিচাঁদ ঈশ্বর গুপ্ত মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যসেবকগণ তখন গদ্যপদ্য রচনার নূতন নূতন আদর্শ বঙ্গজগতে প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাহাদের অনুকরণে কেহ কেহ কিছু কিছু লিখিত বটে কিন্তু দেশে মুদ্রাযন্ত্রের তখন এমন প্রাদুর্ভাব ছিল না, অথবা পাঠশালায় বিদ্যারও এমন প্রচার ছিলনা যে সুলভে ও অল্পায়াসে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন হইবে এবং মুদ্রিত পুস্তকের লাভজনক বিক্রয় হইবে। সুতরাং নানাকারণে সেই সময়ে কবি বা গ্রন্থকার শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল।

কবি বা গ্রন্থকার অল্পসংখ্যক হইলেও তখন বঙ্গদেশে কাব্যের যে অপ্রাচুর্য্য ছিল একথা কিন্তু বলিতে পারি না; প্রত্যুত সঙ্গীত সহযোগে কাব্যের যে স্ফূর্ত্তি তাহা ঐ সময়ে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান সময় হইতে অধিকতর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। আমরাই স্বকীয় শৈশবাবস্থায় বঙ্গের প্রায় পূর্ব্বতম প্রান্তে গ্রামে গ্রামে যতগুলি কবির দল, যাত্রার দল প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম এখন তাহার চতুর্থাংশও দেখিতে পাইতেছি না।

এই যে কবির দল যাত্রার দল পাঁচালীর দল বঙ্গের সুদূর পল্লীতেও দেখা যাইত ইহাদের জন্য গান ও কবিতা বাঁধিয়া দিত কে? গাজনে ও কীর্ত্তনে যে সকল পদাবলী প্রযুক্ত হইত অথবা শ্যামা পূজাদিতে যে সকল মালসী গান হইত এই সকলেরই বা রচয়িতা ছিল কে? পাঠক কখনও মনে করিবেন না যে কেবল হরু ঠাকুর নিতাই বৈরাগী বা আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, দাশুরায় বা রসিকরায়, রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত প্রভৃতির গান ও রচনাবলী লইয়াই পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা নাড়াচাড়া করিত। ফলতঃ কবি বা গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইবার স্পৃহা অথবা সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও ঐ সকল প্রান্তবর্ত্তী স্থানেও প্রতিভা-শালী লোক জন্মিত, কিন্তু স্থানদোষে তাহাদের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতেছে না।

শিলচারে অবস্থান কালে রামকুমার সঙ্গীতের সবিশেষ চর্চ্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনকল্পে তৎকালপ্রচারিত পুস্তক ও পত্রিকাদির পাঠ ভিন্ন আর কিছু করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক যাত্রার দলে গীত হইবার জন্য পালা প্রস্তুত করিতেই তিনি তদানীং তদীয় ভারতী প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন। পাঁচালীর পালাও তিনি কয়েকটী প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রচিত সমস্ত যাত্রা ও পাঁচালীর পালার নাম নিম্নে লিখা হইল:—

যাত্রা।

১। নিমাই সন্ন্যাস, ২। সীতার বনবাস, ৩। বিজয় বসন্ত, ৪। পদাঙ্ক দূত, ৫। কংশ বধ, ৬। উমার আগমন, ৭। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৮। রাসলীলা, ৯। দোল, ১০। ঝুলন, ১১। ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ।*

পাঁচালী।

১। কলঙ্কভঞ্জন, ২। লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ, ৩। ১৩০৫ বাঙ্গালার বোধন।

বলা আবশ্যক যে এই সকল পালার অনেকগুলি শিলচার হইতে পেন্‌শন গ্রহণপূর্ব্বক বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের পর রচিত হইয়াছিল। এই পালাগুলির অধিকাংশই স্থানীয় গানওয়ালাদের দল কর্ত্তৃক গীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

নব্য লেখকগণের রীতিতে তিনি গ্রন্থরচনায়ও মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। নিম্নে তদীয় গ্রন্থাবলীর নাম প্রদত্ত হইল।

* রামকুমারের বাল্য-রচিত "দাতাকর্ণ" পালার উল্লেখ এখানে করা হইল না, কেননা তাহার পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

পদ্য

১। বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, (অমিত্রাক্ষরে), ২। উষোদ্বাহ কাব্য, প্রথম ভাগ (অমিত্রাক্ষরে), ৩। উষোদ্বাহ কাব্য দ্বিতীয় ভাগ (অমিত্রাক্ষরে), ৪। নবপত্রিকা কাব্য (মিত্র ও অমিত্রাক্ষরে), ৫। প্রবন্ধমালা (নানাবিষয়ক), ৬। জীবন-মুক্তি (গদ্যমিশ্রিত)।

এতদ্ব্যতীত "মালিনীর উপাখ্যান" নামক একখানি উপন্যাস, এবং গণিত-তত্ত্ব নামধেয় একখানি অঙ্কের পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয়খানি ছাপান হইয়াছিল। অঙ্কের পুস্তকখানিও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া কিয়দ্দিন কাছাড় জেলায় পাঠশালার পাঠ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া রামকুমার কীর্ত্তন মালসী প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে "পরমার্থ সঙ্গীত" ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ এই তিন খণ্ড পুস্তক সংকলিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার পদ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর" কাব্যই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে সাহিত্য জগতে কতকটা পরিচিত করিয়াছিল। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লাটিন কবি ওভিড্ লিখিত "নায়িকাগণের লিপিমালা" (Ovid's Epistolæ Heroidum or Letters of the Heroines) গ্রন্থের অনুকরণে, রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত নায়িকাগণ দ্বারা স্বীয় স্বীয় ভর্ত্তৃসমীপে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে যে সকল অভিযোগমূলক লিপি লিখাইয়াছিলেন, রামকুমার নায়কদের দ্বারা ঐ গুলির উত্তর মাইকেলী ছন্দেই এই "পত্রোত্তর" কাব্যে লিখাইয়াছেন। ইহা ১২৭৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং তৎকালীন অনেক পত্রিকায় ইহার প্রশংসাসূচক সমালোচনাও হইয়াছিল। সাহিত্য-মহারথী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন ; "ইহাতে শব্দচাতুর্য্য আছে, ভাবুকতা আছে এবং কবিতাগুলি শ্রুতি-মধুর হইয়াছে।" একখানি ক্ষুদ্র কাব্যের পক্ষে ইহা কম প্রশংসা নহে।* পত্রোত্তরের সমালোচনা করিতে গিয়া সেই সময়কার পূর্ব্ববঙ্গের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ "ঢাকাপ্রকাশ" লিখিয়াছিলেন :—"কবিকেশরী মাইকেলের বীরাঙ্গনা পত্র পাঠ করিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম পত্রগুলি যাঁহার সরস লেখনী-প্রসূত তিনিই উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। বোধ হয় সময়াভাবে অথবা অস্বাস্থ্য নিবন্ধন তিনি তাহা পারেন নাই। যাহা হউক রামকুমার বাবু আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিয়াছেন ; আমরা তাঁহার এই পুস্তক পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। * * * *"

এই অবস্থায় মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে রামকুমারের বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্যও উল্লেখযোগ্য এবং সমালোচ্য কিনা পাঠক মহোদয়গণ তাহার বিচার করিবেন।

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্যে রামকুমার কতদূর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন নিমিত্ত মধুসূদনের "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী" এই লিপির উত্তরটি যদৃচ্ছাক্রমে তুলিয়া দিলাম।

চতুর্থ সর্গ। কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ।

"রাজর্ষি দশরথ আপন দ্বিতীয়া মহিষী কেকয়ী দেবীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ; মহিষীও সেই বরদ্বয় যথাকালে গ্রহণ করিবেন বলিয়া সে সময় আপনার মনোগতভাব প্রকাশ করেন নাই। যখন রাজা প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন কেকয়ী আপন পুত্র ভরতের জন্য সেই পদ প্রার্থনা করেন এবং রাজাকে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনার্থ অসত্যবাদী বলিয়া যে পত্র লিখেন, দশরথ নিম্নস্থ পত্রিকাখানি তাহার উত্তরস্বরূপ লিখিয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বে কোনও স্পষ্টতঃ প্রতিজ্ঞা না হওয়াতে রাজা অসত্যবাদী নহেন বরং কেকয়ী তাহার বিপরীত লিপি করাতে তাঁহাকেই মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পারে।

"হায় কে হানিল হেন নিশিত বিশিখে,
সুখের সময় মোরে বিবাদ সাধিয়া,
ফলিল মুনির শাপ এতদিনে বুঝি
দশরথে। করিয়াছি কুকর্ম্ম যেমন,
পাইনু তাহার ফল হাতে হাতে আজি।
জাগে মনে (ভাগ্য দোষে) মৃগয়ার ছলে
একদিন, বনমাঝে, বাক্য লক্ষ্য করি
এড়ি শব্দভেদি বাণ, ভেদিনু সহসা,
(মৃগবোধে) না জানিয়া মুনির তনয়ে।
ত্যজিল তখনি প্রাণ, - তিরস্কারি মোরে
মুনিপুত্র। পিতা তার অন্ধ ঋষি (ছিল
তপোরত) ধ্যান ভাঙ্গি শাপিল আমারে
রোষ বশে, "প্রাণাধিক তনয় আমার
"বধিয়া, বধিলি মোরে, ক্ষত্রকুল গ্লানি।
"মরিবি তেমন তুই তনয়ের শোকে।"

* শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ রায় নামক কোনও ব্যক্তি এই কাব্যখানির ভূমিকা ও টীকা করেন—তাহাও কাব্যের সঙ্গেই মুদ্রিত হইয়াছিল। সমালোচকরাজ বঙ্কিমচন্দ্র এই টিপ্পনী পড়িয়া বিরক্ত হইয়া দক্ষিণা বাবুকে বহু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন

কবি রামকুমার নন্দী।

অমোঘ মুনির শাপ। সাপিনীর রূপে
নিবসিয়া এতদিন রাজ-অবসথে,
দংশিলি হৃদয় মোর বিষাক্ত দশনে;
ছিলি লো পাপিনি! তুই পরাণ-প্রতিমা
এতদিন, স্থাপি তোরে হৃদয়-মন্দিরে,
কত যে তুষেছি নিত্য প্রেমাঞ্জলি দানে
গুণে তোর; কে জানে এমন নিশাচরী,
নারীরূপে প্রবেশিলি বিনাশিতে মোরে
অকালে, অধরে মাখিয়া মধু ভুলালি
সহজে, হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ হলাহলে।
হায় রে অবোধ আমি, তোর এই মায়া —
মিছে নিন্দি আপনারে, নারীর চরিত্র
নাহি বুঝে সুরাসুর, কি ছার মানুষ
আমি জানিব কি গুণে, এ কুহক তব?
তুষিলি মধুর বাক্যে এতদিন কত,
সেবিলি আমারে সদা, পতিব্রতা নারী
সেবে যথা পতির চরণ কায়-মনে।
সরল হৃদয় মোর—ভুলিল অমনি,
বুঝিতে না পারি তোর কপট ভকতি,
করিয়াছি সত্য আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
তোর কাছে, ধর্ম্মভয়ে, নহে কামবশে;
আছে এ দম্পতিধর্ম্ম আজিও জগতে
যে নারী পূজিবে পতি ইষ্টদেব মানি,
অভীষ্ট তাহার সদা পুরাইবে পতি;
পতির কর্ত্তব্য এই ধর্ম্মনীতি মতে।
করে'ছি পতির কার্য্য, প্রতিজ্ঞা করিয়া
কহিয়াছি "প্রাণাধিকে! পতিপ্রাণা তুমি,
তুষিলে আমারে যেন আমিও তেমনি,
পালিব তোমার বাক্য যা' কহিবে যবে।"
কিন্তু কোন্ দিন, ক' দেখি আবার শুনি,
বাহিরিল হেন কথা রাঘবের মুখে,
ভরতেরে দিবে রাজ্য না দিয়া রামেরে?
আ-মরি কি সত্যবাদী লিখেছেন পুনঃ
"অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ; কিংবা দিয়া চূণ কালি গালে
দেও বনে।" কি করিব নারী তুই নারি
বধিতে জীবনে, ইচ্ছা নতুবা এখনি,
প্রহারিয়া তীক্ষ্ণ অসি পাপীয়সি! তোরে
দ্বিখণ্ড করিয়া খণ্ডি মনোদুঃখ যত;
যদি এ হৃদয় আজি হ'ত তোর মত,
নিরমিত বজ্রে কিংবা লৌহ কি পাষাণে,
নির্ব্বাসি এখনি তবে, বিজন কাননে,
এই রঘুকুলকলঙ্কিনী তুই, তোরে,
রক্ষি এ বিপুলকুল, "কুলরক্ষা হেতু,"
নীতি বাক্য আছয়ে, "ত্যজিবে একজনে।"
তবে যদি রাজ্যলোভে থাকিস্ সেবিয়া
মোরে, বারাঙ্গনা যথা পর পুরুষেরে
অর্থলোভী হয়ে, মুখে দেখায়ে কপট
প্রেম; ক' তবে এখনো ভাল ভাঙ্গি আজি
সে প্রতিজ্ঞা করেছি যা তোর কাছে আমি;
কে করে প্রতিজ্ঞা হেন গণিকার সনে?
নহ তুমি ধর্ম্মপত্নী কৃত অভিষেকা।
কেন আজি হেন কথা রাঘবের মুখে
শুনিলি? শুননি যাহা আর কোন কালে,
কেবল আপন গুণে, গুণবতী তুমি।
তবু কি অসত্য কথা বাহিরিবে মুখে
প্রাণান্তে? জেননা হেন রঘুবংশধরে।
কয়েছে কি কোন দিন পরিহাস ছলে
মিথ্যা কথা দশরথ? ক' তবে এখনি
কাটিয়া ফেলিব জিহ্বা তোর বিদ্যমানে।
এখনো চাহিস্ যদি (লজ্জা পরিহরি)
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ভরতে,
হবেনা অন্যথা আছে এ প্রতিজ্ঞা মম
"পালিব তোমার বাক্য যা কহিবে যবে"।
পুত্র মম রামচন্দ্র কুলপদ্মরবি,
পালিবেক পিতৃসত্য প্রাণপণ করি।
ভরত তনয় মোর (মিথ্যা না কহিলি)
ভারতের শিরোরত্ন অতুল্য জগতে,
থাকিত যদ্যপি এই অযোধ্যা ভবনে,
নাহি করি আমি যাহা করিত সে আজি,
পরশুরামের মত (শুনেছ যেমন)
শোধিয়াছ মাতৃধার ধারাল কুঠারে।
কহিবি অযশ মম দেশ দেশান্তরে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"?

দেখাব এ কুলধর্ম্ম তোরে আজি আমি,
ত্যজিব জীবন তবু প্রতিজ্ঞা পালিব।
যদি আমি পতি হই গুরুজন তোর,
ফলিবে আমার বাক্য ও পতিঘাতিনি!
একদিন তোরে; ঘুষিবে জগতে তোর
অযশকাহিনী এ ত্রেতা দ্বাপর কলি
তিনযুগ ভরি; তোর এ কলঙ্কগীত
রচিয়া যতনে, গাইবে সুকবিগণ,
ভারত ভবনে। কাঁদাইলি যেন মোরে,
কাঁদিবি তেমন কোন দিন যদি ভাগ্যে
দিব্যজ্ঞান হয় তোর এই পাপ দেহে।"

তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ উষোদ্বাহ ১ম ভাগ ১৮৮৬ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ মুদ্রণে তাঁহার বান্ধব অনেকে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার শিলচারে অবস্থান করিয়া কলিকাতার একটি প্রেসে তাহা মুদ্রিত করান। ইহাতে গ্রন্থ মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়। যাঁহারা সহৃদয় সমালোচক তাঁহারা এই সকল দোষ উপেক্ষা করিয়া গ্রন্থগত ভাবের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাই "হিতবাদী" "শিক্ষাপরিচর" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা এই পুস্তকখানির প্রশংসাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামকুমারের অদৃষ্টের মন্দতা নিবন্ধনই বোধ হয়, কোনও বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের খর নজর এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির উপরে পতিত হয়। তৎকালে সেই পত্রিকা সম্পাদকের ঘাড়ে একটা খেয়াল চড়ে যে সমালোচনারূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা তিনি সাহিত্যপ্রাঙ্গণে নিপতিত যাবতীয় খড়কুটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। এতদর্থে দুই সপ্তাহকাল ধারাবাহিকরূপে কয়েক খানি গ্রন্থের মুণ্ডপাত করিয়া উষোদ্বাহ কাব্যখানিও ধরেন। কিন্তু জনৈক সাহিত্যসেবী মহাত্মা* পত্রিকান্তরে সেই সম্পাদকের নিজ পত্রিকা হইতে ভুরি ভুরি গলদ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদ্রূপবাণে সম্পাদক পুঙ্গবকে ক্ষতবিক্ষত করাতে তাঁহার সেই খেয়াল চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়। ফলতঃ কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদাদি মাত্র অবলম্বনে একখানি কাব্যের দোষ প্রদর্শন সমালোচনা-পদবাচ্য হইতে পারে না, ইহার নাম "পৌরোভাগ্য"।

* সাধুচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়

বিশেষতঃ রামকুমার গ্রন্থের ভূমিকার পৃষ্ঠে "নিবেদন" ছলে স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, "নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। প্রুফ সংশোধন দোষে যদি কোন কোন স্থলে কোনরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।" ইহা সত্ত্বেও, প্রধানতঃ ঐরূপ দোষ লইয়া ঘাঁটানটা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা সুধী পাঠক-বৃন্দই বিবেচনা করুন।

যাহা হউক উষোদ্বাহের তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহা হইতেই রামকুমারের কবিতা লিখিবার ক্ষমতা কতদূর ছিল, তাঁহার কাব্যের দোষগুণই বা কি পরিমাণ ছিল, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে:—

"লুকাইল বিভাবরী, তারাগণ যত
ত্যজিলা অম্বরশয্যা লজ্জা অনুরোধে,
বিচ্ছেদ বিষাদে এবে মলিন চন্দ্রমা।
ভুবনমোহিনী উষা দাঁড়াইলা আসি
পূর্ব্বাচল শিরে পরি সীমন্তের মাঝে,
সিন্দুর-বিন্দুর সম তরুণ-অরুণে;
বিনাশি তিমির রাশি জগতের রিপু,
পরকাশি দশ দিশা আপনার রূপে।
কলম্বনাগণ যত নিকুঞ্জগায়িকা,
জাগিয়া আনন্দে নিজ নিজ পতিসহ,
স্তুতিলা সতীরে তারা প্রাত্যুষিক রাগে,
তুষিয়া জগৎ কর্ণ বৈতালিক সম।
যেন রে তুষারগিরি! তোর তুঙ্গ শিরে
দাঁড়াইলা তেজোময়ী ত্রিদশবৎসলা,
পরকাশি দশদিক আপনার তেজে
নাশিয়া অসুরদলে ত্রিপুরের রিপু,
অমরগণের যথা হয়ে স্তূয়মানা।
বহিল শীতল বায়ু পশি ফুলবনে,
ফুল্ল কুসুমের যত পরিমল ধন
বিতরিল বিনামূল্যে জীবজন্তগণে।
সাধিছে মধুপচয় গুঞ্জি মৃদুনাদে
পদ্মিনীর পদে পড়ি হাসাইতে তারে;
সাধিলা মাধব যথা প্রভাতে আসিয়া
পায়ে ধরি বিপ্রলব্ধা মানিনী রাধারে
ভাঙ্গিতে দুর্জ্জয়মান বৃন্দাবন-বনে।"

রামকুমারের কাব্য সমালোচনার স্থান ইহা নহে, নচেৎ তাঁহার কাব্যসমূহ হইতে আরও কতিপয় কবিতাব উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করা যাইত, কি জন্য মহাত্মা বঙ্কিমবাবু কবির শব্দচাতুর্য্য ও ভাবুকতার এবং তদীয় কাব্যেব শ্রুতি-মাধুর্য্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন থীব্‌স্‌ নগরস্থ একটি চিত্র

ব্‌সের একটি কবরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র।

কার্নাকের সূচ্যগ্র স্তম্ভাবলী।

এদ্‌ফুর মন্দির।

স্ফিংস্, এবং মিসরের একটি পিরামিড্।
চারি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

২য় রাম্‌সেসের পিতা
১ম সেটির রক্ষিত শবের মস্তক।

"খা-হোর্"এর রক্ষিত শবের আধার।
অন্য দুটির মধ্যে স্থিত।
মিসরের কায়রো নগরে বোলাক যাদুঘরে রক্ষিত।

লক্সারে ২য় রাম্‌সেসের মূর্ত্তি।

কাব্য ও সঙ্গীত এক বৃন্তেরই দুইটি ফুল, অথবা সংস্কৃত কবির ভাষায় বলিতে গেলে, মা সরস্বতীর দুইটি স্তন। * কিন্তু উভয়ের পার্থক্যও বিস্তর। কাব্যের প্রচলন অনেকটা সৌভাগ্যসাপেক্ষ, বিশেষতঃ আজকাল। মুদ্রণসৌষ্ঠব এবং সদয়-সমালোচনার সহায়তায় অনেকস্থলে অনুৎকৃষ্ট গ্রন্থও সাধারণ্যে বেশ বিকাইয়া যায়; অথচ তদভাবে উৎকৃষ্ট কাব্যেরও তেমন আদর হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের অবস্থা তদ্রূপ নহে; কোনও বাহ্য চাকচিক্য বা সমালোচকের প্রশংসাবাদে আকৃষ্ট হইয়া লোকে গান শিখে না; যে গান প্রাণের ভিতর দিয়া "মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল না করে, কেহই তাহা কণ্ঠস্থ করিবার নিমিত্ত জোর জবরদস্তি করিবে না। কাব্য ও সঙ্গীতের পার্থক্য এতদ্দ্বারাই পরিস্ফুট হইবে যে কাব্য প্রথমতঃ রচিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তৎপর প্রসিদ্ধি লাভ করে; কিন্তু গান রচিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে তাহা গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়া কখনও প্রচারিত হয় না।

রামকুমার কাব্যরচনায় সৌভাগ্যশীল হইতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর প্রশংসালাভ করিয়া থাকিলেও, এবং তৎকালে তাহা বিক্রীত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়া দিয়া থাকিলেও, উহা যে পুনর্মুদ্রিত হইবে, নানা কারণে তাহার সম্ভাবনা বড় কম। কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবিষয়ক যে সকল গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন সেইগুলি তাঁহাকে বহুদিন স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। পূর্ব্ববঙ্গের সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেকেই তাঁহার গীত আদরসহকারে কণ্ঠস্থ করিয়া যত্র তত্র গান করিয়া থাকে। তাঁহার গানের আদর দেখিয়া শিলচারের ভূতপূর্ব্ব একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার গুণগ্রাহী ৺প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "পরমার্থ-সঙ্গীত" নাম দিয়া রামকুমারের সঙ্গীতাবলীর প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই প্রথমভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে এবং পরমার্থ-সঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগও প্রকাশিত হইয়াছে।

* সঙ্গীতং কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সরস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্।
একমাপাতমধুরং অন্যদালোচনামৃতম্॥

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তদীয় "সাধক-সঙ্গীত" নামক সংগ্রহ গ্রন্থে "পরমার্থ-সঙ্গীত" হইতে অনেক গীত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র রামকুমারের গানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতরচনাকারকগণ সকলেই নিজের একটা বিশেষ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া যান। রামকুমারেরও কতিপয় সঙ্গীত তাঁহার উদ্ভাবিত রাগিণী-বিশেষে রচিত। "পরমার্থ-সঙ্গীত" হইতে সেই শ্রেণীর একটি গীত এস্থলে নমুনাস্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত করা হইল :—

রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত—তাল ঠুংরী।

তাইত শিবে, মা ব'লে কাঁদিগো কাতরে।
যদি কান্না শু'নে দয়া ক'রে কোলে নেও মা কুমারে॥
শুনেছি মা কথায় বলে, খে'তে পায় মা কাঁদলে ছেলে,
মাগো না কাঁদিলে আদর ক'রে খে'তে দেয় মা কে তারে? ॥
যার আছে মা অনেক ছেলে, রাখ্‌তে নারে কোলে কোলে
খেল্‌তে দেয় মা ব'সে ধরাতলে—
খেলে নিয়ে মালা মাটি পত্রপুষ্প ঘটী বাটি,
মায়ের মায়াতে মুগ্ধ হ'লে
খেলা ছেড়ে যেই ছেলে কেঁদে উঠে মা মা ব'লে, মা-গো—
অমনি মা এসে তারে করে কোলে, আর কি গো থাকতে পারে?
অচিন্ত্যরূপ তোমার চিন্তিতে নারে সুরাসুর—
কিরূপে চিন্তিব রূপ আমি—
এখন তুমি চিন্ত তোমার রূপ, তোমার মন্ত্র তুমিই জপ,
তোমার পূজা কর এসে তুমি—
আমি সন্ধ্যা পূজা সকল ফেলে কাঁদব বলে মা মা বলে মা—গো—
দেখব মায়ের মতন মায়া তোমার আছে কিনা অন্তরে॥
যে ছেলের মা, মা না থাকে তার কান্না শুনে বা কে
কে তারে মা ক'রে থাকে কোলে—
যদি না থাকতে মা তুমি শিবে, আমি কিগো কাঁদতাম তবে,
কাঁদি কেবল তুমি আছ ব'লে—
তুমি জগন্নিস্তারিণী কালভয়নিবারিণী মা—গো—
আমি ডাকব কারে এ সংসারে না ডে'কে মা তোমারে॥
তারে শাস্তি করে মেরে ধ'রে কথায় কথায় আখুট ক'রে
যে ছেলে মা কাঁদে দিনে রে'তে—
কিন্তু কাঁদে যদি ভয়ে প'ড়ে মা যে তখন চায়না ফিরে
এমন মা কি আছে ত্রিজগতে—
যদি সাধে সাধে কাঁদি আমি শাস্তি কর এ'সে তুমি, মা—গো—
কাঁদি কালান্তে কালের ভয় আছে ব'লে অন্তরে॥

বলা বাহুল্য রামকুমারের পরমার্থ সঙ্গীতগুলির প্রায় সমস্তই ভক্তিরসাত্মক। ষট্‌চক্রাদি সম্বন্ধে দুই একটি ভিন্ন ভাবের কথা থাকিলেও কবিবরের সরস হৃদয়ে ভক্তিরই প্রাধান্ত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবেদন আব্‌দার নিষ্ফল ভিক্ষানীতি (mendicant policy) বলিয়া আজ-

কাল অনেকেই সেই পথ ছাড়িতেছেন বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম-রাজ্যে এই কান্নাকাটির অর্থাৎ ভক্তির পথ সোজা এবং আশু-ফলক বলিয়া চিরদিনই সমাদরণীয় থাকিবে। রাম কুমার স্বধর্ম্মে আস্থাবান ও সতত ইষ্টনিষ্ট ছিলেন; তাঁহার সঙ্গীতচ্ছলে আবেদন আবদার নিষ্ফল হয় নাই। তাই মৃত্যুর অতি অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে জগদম্বা তাঁহাকে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীতে টানিয়া আনিয়াছিলেন; অনধিক পাঁচবৎসর হইল ভক্তকবির পাঞ্চভৌতিক দেহ কাশীর মহাশ্মশানে বিলীন হইয়াছে এবং তদীয় বিমুক্ত আত্মা মায়ের ক্রোড়ে লীন হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।*

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

ভারতীয় ব্রহ্মবাদ।

(উপনিষদ্ ও শঙ্করের মত)।

১। নিত্যানিত্য বিবেক।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, এই সংসার 'জন্ম-মরণ-শোকাদি বহু অনর্থাত্মক', মায়া ও মরীচিস্থ উদক এবং গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এবং ইহা 'কদলী-স্তম্ভের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য'।

কঠ ভাঃ ৬।১।

এই উক্তির মূলে কি কোন সত্য নাই। আজ যিনি রাজচক্রবর্ত্তী কাল তিনি নির্ব্বাসিত—পরের অন্নে প্রতি-পালিত,—ইতিহাস কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? আত্মীয় স্বজন লইয়া পরম সুখে সংসারে বাস করিতেছি। প্রাণের প্রিয়জন হঠাৎ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া কোথায় চলিয়া গেল! যাহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া, যাহার প্রেমমাখা মুখ দেখিয়া, যাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রাণে কত শান্তি কত আরাম লাভ করিতাম, সেই প্রিয়তম সন্তান আজ কোথায়? যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া-ছিলাম, যাহার পদতলে জীবন যৌবন ঢালিয়া দিয়াছিলাম, সে আজ আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল, জগৎ আমার নিকটে অন্ধকার। পরিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন—এ সংসারে কেবলই পরিবর্ত্তন! এ সংসারে জরা আছে, ব্যাধি আছে, মরণ আছে, হিংসা, বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃখ দারিদ্র্য সবই আছে। এ সব দেখিয়া কি মনে হইতে পারে না যে, এ সংসার অসার,—কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার? কেবল বুদ্ধদেবই যে জরা মৃত্যু রোগ শোক দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা নহে—প্রতিনিয়ত আমরাও এই সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা অনুভব করিতেছি। তবে কি নিত্যবস্তু কিছু নাই? তবে কি মানুষ নিতান্তই নিরাশ্রয়? এই প্রশ্ন সকলদেশেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে এবং নানালোকে নানাভাবে ইহার উত্তর দিতে-ছেন। কেহ বলিতেছেন নিত্যবস্তু না হইলে মানুষের চলে না, নিত্যবস্তু না থাকিলে মানুষের শান্তি নাই, আরাম নাই, আশ্রয় নাই সুতরাং একজন নিত্য-সত্য সনাতন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন। কেহ বলেন যখন বুঝিয়াছি এ সংসার অসার ও অনিত্য সেই সঙ্গে সঙ্গেই এক নিত্যবস্তুর আভাস পাইয়াছি। নিত্যতার আভাস না পাইলে অনিত্যতার জ্ঞানই আসিতে পারিত না। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই, নিজের আদর্শেই বুঝিয়াছি যে, অনিত্যের অন্তরালে এক নিত্যসত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার আত্মাতে কত পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন —অথচ এই পরিবর্ত্তনসমূহকে একই আত্মা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই আত্মার স্থায়িত্ব হইতেই সেই পরমসত্তার নিত্যতাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। এইরূপে লোকে আরও কত ভাবে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই এক নিত্য-সত্তার অস্তিত্বেই উপনীত হইয়াছে।

সেই নিত্যবস্তুর প্রকৃতি কি? ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদ্ ও শঙ্কর এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, অদ্য আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

২। শঙ্কর ও 'পার্মিনাইডিস্'

যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ ঋষিগণ সেই নিত্যবস্তু বিষয়ে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য সেই মতই দার্শনিক ভিত্তির

---

* অতীব সুখের বিষয় যে রামকুমার নন্দীর সম্পূর্ণ জীবনী ও তদীয় গ্রন্থাবলীর সমালোচনা সমন্বিত একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। তাঁহার সংগৃহীত সরঞ্জাম হইতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সঙ্কলনে অনেক সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপর দাঁড় করাইয়াছেন। এই মতের সহিত পার্মিনাইডিস্ (Parmenides)এর মতের সৌসাদৃশ্য আছে। 'ইলিয়া' (Elia) নগরীতে যে সমুদয় পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পার্মিনাইডিসের নাম দর্শন-জগতে সুপরিচিত। ইঁহার মতে Nothing exists but one indivisible unalterable absolute reality—এক অদ্বিতীয় অংশবিহীন অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। বেদান্তেও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'. এই ব্রহ্ম নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং স্বগতভেদরহিত। পার্মিনাইডিসের মতে "All variety and change are a delusion" সমুদয় ভেদ ও পরিবর্ত্তন ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার মতে সেই নিত্যবস্তু অসৃষ্ট, অবিনাশী, ইহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ইহাতে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—ইহা আপনাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য ইহা শঙ্করেরও মত এবং বেদান্তেও এ মতের অভাব নাই।

'ইলিয়' দর্শন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণও ২৫০০ বা ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক উভয় দর্শনে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

৩। 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম।'

সেই নিত্যবস্তুর নাম ব্রহ্ম। উপনিষদের ব্রহ্মকে 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্' বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"যাহা যেরূপে নিশ্চিত তাহার যদি সেই রূপের ব্যভিচার না হয় তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত তাহার সেইরূপের যদি ব্যভিচার হয় তবেই তাহা অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা সুতরাং বিকার অনৃত। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'বিকার ভাষাজনিত নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' 'সদ্বস্তুই সত্য' ইহা নির্ণীত হওয়াতে 'সত্যম্ ব্রহ্ম' এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের বিকার নিষেধ করা হইল। মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মই কারণ। ব্রহ্মই যখন কারণ তখন অপরাপর বস্তুর ন্যায় ইহার কারকত্ব রহিয়াছে এবং ইহাও মনে হইতে পারে যে মৃত্তিকার ন্যায় ইহা অচিৎ। এই সমুদয় আপত্তি দূর করিবার জন্য বলা হইল 'জ্ঞানম্ ব্রহ্ম'। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'জ্ঞপ্তি', 'অববোধ'। ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্'—এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল ব্রহ্ম 'সত্যম্' এবং 'অনন্তম্'; সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেখানে জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব সেই খানেই কার্য্য (অর্থাৎ বিকার ও পরিবর্ত্তন) সুতরাং জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কিরূপে ব্রহ্মকে সত্য ও অনন্ত বলা যাইতে পারে? যাহাকে কোন বস্তু হইতে বিভাগ করা যায় না তাহাই অনন্ত কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে পৃথক করা হয় সুতরাং এ অবস্থায় ব্রহ্মকে অনন্ত বলা যায় না। শ্রুতিতেও আছে যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না তাহাই ভূমা এবং (যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় এবং) অন্য কিছু জানা যায় তাহাই 'অল্প'। কেহ কেহ বলিতে পারেন 'এই শ্রুতিতে অন্য বস্তুর জ্ঞানই অস্বীকার করা হইল, আত্মা নিজে নিজেকেই জানেন ইহা ত হইতে পারে।' না, এ প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ উক্ত বাক্যে কেবল অপর বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করা হইয়াছে—আত্মা নিজেকে জানিতে পারেন, ইহা উক্ত বাক্যের অর্থ নহে। আত্মাতে যখন ভেদ নাই তখন আত্মাতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাকে যদি জ্ঞেয় বলা যায় তাহা হইলে ইহাকে আর জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না—কারণ ইহাতে কেবল জ্ঞেয়ত্বই অর্পণ করা হইয়াছে। আবার যদি বল এক আত্মাই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই উভয়ই—আমরা বলিব, না, একই আত্মা যুগপৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারেন না, কারণ আত্মা অংশবিহীন। যাহা নিরবয়ব তাহা যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং 'জ্ঞানম্ ব্রহ্ম' এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি কারক অস্বীকার করা হইল এবং ইহাও বলা হইল যে ব্রহ্ম মৃদ্বৎ 'অচিৎ' নহেন। 'জ্ঞানম্ ব্রহ্ম'—ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে ব্রহ্ম বুঝি সান্ত—সীমাবিশিষ্ট, কারণ লৌকিক জ্ঞান সান্ত—এই জন্য বলা হইয়াছে ব্রহ্ম 'অনন্তম্'। তৈত্তিরীয় উঃ ভাঃ ২।১।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয় নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়

সত্তা ; ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। কর্ত্তৃত্বাদি কারক ইহাতে অর্পণ করা যাইতে পারে না। এমন কি ইহাও বলা যায় না যে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন।

৪। সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু গীতাকার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন। (১৩।১৩)। শ্লোকটীর অর্থ এই:—'যাহা জ্ঞেয় তাহা তোমাকে বলিব—ইহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই আদিরহিত পরব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না'। শঙ্কর ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—বিশেষরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হইল 'যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিব'; কিন্তু শেষে বলা হইল 'তাঁহাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না'—ইহা অনুরূপ হয় নাই"। সিদ্ধান্তী বলিবেন—না ঠিকই হইয়াছে। কেন? না তিনি বাক্যের অগোচর; এইজন্য উপনিষদে "তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন" এইরূপ নিষেধমুখেই সেই জ্ঞেয়কে—সেই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(পূর্ব্বপক্ষ), যে বস্তুকে 'অস্তি' অর্থাৎ আছে এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় তাহাই আছে। যাহা নাই তাহাকে 'অস্তি' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। 'অস্তি' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না এমন 'জ্ঞেয়' অসিদ্ধ।

(সিদ্ধান্তী)—না, তাহা হইতে পারে না কারণ ইহাও বলা হইয়াছে যে 'তিনি নাই' ইহাও নহে যেহেতু তিনি 'নাস্তি'—বুদ্ধিরও অতীত। (নাস্তি=নাই)।

(পূর্ব্বপক্ষ) সমুদয় বুদ্ধিই হয় 'অস্তি' বুদ্ধি না হয় 'নাস্তি' বুদ্ধির অনুগত, সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞেয় হয় 'অস্তি' বুদ্ধি না হয় 'নাস্তি' বুদ্ধির অধিগম্য।

(সিদ্ধান্তী)—এই জ্ঞেয় উক্ত কোন প্রকার বুদ্ধিরই অধিগম্য নহেন। কারণ ইহা একমাত্র শব্দ প্রমাণ দ্বারা অধিগম্য এবং ইহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। সুতরাং ঘটাদির ন্যায় ইহাকে উভয় বুদ্ধির অধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না। এইজন্যই বলা হইয়াছে তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন।

আর যে বলিয়াছিলে যে 'তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন'; এপ্রকার বলা আত্মবিরোধী কথা। ইহাও ঠিক নহে কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিত হইতে শ্রেষ্ঠ।"

উক্ত ভাষ্যের শেষাংশে শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে শব্দ মাত্রই জাতি, ক্রিয়া, গুণ বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে। জাতি যেমন গো বা অশ্ব; ক্রিয়া যেমন—পাঠ করা বা রন্ধন করা; গুণ যেমন শুক্ল বা কৃষ্ণ; সম্বন্ধ যেমন ধনবান বা গোমান। ব্রহ্ম কোন জাতিভুক্ত নহেন সুতরাং তিনি সদাদি শব্দ বাচ্য নহেন। ব্রহ্ম গুণবান নহেন যে তাঁহাকে গুণ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে কারণ তিনি নির্গুণ। তিনি ক্রিয়া শব্দ বাচ্যও নহেন কারণ তিনি নিষ্ক্রিয়—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে তিনি নিষ্ফল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। ইহার সহিত কোন বস্তুর সম্বন্ধও নাই কারণ ইনি এক অদ্বিতীয় আত্মা। সুতরাং ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত যে 'কোন শব্দ দ্বারাই ইহাকে বর্ণনা করা যায় না'। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে গীতাকারের মতেও ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও কারক বর্জ্জিত।

৫। ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; ব্রহ্মের স্বজাতীয় কোন বস্তু নাই, বিজাতীয়ও কোন বস্তু নাই—তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত। শঙ্কর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর এই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াও তৃপ্ত হন নাই। ব্রহ্ম যে কেবল স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত তাহা নহে তাঁহাতে স্বগত ভেদও নাই। যদি বলা হয় ব্রহ্মে নানা প্রকার শক্তি আছে, তাঁহাতে জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, ইচ্ছা আছে—তাহা হইলে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করা হইল। কিন্তু শঙ্কর বলেন ব্রহ্মে এপ্রকার কোন ভেদ নাই। এ বিষয়ে তিনি বেদান্ত ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যেমন বৃক্ষ এক হইলেও শাখা স্কন্ধ মূল প্রভৃতি রূপে অনেকাত্মক তেমনি আত্মাও নানারস ও বিচিত্র। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—তাঁহাকে এক আত্মা-

রূপেই জানিবে।” বেঃ ভাঃ ১।৩।১। ভাষ্যের অন্য একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন:—“যদি বল ব্রহ্ম বহুরূপ, বৃক্ষ যেমন বহুশাখান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহু শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষ সমগ্র বৃক্ষরূপে এক কিন্তু শাখাদি রূপে বহু, সমুদ্র সমুদ্র রূপে এক কিন্তু ফেনতরঙ্গাদি রূপে বহু, মৃত্তিকা মৃত্তিকা রূপে এক ঘটশরাবাদি রূপে বহু—তেমনি ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য। এই একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার ও নানাত্বাংশে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমরা বলি—না এরূপ নহে।” বেঃ ভাঃ ২।১।১৪। বৃহদারণ্যক ভাষ্যেও এই মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লইয়া শঙ্কর বলিতেছেন যে অনেকে মনে করেন যেমন তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদাদি বশতঃ সমুদ্রে স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হয় তেমনি ব্রহ্মেও স্বগতভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এ মত সত্য নহে। কারণ শ্রুতিতে তাঁহাকে সৈন্ধব ঘনবৎ প্রজ্ঞান-ঘন একরস অন্তরবিহীন, পূর্ব্ব-অপর, বাহ্য-অভ্যন্তর ভেদ বর্জ্জিত বলা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে তাঁহাকে ‘একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্’—তাঁহাকে একরূপ বলিয়া জানিবে। সুতরাং তাঁহাকে সমুদ্রের ন্যায় বা বনের ন্যায় সাবয়ব বা অনেকরস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত বলা হইয়াছে যে ‘যে ইহাতে ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে। যখন ভেদ দর্শনের নিন্দা করা হইয়াছে তখন বলিতেই হইবে ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই।’ বৃহঃ ভাঃ ৫।১। শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্যের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে “শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম চৈতন্য মাত্র নির্ব্বিশেষ, ইহার কোন মাত্র রূপ নাই। যেমন সৈন্ধব খণ্ড অন্তর ও বাহ্য রহিত এবং একমাত্র রসঘন তেমনি আত্মাও অন্তর ও বাহ্য রহিত ও একমাত্র চৈতন্যঘন। ইহাতে বলা হইল যে আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই এবং চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ নাই; তিনি অন্তর বিহীন অর্থাৎ ভেদ বিহীন; নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ইহার স্বরূপ। যেমন সৈন্ধব খণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র লবণরস, ইহাতে অন্য কোন রস নাই; ব্রহ্মও সেই প্রকার। বেঃ ভাঃ ৩।২।১৬।

৬। ব্রহ্ম ক্রিয়া, কারক ও ফল বর্জ্জিত।

অনেকে মনে করেন ব্রহ্ম অনন্তশক্তিশালী, প্রেমময়, ইচ্ছাময়, তিনি স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শঙ্কর এ সমুদয় কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এ সমুদয়ের অতীত। “ইহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিম্বা ক্রিয়া, কারক বা ফল কিছুই নাই।” প্রশ্ন ভাষ্য ৬।৩। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণাদিকে কারক বলে। ব্রহ্ম কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মও নহেন। তাঁহা দ্বারা কোন্ কর্ম্মও সম্পাদন করা যাইতে পারে না—সুতরাং তিনি করণও নহেন। তাঁহা হইতে কোন বস্তু উদ্ভূত হয় না সুতরাং তাঁহাকে অপাদান বলা যায় না। তাঁহাতে কোন বস্তু অবস্থিত নহে সুতরাং তিনি অধিকরণও নহেন। ব্রহ্মের কারকত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে ভেদ এবং ক্রিয়াও স্বীকার করিতে হয়। আবার যেখানে ক্রিয়া সেই খানেই পরিবর্ত্তন। কিন্তু ব্রহ্ম অপরি-বর্ত্তনীয় সত্তা। সুতরাং ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ক্রিয়া, কারক ফল কিছুই স্বীকার করা যায় না। এই মত শঙ্কর বহুস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪, গীঃ ভাঃ ১৩।২, বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৩।৪।১ ইত্যাদি)।

৭। ‘ধ্যায়তীব লেলায়তীব।’

শঙ্কর বলিতেছেন আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি কিছুই নাই অথচ দেখিতেছি এ সমুদয় সকলেরই প্রত্যক্ষ। যাহা সকলেই দেখিতেছে, সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে সে বিষয়ে কি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন ‘তোমরা যাহা দেখিতেছ তাহা ভ্রমাত্মক, তোমাদের জ্ঞান হয় নাই বলিয়াই তোমরা এই প্রকার ভ্রম করি-তেছ’। এই মত সমর্থনের জন্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে (৪।৩।৭) “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” কথাটী বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ২।৩।৩০, ৪০, বৃহঃ ভাঃ ১।৩।২ ২।১।২০ ইত্যাদি)। ধ্যায়তীব=ধ্যায়তি+ইব=যেন বিচরণ করেন। লেলায়তীব=লেলায়তি+ইব=যেন বিচরণ করেন। ‘ইব’ শব্দের ব্যবহারে প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মা ধ্যানাদি করেন না কিন্তু ভ্রম হয় যেন ধ্যানাদি করেন। শঙ্কর ঘোরতর অদ্বৈতবাদী, সেই জন্য ‘ইব’ শব্দ তাঁহার

বড়ই প্রিয়। উপনিষদ্ ও গীতাতে যে সমুদয় স্থলে ব্রহ্মের কর্তৃত্বাদি স্বীকার করা হইয়াছে, শঙ্কর সেই সমুদয় স্থলেও 'ইব' শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই সমুদয় কার্য্যকে ভ্রমাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

জায়মানঃ = জায়মান ইব (মুঃ ভাঃ ২।১।৬)।

প্রতিষ্ঠিতঃ = প্রতিষ্ঠিত ইব (মুঃ ভাঃ ২।১।৭)।

যাতি = যাতি ইব (কঠঃ ভাঃ ২।২১)।

ব্রজতি = ব্রজতি ইব (কঠঃ ভাঃ ২।২১)।

এজতি = চলতি ইব (ঈঃ ভাঃ ৫)।

অত্যেতি = অত্যেতি ইব (ঈঃ ভাঃ ৪।

সম্ভবামি = সম্ভবামি ইব (গীঃ ভাঃ ৪।৬)।

যন্ত্রারূঢ়াণি = যন্ত্রারূঢ়াণি ইব (গীঃ ভাঃ ১৮।৬১)।

ইচ্ছন্তঃ = ইচ্ছন্ত ইব (গৌড়ঃ পাঃ ভাঃ ৪।১০) ইত্যাদি।

বেদান্ত সূত্রে (২।৩।৪৩) জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে শঙ্করের দর্শন বেদান্তদর্শনের বিরোধী হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি বলিলেন অংশঃ = অংশ ইব।

সুতরাং শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ক্রিয়া কারকাদি বর্জ্জিত।

৮। সুষুপ্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে 'যখন কোন পুরুষ নিদ্রিত হয় (স্বপিতি), তখন সে সৎ-স্বরূপের সহিত একীভূত হয়—তখন সে আপনাকে প্রাপ্ত হয় (স্বম্ অপীতঃ); এই জন্য বলা হয় সে নিদ্রা যাইতেছে (স্বপিতি)। ৬।৮।১। 'স্বপিতি' শব্দের অর্থ 'নিদ্রা যাইতেছে'; স্বং অপীতঃ = আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া। কয়েকটী অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন যে 'স্বপিতি' এবং স্বং অপীতঃ' একই কথা অর্থাৎ "নিদ্রিত হওয়া = স্ব-রূপ প্রাপ্ত হওয়া"। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ১।১।৯; ১।৩।১৫; ৩।২।৭, ১০; ৩২, ৩৫ ইত্যাদি)।

সুষুপ্তির সময় আত্মা সৎ-স্বরূপের সহিত একীভূত হয় সুতরাং এই অবস্থাই আত্মার স্ব-রূপ, ইহাই ব্রহ্মত্ব। অতএব ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ কি তাহা জানিতে হইলে এই সুষুপ্তির দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবিষয়ে এই প্রকার লিখিত আছে :—

"ইহাই তাঁহার কামনারহিত পাপরহিত অভয়রূপ। 'প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ' হইলে পুরুষ যেমন অন্তর ও বাহ্য জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রজ্ঞাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে অন্তর বা বাহ্য কিছুই জানে না। ইহাই তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত অবস্থা। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, দেব অদেব, বেদ অবেদ হয়েন। এই অবস্থাতে স্তেন (= চোর) অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ এবং তাপস অতাপস হয়। পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপও ইহার অনুগমন করে না, তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই অবস্থাতে তিনি দর্শন করেন না। দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। (দর্শন করেন ইহার কারণ এই যে) দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (দর্শন করেন না ইহার কারণ এই যে) তাহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না। (আত্মা আঘ্রাণ করেন, কারণ) ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (আঘ্রাণ করেন না, কারণ) ইহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেন না, রসাস্বাদন করিয়াও রসাস্বাদন করেন না (রসাস্বাদন করেন, কারণ) রসয়িতার রসাস্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (রসাস্বাদন করেন না, কারণ) তাহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আস্বাদন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি বলেন না, বলিয়াও বলেন না; (তিনি বলেন, কারণ) বক্তার বক্তৃতা কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (তিনি বলেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন। এই সময়ে তিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না; (শ্রবণ করেন, কারণ) শ্রোতার শ্রুতি কখন

সুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (শ্রবণ করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি মনন করেন না, মনন করিয়াও মনন করেন না; (মনন করেন, কারণ) মননকারীর মনন কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (মনন করেন না, কারণ) ইহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। এই অবস্থায় আত্মা স্পর্শ করেন না; (স্পর্শ করেন, কারণ) স্পর্শকারীর স্পর্শ কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (স্পর্শ করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। এই অবস্থায় আত্মা জানেন না, জানিয়াও জানেন না; (জানেন, কারণ) জ্ঞাতার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (জানেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি জানিবেন। যেখানে অন্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, তখন এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে বলিয়া থাকে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে এবং এক অপরকে অবগত হয়। বস্তু এই সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্যভেদ রহিত আত্মা) এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। ইহাই ব্রহ্মলোক।··· ইহাই পরমাগতি, ইহাই পরম সম্পৎ, ইহাই পরমলোক। ইহাই পরমানন্দ। বৃহঃ উঃ ৪।৩।

উদ্ধৃত অংশের ভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ, সুতরাং ইহা উদ্ধৃত করা অসম্ভব। এই অংশ শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়, বেদান্ত দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ইহা ২০।৩০ বার উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অবস্থাকে 'ব্রহ্মলোক' বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন 'ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মকেই লোক বলা হইয়াছে। ইহাই পুরুষের আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকরহিত রূপ। এই অবস্থাতে পুণ্য ইহার অনুগমন করে না, পাপও ইহার অনুগমন করে না। তখন পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই অবস্থাই পরমাগতি, পরম সম্পৎ, ও পরমানন্দ—সংক্ষেপে ইহাই মুক্তাবস্থা। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "ব্রহ্ম এবহি মুক্ত্যবস্থা" ৩।৪।৫২ অর্থাৎ ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অবস্থাই ব্রহ্ম।

সুষুপ্তাবস্থায় আত্মা একাকার প্রাপ্ত হয়—এই অবস্থাতে আত্মাতে কোন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় না। শঙ্কর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন "যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভাজ্যমানং সর্ব্বম্ ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞান ঘন এব (মাঃ ভাঃ ৫।) অর্থাৎ রাত্রিতে নৈশ অন্ধকারে সমুদয় বস্তু যেমন অবিভক্ত ঘনাকার হয়, প্রজ্ঞান ঘনও তদ্রূপ"।

৯। তুরীয় ব্রহ্ম।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার বিষয় সকলেই জানেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে জাগরিত স্থানকে 'বিশ্ব' বা 'বৈশ্বানর', স্বপ্ন স্থানকে 'তৈজস' এবং সুষুপ্ত স্থানকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের মতে সুষুপ্তাবস্থাই মোক্ষাবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থা কিন্তু মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে আত্মার প্রকৃতাবস্থা সুষুপ্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। এই অবস্থার নাম তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা। শঙ্কর বলেন 'এই জন্যই মুনিগণ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বর্জ্জন করেন।' বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২৩।

গৌড়পাদীয় কারিকার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের এই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেনঃ—

"তুরীয় আত্মা কি প্রকার তাহা অবধারণ করিবার জন্য বিশ্বাদির সামান্য ও বিশেষ ভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। যাহা করা যায় তাহাই কার্য্য, তাহাই ফল স্বরূপ, যে করে সে কারণ, ইহাই বীজ স্বরূপ। 'বিশ্ব' তত্ত্বগ্রহণ করিতে পারে না এবং 'তৈজস' তত্ত্বের বিপরীত ভাব গ্রহণ করে অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে এবং স্বপ্নাবস্থায় আত্মার বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে। এই 'বিশ্ব' ও 'তৈজস' বীজ ও ফল ভাব দ্বারা আবদ্ধ। 'প্রাজ্ঞ' কেবল মাত্র বীজ ভাব দ্বারাই আবদ্ধ। সুতরাং বিশ্ব ও তৈজস তুরীয় ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই। প্রাজ্ঞ ও তুরীয় কেহই দ্বৈত গ্রহণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে ইহারা একরূপ। এখন আশঙ্কা হইতে পারে কেন প্রাজ্ঞকে কারণবদ্ধ বলা হইল এবং তুরীয়কে এ প্রকার বলা হইল না। এই আশঙ্কা নিবৃত্তি করা যাইতেছে। তত্ত্বের প্রতিবোধ না হওয়াই নিদ্রা, ইহাই

বিশেষ প্রতিবোধের বীজ, ইহাই বীজনিদ্রা। প্রাজ্ঞ এই বীজনিদ্রাযুক্ত। কিন্তু সর্ব্বদা দর্শনই তুরীয়ের স্বভাব, সুতরাং তত্ত্বপ্রতিবোধরহিত নিদ্রা তুরীয়ে বর্ত্তমান নাই—সুতরাং তুরীয়ে কারণভাব নাই। স্বপ্ন=অন্যথা গ্রহণ; যেমন রজ্জুতে সর্প গ্রহণ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই নিদ্রা, ইহাই তমঃ। বিশ্ব ও তৈজস এই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত। সুতরাং ইহারা কার্য্যকারণবদ্ধ। প্রাজ্ঞ স্বপ্নবর্জ্জিত কেবল নিদ্রাযুক্ত সুতরাং কেবল কারণবদ্ধ। সূর্য্যে যেমন অন্ধকার দৃষ্ট হয় না তেমনি তুরীয় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্‌গণ স্বপ্ন ও নিদ্রা দর্শন করেন না; কারণ তুরীয়ে এই প্রকার দর্শন বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং তুরীয়ে কার্য্য কারণ বন্ধন নাই।" ১।১১—১৪।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে (৭) শঙ্কর বলিয়াছেন:—

'তুরীয় ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন'—ইহাতে বলা হইল যে তিনি 'তৈজস' নহেন। 'তিনি বহিষ্প্রজ্ঞ নহেন' ইহাতে বলা হইল তিনি বিশ্ব নহেন। 'তিনি উভয়প্রজ্ঞ নহেন'—ইহাতে বলা হইল যে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থাও নহেন। 'তিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন'—ইহাতে বলা হইল তিনি সুষুপ্ত অবস্থাও নহেন। কারণ সুষুপ্তিই অবিবেক এবং বীজ স্বরূপ। 'তিনি প্রজ্ঞ নহেন' ইহাতে বলা হইল যে 'তাঁহার যে যুগপৎ প্রজ্ঞাতৃত্ব আছে তাহাও নহে'। 'তিনি অপ্রজ্ঞ নহেন' ইহাতে বলা হইল তিনি অচেতন নহেন"। মাঃ ভাঃ ৭।

১০। নেতি নেতি।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের মতে "ব্রহ্ম বহিঃ প্রজ্ঞ নহেন, অন্তঃ প্রজ্ঞ নহেন, উভয় প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞান ঘন নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন"—তবে ব্রহ্ম কি? উপনিষদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন "নেতি নেতি" "তিনি ইহা নহেন ইহা নহেন।" এই ভাবেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে।

আত্মা, অবিদ্যা, জগৎ ইত্যাদি বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

দেবদূত।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—অরবিন্দের শয়ন-কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

(অরবিন্দ ও মাধবী। সম্মুখে—পীড়িত শিশু শায়িত।)

অর।—ঘুমায়েছে! যাও এবে ক্ষণেক বিশ্রাম তরে;
আজি চারিদিন হ'তে ওই দু'টী নেত্র 'পরে
নিদ্রা নাহি। অপলক চক্ষে কেমনে না জানি
—অনিবার এত যত্নে কর সেবা হে কল্যাণি,
অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্ব সুখ-স্বাস্থ্য আপনার!
তুমি বড় মায়াময়ী!

মাধবী।—(স্তন্য পান করাইতে বৃথা বারম্বার চেষ্টা করিয়া)
আহা—বাছারে আমার,
দেখ্ চেয়ে—দেখ্ চেয়ে—আমি যে জননী তোর!
এত ঘুম কেন ধন?—ও মাণিক!

অর। (স্বগত) কি সুন্দর!
(প্রকাশ্যে) থাক্, থাক্,—যাও তুমি ক্ষণেক বিশ্রাম তরে।
ঘুমাক্ না আরো কিছু। জাগিবে যখন পরে,
তোমারে আনিব ডাকি'। যাও তুমি। আপনার
শরীরে তাচ্ছীল্য হেন করিলে গো অনিবার,
তোমারি তনয়ে সেবা করিতে পা'বেনা;—নিজে
পীড়িতা হইলে তুমি, ভাবিছ না হ'বে কি যে।
যাও এবে;—শোন কথা!

মাধবী। কি বলিছ?—এঁই যাই।
দেখো—দেখো! এ কি ঘুম? না না।—থাক।
কি যে ছাই
মনে ভাবি!
শোন নাথ, বহুক্ষণ থেকে ওযে
খায় নাই! যাদু মোর, —উঠো!

অর। আজো ও কি বোঝে
কথা তব? হেন ভাবে বিরক্ত করিলে ওরে,
পীড়ার যে বৃদ্ধি হ'বে! বিশ্বাস করগো মোরে,
শোন কথা—যাও তুমি; জাগিলে, নিজেই আমি
ডাকিয়া আনিব পুনঃ। যাও, কথা শোনো।

মাধবী। স্বামি,
যাব? যাব? কোথা যাব নাথ? ও ছাড়া যে আর
কেহ কোথা নাহি মম! জানো নাথ, ও আমার
কত পুণ্য-ফলে পাওয়া নির্ম্মাল্য-কুসুম? তুমি
দেখো চেয়ে—এ ফুল তো ত্যজিবে না মর্ত্ত্য-ভূমি!
—ও যে বড় প্রভাময়! ও যে বড় সুমধুর!—

দেখিছ না মুখখানি !　　(মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া)
ওই দেখো—নীচে ভ্রূর
তুলি-আঁকা, ফুটে' আছে যেন দু'টি পদ্ম-ফুল !
কি সুন্দর দেখো রঙ্ ! গঠনটি কি অতুল !
বল দেব, বল প্রভু, একি সত্য মোর কেহ ?—
না, এ স্বপ্ন-লব্ধ দেব-আশীর্ব্বাদী ?

র। (স্বগত)　　—মাতৃস্নেহ !
কি অসীম ভালবাসা ! কি প্রেমান্ধ এ আগ্রহ
দুর্নিবার ! এ বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে অহরহ
এই প্রেম ! ওই ক্ষুদ্র রমণী-জীবন-মাঝ
জগতের মূল তত্ত্ব ফুটিয়া উঠেছে আজ !
কি অপূর্ব্ব এই শক্তি। আছ তুমি হে ঈশ্বর !—
বৃথা ভ্রান্ত জীবকুল সন্দেহেতে নিরন্তর
আঁধারে ঘুরিয়া মরে ব্যথাপূর্ণ, খিন্ন প্রাণে !
--আছ তুমি !

ধবী। (সন্ত্রস্ত ব্যাকুলতার সহিত দ্রুত নিকটে আসিয়া)
কি ভাবিছ ? সত্য বল,—বল কাণে,
—বাঁচিবে তো ?
(অর্দ্ধ স্বগত) এত ঘুম ! ঘুমেও তো স্তন মোর
লভেনি বিশ্রাম কভু !
(প্রকাশ্যে) ঘুমিয়ে কখনো ওর
এমন বিরাগ আর প্রভু, দেখিনি তো কভু !
থাকে ঘুমে ; স্বভাবতঃ—এই বক্ষ থেকে তবু,
টেনে' লয় স্তন হ'তে হৃদয়ের স্নেহ-ধারা !
কখনো তো মা'র ডাকে বাছা দেয় নাই সাড়া,—
এমন তো ঘটে নাই ! বল—বল দেব, বল—
এ তো কিছু মন্দ নয় ?
(নিকটে গিয়া, তনয়ের গাত্রে হস্ত দিয়া)
একি ! কেন অবিরল
এত ঘাম ঝরে ?
(স্তন্য দানের চেষ্টা করিয়া, শিশুর প্রতি চাহিয়া)
এরি মধ্যে এত অবহেলা !—
নিবিনে আমার দান ? আজি, এইটুকু বেলা,—
এরি মধ্যে মা'র অপমান ?
(সরোদনে) অভাগী ব'লে কি
তুই-ও চা'বিনে মোরে—ধন !

র। (স্বগত)　　হা—বিধাতা, একি ?
অবহেলা কে করে তোমায় ? অভাগী বলিয়ে
কে চাহে না বলে,' শিশু-পুত্র বক্ষে নিয়ে
এত অভিমান তব ? হায়—কে সে ঘৃণ্য প্রাণী ?
কে সে ?—আমি ! এতদূর ! হা অদৃষ্ট !

প্রকাশ্যে)　　শোনো বাণী—
যাও তুমি, করগে বিশ্রাম। বৃথা, হেন ভাবে
পাগলিনী হ'লে প্রিয়ে, কিবা শুভ ফল পাবে ?
পীড়িত তনয় তব ; তাই, এবে নাহি চাহে
স্তন-পান করিবারে তব ; আরো হের তাহে
একান্ত নিদ্রিত ওযে !
যাও ! শোন মোর কথা।
কখনো তো মোর বাক্যে তোমার এ বধিরতা
হেরি নাই। তবে, কেন ?
(কাছে আসিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)
—যাও প্রিয়ে, ওই গৃহে
ক্ষণেক শয়ন কর। আমিই তোমারে গিয়ে
আনিব ডাকিয়া দেবি, পুনঃ স্বল্পকাল পরে।
যাও হোথা হে প্রেয়সি, বারেক বিশ্রাম তরে।
—কথা শোন।

[মাধবী নীরবে, পুত্রের প্রতি চাহিতে চাহিতে
বক্ষে হাত দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

কি আশ্চর্য্য মহানের এ সৃজন!
ওই টুকু বক্ষে গুণ-সমুদ্রের এ প্লাবন
কেমনে— কি ভাবে এল ? ও জীবন-মাঝে, আহা—
এত বুদ্ধি, এত সহ্য, এত পবিত্রতা, যাহা
আমাদেরো এ জীবনে হ'ল নাক সঞ্চারিত—
কেমনে ও হিয়া মাঝে হ'ল তাহা বিকশিত !
করিয়াছি অবহেলা, -সত্য, বিনা দোষে, মরি
তোমারে গো এতকাল নিয়তই তুচ্ছ করি' !
এত গুণ তব ! তবে, করিবে না কিগো ক্ষমা—
আমার সে শত দোষ দেবি ?
চির-মনোরমা
সত্যই এ নারী-জাতি ! রূপে ? নহে—তাহা নহে !
অতুল গুণেরি প্রভা নিত্য দীপ্ত হ'য়ে রহে
ওই পুণ্য তনু' পরে ;—স্বচ্ছ ওই দেহ যেন
করিতেছে বিকিরণ অন্তরের আভা হেন।
তাই, তুমি মধুময়ী,—অপরূপ রূপবতী !
তাই, বিশ্বে নানা ভাবে ওঠে নিত্য এ আরতি
তোমাদের হে সুন্দরি !

[অন্নপূর্ণা, অজয় ও চিকিৎসকের প্রবেশ।]

(শয্যা'পরে উপবিষ্ট হইয়া, শিশুর প্রতি চাহিয়া)

অন্ন।　　এখন কেমন আছে ?
একি !—এত ঘর্ম্ম কেন ? (গাত্র-স্পর্শ করিয়া রোদন)

অজ। (রুগ্ন-শিশুর প্রতি চাহিয়া) অর্দ্ধ ঘণ্টা !—এরি মাঝে
এতই মলিন কেন ?
(শিশুর নিকটে অগ্রসর হইয়া, চিকিৎসকের প্রতি)
দেখো—স্পন্দহীন যেন !
আছে তো ?

(অন্নপূর্ণার প্রতি)

ও দিদি, সরো !

[অলক্ষিত ভাবে, এই সময়ে, স্থির দৃষ্টিতে, ধীর পদক্ষেপে মাধবীর প্রবেশ। আকাশে মেঘ-গর্জ্জন ও তৎসহ সহসা ক্ষণপ্রভার তীব্র দীপ্তি !]

চিকি। (শিশুর তনুতে হস্ত দিয়া)—নাই !

বৃথা, আর কেন ?

বৃথা শোক ! বিশ্বে এই উদ্দাম উচ্ছ্বাস হেন—
নিরর্থ আক্ষেপ ! দুঃখ-শোক এই দেহ সহে ;
তবু জীব কাঁদে !

সব যায়, পুনঃ সবি রহে !

[চিকিৎসকের প্রস্থান।]

[অন্নপূর্ণা ছিন্ন-মূল ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, অজয় চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন ; শুধু, দূরে—নিস্পন্দ প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায়, শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া,—দাঁড়াইয়া রহিলেন অরবিন্দ।]

মাধ। (ধীরে অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া, ধীর কণ্ঠে, অৰ্দ্ধ স্বগত ভাবে)

চুপ কর দিদি ! দেখো—কিবা এ সুন্দর রূপ !
—যেন শুধু রশ্মি-কণা !

থামো, স্থির হও, চুপ্ !—

দেখি'ছনা কত গাঢ় ঘুম ? এত শীঘ্র আর
জাগায়ো না ! চুপ্ কর। দেখো, এ ঘুম বাছার
ঘুম নহে, জাগরণ ! ও যে করিতেছে খেলা !
—জাগিয়ে ঘুমের ভাণ ! শোনো—চলো এই বেলা
গৃহকায সেরে' আসি। বাছা স্বপ্নটিরে ল'য়ে
খেলুক না কিছুক্ষণ হেন ভাবে ভোর হ'য়ে !—
কিবা ক্ষতি ? ও ওকি ঘুম,—না, চেতনা ?

অর। (গম্ভীর স্বরে) মাধবী,
কি কহি'ছ ?—ক্ষান্ত হও !

মাধ। (স্বামীর প্রতি ত্রস্ত নেত্রে চাহিয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া)

(স্বগত) প্রভু !—এখানে ! এখন !
একি ? কেন ?—দিদি কেন হেন করেন রোদন !
একি হলো ?—

(ক্ষণ পরে, প্রকাশ্যে, ক্রন্দন সহ)

খোকা !—যাদু মোর !

অন্ন। ডাকিছ এমন
ক'ারে চির-হতভাগি ! ওরে, সে বুকের ধন
চলে গেছে, চলে গেছে ! কর্—যতই ক্রন্দন,
পা'বিনে তাহারে আর !

মাধ। (মৃত দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সচুম্বনে)

ওরে ও বুকের ধন,

ওরে মোর অশ্রুবিন্দু, ও নিধি, নয়নমণি
ওরে রে সর্ব্বস্ব মোর, দেখ্—আমি যে জননী !
কোথা—কোথা গেলি বাপ্, ফেলি' আমারে ?—

কোথায় ?

বল্, বল্ ! (চুম্বন)

কোথা যাস্ বল্ ! এই-টুকু হায়,—
বড়ই যে ছোট তুই ! একা, একা, কোথা যা'বি ?
কিছু তো জানিনা ধন। বল্—দুধ কোথা পা'বি
মায়ের এ বুক ছাড়া ! ওরে বোটা-ছেঁড়া কুঁড়ি,
আমারে ফেলিয়া গেলি ?—বাপ্ ! (মূর্চ্ছা)

অর। (সবেগে অগ্রসর হইয়া) ফেলো দূরে ছুঁড়ি'
ওই ও শিশুর ওই তুচ্ছ, বিনশ্বর দেহ !
কেহ ওরে চিনিয়াছ ? জেনেছ কি আজো কেহ—
কে দু'দিন তরে হেথা আসিয়াই গেল চলি' ?
দেবদূত ! মোর প্রতি আজি গিয়াছে ও বলি'—
বিধির নির্দ্দেশ-বাণী, সে অপূর্ব্ব মহাদেশ !
ক্ষান্ত হও ! মিশাইয়া দাও—এই, এই শেষ
উপলক্ষ চিহ্নটিরে ওই মৃত্তিকার সনে
কেঁদোনা বিমূঢ় সম।—আসে নাই অকারণে।
কি জন্য ও এসেছিল, আমি জানি।

এবে তবে,

যাও—ওরে নিয়ে যাও দূরে হেথা হ'তে। হ'বে
এবে হেথা নিরজনে, এই পুণ্য-ক্ষণে, মোর এ
জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য-পালন।

(ছুটিয়া মাধবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাহার শির স্বীয় জানুদেশে উঠাইয়া লইলেন।)

অন্ন। ওরে,
ও অজয়, শোন্—শোন্, দেখ্—কি হ'ল আবার !
দুঃসহ এ দৃশ্য যেরে দেখিতে পারিনে আর !
ভগবান, হে শ্রীহরি, আজো নে'বে নাকি এই—
এই চির-দুঃখিনীরে ?—দয়া এটুকুও নেই !

[গৃহ-বহির্গতা হইলেন।]

অজ। অরবিন্দ, তুমিও কি হেন হইবে উতলা ?
বন্ধু, প্রিয়বর !

অর। —যাও এবে হেথা হ'তে !

(মাধবীর প্রতি) বালা,

মাধবী, উঠিয়া দেখো—আজি কে ডাকে তোমারে !
—আমি, হীন অরবিন্দ তব। এতদিন যা'রে
চাহিয়া, সাধিয়া, ভালো বাসিয়া অনন্ত মনে,—
কিছুতেই পাও নাই ; আজি দেখো—সে কেমনে
তব কৃপা, ক্ষমা-প্রার্থী ! প্রিয়ে,—

অজয়। (মৃত কায়াটি বস্ত্রাবৃত করিয়া, কোলে
উঠাইয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে স্বগত)
হে মঙ্গলময়,
এ কেমন লীলা প্রভু, তব ? জয় তব জয়।
[নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।]

অর। প্রিয়ে, আমি স্বামী তব। হের কহি পুনঃ পুনঃ
ওঠ, চেয়ে দেখো--আমি !

মাধবী। — প্রাণনাথ, তুমি !

অর। শুন—
আমি চিরদিন অয়ি দেবি, তোমারে—তোমারে
—আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ওই স্বর্ণ-প্রতিমারে
করিয়াছি অবহেলা--অকারণে ! কেন জানো ?
—এত দিন অন্ধ, মূঢ় ; ছিল না আমার প্রাণো ;
এত দিন অচেতন আছিলাম আত্ম-মোহে ;
তাই, রত্ন চিনি নাই। তুমি সে সকলি সহে'
দেবীত্বে উন্নীতা আজি ! আর, আমি ?—আজি হায়,
দাঁড়াইয়া চাহি ক্ষমা ঘৃণ্য অপরাধী প্রায় !
ক্ষমা কি করিলে দেবি, করিবে কি কৃপা মোরে ?
তেমনি অতুল ধৈর্য্যে দিবে স্থান বক্ষ'পরে ?
চাহো নাকি আর মোরে ? বল ! বলিতেই হ'বে—
করিবে না ক্ষমা মোরে ?

মাধ। (চরণ-ধারণ করিয়া, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে)
—সর্ব্বস্ব আমার !

অর। —তবে,
এসো—এসো বক্ষে এসো হে নিখিল-দিব্য-জ্যোতি ;
এসো আলিঙ্গন-পাশে সতি, সতি, সতি, সতি !
[মাধবী আলিঙ্গন-বদ্ধা হইলেন।]
[যবনিকা-প্রক্ষেপ।]

সমাপ্ত।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

সদুপায়।

বরিশালের কোনো একস্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতী লবণের চেয়ে শস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতী লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতী কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না, তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেকস্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশান ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে আমি এই উত্তর দিব যে—বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে, সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা--রাগপ্রকাশ করাটা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের আশঙ্কার কারণ কি ? সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব্ব অপূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্ব্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশতঃ হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছি বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই ;--দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়াছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া

দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ বাঙালীর প্রতিবেশী এবং বাঙালী অনেক দিন হইতেই বেহারীদের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বিহারবাসী বাঙালীমাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িয়া আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলা দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালীও বেহারী উড়িয়া এবং আসামীকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড় নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্ব্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সারভাগ শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান সংখ্যা প্রতি বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালীর বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতী বর্জ্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হোক্ না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট্ ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনো প্রকারে হোক্ বয়কট্‌কে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্ম্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষ্যে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কত দূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি একথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই—মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই—আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেই জন্য সহসা একদিন

হাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া তে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে, বিরোধকেই জাগাইয়া লিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই হাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবী করিয়াছি। এবং য উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার চ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া াড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে সহজেই একটা শ্ন উদয় হইল একি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য াবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্ব্বেও ত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো একমুহূর্ত্তে অত্যন্ত বেশি ইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের াছে যাই নাই যে "দেশি কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল ইবে এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে দ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গয়াছিলাম যে, "ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা ামাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না তএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশি কাপড় রিতে হইবে।"

কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, াহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, াহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার রাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে নের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয়, যে, কানদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহা- গকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না। ল্টা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ লিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ ধৈর্য্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের পরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্য্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সে বাধাকে অবিমিশ্র স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা যে, মুসল- মানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোন দিন দিই নাই অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়া- ছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসাবশতই যে গিয়া- ছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মা শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য দেশের সাধারণ জন-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা

অধৈর্য্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃ-বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাষ্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি!

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজি পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না আমরা অনেক স্থলেই যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি যাহারা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের নাই;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়—কাজ ফাঁকি দিবার পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনি এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোন একটি বড় বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে যদি তাহারা বিলাতী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষের আমদানী না করে তবে নির্দ্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় নিকটবর্ত্তী জমিদারদের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্ব্বক বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষ্যে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইহাঁদের নিকট ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইঁহারা বলেন মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক

ৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছুই নাই। দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মত আবদ্ধ করিবে ইহার মত ইষ্টহানিও আর কিছুতে হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ সকল প্রণালী দাসত্বের প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এই প্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো প্রকার আপসে অধিকার প্রাপ্তির মূল্য বোঝে না তাহারা জোরকেই মানে-- তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা ত প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। হাতে কোনো প্রকার ক্ষমতা পাইবামাত্র অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিবার অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্ত্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানেরও উপায়ের দ্বারা আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধোর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কি কাপড় পরিবে বা কি নুন খাইবে তাহাকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়--নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্ত্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছি না আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনি সে বুঝিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি--তখনি সে বুঝিবে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটবড় সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারী উড়িয়া অথবা অন্য যে কোনো ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনি সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের-উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ;—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না; বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে

সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মত তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্ব্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।* এইরূপ ধর্ম্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্ব্বলতা; প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে সয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটু মাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিতে কতকটা কৃতকার্য্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্ম্মের পথ। কিন্তু ধর্ম্মের পথ দুর্গম—দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে অহংকার বিসর্জ্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলগাড়িতে 'বোমা' ছুড়িবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ ও মিশরের পুরাতত্ত্ব।

পৃথিবীর মধ্যে যত গুলি পুরাতত্ত্বের মিউজিয়ম্ আছে, তন্মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এখানে সব পুরাতন দেশের অতীত ইতিহাসের নিদর্শন সংগৃহীত হইয়া, অথবা তাহার অনুকরণে প্রস্তুত নমুনা সকল অতি যত্নে ও অতি সুব্যবস্থায় সাজান, আছে। সে সাজানর প্রথা এমন সুন্দর, যে ঠিক স্থান হইতে দেখিতে আরম্ভ করিয়া নিয়ম মত পরে পরে ক্রমান্বয়ে দেখিয়া যাইলে, কেহ না কিছু বুঝাইয়া দিলেও, মোটামুটি সকল কথা বুঝা যায়। মনে হয়—যেন স্বপ্ন রাজ্যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া, বাষ্পময় সৌর জগতের মধ্য দিয়া, জ্বলন্ত গোলার মত পৃথিবীতে আসিয়া—তাহার পর, আজ অবধি পৃথিবীর যাবতীয় পরিবর্ত্তন সবই চোখের উপরে দেখিলাম।

একরূপ পদার্থ হইতেই যাবতীয় পদার্থের স্তরে স্তরে অভিব্যক্তি; ও সকল দেশের সকল সমাজের ইতিহাসের মোটামুটি একতা। সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে ক্ষমতাশালী ও দিগ্বিজয়ী হইয়া, কোনও কোনও মানব সমাজ কিছু দিন মেদিনী কাঁপাইয়া, পরে সকল জিনিষেরই যেমন স্বধর্ম্ম—লয় প্রাপ্ত হইয়া, এখন কেবল মাত্র নিজের কঙ্কাল রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার তারই ভস্মাবশেষ হইতে নূতন ভাবে নূতন দেশের নূতন রাজ্যের আবির্ভাব। ঠিক যেন পিতার পর পুত্রের বংশ পরম্পরায় আবির্ভাবের মত। যেমন একটি লোকের ইতিহাস, তেমনি একটি সংসারের ইতিহাস ও তেমনিই সেই দেশের ও মানবজাতির ইতিহাস। সেটি কি?—না—জন্ম, অতিবৃদ্ধি, মৃত্যু, ও শেষে স্মৃতি চিহ্ন ও কোনও

না কোনও রূপে ভবিষ্যতের বীজ রাখিয়া—অনন্তের গর্ভে লুকান।

এখানে থাকিতেই সে জ্ঞানরত্নভাণ্ডারের নাম শুনিয়াছিলাম, ও বিভিন্ন পুস্তকে তাহার সম্বন্ধে অনেক মনোহর কথাও পড়িয়াছিলাম। তাই যাইবার পূর্ব্ব হইতেই সে স্থান দেখিবার একান্ত বাসনা অহরহ মনে জাগিয়া থাকিত।

লণ্ডনে পৌঁছাবার পর এক দিন লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী "ইষ্ট্ ফিন্‌চলে" নামক এক স্থানে একটি রমণী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবাসী জানিলেই এইরূপ সৌজন্য করেন। এরূপ সেখানে অনেক লোক আছেন। সেই দিনই সদ্বংশীয় ইংরাজ পরিবারের আচার ব্যাবহার প্রথম দেখিলাম। বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। সে দেশে নিমন্ত্রণ মানে খাওয়া দাওয়াই সব নহে। একত্র কথাবার্ত্তাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এমন সহজ কায়দা দুরন্ত সরল আত্মীয়তা, যে মনেই হয় না পরের বাড়ীতে আছি। পিয়ানোতে গান গাহিয়া শুনাইলেন। নিজের লেখা কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। তার অধিকাংশই ভালবাসার কবিতা। সেগুলি অতি সুরুচিপূর্ণ ও সে দেশের প্রথার অনুমোদিত। নিজের ছোট লাইব্রেরীটি দেখাইলেন—তাতে অধিকাংশই উপন্যাস। বিংশতিবর্ষীয়া রমণী, সবে মাত্র বিবাহ হইয়াছে। স্বামী একখানি খবরের কাগজের লেখক। শরীর ক্ষীণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা ও কথা কহিবার ভাব অতি তৎপর। মিষ্ট কথার তুলনা নাই। তিনিই কথায় কথায় ওই মিউজিয়মের (British Musium) কথা তুলিলেন—ও আপনিই বলিলেন—"আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া কাল লইয়া যাইব।" একত্র মিলিবার স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া, কাগজে টুকিয়া দিয়া, আমাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন যথা সময়ে টিউব ষ্টেশনে ঠিক একটার সময় সাক্ষাৎ হইল। তাঁর সহিত আরও দুটি লোক ছিলেন—একটি ডার্বিসায়ারের এক রমণী—অপরটি ময়ুরভঞ্জ রাজার প্রধান ইঞ্জীনিয়ার—"মার্টিন" সাহেব।

সেখান হইতে একত্রে চলিতে চলিতে আমরা (British Museum) "ব্রিটিশ মিউজিয়মে" গেলাম। সে সব চলিবারই স্থান—যেমন রাস্তা ভাল, সুন্দর নির্ম্মল হাওয়া, তেমনি সে দেশের লোকেরাও সজোরে দ্রুতপদে ও সুনিয়মে অতি সুন্দর চলে।—সে দেশের সকল লোক পদব্রজে চলিতে বড়ই ভালবাসে। আমি সেরূপ চলায় অভ্যস্ত ছিলাম না বলিয়া একত্রে চলিতে বাধ বাধ লাগিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে একত্র পা ফেলিতে হয়, অথচ অন্য কোনও যাত্রীর গায়ে গা না লাগে সে বিষয়েও বেশ লক্ষ্য রাখিতে হয়—সে চলা শিক্ষাসাধ্য।

কিছু দূরে যাইয়াই কাল পাথরের সে প্রকাণ্ড বাড়িটি দেখা যাইতে লাগিল। লণ্ডনের অধিকাংশ বড় বড় বাড়ি গুলিই কালো। ধোঁয়া ও কুয়াশায় আপনিই কাল হইয়া যায়। মোটা উঁচু থামের সারিগুলির চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। সম্মুখেই অনেকগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রস্তরময় মূর্ত্তি। ও ভিতরে ঢুকিলে পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনোপযোগী পুরাতন ইতিবৃত্ত স্বচক্ষে দেখা যায়।

কি পুস্তক পড়া, কি দর্শনীয় স্থান দেখা, এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে আমি প্রথমেই তার সম্বন্ধে মোটামুটী একত্রে একটি জ্ঞান পাইতে চাই। তারপর তার উপর বিশেষ বিশেষ স্থানের সবিস্তার অনুসন্ধান সহজেই বুঝা যায়। এইরূপ প্রথার অনেক সুবিধা আছে। সমস্ত অংশগুলি পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া একটির স্মৃতি অপরটিকে ডাকিয়া আনে। বিষয়গুলি মনে রাখিতে বড় বেশী আয়াস হয় না। আর তা ছাড়া সবগুলি একত্রে দেখিলে সকল জিনিষেই একটি সুন্দর নিয়ম অন্তর্নিহিত দেখা যায়—আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে তা থাকে না। তাই সেরূপ কল্পনার অতীন্দ্রিয় একটি মধুর ভাব আছে।

বাড়িটি দ্বিতল। এক তালায় ঢুকিয়া সামনেই একটি বড় হল আছে, সেইখানে সমিতির অধিবেশন হয়। আর তার পিছনে, চারিদিকের পুস্তকাগারের মধ্যস্থিত বড় একটি পড়িবার ঘর। বাম দিকে সব ব্লকগুলিতে মিশর, বেবিলন, ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সকল পুরাতন দেশের অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আছে। ও দক্ষিণদিকের ব্লকগুলি সব পুরাতন পুঁথি ছবি ও অন্যান্য পুস্তকসম্বন্ধীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। এদিকে বই পড়, আর ওদিকে সেই সব জিনিষ স্বচক্ষে দেখিয়া লও, এই উদ্দেশ্যে এমন করিয়া সাজান।

উপরে উঠিবার অনেকগুলি সিঁড়ি আছে। তারও চারিধারেই সব দর্শনীয় দ্রব্যাদি সাজান। এইরূপ একটি স্থানে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতক স্মৃতি রক্ষিত আছে। এত দূরদেশেও ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ঘাড়টি আপনা আপনিই নত হইয়া পড়িল। এমন দেবতা তো কোথাও জন্মান নাই, যার ভুবনের যাবতীয় প্রাণীরই দুঃখ মোচন করা একমাত্র ব্রত ছিল। আমাদের ও অন্যান্য সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা, তোষামোদপ্রিয় ও প্রতিহিংসালোলুপ ধর্ম্মের কল্পনা হইতে এই কল্পনাটি কত সুন্দর,—কত মহান্। কেবলই পরের দুঃখে অশ্রুজল—ও কেবলই ক্ষমা।

উপরে উঠিয়াও একধার আবার কেবল মিশর, বেবিলন, ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস্, রোম, ইত্যাদি দেশের পুরাকালিক ছোট ছোট দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। অপর দিকে অন্যান্য নানা বিষয়ের প্রস্তুদ্রব্য সাজান আছে। তার মধ্যে আমেরিকা. অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, ব্রীটেন, প্রভৃতি

স্থানের দ্রব্যগুলিই অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। ভারতীয় দ্রব্যাদি কেবল ছোট ছোট দুটি ঘরে মাত্র ভরা।

এই গেল ব্রিটিশ মিউজিয়মে দ্রব্যাদি সাজাইবার মোটামুটী ব্যবস্থা। তাহা হইতে বুঝা যায় মিশরই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান পাইয়াছে। মিশরই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম বলিয়া বিবেচিত। ও মিশর সম্বন্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা অনুসন্ধানের সুব্যবস্থা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধেই কিছু কথা বলিব।

মিশর ইউরোপের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান, ও পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার পথে অবস্থিত, ও আবহাওয়া অতি ভাল বলিয়া, শীতকালে অনেক লোক সেইখানে স্থান পরিবর্ত্তনে যান। এইরূপ নানা কারণে মিশরসম্বন্ধে চর্চ্চা সমগ্র ইউরোপেই বড়ই বলবতী। কত শত ধনী লোকেরা রাশি রাশি টাকা দিয়া এই সকল বিষয় অনুসন্ধানের সাহায্য করেন, ও স্বয়ং গবর্ণমেণ্টরাও এই কাজে সাহায্য ও উৎসাহ দেন। সকল কলেজেই মিশরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা হয়। এই সব কারণে পুরাতন মিশরসম্বন্ধে কত তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর সে আবিষ্কারের অন্য সুবিধাও অনেক। সে দেশে এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল, যে মৃত লোকেরা ভবিষ্যতে আবার নিজ নিজ দেহেই ফিরিয়া আসিবেন। এবং মৃতদেহের যত্ন করিলে, পরলোকে আত্মা সুখে থাকে। এই মধুর কল্পনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সে দেশের লোকেরা অশেষপ্রকারে মৃত আত্মীয়দের দেহ রক্ষা করিতে যত্ন করিতেন। সেই কারণেই এত "মামী" বা সুরক্ষিত মৃত দেহের বাহুল্য, ও সেই কারণেই সুন্দর সুন্দর চিত্রিত "শবাধার", ও কাঠ বা প্রস্তরময় "কবর" (sarcophagus)। এমন কি সেই কারণেই অতি বিস্ময়কর "পিরামিদেরও" উৎপত্তি। এই পিরামিদের ভিতরেই ছোট বড় কামরায় ধনী লোক ও রাজা রাজড়ার মৃতদেহ সুরক্ষিত আছে। আর তার সহিত জীবনধারণ ও ভোগবিলাসের আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদিও ন্যস্ত আছে, ও চারিদিকের চিত্রে সে সময়ের সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও অবস্থারও বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে প্রচারিত। এই সকল কারণে সে সব পুরাতত্ত্ব উদ্ভাবন করিবার বা বুঝিবার কিছুই অসুবিধা নাই।

এই সকল দ্রব্যাদি, চিত্র, ও লেখা হইতে জানা যায় যে অন্ততঃ আজ হইতে ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বেও পুরাতন মিশর-বাসীরা সুসভ্য ছিল, ও "নীল" নদীর ধারে তাহারা "মেমফিস্" নামক সমৃদ্ধিশালী নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। নীল নদী বছরে বছরে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়, তাহা নিবারণের জন্য তাহারা যে সুন্দর ও দৃঢ় পাথরের বাঁধ বাঁধিয়াছিল, আজও তাহার কতক অংশ বিদ্যমান আছে। অত পুরাকালেও তারা এক রাজার অধীনে বাস করিত, ও নানা রূপ জ্ঞান চর্চ্চায় ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল।

"কেরো" নগরের নিকটবর্ত্তী মরুভূমিতে যে তিনটি পিরামিদ আছে, তার মধ্যে সর্ব্বোচ্চটি ৫০০ ফুট উচ্চ। তার পাথর গুলি এমন সুন্দর গাঁথা যে দুটির মধ্যে একটু চুল অবধি গলে না। তার ভিতর সুড়ঙ্গ পথ আছে—তদ্দ্বারা একটি কামরা হইতে অপর কামরায় যাওয়া যায়। এই সকল কামরাগুলিই বড় লোকের মৃত দেহ রাখিবার স্থান। পাছে কোনও লোক দেহটি সেখান হইতে লয় এই ভয়ে অনেকগুলি পথ একেবারে গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া। সহজে খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। উপযোগী দ্রব্যাদি, ও চিত্র, ও লেখার সহিত এই মৃতদেহগুলি এমন সুন্দর ও স্থায়ীভাবে রক্ষিত বলিয়াই, সে গুলি আজ কাল পুরাকালের মিশর দেশের পুরাতন বার্ত্তা জানায়।

মৃতদেহ রক্ষার জন্য সেকালে বহু আয়োজন ও ব্যবস্থা ছিল। রাজ্য হইতেই এক শ্রেণীর লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল, যাহাদের কেবল এই মাত্র কাজ। ভালরূপে দেহকে শুষ্ক ও সেদন করিয়া রক্ষা করা বহু ব্যয়সাধ্য, তাহার জন্য মোট প্রণালী এইরূপ।

অধিকাংশ স্থলেই পেট চিরিয়া মৃত দেহের অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া লওয়া হইত, কারণ এই সকলগুলিই সহজে পচে। এবং সেইগুলি চারিটি বৃহৎ সুন্দর কারুকার্য্য করা হাঁড়ির মধ্যে পচা নিবারক দ্রব্য বিশেষের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া, কবরের মধ্যে শবাধারের নীচে চারি কোণে রক্ষিত হইত। তারপর দেহটির ব্যবস্থা অনুরূপ। সেটি নানা-রূপ আরকে ডুবাইয়া ও মূল্যবান গন্ধদ্রব্যে সিঞ্চিত করিয়া —পরে একরূপ লেপদ্বারা নিষিক্ত করিয়া ফালি ফালি কাপড় দিয়া আপাদ মস্তক জড়াইয়া—"মামী" করা হইত। এইটি একটি কাঠের বাকসের ভিতর রক্ষিত হইয়া শব সমেত একটি কবরের ভিতর স্থাপিত হয়। সে কাঠের বাক্সটির ভিতর পিটেই সেই পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত থাকে। সবগুলিই ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক চিত্র। আর সেই মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, যথা আহার বসন ভূষণ অস্ত্রশস্ত্র গন্ধদ্রব্যাদিও দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় কতকগুলি ছোট পুঁতুল থাকে—তাহারা যেন তার পরলোকে সেবা করিবার ভৃত্য স্বরূপ। আর সেই চারিটি অন্ত্ররক্ষিত ভাঁড়ের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সেগুলিকে "কপ্‌টিক জার" বলে। এতগুলি সব কবরের উপকরণ। সে লোকের বা সে সময়কার সকল ইতিবৃত্তই এই সব হইতে সহজেই জানা যায়।

এত বাহুল্য ব্যবস্থার কারণ, মৃত আত্মীয়েরা এই সকল সৌষ্ঠব উপভোগ করিবেন বলিয়া। সকল দেশেই অল্প বিস্তর, এইরূপ বিশ্বাস। তাঁহারা যেন উপভোগ করেন। যদিও তাঁহাদের উপভোগ করার কথা দূরে থাকুক পরলোকে

আত্মার কোনও ভাবে অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ অনেকে করে, —তবুও কিন্তু আমাদের মন সেইরূপ ভাবিয়াই সুখী হয়, বলিয়া —আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস সহজেই আসে।

মিশর সম্বন্ধে এই সকল গ্যালারীতে—সে সব বিষয়ের যাবতীয় দ্রব্যাদি সাজান আছে। একবার ঘুরিয়া দেখিলেই সবগুলি দেখা যায়। মনে হয়—ঠিক আমাদের মতনই তাদের সব আবশ্যক ছিল, ঠিক আমাদের মতনই তাদের সুখ দুঃখ। অভাবেরও উৎপত্তি, ও তার ব্যবস্থা আদি মনুষ্যেরা প্রায় এক প্রকারেই করে।

সে সময়ে তাদের দেশে রাজাই পুরোহিত ছিলেন। ও তাঁহারই অধীনে অন্যান্য পুরোহিত মন্দিরে পূজাদি সম্পন্ন করিতেন। আমাদের মত তাঁহারাও প্রকৃতির শক্তি পূজা করিতেন –যথা—সূর্য্য বায়ু আকাশ ইত্যাদি। সূর্য্যদেবই তাঁহাদের প্রধান দেবতা। ইহারই প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি "কেরোব" বালুময় মরুভূমে অদ্ধ প্রোথিত আছে। সেটি পিরামিদ হইতেও পুরাতন। সে বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তিটির মুখ স্ত্রীলোকের মত, আর দেহ সিংহের মত। তার নাম "স্ফিংস্।" সুফলের জন্য জলের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারাও আমাদের মত আকাশের পূজা করিতেন। ও হানিকর দেবতাদের প্রসন্ন করিবার জন্য সাধনা করিতেন। এইরূপে অনেক দেবীমূর্ত্তিরও পূজা হইত, এবং সিংহ বলীবর্দ্দ ও কুম্ভীর আদি জন্তুদের পবিত্র বলিয়া মনে করাতে—এগুলিরও পূজা হইত, কখনও তাদের মারা হইত না। "Apis Bull" বা বাৎসরিক মহাসমারোহে ষাঁড়-পূজা প্রাচীন মিশরের একটি প্রধান উৎসব ছিল।

সোনা লোহা তামা আদি সকল ধাতুরই তাঁহারা সদ্ব্যবহার জানিতেন। সেই সব ধাতু নির্ম্মিত কত দ্রব্যাদিই সংগৃহীত হইয়া সাজান আছে। ও এই সকল দ্বারা কত কারুকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্যও চলিত। সে দেশে তখন কামার ছুতার সেকরা রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি সকল কারবারী লোকই ছিল। তাঁহারা বলদএর সাহায্যে, ও বাঁকা লাঙল দিয়া, ক্ষেত চষিয়া চাষ বাস করিতেন।

আর লেখা পড়া ও শাস্ত্রচর্চ্চার কথাতো কিছু বলিবারই নয়! সকল শাস্ত্রই অধীত হইত। সে ক্ষুদ্র মরুভূমির দেশে চাষের উপযোগী জমীর বড়ই অনাটন বলিয়া সূক্ষ্মরূপে জমী মাপিবার জন্য সেখানেই প্রথম জ্যামিতি শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহারা বড় পারদর্শী ছিলেন। আমাদের দেশেও এই সকল শাস্ত্রগুলিই প্রথমে পরিপুষ্ট হয়। বিজ্ঞান পরে আসে। লিখিবার ও পুস্তকের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সেখানে এক আলাহিদা শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের "স্ক্রাইব" বা লেখক বলা হইত। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান ছিলেন। অনেক পরেও দেখা গিয়াছে, তাহাদের দেশে নানা বিষয়ক "হাতে লিখা" পুস্তকপূর্ণ ভাল ভাল লাইব্রেরীও ছিল। এলেকজান্দ্রিয়া নগরের লাইব্রেরী মুসলমানেরা মিশর জয় করিলে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেন—সেই হইতেই কয় খণ্ড জ্যামিতি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের পুস্তকাগার পুড়াইয়া দিবার কারণ—"কোরাণে যাহা লিখা আছে তা ছাড়া আর কিছু পুস্তকের আবশ্যক নাই, বা অন্যত্রে কোনও সত্য থাকিতে পারে না।" সকল দেশেই গোঁড়াদের মধ্যে অন্ধধর্ম্মবিশ্বাস এইরূপ। তাতে অলক্ষিতে মানব জাতির কতই ক্ষতি হইয়াছে।

সে দেশের পুরাকালের লেখা বিশেষ একরূপ ছিল। "প্যাপীরস" নামক গাছের ছালে সরকাঠির কলমে লেখা তখন হইত। সে হরফগুলি এক রকম ছবি আঁকার মত। তাকে Hieroglyphic বলে—মানে "ছবির মত লিখা"। "মানুষ" এই নাম লিখিতে হইলে তারা সত্য সত্য একটি মানুষই লিখিত। সেইরূপ সকল নামই তার প্রতিকৃতি দিয়া লেখা। পরে এই লেখা ভাঙ্গিয়া সংক্ষেপ হইয়াই—অন্যান্য দেশের বর্ণমালা হইয়াছে। ব্যবসাদার ফিনিসিয়ানরাই— ব্যবসা সূত্রে অন্যান্য দেশে যাইয়া এই লেখা সে সকল দেশে প্রচলিত করিয়া দেন। এই হইতেই আমাদের "আনিকানি" বর্ণমালা ও ইউরোপের "আলফাবেট"। মিশরেও অনেক পরিবর্ত্তনের পর, তবে অক্ষরগুলি আধুনিক অক্ষরের মত দাঁড়ায়। অতি পুরান অক্ষর পড়িবার যো নাই। গ্রীস্ মিশর জয় করার পর, কতকগুলি আদেশ পুরাতন মিশর ভাষায় ও গ্রীক ভাষায়, প্রস্তর গাত্রে খোদিত হইয়াছিল। সেইগুলি মিলাইয়াই মিশরের আদি অক্ষর নিরূপিত হয়। সে "রোজেটা" পাথর খানিও মিউজিয়মে আছে। ইংরাজ ফরাসীকে পরাস্ত করিয়া তার কাছ হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়া আনিয়াছে।

সে দেশের লোকেরা চিরকালই বড় সদানন্দচিত্ত ও আমোদপ্রিয়। নাচিয়া খেলিয়া সময় কাটায়। এমন কি জাহাজের কুলিরাও কাজ কর্ম্মের অবসরে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করে। সে ভাব তাদের রাণী ক্লিওপেট্রার চরিত্র হইতে বেশ লক্ষিত হয়। কিন্তু তারা মোটেই পরিশ্রমী, বা বলবান বা সাহসিক নয়। অথচ ভীষণ ভীষণ প্রতিবাসী শত্রু দ্বারা সেই ধনশালী দেশটি তখন চারিদিকে পরিবৃত ছিল। তাতে আত্মরক্ষা কেবল বুদ্ধিবলেই হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রাচীর তুলিয়া দক্ষিণে নিউবিয়া দেশ হইতে দেশরক্ষা, ও সুয়েজযোজকের উপর প্রাচীর দিয়া বলশালী সীরিয়া এসিরিয়া বেবিলন ও অন্যান্য জাতি হইতে আত্মরক্ষা, করিয়াছিলেন। সে সকল প্রাচীরের, বুদ্ধির কীর্ত্তিস্তম্ভের মত, কতক কতক অংশ এখনও বিদ্যমান আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের যে ঘরে তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য

দ্রব্য সামগ্রীগুলি আছে সে ঘরটি দেখিলে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। এগুলি অধিকাংশই গোর হইতে খুঁজিয়া লওয়া হইয়াছে। কারিগরের যন্ত্রগুলি ও ব্যবহার্য্য বাসন-কোষণগুলি প্রায় আমাদেরই মত। তাদেরও পেয়ালা, থালা, ঘটী, হাঁড়ী, কলসীর ব্যবহার ছিল। অলঙ্কারগুলি নানা ধাতুর ও নানা ছাঁদে গড়া। বালা আছে হার আছে কর্ণ ভূষণ আছে, সবগুলিই অতি পরিপাটীরূপে নক্‌সা কাটা। মুখ দেখিবার আরসীগুলি চকচকে ধাতু নির্ম্মিত, কাঁচের নহে। চিরুণী ও মাথার কাঁটাগুলি ঠিক প্রায় আধুনিক মতই দেখিতে। ডাক্তারী যন্ত্রগুলি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলাম। তাদেরও অস্ত্র চিকিৎসার ছুরিগুলি আমাদের মত ছাঁদে গড়া। সলা বা "প্রোব্" গুলিও আধুনিক মত। চিমটা ও কাঁচিগুলির নাচি নাই, তারা স্প্রীংএ কাজ করে। তাহারাও "আরসিনিক্" ও "পারার" ব্যবহার জানিতেন। এই সকল দেখিয়া বুঝা যায় পূর্ব্বকালেও আধুনিকদিগের মত অনেক দ্রব্যাদি ছিল। কেবল কালক্রমে তাহারাই সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান কালের দ্রব্যাদির মত হইয়াছে। একথা সকল বিষয়েই খাটে। মনের ভাব, সামাজিক প্রথা, দর্শন বিজ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তা, সবই সমান ছিল। কেবল কালক্রমে সে সব আরও উন্নত হইয়াছে। "History repeats itself" অর্থাৎ ইতিহাসেরও পুনরাবৃত্তি হয় একথার বোধ হয় এই মানে।

যে ঘরগুলিতে "মামী" ও "কবর" গুলি রক্ষিত আছে সে ঘরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা লোমহর্ষক। সেখানে গিয়া সে সকলের কথা ভাবিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০০ বছরেরও নরদেহ সেখানে রক্ষিত আছে। একটি দেহ শুকাইয়া তার অস্থি পঞ্জর ও ক্ষীণ দেহের শুক্‌না চামড়া সুদ্ধ—একটি গোরের ভিতর খুলা অবস্থায় দেখান আছে। ঠিক যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রক্ষিত। মাথার চুলগুলি অবধি বিদ্যমান। আর একটি কবরে অনেকগুলি পুরোহিতের দেহ একত্র রক্ষিত আছে। তাদের যজমানেরা নিজ হাতে বুনিয়া যে সকল বস্ত্রাদি তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য উপহার দিয়াছিল সে গুলিও রাখা আছে। অতি পরিপাটী করিয়া বুনা ও কারুকার্য্যে খচিত। কোনওটিতে একটুও দুর্গন্ধ নাই। আবৃত গোরের উপরও হাতগড়া নানা ছাঁদের প্রতিমূর্ত্তি কোথাও কোথাও রাখা দেখিলাম, সে সবই ভোগবিলাসে রত। এক রাণী নিজের গোরের উপর বিবস্ত্রা হইয়া বসিয়া দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছেন। আর একটির উপর রাজা ও রাণী দুজনে একত্রে পাশাপাশি উপবিষ্ট। এইরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে জপমালা সমেত জোড় হস্ত একটি মূর্ত্তি স্থাপিত হইত।

শবকোষের ভিতরকারদিকের চিত্রগুলি ও দেওয়ালের বৃহৎ চিত্রগুলিতে অনেক পরলোকের কল্পনা অঙ্কিত আছে। মৃত্যুর পর কিছু দিন আত্মা সেই দেহের নিকটই ঘুরে। পরে পাতালের কোন রাজ্যে চলিয়া যায়—অস্তমান সূর্য্যেরও সেই স্থানে থাকিবার স্থান। দেহকে যত যত্নে রাখা যায় আত্মাও পরলোকে তত সুখে থাকে। আত্মার প্রতিকৃতি তাহাদের কল্পনায় কতকটা পাখীর মত, কারণ পাখীর মত সেটিও উড়িয়া যায়। এইরূপ পাখীর মুখবিশিষ্ট সেখানে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরলোকের বিচারের কথা অতি সুন্দর ছবিতে, দেওয়ালের উপর, বরাবর, পরে পরে, চিত্রিত আছে। তার নাম "ইনির" বিচার। মৃত্যুর পর "ইনি" জোড় হাতে একটি তৌল দাঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। এই দাঁড়িতে তাহার আত্মা ওজন হইবে। নিকতির অপর দিকে একটি মাত্র পক্ষীর পালক রাখা। আর "ইসিস্" নিকতির কাঁটাটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন যে "ইনির" আত্মা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় নাই। অমনি দেবতারা আসিয়া তাহাকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেলেন। সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্ম্মের সাজা তাহাদের মতে পরলোকে অবশ্যম্ভাবী ফল।

নীচের তলায় যে সকল মিশর দেশীয় প্রতিমূর্ত্তি ও অট্টালিকা বা মন্দিরের ভগ্নাংশগুলি সংগৃহীত আছে সেগুলিও অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। তাহা হইতেও মিশরের অনেক ইতিহাস জানা যায়। তার কারণ সেসবগুলি অতিশয় পরিপাটি ও সুরক্ষিত। মন্দিরের ভিতরদিকেই এইসব বেশী লক্ষিত হয়। তার কারণ আমাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থের জ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ একটা সাধারণ লোক হইতে লুকানর ভাব আছে, সকল পুরোহিতবিধ্বস্ত দেশেই সেরূপ ছিল। সে সম্বন্ধে বাহিরে সাধারণ লোককে কিছু দেখান যুক্তিযুক্ত বা স্বার্থ সম্বন্ধে নিরাপদ মনে হয় নাই।

এই সকল ইতিহাস হইতে আর একটি বিস্ময়কর কথা জানা যায়। সে এই, যে পুরাতন জাতি মাত্রেই বংশ রক্ষা বড় আবশ্যকীয় ও ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচনা করিত। পারলৌকিক কাজের জন্য তাহা বড়ই আবশ্যকীয়। ধন-সম্পত্তি সব সংসারের সকল লোকের একত্রে ও সমান স্বত্ব। কাহারও কোনও অংশে আলাহিদা অধিকার নাই। ঠিক আমাদের দেশের মিতাক্ষরা আইনের মত। তাহাদের সংসারে অনেক ক্রীত দাস দাসীও থাকিত এবং পোষ্যপুত্র লইয়া বংশরক্ষা করা তাহাদেরও প্রথা ছিল। আমাদের দেশেও ওইরূপ পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে;—জাপানেও ওইরূপ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তাই সে দেশের জাপানের মত কত সহস্র বৎসর ধরিয়া বংশ পরম্পরায় একই রাজ্য চলিয়া আসিতেছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪,০০০ বৎসরে প্রথম মিশরের রাজ-পুরোহিত বা রাজা বা "ফেরোয়ার" কথা জানা যায়। তারপর হইতে অনেক বংশ চলিয়া আসিয়াছে। মোটামুটি এই পরবর্ত্তী কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা প্রথম হইতে একাদশ বংশ পর্য্যন্ত বা ২,৫০০ খৃঃ পূঃ বৎসর অবধি রাজত্বকে—পুরাতন রাজ্য বলা যায়।

সেইরূপ ১২ হইতে উনবিংশতম বংশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২০০ খৃঃ পূ বৎসর অবধি—মধ্যম রাজ্য।

এবং বিংশ হইতে ত্রিংশ বংশ বা ৩৫০ খৃঃ পূঃ বৎসর অবধি—নূতন রাজ্য বলা যায়।

প্রথম রাজা "মেনিস্"ই "মেমফিস্" নামক রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু চতুর্থ বংশের রাজারাই যত বড় বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। "গীজার" বড় "পিরামিদ" তাঁদেরই কীর্ত্তি, এইরূপে তিনটি পিরামিদ সৃষ্ট হয়—তাতে অনেক বৎসর সময় লাগে ও অনেক অর্থ্যব্যয় হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি ৫০০ ফিট উঁচু। ইহাদের ভিতরকার সুড়ঙ্গগুলি সব ধ্রুব তারার দিকে ফিরান। তার নিকটেই যে নরমুণ্ড বিশিষ্ট এক সিংহের প্রকাণ্ড ছবি আছে সেটিকেই "স্ফিংস্" বলে। সেটি ইহাদের প্রধান দেবতা সূর্য্যদেবেরই ছবি—ও পিরামিদ হইতেও পুরাতন।

অনেক হাজার বৎসর পরে মিশর পরাধীন হইয়া পড়ে ও নিকটবর্ত্তী সিরিয়ার লোক আসিয়া রাজ্য দখল করে। এত সহজে দখল করিবার কারণ—যে, অনেক ভিন্ন দেশীয় লোকে মিশর দেশে আসিয়া বাস করিতেছিল, তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া সিরিয়ানদের সাহায্য করে। ইহাদেরই নাম Shepherd King বা "রাখালরাজা" কিন্তু কিছুদিন পরেই ইহারা নিজেরাই মিশর দেশের আচার ব্যবহার লইয়া মিশরবাসীর মতই হইয়া পড়িলেন। রোম যখন গ্রীস জয় করেন তখন জেতা হইয়াও গ্রীসের সভ্যতা নিজে লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও দলে দলে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। যথার্থ পক্ষে উন্নতির এমনিই আকর্ষণ যে মহাবলশালীও তার কাছে মাথা নিচু করে। কিছুদিন পরে মিশরের আরও দক্ষিণ দেশস্থ "থীবস্"এর করদরাজা কর অস্বীকার করিয়া—মিশর দেশ হস্তগত করিয়া ফেলি-লেন। ইনিই অষ্টাদশ বংশীয় রাজা। ইঁহাদের আগমনের পর বাইবেলে উক্ত মিশর দেশের ঘটনাগুলি ঘটে। ইঁহারাই ইহুদী দলপতি "জোসেফ"কে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন হইতে মিশরের প্রতাপের আর সীমা রহিল না। তাঁরা জয়োল্লাসে নিক্রান্ত হইয়া—আরো নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজ্যসমূহ যথা "বেবিলন" "এসিরিয়া" প্রভৃতি জয় করি-লেন। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্য বেশী দিন রহিল না। তারপর আসিরিয়ার লোকেরা আসিয়া অচিরে মিশর দেশ জয় করিয়া ফেলিল। এই প্রতাপশালী অষ্টাদশ বংশীয় রাজারাই মিশরের দক্ষিণে ও নীল নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাজধানী "থীবস্"নগর নানারূপ বড় বড় মূর্ত্তি গড়িয়া সাজাইলেন, এই মূর্ত্তিকে গ্রীক জাতিরা "মেমন" নাম দিয়াছিল। ট্রয়যুদ্ধে কথিত আছে এই "মেমন" রাজাই লড়াই করিতে গিয়া হত হন।

এই বংশের আর এক রাজা ভিন্ন দেশীয় মাতার গর্ভজাত বলিয়া এক নূতন ধর্ম্ম মতের আবির্ভাব করেন। তাঁহার মতে মিশরের চিরকালের দেবতা সূর্য্যদেবকে পূজা করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি এ পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হন নাই। আমা-দের দেশেও সেই রূপ ভিন্ন জাতি আসিয়া বসবাস করার ফলে অনেক নূতন ধর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। শকদের আগমনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উঠে। মুসলমানেরা আসার পর "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অধুনা ইংরাজদের আগমনে— "ব্রাহ্ম ধর্ম্মও" প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সংসর্গে সকল জিনিষই কাল ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তা না হইলে অপরিবর্ত্তিত একই অবস্থাতে পৃথিবীর অবস্থা কি শোচনীয় হইত?

ইহাদের পরই উনবিংশ বংশে—খৃঃ পূঃ ১,৪০০ বিখ্যাত রাজা প্রথম "রামেসিস্" রাজা হন। ইনি বড় বড় অট্টালিকা ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বিদিত হইয়াছেন। ইনি সিরিয়াতে যুদ্ধ করিতে যান—এবং সেখানে ইঁহার বীরত্বের কথা থীবস্ নগরের একজন কবি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

নিউবিয়া দেশে থীবস্ নগরে নীল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে খোদিত ইহাঁরই চারিটি মূর্ত্তি মন্দিরের তলায় দণ্ডায়মান। সে ছবিটি এখানে দিলাম। মন্দিরের গায়ে গায়ে ইহাঁর কীর্ত্তি কথা লিখা আছে। ইহাঁর আমলেই ইহুদিজাতি এখানে আসিয়া নানারূপ অত্যাচার সহ্য করে। ধনাগার তৈয়ারী করিবার জন্য তাহারাই ক্রীত দাসের মত খাটিয়া সে সব কাজ করিয়া দেয়। এ সময়ে "সেমিটিক" বা অন্য জাতীয় লোক এখানে সংখ্যায় এত বাড়িয়া পড়ে—যে দেশের লোকের সংখ্যায় তারা অনেক বেশী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের দিয়া সব কাজ করিয়া লওয়া হইত বলিয়া তাহারা বিদ্রোহী হয়—ও পরিশেষে ইহুদিরা মিসর ত্যাগ করিয়া বনে বনে লুকাইয়া পলায়। একেই বলে "একজোডাস্" বা বাইবেলে কথিত পলায়ন অঙ্ক। ইহার পরই "মধ্য রাজ্যের" অবসান ও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার বিলুপ্তি—ও যত পরাজয়, উপসর্গ ও যন্ত্রণা ঘটে। বাইবেলে লিখিত আছে—"বিদেশী এসিরিয়ানরা মন্দির হইতে ও রাজপ্রাসাদ হইতে সব ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

এই সময়কার রাজারা সব বিদেশীয়। তাহাদের মূর্ত্তি সকল—দেখিতে অন্যরূপ ও সুশ্রী। এইবার মিশর দেশের অধোগতির সময়। দুঃসময় বুঝিয়া উত্তর হইতে এসিরিয়ান ও দক্ষিণ হইতে এথিওপিয়ানরা আসিয়া মিশর

আক্রমণ করিল। এবং মিশর জয় করিয়া "দ্বিংশতি বংশ" হইয়া সিংহাসনে বসিল। এই সময় হইতে সকল বড় বড় পদবী এসিরিয়ানরই লইতে লাগিলেন ও মিসরবাসীরা বিদ্রোহী হইলে তারাইয়া দিয়া "থীবস" নগর ধ্বংস করিলেন। সকল সময়ের জেতারাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র কখনও কোথাও সমান থাকে না। কিছুদিন বাদে বেবিলন দেশের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল আর সেই গোলমালে মিশরও উঠিয়া আপনার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিল। এইটি ষড়বিংশতি বংশ। ইহার পর হইতেই আবার শুভদিন দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে কলা বিদ্যার উন্নতির আর অবধি ছিল না। এবং সিরিয়া দেশ জয় করিয়া ও নিজে বরাবর স্বাধীন থাকিয়া পারস্য দেশের অভ্যুত্থানে মিশর আবার স্বাধীনতা হারাইল। এই সময়েরই একটি সুন্দর "সূচ্যগ্রস্তম্ভ" ছাপাইলাম।

৫৩৯ খৃঃ অঃ পারস্যদেশ অতিশয় ক্ষমতাবান হইয়া বেবিলন অধিকার করিল ও তার অব্যবহিত পরেই আর্ট জেরেক্সসের আমলে মিশর আক্রমণ করিয়া মেমফিস্ নগর অধিকার করিল। একশত বৎসর মিশরকে পারস্যের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল।

তার পর গ্রীকবীর এলেকজণ্ডার আসিয়া মিশর জয় করেন। ও তাঁর মৃত্যুর পর এক সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমী নামে রাজা হন। এই সময়ে গ্রীসই মিশরের রাজভাষা হয়, ও অনেক লিপি সেই ভাষাতেই খোদিত আছে। পরে ক্লিওপ্যাট্রার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমানেরা মিশরের সিংহাসন অধিকার করেন।

এই টলেমীর আমলেই সেই প্রসিদ্ধ "রোজেটা" স্তম্ভ খোদিত হয়। পুরোহিতের আদেশ—ও ৫ম টলেমীর সম্মান সূচক অনুজ্ঞা এই পাথরে তিন রকম ভাষায় লিখা থাকে—যথা—পুরোহিতের ছবি আঁকা ভাষা বা Hieroglyphic, সাধারণ লোকদের ভাষা, ও গ্রাম্য ভাষায়। এই হইতেই মিলাইয়া মিশরের পুরাতন হরফ নির্ণয় হয়। রাজার নাম গুলি সব আঁকসী দিয়া অঙ্কিত। তাই হইতেই হরফ ঠিক হয়। ফরাসীরা ১৭৯৮ খ্রীঃ অঃ এই পাথর নীল নদীর মোহানা হইতে আনে। পরে এলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে হারাইয়া ইংরাজরা ইহা লইয়া আসেন। সেই অবধি ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিদ্যমান।

পরে আরব জাতিরা মিশর জয় করিল। সেই অবধি এদেশটি এখন তুর্কীয় সুলতানের অধীনেই আছে। এবং ইংরাজ ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন মানুষ মরিয়া গেলে আর যেমন সেরূপ ভাবে বা সে দেহে আর বাঁচিতে পারে না, জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুরাকালে যে সকল জাতি উন্নত ও ক্ষমতাবান হইয়া এখন পড়িয়াছেন তাহাদের আর উঠিবার আশা নাই। মিশর দেশ, গ্রীস্ দেশ, রোম দেশ কেহই পারে নাই। অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও ওই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু গ্রীস্ তো উঠিয়াছে—তাহার ভাষা, দর্শন, কলা বিদ্যা, পৃথিবী জুড়িয়া আদৃত হইয়াছে। সব তো তার নষ্ট হয় নাই। জিনিষের ফলাফল এমনি ভাবেই থাকে। সব থাকে না; যে টুকু ভাল ও থাকিবার উপযুক্ত সে টুকু অবিনাশী ও পরিশেষে গৃহীত ও আদৃত হইবে। অনেক বিষয়ে পতিত হইলেও নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও এমন অনেক জিনিষ আছে। সেগুলি কি আমরা এখনও জানি না।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীখুদীরাম বসু।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৮ম ভাগ। ভাদ্র, ১৩১৫। ৫ম সংখ্যা।

গোরা।

৩০

কোন প্রকার অপরাধ বিচার না করিয়া কেবল মাত্র গ্রামকে শাসন করিবার জন্য সাতচল্লিশজন আসামীকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের পর গোরা উকিলের সন্ধানে বাহির হইল। কোনো লোকের কাছে খবর পাইল সাতকড়ি হালদার এখানকার একজন ভাল উকিল। সাতকড়ির বাড়ি যাইতেই সে বলিয়া উঠিল—"বাঃ, গোরা যে! তুমি এখানে!"

গোরা যা মনে করিয়াছিল তাই বটে—সাতকড়ি গোরার সহপাঠী। গোরা কহিল, চরঘোষপুরের আসামীদিগকে জামিনে খালাস করিয়া তাহাদের মকদ্দমা চালাইতে হইবে।

সাতকড়ি কহিল—"জামিন হবে কে?"

গোরা কহিল—"আমি হব।"

সাতকড়ি কহিল,—"তুমি সাতচল্লিশ জনের জামিন হবে তোমার এমন কি সাধ্য আছে?"

গোরা কহিল, "যদি মোক্তাররা মিলে জামিন হয় তার ফি আমি দেব।"

সাতকড়ি কহিল—"টাকা কম লাগবে না।"

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাসে জামিন খালাসের দরখাস্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্যকার সেই মলিন বস্ত্রধারী পাগ্‌ড়িপরা বীরমূর্ত্তির দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। চৌদ্দ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বুড়া পর্য্যন্ত হাজতে পচিতে লাগিল।

গোরা ইহাদের হইয়া লড়িবার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ করিল। সাতকড়ি কহিল, "সাক্ষী পাবে কোথায়? যারা সাক্ষী হতে পারত তারা সবাই আসামী! তার পরে এই সাহেব-মারা মামলার তদন্তের চোটে এ অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের ধারণা হয়েছে ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোকের যোগ আছে; হয় ত বা আমাকেও সন্দেহ করে, বলা যায় না। ইংরেজি কাগজগুলোতে ক্রমাগত লিখ্‌চে দেশিলোক যদি এ রকম স্পর্দ্ধা পায় তা হলে অরক্ষিত অসহায় ইংরেজরা আর মফস্বলে বাস করতেই পারবে না। ইতি মধ্যে দেশের লোক দেশে টিঁক্‌তে পারচে না এমনি হয়েছে। অত্যাচার হচ্চে জানি কিন্তু কিছুই করবার জো নেই।"

গোরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কেন জো নেই?"

সাতকড়ি হাসিয়া কহিল—"তুমি স্কুলে যেমনটি ছিলে

এখনো ঠিক তেমনিটি আছ দেখ্‌চি। জো নে মানে আমাদের ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে রোজ উপার্জ্জন না করলে অনেকগুলো লোককে উপবাস করতে হয়। পরের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে মরতে রাজি হয় এমন লোক সংসারে বেশি নেই—বিশেষত যে দেশে সংসার জিনিষটি বড় ছোট খাট জিনিষ নয়। যাদের উপর দশজন নির্ভর করে তারা সেই দশজন ছাড়া অন্য দশজনের দিকে তাকাবার অবকাশই পায় না।"

গোরা কহিল, "তাহলে এদের জন্যে কিছুই করবে না? হাইকোর্টে মোশন করে যদি"

সাতকড়ি অধীর হইয়া কহিল—"আরে ইংরেজ মেরেছে যে—সেটা দেখ্‌চনা! প্রত্যেক ইংরেজটিই যে রাজা—একটা ছোট ইংরেজকে মারলেও যে সেটা একটা ছোট রকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপনয়নে পড়ব সে আমার দ্বারা হবে না।"

কলিকাতায় গিয়া সেখানকার কোনো উকিলের সাহায্যে কিছু সুবিধা হয় কিনা তাই দেখিবার জন্য পরদিন সাড়ে দশটার গাড়িতে রওনা হইবার অভিপ্রায়ে গোরা যাত্রা করিয়াছে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল।

এখানকার মেলা উপলক্ষ্যেই কলিকাতার একদল ছাত্রের সহিত এখানকার স্থানীয় ছাত্রদলের ক্রিকেটযুদ্ধ স্থির হইয়াছে। হাত পাকাইবার জন্য কলিকাতার ছেলেরা আপন দলের মধ্যেই খেলিতেছিল। ক্রিকেটের গোলা লাগিয়া একটি ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মাঠের ধারে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল—আহত ছেলেটিকে দুইটি ছাত্র ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া চাদর ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া তাহার পা বাঁধিয়া দিতেছিল এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাহারাওয়ালা আসিয়াই একেবারেই একজন ছাত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। এই পুষ্করিণীটি পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ করা, ইহার জলে নামা নিষেধ, কলিকাতার ছাত্র তাহা জানিত না, জানিলেও অকস্মাৎ পাহারাওয়ালার কাছে এরূপ অপমান সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস ছিল না, গায়েও জোর ছিল তাই অপমানের যথোচিত প্রতিকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া চার পাঁচ জন কন্‌ষ্টেবল ছুটিয়া আসিল। ঠিক এমন সময়টিতেই সেখানে গোরা আসিয়া উপস্থিত। ছাত্ররা গোরাকে চিনিত গোরা তাহাদিগকে লইয়া অনেকদিন ক্রিকেট খেলাইয়াছে। গোরা যখন দেখিল, ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পারিল না—সে কহিল—"খবরদার মারিস্‌নে।" পাহারাওয়ালার দল তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। এদিকে দেখিতে দেখিতে ছাত্রের দল জুটিয়া গেল। গোরার উৎসাহ ও আদেশ পাইয়া তাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিতেই পাহারাওয়ালার দল রণে ভঙ্গ দিল। দর্শকরূপে রাস্তার লোকে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল; কিন্তু বলা বাহুল্য এই তামাসা গোরার পক্ষে নিতান্ত তামাসা হইল না।

বেলা যখন তিন চারটে,—ডাকবাংলায় বিনয়, হারান বাবু এবং মেয়েরা রিহার্সালে প্রবৃত্ত আছে এমন সময় বিনয়ের পরিচিত দুইজন ছাত্র আসিয়া খবর দিল গোরাকে এবং কয়জন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেফতার করিয়া লইয়া হাজতে রাখিয়াছে, আগামী কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই ইহার বিচার হইবে।

গোরা হাজতে! একথা শুনিয়া হারান বাবু ছাড়া আর সকলেই একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিনয় তখনই ছুটিয়া প্রথমে তাহাদের সহপাঠী সাতকড়ি হালদারের নিকট গিয়া তাহাকে সমস্ত জানাইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া হাজতে গেল।

সাতকড়ি তাহার পক্ষে ওকালতি ও তাহাকে এখনি জামিনে খালাসের চেষ্টা করিবার প্রস্তাব করিল। গোরা বলিল, "না, আমি উকীলও রাখব না, আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।"

সে কি কথা! সাতকড়ি বিনয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল—"দেখেছো! কে বলবে গোরা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে! ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক সেই রকমই আছে।"

গোরা কহিল—"দৈবাৎ আমার টাকা আছে বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাইনে। আমাদের দেশের যে ধর্ম্মনীতি তাতে

আমরা জানি সুবিচার করার গরজ রাজার; প্রজার প্রতি অবিচার রাজারই অধর্ম্ম। কিন্তু এ রাজ্যে উকীলের কড়ি না জোগাতে পেরে প্রজা যদি হাজতে পচে জেলে মরে, রাজা মাথার উপরে থাক্‌তে ন্যায় বিচার পয়সা দিয়ে কিন্‌তে যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় তবে এমন বিচারের জন্যে আমি সিকি পয়সা খরচ করতে চাইনে।"

সাতকড়ি কহিল—"কাজির আমলে যে ঘুষ দিতেই মাথা বিকিয়ে যেত।"

গোরা কহিল—"ঘুষ দেওয়া ত রাজার বিধান ছিল না যে কাজি মন্দ ছিল সে ঘুষ নিত এ আমলেও সেটা আছে। কিন্তু এখন রাজদ্বারে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে গেলেই বাদী হোক্ প্রতিবাদী হোক্ দোষী হোক্ নির্দ্দোষ হোক্ প্রজাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। যে পক্ষ নির্দ্ধন, বিচারের লড়াইয়ে জিত হার দুই তার পক্ষে সর্ব্বনাশ। তারপরে রাজা যখন বাদী আর আমার মত লোক প্রতিবাদী তখন তাঁর পক্ষেই উকীল বারিষ্টার—আর আমি যদি জোটাতে পারলুম ত ভাল নইলে অদৃষ্টে যা থাকে! বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তবে সরকারী উকীল আছে কেন? যদি প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা? এ কি রকমের রাজধর্ম্ম?"

সাতকড়ি কহিল—"ভাই, চট কেন? সিভিলিজেশন্ সস্তা জিনিষ নয়। সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে সূক্ষ্ম আইন করতে হয়—সূক্ষ্ম আইন করতে গেলেই আইনের ব্যবসায়ী না হলে কাজ চলেই না—ব্যবসা চালাতে গেলেই কেনাবেচা এসে পড়ে—অতএব সভ্যতার আদালত আপনিই বিচার কেনাবেচার হাট হয়ে উঠ্‌বেই—যার টাকা নেই তার ঠকবার সম্ভাবনা থাক্‌বেই। তুমি রাজা হলে কি করতে বল দেখি?"

গোরা কহিল, "যদি এমন আইন করতুম যে হাজার দেড় হাজার টাকা বেতনের বিচারকের বুদ্ধিতেও তার রহস্য ভেদ হওয়া সম্ভব হত না তাহলে হতভাগা বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের জন্য উকীল সরকারী খরচে নিযুক্ত করে দিতুম। বিচার ভাল হওয়ার খরচা প্রজার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সুবিচারের গৌরব করে পাঠান মোগলদের গাল দিতুম না।"

সাতকড়ি কহিল—"বেশ কথা, সে শুভদিন যখন আসে নি—তুমি যখন রাজা হওনি—সম্প্রতি তুমি যখন সভ্য রাজার আদালতের আসামী তখন তোমাকে হয় গাঠের কড়ি খরচ করতে হবে, নয় উকীল বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হবে, নয় ত তৃতীয় গতিটা সদ্গতি হবে না।"

গোরা জেদ করিয়া কহিল—"কোন চেষ্টা না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোক্। এরাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারো সেই গতি।"

বিনয় অনেক অনুনয় করিল কিন্তু গোরা তাহাতে কর্ণপাতমাত্র করিল না। সে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি হঠাৎ এখানে কি করে উপস্থিত হলে?"

বিনয়ের মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। গোরা যদি আজ হাজতে না থাকিত তবে বিনয় হয় ত কিছু বিদ্রোহের স্বরেই তাহার এখানে উপস্থিতির কারণটা বলিয়া দিত। আজ স্পষ্ট উত্তরটা তাহার মুখে বাধিয়া গেল—কহিল, "আমার কথা পরে হবে এখন তোমার"—

গোরা কহিল—"আমি ত আজ রাজার অতিথি। আমার জন্যে রাজা স্বয়ং ভাব্‌চেন তোমাদের আর কারো ভাব্‌তে হবে না।"

বিনয় জানিত গোরাকে টলানো সম্ভব নয়—অতএব উকিল রাখার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইল। বলিল—"তুমি ত খেতে এখানে পারবে না জানি, বাইরে থেকে কিছু খাবার পাঠাবার জোগাড় করে দিই।"

গোরা অধীর হইয়া কহিল—"বিনয়, কেন তুমি বৃথা চেষ্টা করচ! বাইরে থেকে আমি কিছুই চাইনে। হাজতে সকলের ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশি চাইনে।"

বিনয় ব্যথিত চিত্তে ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিল। সুচরিতা রাস্তার দিকের একটা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া জানলা খুলিয়া বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। কোনো মতেই অন্য সকলের সঙ্গ এবং আলাপ সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

সুচরিতা যখন দেখিল বিনয় চিন্তিত বিমর্ষমুখে ডাক-

বাংলার অভিমুখে আসিতেছে তখন আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় সে নিজেকে শান্ত করিয়া একটা বই হাতে করিয়া এ ঘরে আসিয়া বসিল। ললিতা শেলাই ভালবাসে না কিন্তু সে আজ চুপ করিয়া কোণে বসিয়া শেলাই করিতেছিল,—লাবণ্য সুধীরকে লইয়া ইংরেজি বানানের খেলা খেলিতেছিল, লীলা ছিল দর্শক ; হারান বাবু বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আগামী কল্যকার উৎসবের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

আজ প্রাতঃকালে পুলিসের সঙ্গে গোরার বিরোধের ইতিহাস বিনয় সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল। সুচরিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল -ললিতার কোল হইতে শেলাই পড়িয়া গেল এবং তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"আপনি কিছু ভাববেন না বিনয় বাবু -আজ সন্ধ্যা বেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেমের কাছে গৌরমোহনবাবুর জন্যে আমি নিজে অনুরোধ করব।"

বিনয় কহিল—"না, আপনি তা করবেন না · গোরা যদি শুনতে পায় তাহলে জীবনে সে আমাকে আর ক্ষমা করবে না।"

সুধীর কহিল—"তার ডিফেন্সের জন্য ত কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে।"

জামিন হইতে খালাসের চেষ্টা এবং উকিল নিয়োগ সম্বন্ধে গোরা যে সকল আপত্তি করিয়াছিল বিনয় তাহা সমস্তই বলিল—শুনিয়া হারান বাবু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন —"এ সমস্ত বাড়াবাড়ি !"

হারান বাবুর প্রতি ললিতার মনের ভাব যাই থাক্ সে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মান্য করিয়া আসিয়াছে, কখনো তাঁহার সঙ্গে তর্কে যোগ দেয় নাই,—আজ সে তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়—গৌর বাবু যা করেছেন সে ঠিক করেছেন—ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের জব্দ করবে আর আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করব! তাদের মোটা মাইনে জোগাবার জন্যে ট্যাক্স জোগাতে হবে, আবার তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে উকীল ফি গাঠ থেকে দিতে হবে! এমন বিচার পাওয়ার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল !"

ললিতাকে হারান বাবু এতটুকু দেখিয়াছেন—তাহার যে একটা মতামত আছে সে কথা তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেন নাই। সেই ললিতার মুখের তীব্র ভাষা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—তাহাকে ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তুমি এ সব কথার কি বোঝ? যারা গোটাকতক বই মুখস্থ করে পাস করে সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যাদের কোনো ধর্ম্ম নেই ধারণা নেই, তাদের মুখ থেকে দায়িত্বহীন উন্মত্ত প্রলাপ শুনে তোমাদের মাথা ঘুরে যায়!" এই বলিয়া গত কল্য সন্ধ্যার সময় গোরার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ-বিবরণ এবং সে সম্বন্ধে হারান বাবুর সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের আলাপের কথা বিবৃত করিলেন। চরঘোষপুরের ব্যাপার বিনয়ের জানা ছিল না; শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল—বুঝিল ম্যাজিষ্ট্রেট গোরাকে সহজে ক্ষমা করিবে না।

হারান যে উদ্দেশ্যে এই গল্পটা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি যে গোরার সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে নীরব ছিলেন তাহার ভিতরকার ক্ষুদ্রতা সুচরিতাকে আঘাত করিল এবং হারান বাবুর প্রত্যেক কথার মধ্যে গোরার প্রতি যে একটা ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রকাশ পাইল তাহাতে গোরার এই বিপদের দিনে তাঁহার প্রতি উপস্থিত প্রত্যেকেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিল। সুচরিতা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; কি একটা বলিবার জন্য তাহার আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সেটা সম্বরণ করিয়া সে বইয়ের পাতা খুলিয়া কম্পিত হস্তে উল্টাইতে লাগিল। ললিতা উদ্ধতভাবে কহিল, "ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত হারান বাবুর মতের যতই মিল থাক্, ঘোষপুরের ব্যাপারে গৌরমোহন বাবুর মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।"

৩১

আজ ছোটলাট আসিবেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক সাড়ে দশটায় আদালতে আসিয়া বিচারকার্য্য সকাল সকাল শেষ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

সাতকড়ি বাবু ইস্কুলের ছাত্রদের পক্ষ লইয়া সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বন্ধুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অপরাধ স্বীকার করাই এ স্থলে ভাল চাল। ছেলেরা দুরন্ত হইয়াই থাকে, তাহারা অর্ব্বাচীন নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছাত্রদিগকে জেলে লইয়া গিয়া বয়স ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশ বেতের আদেশ করিয়াছিলেন। গোরার উকীল কেহ ছিল না। সে নিজের মামলা নিজে চালাইবার উপলক্ষ্যে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন ও পুলিসের কর্ম্মে বাধা দেওয়া অপরাধে তাহাকে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং এইরূপ লঘু দণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন।

সুধীর ও বিনয় আদালতে উপস্থিত ছিল। বিনয় গোরার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে তাড়াতাড়ি আদালত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুধীর তাহাকে ডাক-বাংলায় ফিরিয়া গিয়া স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিল—সে শুনিল না—মাঠের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সুধীরকে কহিল, "তুমি বাংলায় ফিরিয়া যাও কিছুক্ষণ পরে আমি যাইব।" সুধীর চলিয়া গেল।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতে পারিলনা। সূর্য্য মাথার উপর হইতে পশ্চিমের দিকে যখন হেলিয়াছে তখন একটা গাড়ি ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল সুধীর ও সুচরিতা গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার কাছে আসিতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতা কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "বিনয় বাবু আসুন!"

বিনয়ের হঠাৎ চৈতন্য হইল যে এই দৃশ্যে রাস্তার লোকে কৌতুক অনুভব করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। সমস্ত পথ কেহ কিছুই কথা কহিতে পারিলনা।

ডাক বাংলায় পৌঁছিয়া বিনয় দেখিল সেখানে একটা লড়াই চলিতেছে। ললিতা বাঁকিয়া বসিয়াছে সে কোনোমতেই আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দিবেনা। বরদাসুন্দরী বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন—হারান বাবু ললিতার মত বালিকার এই অসঙ্গত বিদ্রোহে ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বারবার বলিতেছেন আজকালকার ছেলে মেয়েদের এ কিরূপ বিকার ঘটিয়াছে—তাহারা 'ডিসিপ্লিন্' মানিতে চাহে না। কেবল যে-সে লোকের সংসর্গে যাহা-তাহা আলোচনা করিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে!

বিনয় আসিতেই ললিতা কহিল "বিনয় বাবু, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছে ভারি অপরাধ করেছি; আপনি তখন যা বলেছিলেন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি; আমরা বাইরের অবস্থা কিছুই জানিনে বলেই এত ভুল বুঝি! পানুবাবু বলেন ভারতবর্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই শাসন বিধাতার বিধান—তা যদি হয় তবে এই শাসনকে সমস্ত কায়মনোবাক্যে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়াও সেই বিধাতারই বিধান!"

হারান বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ললিতা, তুমি"—

ললিতা হারান বাবুর দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চুপ করুন! আপনাকে আমি কিছু বলচিনে! বিনয় বাবু, আপনি কারো অনুরোধ রাখ্‌বেন না! আজ কোনোমতেই অভিনয় হতেই পারে না!"

বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ললিতার কথা চাপা দিয়া কহিলেন—"ললিতা, তুই ত আচ্ছা মেয়ে দেখ্‌চি! বিনয় বাবুকে আজ স্নান করতে খেতে দিবিনে? বেলা দেড়টা বেজে গেছে তা জানিস্? দেখ্‌দেখি ওঁর মুখ শুকিয়ে কি রকম চেহারা হয়ে গেছে!"

বিনয় কহিল—"এখানে আমরা সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিথি এবাড়িতে আমি স্নানাহার করতে পারবনা।"

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বিস্তর মিনতি করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মেয়েরা সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি রাগিয়া বলিলেন "তোদের সব হল কি? সুচি, তুমি বিনয় বাবুকে একটু বুঝিয়ে বলনা! আমরা কথা দিয়েছি—লোকজন সব ডাকা হয়েছে, আজকের দিনটা কোনোমতে কাটিয়ে যেতে হবে—নইলে ওরা কি মনে করবে বল দেখি? আর যে ওদের সাম্‌নে মুখ দেখাতে পারব না!"

সুচরিতা চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় অদূরে নদীতে ষ্টীমারে চলিয়া গেল। এই ষ্টীমার আজ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই যাত্রী লইয়া কলিকাতায় রওনা

হইবে—আগামী কাল আটটা আন্দাজ সময়ে সেখানে পৌঁছিবে।

হারান বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিনয় ও গোরাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচরিতা তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া বেগে দ্বার ভেজাইয়া দিল। একটু পরেই ললিতা দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সুচরিতা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে।

ললিতা ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সুচরিতার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সুচরিতা যখন শান্ত হইল তখন জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে বাহুর আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল—"দিদি, আমরা এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাই, আজ ত ম্যাজিষ্ট্রেটের ওখানে যেতে পারব না।"

সুচরিতা অনেকক্ষণ এ কথার কোনো উত্তর করিল না। ললিতা যখন বার বার বলিতে লাগিল তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিল—"সে কি করে হবে ভাই? আমার ত একেবারেই আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না—বাবা যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন, যে জন্যে এসেছি তা না সেরে যেতে পারব না।"

ললিতা কহিল—"বাবা ত এসব কথা জানেন না—জান্‌লে কখনই আমাদের থাক্‌তে বল্‌তেন না।"

সুচরিতা কহিল, "তা কি করে জান্‌ব ভাই!"

ললিতা। দিদি, তুই পারবি? কি করে যাবি বল্ দেখি? তার পরে আবার সাজগোজ করে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কবিতা আওড়াতে হবে! আমার ত জিভ ফেটে গিয়ে রক্ত পড়বে তবু কথা বের হবে না!

সুচরিতা কহিল—"সে ত জানি বোন্! কিন্তু নরকযন্ত্রণাও সইতে হয়। এখন আর কোনো উপায় নেই! আজকের দিন জীবনে আর কখনো ভুল্‌তে পারব না।"

সুচরিতার এই বাধ্যতায় ললিতা রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে আসিয়া কহিল—"মা তোমরা যাবে না?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন,—"তুই কি পাগল হয়েছিস্? রাত্তির নটার পর যেতে হবে।"

ললিতা কহিল—"আমি কলকাতায় যাবার কথা বল্‌চি।"

বরদাসুন্দরী। শোন একবার মেয়ের কথা শোন!

ললিতা সুধীরকে কহিল, "সুধীর-দা, তুমিও এখানে থাক্‌বে?"

গোরার শাস্তি সুধীরের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছিল কিন্তু বড় বড় সাহেবের সম্মুখে নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে এমন সাধ্য তাহার ছিল না। সে অব্যক্তস্বরে কি একটা বলিল—বোঝা গেল সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে কিন্তু সে থাকিয়াই যাইবে।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "গোলমালে বেলা হয়ে গেল। আর দেরি করলে চল্‌বে না। এখন সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত বিছানা থেকে কেউ উঠ্‌তে পারবে না বিশ্রাম করতে হবে। নইলে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে মুখ শুকিয়ে যাবে—দেখ্‌তে বিশ্রী হবে।"

এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া সকলকে শয়নঘরে পুরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল কেবল সুচরিতার ঘুম হইল না এবং অন্য ঘরে ললিতা তাহার বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

ষ্টীমারে ঘন ঘন বাঁশ বাজিতে লাগিল।

ষ্টীমার যখন ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, খালাসীরা সিঁড়ি তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় জাহাজের ডেকের উপর হইতে বিনয় দেখিল একজন ভদ্রস্ত্রীলোক জাহাজের অভিমুখে দ্রুতপদে আসিতেছে। তাহার বেশভূষা প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে ললিতা বলিয়াই মনে হইল কিন্তু বিনয় সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে ললিতা নিকটে আসিতে আর সন্দেহ রহিল না। একবার মনে করিল ললিতা তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে কিন্তু ললিতাই ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ললিতা ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল—খালাসী সিঁড়ি তুলিয়া লইল। বিনয় শঙ্কিতচিত্তে উপরের ডেক হইতে নীচে নামিয়া ললিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিতা কহিল, "আমাকে উপরে নিয়ে চলুন।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে!"

ললিতা কহিল, "সে আমি জানি।" বলিয়া বিনয়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া উপরের তলায় উঠিয়া গেল।

ষ্টীমার বাঁশি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ছাড়িয়া দিল।

বিনয় ললিতাকে ফাষ্টক্লাসের ডেকে কেদারায় বসাইয়া নীরব প্রশ্নে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ললিতা কহিল—"আমি কলকাতায় যাব—আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারলুম না।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁরা সকলে জানেন?"

ললিতা কহিল—"এখনো পর্য্যন্ত কেউ জানেন না। আমি চিঠি রেখে এসেছি—পড়লেই জান্‌তে পারবেন।"

ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সঙ্কোচের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—"কিন্তু—"

ললিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—"জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে এখন আর 'কিন্তু' নিয়ে কি হবে! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝিনে। আমাদের পক্ষেও ন্যায় অন্যায় সম্ভব অসম্ভব আছে। আজকের নিমন্ত্রণে গিয়ে অভিনয় করার চেয়ে আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে সহজ।"

বিনয় বুঝিল, যা হইবার তা হইয়া গেছে, এখন এ কাজের ভালমন্দ বিচার করিয়া মনকে পীড়িত করিয়া তোলায় কোনো ফল নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল, "দেখুন্ আপনার বন্ধু গৌরমোহন বাবুর প্রতি আমি মনে মনে বড় অবিচার করেছিলুম। জানিনে, প্রথম থেকেই কেন তাঁকে দেখে তাঁর কথা শুনে আমার মনটা তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বড় বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন, আর আপনারা সকলেই তাতে যেন সায় দিয়ে যেতেন—তাই দেখে আমার একটা রাগ হতে থাকৃত। আমার স্বভাবই ঐ—আমি যদি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করচে সে আমি একেবারেই সইতে পারিনে। কিন্তু গৌরমোহন বাবুর জোর কেবল পরের উপরে নয় সে তিনি নিজের উপরেও খাটান্—এ সত্যিকার জোর—এরকম মানুষ আমি দেখিনি।"

এমনি করিয়া ললিতা বকিয়া যাইতে লাগিল। কেবল যে গোরা সম্বন্ধে সে অনুতাপ বোধ করিতেছিল বলিয়াই এ সকল কথা বলিতেছিল তাহা নহে; আসলে, ঝোঁকের মাথায় যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার সঙ্কোচ মনের ভিতর হইতে কেবলি মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছিল; —কাজটা হয়ত ভাল হয় নাই এই দ্বিধা জোর করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল; বিনয়ের সম্মুখে ষ্টীমারে এইরূপ একলা বসিয়া থাকা যে এত বড় কুণ্ঠার বিষয় তাহা সে পূর্ব্বে মনেও করিতে পারে নাই; কিন্তু লজ্জা প্রকাশ হইলেই জিনিষটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিবে এইজন্য সে প্রাণপণে বকিয়া যাইতে লাগল। বিনয়ের মুখে ভাল করিয়া কথা জোগাইতেছিল না। একদিকে গোরার দুঃখ ও অপমান, অন্যদিকে সে যে এখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ি আমোদ করিতে আসিয়াছিল তাহার লজ্জা, তাহার উপরে ললিতার সম্বন্ধে তাহার এই অকস্মাৎ অবস্থাসঙ্কট, সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া বিনয়কে বাক্যহীন করিয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে তিরস্কারের ভাব উদয় হইত—আজ তাহা কোনো মতেই হইল না। এমন কি, তাহার মনে যে বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল—ইহাতে আরো একটি আনন্দ এই ছিল তাহাদের সমস্ত দলের মধ্যে গোরার অপমানের সামান্য প্রতিকারচেষ্টা কেবল বিনয় এবং ললিতাই করিয়াছে। এজন্য বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ পাইতে হইবে না, কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্ম্মফলে অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে। অথচ এই ললিতাকে বিনয় বরাবর গোরার বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিত। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণাম-বিচারহীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে লাগিল। কেমন করিয়া কি বলিয়া যে সে এই ভক্তি প্রকাশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বিনয় বারবার ভাবিতে লাগিল ললিতা যে তাহাকে এত পরমুখাপেক্ষা সাহসহীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে সে ঘৃণা যথার্থ। সে ত সমস্ত আত্মীয় বন্ধুর নিন্দা প্রশংসা সবলে উপেক্ষা করিয়া এমন করিয়া কোনো বিষয়েই সাহসিক আচরণের দ্বারা নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিত না

সে যে অনেক সময়েই গোরাকে কষ্ট দিবার ভয়ে অথবা পাছে গোরা তাহাকে দুর্ব্বল মনে করে এই আশঙ্কায় নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে নাই—অনেক সময় সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া গোরার মতকে নিজের মত বলিয়াই নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে আজ তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া ললিতাকে স্বাধীন বুদ্ধিশক্তিগুণে নিজের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিল। ললিতাকে সে যে পূর্ব্বে অনেকবার মনে মনে নিন্দা করিয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জা বোধ হইল—এমন কি, ললিতার কাছে তাহার ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা করিল—কিন্তু কেমন করিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্ত্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহঙ্কার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্য্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জ্জন দিল।

চক্ষু পদার্থটা কি?

(দ্বিতীয় ক্ষেপ।)

"চক্ষু পদার্থটা কি" এই এক মৃগতৃষ্ণিকা'র পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়'টিকে হারাইয়া বসিয়াছিলাম বলিলেই হয়—চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া মাঝপথে থামিয়া দাঁড়াইয়া শেষে দেখিলাম—কি আশ্চর্য্য—সারারাজ্য ঘুঁটিয়া কোথাও যাহাকে আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, তাহা চৌপহর দিন আমাদের সম্মুখে বিরাজমান! তাহা আর কিছু না—আলোক! আলোক সর্ব্বজীবের চক্ষু!

যাহা সর্ব্বজীবের চক্ষু, তাহা কি প্রত্যেক জীবের চক্ষু নহে? অবশ্যই তাহা প্রত্যেক জীবের চক্ষু; কিন্তু তথাপি—কি-ভাবেই বা তাহা সর্ব্বজীবের চক্ষু, আর, কি ভাবেই বা তাহা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু, তাহা বিধিমত প্রকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

॥১॥ আলোক যে সময়ে আমাদের চক্ষে পড়ে, সে সময়ে আমরা তাহাকে দেখিতো বটেই—না দেখিলে সে আমাদিগকে ছাড়ে কই? কিন্তু শুধুই কি কেবল দেখি? স্পর্শ কি করি না? আলোক দর্শকের চক্ষে পড়িলে, অথবা যাহা একই কথা, দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোকের সংস্পর্শ ঘটিলে, তবে তো দর্শক আলোককে দেখে; তাহার পূর্ব্বে তো আর না? তবেই হইতেছে যে, আগে আলোকের স্পর্শ; পরে আলোকের দর্শন।

॥২॥ তোমার কথার ভাবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আলোকের দর্শন এবং স্পর্শ দুইই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কথা'টা ঠিক্ যে, আলোক'কে দেখি-ও আমরা চক্ষে, স্পর্শ করি-ও আমরা চক্ষে; পরন্তু চক্ষুগোলকের কোন্ স্থানটাই বা দর্শনক্ষেত্র, কোন্ স্থানটাই বা স্পর্শক্ষেত্র, সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।*

॥১॥ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলি এই যে, চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ আলোকের দর্শনক্ষেত্র, আর চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র।

॥২॥ সে আবার কি? অন্তরাকাশ বহিরাকাশ আবার কি?

॥১॥ তা' আর জান'না? বল দেখি—ঐযে একবাটি গরম দুধ তোমার সম্মুখে ধূমায়মান, উহা ঐ বাটি'টার অন্তরাকাশে অবরুদ্ধ, না বহিরাকাশে পরিব্যাপ্ত? আবার, দুগ্ধের উপর দিয়া ঐযে উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে, উহা বাটি'টার অন্তরাকাশে চাপা থাকিতেছে, না বহিরাকাশে গা ঢালিয়া দিতেছে?

॥২॥ আর বলিতে হইবে না—বুঝিয়াছি! ঐ বাটি'টার ভিতরপ্রদেশ যাহা দুগ্ধে ভরা রহিয়াছে, তাহাই উহার অন্তরাকাশ, আর, উহার বাহিরের মুক্ত প্রদেশ যাহা বাষ্পে আক্রান্ত হইতেছে, তাহাই উহার বহিরাকাশ; এই না তোমার অভিপ্রায়?

॥১॥ ঠিক্ই বুঝিয়াছ! এটাও তেম্নি বুঝিয়া দেখা চাই যে, ঐ বাটি'টার অ্যাকলা'র কেবল না, পরন্তু সকল বস্তুরই

---

* চক্ষুর্গোলক ডাহা সংস্কৃত; তাই উহার রেফ ছাঁটিয়া উহাকে শোভন বাঙ্‌লা করিয়া লওয়া হইল। ফলে, দেশী ভাষা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ডাহা সংস্কৃত, (২) ভাঙা সংস্কৃত, (৩) ডাহা বাঙ্‌লা। ইহার নমুনা:—

(১) ডাহা সংস্কৃত—গুবাক;
(২) ভাঙা সংস্কৃত—গুয়া;
(৩) ডাহা বাঙ্‌লা—সুপারি।

অন্তরাকাশ বহিরাকাশ আছে; তা'র সাক্ষী—নাসিকার অন্তরাকাশে নিশ্বাস * প্রবেশ করে, বহিরাকাশে প্রশ্বাস বিনির্গত হয়; সমুদ্রের বহিরাকাশে ঝড় উঠিলে, তাহার অন্তরাকাশে তরঙ্গ ওঠে; জলপূর্ণ কলসের অন্তরাকাশে জল, বহিরাকাশে বায়ু; শূন্য কলসের অন্তরাকাশেও যেমন, বহিরাকাশেও তেম্নি, উভয়স্থানেই বায়ু; ইত্যাদি। অন্তরাকাশ বহিরাকাশ কাহাকে বলে, তাহা দেখিলে তো? এখন তোমাকে দেখিতে বলিতেছি এই যে, (১) চক্ষু-গোলকের বহিরাকাশ আলোকের দর্শনক্ষেত্র; (২) চক্ষু-গোলকের অন্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র!

॥২॥ তুমি যাহা আমাকে গিলাইতে চাহিতেছ, তাহার প্রথমার্দ্ধটি বেস্ আমার গলাধঃকরণ হইয়াছে; দ্বিতীয়ার্দ্ধটি কিন্তু গলায় নাবিতেছে না। বলিতে কি--চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে আলোকের রূপ যেমন আমি দর্শন করি, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে আলোকের স্পর্শ তেমন অনুভব করি না; অনুভবই যখন করি না, তখন, তোমার মনো-রক্ষার্থে আমি না হয় মুখে বলিলাম যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র; কিন্তু আমার মন তাহা শুনিবে কেন? মন আমার বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রত্যুত্তর শুনাইয়া দিবে এইরূপ যে, "স্পর্শানুভব-বর্জ্জিত স্পর্শক্ষেত্র, আর, শিরো-নাস্তি শিরঃপীড়া, এতদুয়ের মধ্যে প্রভেদ তো আমি কিছুই দেখিতে পাই না!"

॥১॥ গতরাত্রে তোমায় আমায় একসঙ্গে নাট্যশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, যখন, অন্ধকারাবৃত গলি-ঘুচি'র পিছল মাটিতে অতীব সন্তর্পণের সহিত ধীরে ধীরে পদ-নিক্ষেপ করিতেছিলাম, আর, সেই সময়ে যখন সেই হতভাগা পুলিসের চৌকিদার'টা হঠাৎ তোমার চক্ষুতে বৃষাক্ষ ল্যাণ্ঠানের আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করিল, তখন তুমি চম্‌কিয়া উঠিয়া পা পিছ্‌লিয়া কাদায় পড়িয়া চিত্রবিচিত্রিত হইয়াছিলে কি!—সেই কথাটি আগে আমাকে বল', তাহার পরে আমি তোমার কথা'র উত্তর দিব।

॥২॥ বলিব কি— আমার চক্ষুর মর্ম্মস্থানটিতে, সেই প্রখর রশ্মির সংস্পর্শ—বোধ হইয়াছিল তখন—ঠিক্ যেন চাবুকের আঘাত।

॥১॥ তা' তো বোধ হইবেই! যিনি হাসিতে হাসিতে বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখাগ্রে করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অমানুষিক নখের আগায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ে বারো মুনির বারো মত হইতে পারে, পরন্তু গত রাত্রে এটা যখন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, বৃষাক্ষ-দীপালোকের পীড়নে তোমার চক্ষুযুগলে কেবল জল বাহির হইতে বাকি ছিল, তখন, সেই মুখ্য সময়টিতে তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে আলোকের স্পর্শ যে, বিলক্ষণই অনুভূত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতান্তর ঘটিয়া মনান্তরে পবিণত হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

॥২॥ একব্যক্তি যদি অন্ধকার রাত্রে রুমালের পুঁটুলির মধ্যে করিয়া গোটা-দুই-তিন জোনাক পোকা ধরিয়া আনিয়া আর এক ব্যক্তিকে বলে "এই দেখ—অগ্নি নিস্তেজ পদার্থ", আর, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ দিএসলাই জ্বালাইয়া সেই রুমাল'টায় আগুন ধরাইয়া দিয়া বলে "এই দেখ—অগ্নি সতেজ পদার্থ", তবে কাহার কথা সত্য? প্রথম ব্যক্তিব কথা, না দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা? জোনাক পোকার দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয় কেবল এই যে, কোনো কোনো স্থলে অগ্নি নিস্তেজ পদার্থ; তেম্নি, গতরাত্রের বিশেষ ঘটনাটির দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয় কেবল এই যে, কোনো কোনো স্থলে দ্রষ্টার চক্ষুগোলকে আলোকের স্পর্শ অনুভূত হয়; তা' বই, এরূপ প্রমাণ হয় না যে, সর্ব্বসাধারণত চক্ষুগোলক আলোকের স্পর্শক্ষেত্র। এখনো তো আমার চক্ষে যথেষ্ট আলোক নিপতিত হইতেছে; তাহাতে আবার, এ আলোক যেমন-তেমন আলোক না—এ আলোক মধ্যাহ্ন দিবালোক। এখন তবে আলোকের স্পর্শ আমার চক্ষুগোলকে অনুভূত না হইবার কারণ কি?

॥১॥ বছর দুয়েক পূর্ব্বে তুমি যখন ব্যায়াম অভ্যাস

* এখানে নি (=in)+শ্বাস=নিশ্বাস। নিশ্বাস কিনা অন্তর্মুখী শ্বাস। এখানকার নিশ্বাসের প্রতিপক্ষ প্র (=pro)+শ্বাস অর্থাৎ প্রশ্বাস। যেমন নিবাস=অন্তর্মুখী বাস, প্রবাস=বহির্মুখী বাস। পক্ষান্তরে, "প্রজার নিঃশ্বাসানলে রাজ্য দগ্ধ হইতেছে" এরূপ স্থলে নিঃশ্বাস=নিঃ (=ex)+শ্বাস অর্থাৎ বহিঃশ্বাস; এ নিঃশ্বাসের প্রতিপক্ষ বিসর্গ-বিহীন নি+শ্বাস। "নি+শ্বাস" এ নিশ্বাস নিঃশ্বাসেরও যেমন, প্রশ্বাসেরও তেম্নি, দুয়েরই প্রতিপক্ষ।

করিতে, তখন আমার বেস্ মনে পড়ে—একদিন তুমি আমাকে তোমার ফোস্কাপড়া হাতের ভেলো দেখাইয়া কাতর স্বরে বলিলে "স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" —পরধর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল এই দেখ হাতে হাতে! যাহারা প্রত্যহ দুইসন্ধ্যা ঘোড়া'র খোরাক চিবাইয়া পরিপাক করে বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহাদের লোহার শরীরে সবই সয়; কিন্তু ভাই, বলিতে কি, তোমার আমার মতো লোকের ঘৃতদুগ্ধ-মৎস্যের শরীর মুগুরের কঠিন স্পর্শে বড়ই নারাজ!" এখন কিন্তু তুমি তাহা বল'না। আজকাল তুমি যে সময় মুগুর ভাঁজো, সে সময় মুগুরের পরিভ্রামণ ব্যাপারটির প্রতি তোমার মন এম্নি ভরপুর নিবিষ্ট থাকে যে, তাহার কঠিন স্পর্শ তোমার হস্তত্বকের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। এখন যেমন তোমার পাকা হাতের অধিকারক্ষেত্রে মুদ্গর পরিভ্রামণের কর্ম্মোদ্যম মুগুরের স্পর্শানুভবকে গ্রাস করিয়া ফ্যালে, দর্শকের তেম্নি সুপরিস্ফুট চক্ষুর দৃষ্টিক্ষেত্রে আলোকের রূপ-দর্শন উহার স্পর্শানুভব'কে গ্রাস করিয়া ফ্যালে। ফেলুক্ না গ্রাস করিয়া—তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? স্পর্শানুভব যায় না তো কোথাও। রূপ-দর্শনের উদরের মধ্যে দিব্য সে লুকাইয়া থাকে নিরাপদে—রাহুগ্রস্ত সুধাকর যেমন রাহুর বদন-সদনে!

॥২॥ লুকাইয়াই যদি থাকে, তবে তো তাহা দর্শকের চক্ষে ধরা না পড়িবারই কথা। মুখে তুমিও বলিতেছ, আর কাণে আমিও শুনিতেছি যে, আলোকের স্পর্শানুভব রূপদর্শনের উদরের মধ্যে লুকাইয়া আছে; চক্ষে কিন্তু তুমিও তাহা দেখিতেছ না—আমিও তাহা দেখিতেছি না; এরূপ অবস্থায় তাহা যে সত্যসত্যই ঐ স্থানটিতে লুকাইয়া আছে তাহা তুমিই বা কিরূপে জানিলে, আমিই বা কিরূপে জানিব? তাহার নিতান্তই প্রমাণাভাব।

॥১॥ স্থূল বস্তুর স্পর্শানুভবও যেমন—আলোকের স্পর্শানুভবও তেম্নি—দুইই ফলেন পরিচীয়তে। তার সাক্ষী:—এটা যেমন একটা দেখা কথা যে, একতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে পায়ে সুড়সুড়ি লাগে, আরেকতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে গায়ে কাতুকুতু লাগে, আবার, তৃতীয় আরএকতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে পাঁজরে খোঁচা লাগে; এটাও তেম্নি একটা দেখা কথা যে, জবাফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে লাল ঠ্যাকে, বেলফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে সাদা ঠ্যাকে, সরিষাফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে হোল্দে ঠ্যাকে। এইরূপ তরো-বেতরো ফলের উৎপত্তিই তরো-বেতরো স্পর্শানুভবের প্রমাণ। আমাদের বাল্যকালের সেই রাগী পণ্ডিতকে তোমার মনে পড়ে? তোমার তো মনে পড়িবেই, যেহেতু তুমি তাঁহার নাম রাখিয়াছিলে অগ্নি শর্ম্মা। তাঁহার আশীর্ব্বাদে—চপেটাঘাতের ফল যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথানুভব, আর, সে যে ব্যথানুভব আহত কপোলের স্পর্শক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি লাভ করে, এ তত্ত্বটির নিগূঢ় রহস্য তুমি যেমন জান' এমন আর কেহই না; কেননা তুমিই ব্রাহ্মণটিকে রাগাইবার প্রধান অধিনায়ক ছিলে। এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, জবাফুলের মুখালোকের করাঘাতে (কিনা রশ্মি আঘাতে) দর্শকের চক্ষুতে রক্ত বর্ণের অনুভব যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আহত চক্ষু-গোলকের স্পর্শক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি লাভ করে—অন্যত্র কোথাও না; অথবা, যাহা একই কথা—চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশেই ব্যাপ্তি লাভ করে বহিরাকাশে না। তবে যে কেন জবাফুলের লাল রঙ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে ভাসমান হয়, তাহার কারণ অন্যতম। ব্যাপারটা তবে তোমাকে আদ্যোপান্ত খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলি, প্রণিধান কর:—

শুভাদৃষ্ট বশত সুচিকিৎসকের হস্তে পড়িয়া ক্বচিৎ-কদাচিৎ কোনো জন্মান্ধ ব্যক্তি যখন সহসা চক্ষু লাভ করে, তখন প্রথম প্রথম তাহার মনে হয়—যেন তাহার চক্ষু-গোলকের অন্তরাকাশ একখানি স্বচ্ছ কাচ-ফলক, আর, সম্মুখস্থিত দৃশ্যরাজি সেই কাচ-ফলকের গায়ে যেন ছবি আঁকা। মনে কর ঐরূপ একজন নূতন দর্শন-ব্রতী একটা গোচারণের মাঠ ভাঙিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় দর্শক তাহার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী কাল্পনিক কাচ ফলকটার শিরঃস্থানে দেখিবে—গঙ্গার ওপারের শ্যামল তটচ্ছবি; তাহার একপংক্তি নীচে দেখিবে—গঙ্গার জলচ্ছবি; আর এক পংক্তি নীচে দেখিবে—গঙ্গার এপারের বালুকা-ময় তটচ্ছবি; তাহার নীচের পংক্তিতে দেখিবে—তৃণাস্তৃত মাঠের ছবি; আর যদি দর্শক গ্রীবা নত করিয়া আপনার শরীর-পানে ঠাহরিয়া

দেখে, তবে সর্ব্বনীচে (মাঠের ছবিরও নীচে) দেখিবে—আপনার তৈলাক্ত বক্ষকপাটের ছবি। তাহার পরে, গঙ্গার দিকে যতই সে পদব্রজে অগ্রসর হইতে থাকিবে - দেখিবে যে, ততই গঙ্গার জলচ্ছবি উত্তরোত্তর ক্রমশই চওড়া'য় বাড়িতে থাকিয়া তাহার বক্ষচ্ছবির কাছবাগে নাবিয়া আসিতেছে। এইরূপ ক্রমশ উপর হইতে নীচে নাবিয়া-আসাগতিকে গঙ্গার এপারের কিনারা যখন দর্শকের বক্ষচ্ছবির নীচে চাপা পড়িয়া যাইবে, তখন দর্শকের পদতল গঙ্গাজলের সংস্পর্শ লাভ করিবে। নূতন দর্শনব্রতী মাস তিনেক ধরিয়া প্রতিদিন এইরূপ গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসা করিলেই সর্ব্বদা-কাজে-লাগিবার-মতো কতকগুলি নূতন সংস্কার তাহার মনের মধ্যে জন্মের মত বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তাহার মধ্যে যে দুইটি সংস্কার সর্ব্বপ্রধান সেই দুইটি এই :—

(১) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-স্থিত আতপচ্ছবি ক্রমশ আয়তনে ছোটো হইয়া-হইয়া নীচে হইতে উপরে প্রসারিত হওয়ার নামই—বহিরাকাশস্থিত দৃশ্যরাজি দর্শকের সন্নিধান হইতে উত্তরোত্তর দূরে দূরে স্থিতি করা।

(২) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশস্থিত আতপচ্ছবি ক্রমশ লম্বায় চওড়ায় বড় হইয়া-হইয়া উপর হইতে নীচে নাবিয়া আসিতে থাকা'র নামই—বহিরাকাশস্থিত দৃশ্যরাজি দূর হইতে ক্রমশ দর্শকের নিকটবাগে সরিয়া আসিতে থাকা, আর, তাহারই নাম—প্রয়াণস্থান হইতে দর্শকের উত্তরোত্তর-ক্রমে দূরে দূরে অগ্রসর হইতে থাকা।

দ্রষ্টা মাত্রেরই ঐরূপ কতকগুলা কচি-বয়সের পরীক্ষা-লব্ধ সংস্কার আলোকের স্পর্শানুভবমূলক বর্ণাদিবোধের সহিত একত্র জমাট্‌বদ্ধ হইয়া চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশস্থিত আলোকের স্পর্শক্ষেত্রকে বহিরাকাশস্থিত দর্শনক্ষেত্র করিয়া গড়িয়া তোলে।

॥২॥ এ যাহা তুমি বলিলে, তাহার মধ্যে'কার মোট কথাটা আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশব্যাপী আলোকের স্পর্শানুভবমূলক বর্ণাদিবোধই রূপদর্শনবেশে বহিরাকাশে সাজিয়া বাহির হয়। তা যেন হইল—এখন জিজ্ঞাস্য আমার এই যে, ঐরূপে বহিরাকাশে সাজিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে আলোকের স্পর্শানুভব যখন চক্ষুগোলকের সাজঘরে (অর্থাৎ অন্তরাকাশে—স্পর্শক্ষেত্রে) বেশ বিন্যাস করিতে থাকে, তখন শুধুই কি তাহা বর্ণাদিবোধ—রূপদর্শন মূলেই না ?

॥১॥ তাহা আমি বলি না। এ কথাও আমি বলি না যে, ব্যাঙাচী মূলেই ব্যাঙ্ নহে, আর, এ কথাও আমি বলি না যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশব্যাপী বর্ণাদি-বোধ মূলেই রূপদর্শন নহে। উল্টা বরং আমি বলি এই যে, ব্যাঙাচি= হবু ব্যাঙ্ (অর্থাৎ potential ব্যাঙ্); বর্ণাদি-বোধ= হবু-রূপদর্শন। ব্যাঙাচী জলে কিল্‌বিল্ করিতেছে দেখিলে একটি সপ্তমবর্ষীয় বালকের এরূপ মনেই হইতে পারে না যে, ঐ লাঙ্গুল-সর্ব্বস্ব জলকীট-গুলার জন্ম চারিপেয়ে জীবের বংশে ; আবার আর-কিছুদিন পরে বালকটি যদি উহাদের কাহাকেও পাকে ল্যাজ গাড়িয়া পড়িয়া থাকিতে দেখে, তবে নিশ্চয়ই সে মনে ভাবিবে যে উহা একপ্রকার ভিজে টিক্‌টিকি। আর একদিকে তেম্নি আবার, একটা সপ্তাহদুএকের বিড়াল-ছানা'র অস্ফুট চক্ষুগোলকে যখন আলোক ডুব-সাঁতার থ্যালে, তখন আলোকের সেই যে স্পর্শানুভব, সে-যে স্পর্শানুভব রূপ-দর্শনেরই পূর্ব্বাভাস, এ তত্ত্বটি সহসা বুঝিতে পারা সুকঠিন। যাহাই হো'ক্ না কেন—এটা তো তোমার জানিতে বাকি নাই যে, এই বেরাল বনে গেলেই বন-বেরাল হয় ? এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণাদি-বোধ বহিরাকাশে প্রসারিত হইলেই রূপ-দর্শন হইয়া ওঠে।

॥২॥ বহিরাকাশে প্রসারিত হয়—তাহা তো বুঝিলাম ; কিন্তু, কেমন করিয়া তাহা বহিরাকাশে প্রসারিত হয়—বহিরাকাশে প্রসারিত হওনের প্রকরণ-পদ্ধতি কিরূপ—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য ; তাহার তুমি কি-উত্তর দ্যাও ?

॥১॥ পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তের নূতন দর্শনব্রতী যখন পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, তখন, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, একদিকে যেমন দৃশ্য আলোকের ক্রিয়া চলিতেছে চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে, আর-এক-দিকে তেম্নি, দর্শকের পা চলিতেছে চক্ষুগোলকের বহিরা-কাশে। এটাও তেম্নি দেখা চাই যে, অন্তরাকাশে আলোকের ঐযে ক্রিয়া চলিতেছে, উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের

একপ্রকার অন্তস্ফূর্ত্তি, আর, তাহার ফল—বর্ণাদি-বোধ; যেমন ঔজ্জ্বল্য-বোধ, শুভ্রতা-বোধ, রক্তিমা-বোধ ইত্যাদি। আবার বহিরাকাশে দর্শকের ঐযে পা চলিতেছে, উহা একপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বহিস্ফূর্ত্তি, আর, তাহার ফল—বহিরাকাশস্থিত দৃশ্যবস্তুতে বর্ণাদি-বোধের উপসংক্রান্তি অর্থাৎ চালান্। সেতার-বাজিএ যখন সারে গামা বাজাইতেছে, তখন আপন অঙ্গুলি-তাড়না'র বহিস্ফূর্ত্তি'র কথায়-ভুলিয়া এইরূপ সে মনে করে যে, তাহার হস্তের বহিরাকাশস্থিত সেতারের তার সারেগামা বলিতেছে; কিন্তু সত্য এই যে, সেতার-বাজিএ'র কর্ণকুহরের অন্তরাকাশ ব্যাপী বায়ু'র তরঙ্গ-তাড়না সারেগামা বলিতেছে। উদ্যানপতি, তেম্নি, একটি প্রস্ফুটিত রক্তবর্ণ গোলাপফুলের অভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইবার সময়, পায়ে-হাঁটার বহিস্ফূর্ত্তির কথায়-ভুলিয়া মনে করেন যে, বহিরাকাশস্থিত গোলাপ-ফুলটি'র গাত্রে রক্তিমবর্ণের ছাপ লাগানো রহিয়াছে; কিন্তু সত্য এই যে, ঐ বর্ণের ছাপ লাগানো রহিয়াছে—বহিরাকাশে কোথাও না পরন্তু—দর্শকের আপনারই চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে। উদ্যানপতি প্রথমে গোলাপ-ফুলের রক্তিম মুখালোকের স্পর্শ অনুভব করেন ঐস্থানটিতেই অর্থাৎ আপন চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে; তাহার পরে যথাক্রমে পায়ে-হাঁটিয়া এবং হাত বাড়াইয়া গোলাপ-ফুলের দল-সংঘাতের স্পর্শ অনুভব করেন আপনার হস্তত্বকে। উদ্যানপতি তিনটি বিষয় তিনক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অনুভব করেন :—

(১) গোলাপ-ফুলের রক্তিম মুখালোকের স্পর্শ অনুভব করেন চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে।

(২) দলসংঘাতের স্পর্শ অনুভব করেন—চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তত্বকে।

(৩) পায়ে হাঁটা এবং হাত বাড়ানো'র বহিস্ফূর্ত্তি অনুভব করেন—চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তপদের মাংসপেশীতে।

স্পষ্টই তো এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দর্শকের দেহক্ষেত্রের এ মুড়ায়—অর্থাৎ চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে—গোলাপ-ফুলের রক্তিমবর্ণ অনুভূত হয়; ও-মুড়ায়—অর্থাৎ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তত্বকে—দল-সংঘাতের কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়; এবং দুই মুড়া'র মাঝের জায়গা'টিতে—অর্থাৎ হস্তপদের মাংসপেশীতে—কর্ম্মোদ্যমের বহিস্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়। ইহার একটা উপমা দেখাইতেছি—প্রণিধান কর:—এটা যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, বৃক্ষের শিকড়-জাল ব্যাপ্তি-লাভ করে ভূস্তরের অন্তরাকাশে, এবং শাখা প্রশাখা ব্যাপ্তি লাভ করে ভূস্তরের বহিরাকাশে; এটাও তেম্নি দেখা চাই যে, গোলাপ-ফুলের মুখরশ্মির রক্তিমা-বোধ ব্যাপ্তি লাভ করে দর্শকের চক্ষু-গোলকের অন্তরাকাশে, এবং দলসংঘাতের কোমল স্পর্শানুভব ব্যাপ্তি লাভ করে চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে হস্ত ত্বকে। দুয়ের মধ্যে (অর্থাৎ উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে) সৌসাদৃশ্য এইরূপ:—শিকড়ের বিস্তার যেমন ভূস্তরের অন্তরাকাশের ব্যাপার, আলোকের স্পর্শানুভবমূলক বর্ণবোধ তেম্নি চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের ব্যাপার; শাখার বিস্তার যেমন ভূস্তরের বহিরাকাশের ব্যাপার, দল-সঙ্ঘাতের স্পর্শানুভব তেম্নি চক্ষুগোলকের বহিরাকাশের ব্যাপার; আর, অঙ্কুরোদগম যেমন বৃক্ষের ঐ দুইমুড়া'র দুই ব্যাপারের মধ্যবর্ত্তী সোপান, কর্ম্মোদ্যমের স্ফূর্ত্তি-অনুভব তেম্নি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঐ দুইমুড়া'র দুই ব্যাপারের মধ্যবর্ত্তী সোপান। তবেই হইতেছে যে, পায়ে-হাঁটা হাত-বাড়ানো প্রভৃতি কর্ম্মোদ্যমের স্ফূর্ত্তি-অনুভবের মধ্য-দিয়াই চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ বহিরাকাশে প্রসারিত হয়; আর, তাহার ফল হয়—রূপ-দর্শন। প্রকৃত কথা এই যে, জলের ব্যাঙাচী এবং ডাঙার ব্যাঙের মাঝের জায়গা'টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যেমন-তরো, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ এবং বহিরাকাশ-পরায়ণ রূপ-দর্শনের মাঝের জায়গাটিতে তেম্নি-তরো একটা ক্রমবিকাশের সোপান এমুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত নিরবচ্ছেদে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। এখন দেখিতে হইবে এই যে, কর্ম্মোদ্যমের অভ্যাস-বলে সেই ক্রমবিকাশের সিড়ি ভাঙিয়া চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ বহিরাকাশে রূপ-দর্শন-বেশে সাজিয়া বাহির হয়।

॥২॥ "ক্রমবিকাশ" যে বলিতেছ—কিসের ক্রমবিকাশ? আলোকের না চক্ষুরিন্দ্রিয়ের?

৷৷১৷৷ তোমার কথা বার্ত্তার-ভাবে আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে, পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগের চক্ষুরুদ্দীপনের গোড়া'র বৃত্তান্তটা'র তুমি বড় একটা খোঁজ খবর রাখ'না। বিজ্ঞানের মুখে তুমি যদি সেই গোড়া'র বৃত্তান্তটি শুনিতে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতে যে, জীবের চক্ষুরিন্দ্রিয় আলোক হইতে স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নহে, পরন্তু তাহা আলোকের উপাদানে আপাদমস্তক পরিগঠিত—তাহা আলোক'ই। পৃথিবীমাতার এমনও এক সময় ছিল যখন তাঁহার ক্রোড়স্থ সদ্যোজাত জীবদিগের চক্ষু ফোটে নাই; কিন্তু তখনও সূর্য্যালোক ছিল। হইতে পারে যে, তখন সূর্য্যালোক ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল, কিন্তু ছিল। সূর্য্যালোক ছিল কিন্তু দ্রষ্টা ছিল না। দ্রষ্টা যখন ছিল না, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, দর্শন বলিয়া যে একটা চাক্ষুষ উপলব্ধির ব্যাপার, সে সময়ে পৃথিবীতে তাহার নাম গন্ধও ছিল না। দর্শনক্রিয়া যখন ছিল না, তখন, ইহা বলা বাহুল্য যে, সূর্য্যালোক থাকা সত্ত্বেও সূর্য্যালোকের প্রকাশ ছিল না, কেননা আলোকের অদর্শনের নামই আলোকের অপ্রকাশ। সূর্য্যালোকের প্রকাশই না-হয় না-ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই আদিম সময়ে সূর্য্যালোক কি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে একমুহূর্ত্তও বিরত ছিল? কখনই না! তখনকার সেই অপ্রকাশের অবস্থাতেও সূর্য্যালোকের কল্যাণ-হস্ত পৃথিবী-মাতা'র নবপ্রসূত অপ্রাপ্তচক্ষু জীবদিগের মস্তকের উপরে স্থাপিত ছিল—এখনকারই মতো এইরূপ কার্য্যকর ভাবে। আদিমকালে যে-সূর্য্যালোক অপ্রকাশ ছিল, অধুনাতন কালে সেই সূর্য্যালোকই সুপ্রকাশ। তবেই হইতেছে যে, যুগযুগান্তর-ব্যাপী ক্রমবিকাশের সোপান-পরম্পরা'র মধ্য দিয়াই সূর্য্যালোক অপ্রকাশ হইতে সুপ্রকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। মাকড়্সা যেমন আপনারই দৈহিক উপাদান হইতে আপ্নিই জাল নির্ম্মাণ করিয়া সেই জালের উপর দিয়া যাতায়াত করে, আদিম কালের অদৃশ্য সূর্য্যালোক তেম্নি আপনারই অপ্রকাশের ভাণ্ডার হইতে জীবশরীরে আপনার প্রকাশোপযোগী দর্পণ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ-করিয়া-তুলিয়া এক্ষণে সেই সকল স্বনির্ম্মিত দর্পণে পলকে পলকে এবং অহোরাত্রে প্রকাশাপ্রকাশ হইতেছে। সদ্যোজাত শিশুর চক্ষুগোলকের স্পর্শক্ষেত্রে আলোক প্রথমে ডুব-সাঁতার খ্যালে; তাহার পরে শিশুটি'র বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবানুযায়ী পায়ে-হাঁটা এবং হাত-বাড়ানো প্রভৃতি কর্ম্মোদ্যমের মধ্যদিয়া সেই-আলোকই স্পর্শক্ষেত্র হইতে দৃষ্টি-ক্ষেত্রে (অথবা, যাহা একই কথা—চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ হইতে বহিরাকাশে) দৃশ্য-বেশে সাজিয়া বাহির হইতে থাকে। আলোকের ক্রমবিকাশ ব্যষ্টি-জীবক্ষেত্রে এ-যেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সমষ্টি-জীবক্ষেত্রে উহারই বিস্তারিত ডালপালা'র এক এক বাবের পালা এক-এক যুগ-পরিমাণ দীর্ঘ কাল ধরিয়া অভিনীত হইতে থাকে। তার সাক্ষী:—সূর্য্যালোক প্রথমে কেঁচো, জোঁক, কৃমি প্রভৃতি নিতান্ত অধম শ্রেণীর জীবদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শক্ষেত্রে ডুবসাঁতার খেলিত। তাহার পরে উত্তরোত্তর শ্রেণীর জীবের ত্বগিন্দ্রিয়ের বিশেষ একটি স্থানের (যেমন ললাটের) দুই পার্শ্বে আপনার প্রকাশোপযোগী দুইটি দর্পণ ক্রমে ক্রমে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল; তাহার পরে, পরপরবর্ত্তী জীবদিগের চক্ষুগোলকে আপনার স্পর্শানুভবের মূল পত্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চোচ্চতর জীবের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে দৃশ্য-বেশে সাজিয়া বাহির হইতে লাগিল। ব্যষ্টি জীবক্ষেত্রেও যেমন, সমষ্টি জীবক্ষেত্রেও তেম্নি! দুই ক্ষেত্রেই আলোকের ক্রমবিকাশের আনুপূর্ব্বিক তিনটি সোপান-পংক্তি বা পইটা পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—

(১) অনাকাশের অদর্শন-সমুদ্রে নিমজ্জন: যেমন, আদিম যুগে, তথৈব, গর্ভস্থ শিশুর চক্ষে।

(২) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের সাজঘরে (স্পর্শ-ক্ষেত্রে) সংক্রমণ:—যেমন, মধ্যম যুগে, তথৈব, সদ্যোজাত শিশুর চক্ষে।

(৩) বহিরাকাশের দর্শন-ক্ষেত্রে (দৃষ্টিক্ষেত্রে) দৃশ্য বেশে সাজিয়া বাহির হওন:—যেমন, বর্ত্তমান যুগে, তথৈব, বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের চক্ষে।

এতক্ষণ ধরিয়া চাক্ষুষ আলোক-দর্শনের পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়া যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চক্ষু পদার্থটা আর কিছু না—আলোক। আলোকের প্রকাশের

নামই চক্ষুর দৃষ্টিস্ফুরণ, আলোকের অপ্রকাশের নামই চক্ষুর দৃষ্টিরোধ; আর চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের স্পর্শ-ক্ষেত্র হইতে বহিরাকাশের দৃষ্টিক্ষেত্রে দৃশ্য-বেশে আলোকের সাজিয়া বাহির হওনের নামই চক্ষুর দৃষ্টি-বিকাশ।

॥২॥ তা তো বুঝিলাম, কিন্তু গোড়া'র প্রশ্নটির মীমাংসা হইল কই? প্রশ্নটি তোমার মনে আছে তো? জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"আলোক কি-ভাবেই বা সর্ব্বজীবের চক্ষু—কি-ভাবেই বা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু?" ইহার তুমি কী * উত্তর দাও?

॥১॥ উহার উত্তর প্রদানের বাকি আছে নাকি? "সাত কাণ্ড রামায়ণ, সীতা কা'র ভার্য্যা!" এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে আমি যে কথাটা'র ধারাবাহিক যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে অন্ততঃ এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, আলোক যে-অংশে দৃষ্টিক্ষেত্রে (অর্থাৎ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে) প্রকাশ পায়, সেই অংশে তাহা সর্ব্বজীবের চক্ষু; আর যে-অংশে তাহা দর্শকের চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের স্পর্শক্ষেত্রে ছাপ লাগানো থাকে, সেই অংশে তাহা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু। তোমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ-তো-আর আমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ হইতে ভিন্ন নহে; ভিন্ন যখন নহে—এটা যখন স্থির যে, তোমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ এবং আমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ একই অভিন্ন বহিরাকাশ, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, আলোক যে-অংশে চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে ভাসমান সেই অংশে তাহা তোমারও চক্ষু—আমারও চক্ষু। পক্ষান্তরে, তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ কিছু-আর আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ নহে; তথৈব, আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ কিছু-আর তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ নহে; তাহা যখন নহে, তখন ইহা বলা বাহুল্য যে, আলোক যে-অংশে আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা কেবলমাত্র আমারই চক্ষু—অপর কাহারো না; তথৈব, যে অংশে তাহা তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা কেবলমাত্র তোমারই চক্ষু—অপর কাহারো না। ইহার একটি উপমা দিতেছি, তাহা হইলেই তোমার মনের ধন্ধ মিটিয়া যাইবে:—

গঙ্গাজল যে-অংশে গঙ্গায় বহিতেছে, সে অংশে তাহার উপরে তোমার এবং আমার উভয়েরই স্বত্বাধিকার সমান; তেম্নি, আলোক যে-অংশে বহিরাকাশে প্রকাশমান, সে অংশে তাহা তোমার এবং আমার উভয়েরই চক্ষু। পক্ষান্তরে গঙ্গাজল যে-অংশে আমার গৃহের জল-নালীতে বহিতেছে, সে অংশে তাহা যেমন আমার নিজস্ব সম্পত্তি; তেম্নি, আলোক যে-অংশে আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা আমারই চক্ষু, তা বই, তাহা তোমার বা অপর কাহারো চক্ষু নহে। অতএব এটা স্থির যে, চক্ষুগোলকের বহিরাকাশের দৃষ্টিক্ষেত্রে আলোকের রূপ যাহা ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই সমষ্টি জীবের চক্ষু, আর, বিশেষ-বিশেষ জীবের চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে আলোকের বিশেষ-বিশেষ রকমের ছাপ যাহা নিপতিত হয়, তাহাই বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ বিশেষ চক্ষু।

॥২॥ চক্ষু পদার্থটা কি—এতো মোটা মুটি একরূপ বুঝিতে পারা গেল;—আচ্ছা—দ্রষ্টা পদার্থটা কি? তাহার তুমি কোনো প্রকার সন্ধান-বার্ত্তা বলিতে পার' কি? সেই কথাটিই হচ্চে প্রকৃত কাজের কথা।

॥১॥ গুণ টানিয়া নৌকা চালানো বড়ই পরিশ্রমের কাজ; এই খানে এখন নোঙড় নিক্ষেপ করাই পরামর্শ-সিদ্ধ! জোয়ার আসিলে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* কি-শব্দের দ্ব্যর্থ নিবারণের একটা তো উপায় করা চাই! তাহার সহজ উপায় এই:—

প্রশ্ন। ক্ষুধা মান্দ্য হইলে কি আহার করা কর্ত্তব্য?
উত্তর। কোনো ক্রমেই না।
প্রশ্ন। ক্ষুধা মান্দ্য হইলে কী আহার করা কর্ত্তব্য?
উত্তর। লঘু পথ্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

(জি-দে-লার্কোঁর ফরাসী হইতে)

শত বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য ভূভাগের পরিচয় যাহা কিছু আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা গ্রীক্ ও ল্যাটিন ইতিহাসের খণ্ডাংশ হইতে এবং কতকগুলি দেশ পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে। প্রমাণের মধ্যে তখন একটি ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্র ছিল:—সেটি বাইবল্; সেই বাইবল্-অনুসারে প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে শুধু একটি সভ্য জাতি ছিল:—সেই ইহুদি জাতি,—"নির্ব্বাচিত জাতি।"

খৃষ্ট জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়; বিদিত ব্যবস্থাকর্ত্তাদের মধ্যে মূসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব্বে, ফ্যারাওদের কথা, সাইরসের কথা, আসিরিয়ার রাজাদের কথা, গ্রীসের সপ্ত জ্ঞানীর কথা অস্পষ্টভাবে বলা হইত,—শুধু ইহুদি জাতির শ্রেষ্ঠতা আরও ভাল করিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য। পাশ্চাত্য দেশে এখনও যে "পেগান" শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে—একদিকে সেই পেগানেরা,—আর একদিকে, হিব্রু জাতি,—ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি।

এখন সেকাল আর নাই—কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এখন পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, পৃথিবী গঠিত হইতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছিল; ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন,—লক্ষ বৎসর হইল, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, বহু অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফলে, প্রাচ্য জগৎ এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে সত্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সেই দীপ্যমান সত্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এখন উদিত হইয়াছে। আমাদের যুগের পূর্ব্বে, বিদ্যা-জননী মিসরে ৫০০০ বৎসরব্যাপী সভ্যতা বিদ্যমান ছিল—ইহা কনিষ্ঠ Champollion, Champollion Figeac, Bunsen, Osburn, Lenormant, Chabas,—ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কীর্ত্তিস্তম্ভ পিরামিড, সমাধি-মন্দির, মিসরের ত্রিশটা রাজবংশ—এই সমস্ত, মিসরের ঔপন্যাসিক প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। শঙ্কু-আকৃতি অক্ষরের আবিষ্কার হওয়ায়, চ্যাল্ডিয়া ও আসিরিয়ারও কতকটা গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। Burnouf, Westergaard, Oppert, Menant, Rawlinson, Lenormant—ইঁহাদের অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে উহাদের সভ্যতা ৪০০০ বৎসরের পুরাতন। চীন সভ্যতার আরম্ভকাল, প্রাগৈতিহাস-কালের মধ্যে এতটা বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, চীনভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা মধ্য-চীন-সাম্রাজ্যের সভ্যতার কাল নির্দ্দেশ করিতে সাহস পান না। পরিশেষে, William Jones, Colebrooke, Burnouf, Lassen, Max Muller প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্য দেশের প্রধান প্রধান পুঁথির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছেন। কেননা, তুলনা-সিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীক্ জাতি, ল্যাটিন্ জাতি, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতি, সেল্ট্-জাতি—ইহারা সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। Pictet তাঁহার "ইন্দ-য়ুরোপীয় জাতির উৎপত্তি" গ্রন্থে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যে সময়ে মূসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (Exodus,) সেই সময়ে ভারতের যে সভ্যতা ছিল তাহার তুলনা নাই;—ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যে সব অসংখ্য পুঁথি আছে, সেই সকল পুঁথির দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথ্যাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-ঘট পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে; ঐখান হইতেই আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি।

অ্যালেক্জান্দ্রিয়ার Philon বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন: "এখানে প্রাচী (Orient) নামে একব্যক্তি আছেন।" Fernon বলিয়াছেন, "এসিয়ার চুল্লি হইতেই আলোক বাহির হইয়া আমাদের দেশগুলাকে আলোকিত করিয়াছে।" এবং Panthier তাঁহার "প্রাচ্যখণ্ডের ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর" ভূমিকায় আরও এই কথা বলিয়াছেন:—"সূর্য্যের উদয়-কালের সহিত প্রাচী-র যেমন সংস্রব, জগতের সমস্ত শৈশব-

স্মৃতির সহিত প্রাচ্য দেশের তেমনি সংস্রব। প্রাচ্য ভূমির সৈকত-সমুদ্রে কত কত জাতি শয়ান; এই প্রাচ্য ভূমি চিরকালই বর্ত্তমান। প্রাচ্যখণ্ড এখনও তাহার বক্ষের উপর মানব-জাতির প্রথম প্রহেলিকা ও আদিম স্মৃতিগুলি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি দার্শনিক তত্ত্ব—সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব আমাদের নিজেকে জানিতে হইলে, উহাকে জানিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক।"

আমাদের সভ্যতার জন্য আমরা প্রাচ্যখণ্ডের নিকট ঋণী। শিল্পকলার মধ্যে যদি চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী আর সমস্ত শিল্পকলা আমরা প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগেব অঙ্গপুষ্টি করিয়াছ মাত্র। দর্শন কিংবা ধর্ম্মঘটিত যে সকল তত্ত্ব এখন আমবা আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানি, তাহাদের মধ্যে এমন একটি তত্ত্বও নাই যাহার মূলসূত্র প্রাচীন জাতিরা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাস্তুবিদ্যার কথা যদি বল,—তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ কীর্ত্তি মন্দিরের চাপে আমরা নিষ্পেষিত বলিলেও হয়। সে সময় তাহাদের সভ্যতা আমাদেরই মত উন্নতি লাভ করিয়াছিল; তাছাড়া, কোন কোন প্রাচীন জাতির আচার ব্যবহারেব মধ্যে যে একটি মাধুর্য্য দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আচাব ব্যবহারের সম্বন্ধে আমরা আর অহঙ্কার করিতে পারি না।

Bournouf-এর কথা-অনুসারে, ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের অসাধারণ সভ্যতার শুধু একটা প্রমাণের আমরা উল্লেখ করিব। সে কথাটি সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য-সাধারণ। ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে এমন কতকগুলি নাটক ছিল যাহা একেবারেই দার্শনিক, তাহার পাত্রগণ কতকগুলি মানসিক ভাবমাত্র। তাহার একটি দৃষ্টান্ত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়।" Bournouf উপসংহারে এই কথা বলিয়াছেন:- ইহা হইতে অনুমান করা যায়, ভারতীয় নাটকের এরূপ শ্রোতৃ-মণ্ডলী ছিল যাহা—কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন নাট্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের শিষ্ট সমাজের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। এ—ত গেল বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষার কথা। আর একটা ব্যাপার,—হিন্দুজাতির মধুর প্রকৃতি ও উচ্চ জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মেগ্যাস্থিনিস্ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে, হিন্দু কৃষক শান্তভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে দেখিয়া গ্রীকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি বলেন,—"কৃষকের শরীর পবিত্র, কৃষক অবধ্য, কেননা, কৃষক শত্রু মিত্র উভয়েরই হিতকারী।"

কতকগুলা স্থূল ধরণের ভ্রম য়ুরোপীয়দের মনে বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছে; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই সেই ভ্রমগুলি প্রচার করিয়াছেন; এবং সঠিক্ তথ্যের অভাবেই তাঁহারা এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাই:—Deguignes তাঁহার "হুনদিগের ইতিহাস" গ্রন্থে, চীনেরা মিসরের লোক হইতে উৎপন্ন এই কথা এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন:—"চীনেরা ইজিপ্টীয়দিগের একটা ঔপনিবেশিক দল মাত্র—উহারা নিতান্তই আধুনিক। 'একাড্যামি' সভায় পঠিত আমার সন্দর্ভে আমি ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি। মিসরীয় ও ফিনিসীয় অক্ষর শুধু যুক্ত করিয়া চীনে-অক্ষরগুলা গঠিত হইয়াছে। এবং থিব্সের পুরাতন রাজারাই চীনের আদিম সম্রাট্।" আবার ঐ গ্রন্থকারই তাঁহার "সামানীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে মন্তব্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু পুরাণের কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, উহা ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।" তিনি বলেন,—"ঐ সকল পুরাণের কথা, হিন্দুরা গ্রীক্‌দের নিকট হইতেও গ্রহণ করিয়াছে,—কেননা, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কতকগুলি গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ শব্দ পাওয়া যায়।" পরিশেষে, তিনি বলেন,—'যিশু-খৃষ্টের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে, হিন্দুরা বর্ব্বর ও দস্যুমাত্র ছিল।'

তাহার পর, Philarete Chasles বলিলেন যে, ভারত গ্রীসের দুহিতা। কংফুচু-সম্বন্ধে Hegel এই কথা বলিয়াছেন:—"তিনি একজন ব্যবহারিক দর্শনবেত্তা; তাঁহার লেখার মধ্যে ঔপপত্তিক দর্শনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; তাঁহার নীতিসূত্রগুলি সুন্দর, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সিসিরোর "de officiis" নামক নৈতিক গ্রন্থে কংফুচুর লিখিত সমস্ত কথাই পাওয়া যায়। এই সকল মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হয়, ঐ সকল গ্রন্থ কংফুচু যদি অনুবাদ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিত।"

Ritter তাঁহার "প্রাচীন দর্শনের ইতিহাস" গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আরও একটু বেশী দূর গিয়াছেন।

"যে সকল লেখা কংফুচুর বলিয়া আরোপিত হয় এবং যাহা তাঁহার জাত-ভাইরা জ্ঞানের মূল-প্রস্রবণ বলিয়া মনে করে, সেই সকল লেখা সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায়,—এই "জ্ঞানের কথার" মধ্যে আমরা যাহাকে philosophy বলি তাহার কিছুই নাই—চীনেদের "জ্ঞানের কথা" বোধ হয় ফিলজফি ছাড়া আর কিছু; কেননা এই সকল চারিত্র-নিয়ম, ও নৈতিক বাক্য—কংফুচুর গ্রন্থে যাহার বহুল পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,- এই সমস্ত এমন ভাবে বলা হইয়াছে যেন উহার মধ্যে কি গুরুতর কথাই আছে—কিন্তু উহা কেবল আমাদের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র।"

দুই জন জর্ম্মন দার্শনিক কংফুচুর দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন। কংফুচু স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই:—"বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমার দখল মোটেই নাই; আমি প্রাচীন কালের লোকদিগকে ভালবাসি এবং আমি তাঁহাদের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।" আরও তিনি এই কথা বলেন:—"যে ব্যক্তি সত্য ও মঙ্গলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি বিনা শৈথিল্যে ও অধ্যবসায় সহকারে উহাতে লাগিয়া-পড়িয়া থাকে সে কি মনের মধ্যে একটু সন্তোষ অনুভব করে না? উচ্চ প্রকৃতির লোকদের ভাবনা, পাছে তাহারা সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, দারিদ্র্যের জন্য তাহারা চিন্তিত হয় না।" কংফুচুর শিষ্যেরা কংফুচুর মত এইরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"আমাদের গুরুর মতটি শুধু এই,—সরল-অন্তঃকরণ হইবে, এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভালবাসিবে।" দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কংফুচু জীবিত ছিলেন, ৪০ কোটি লোক তাঁহার মতাবলম্বী ছিল; তিনি প্রাচীনদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছেন —এই কথা তিনি বিনীত ভাবে স্বীকার করিয়াছেন; আর, হেগেল ও রিটার যাঁহারা কংফুচুর ২৫০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা "ফিলসফি" আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন। গ্রীকেরা প্রাচীন কালকে অবজ্ঞা করিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, উহাঁরাও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্লেটো, তাঁহার Timee নামক গ্রন্থে, একজন মিশর দেশীয় পুরোহিতের মুখ দিয়া সলমনের প্রতি এই কথা গুলি বলাইয়াছেন:—"এথেনীয়গণ! তোমরা নিতান্তই শিশু! তোমাদের কালের পূর্ব্বেকার যে সকল পুরাতন জিনিস আছে তোমরা তাহার কিছুই জান না; আত্মগৌরবে ও জাতীয় গৌরবে স্ফীত হইয়া, তোমাদের পূর্ব্বে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, সে সমস্ত তোমরা অবজ্ঞা করিয়া থাক; তোমাদের বিশ্বাস, শুধু তোমাদের সহিত ও তোমাদের নগরটিরই সহিত একসঙ্গে পৃথিবীর অস্তিত্ব আরম্ভ হইয়াছে।" এখন এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে মিশরের লোকেরা জীবজন্তুকে, হিন্দুরা পঞ্চভূতকে, পারসিকেরা সূর্য্যকে পূজা করে—কিন্তু একথা বলিলে জানিয়া-শুনিয়া সত্যের অপলাপ করা হয়; এরূপ বলিলে, ত্রিচিনাপলি-বিদ্যালয়ের একজন সমসাময়িক ব্রাহ্মণ যেরূপ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই তিরস্কারের পাত্র হইতে হয়। সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলেন:-"আমাদের গূঢ়রহস্যগুলি য়ুরোপীয়েরা বুঝিতে পারেন না—উহার অধিকাংশই জ্যোতিষের স্মৃতিসাহায্যকারী কতকগুলা সংকেত মাত্র। অতএব আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতাকে খাড়া করা উচিত হয় না।"

১৪০০ বৎসরের পুরাতন- বাইবেলের "পুরাতন বিধান গ্রন্থ" সম্বন্ধে কি বক্তব্য? এই সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার মধ্যে হিব্রু জাতির স্থান কোথায়? খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান আচার্য্যেরা নব-বিধান-গ্রন্থের সহিত পুরাতন-গ্রন্থটি জুড়িয়া দিয়া একটা ভারী ভুল করিয়াছেন—খৃষ্টধর্ম্মের উপর একটা দুঃসহ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহার ফলে, পরম্পরাক্রমে অনেকগুলি ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে; সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলী ইহা স্বীকার করেন। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে, বিজ্ঞানের সহিত বাইবেলের মূল-বচনগুলার মিল রাখিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্যাপারটা বড় সোজা নহে! বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণ সমর্থন করিবার জন্য এইরূপ যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে যে, সৃষ্টিপ্রকরণে যে হিব্রু শব্দ "দিন" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে তাহা আসলে দিন নহে—তাহা একটা অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ

সময়। এই যুক্তি সূক্তির আভাস মাত্র। ১৮০০ বৎসর হইতে খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যগণ এই শব্দ দিন বলিয়াই অনুবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং আধুনিক খৃষ্টানদের মধ্যে এখনও অনেকেই এই কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। St. Thomas এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—"সৃষ্টির প্রথম দিনটি এক-সংখ্যার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে দিনের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা সেই দিন সূচিত হইয়াছে।" St. Augustin, St. Basile, St. Chrysostome এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মূসার কালনির্ণয়ও ঐরূপ ছেলেমান্‌সি ব্যাপার। কবরের গায়ে মিসরীয় রাজাদের জন্মমৃত্যুর যে তারিখ লেখা আছে তাহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, সে সময়ে মনুষ্যের পরমায়ু এখনকার লোকদের অপেক্ষা বেশী ছিল না। এবং সেই সময়ে মিসরবাসীরা, চ্যাল্ডীয়েরা, হিন্দুরা ক্রান্তিপাতের গতির কথা অবগত ছিল, সুতরাং তাহাদের কালগণনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই স্থাপিত। অতএব হিব্রু কুলপতিরা যে বহুশত বৎসর জীবিত ছিলেন, এ কথা নিতান্তই কাল্পনিক।

ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, Pentateuque গ্রন্থ যাহা মূসার লেখা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, উহার অধিকাংশই অপ্রামাণিক; সম্ভবত ঐ গ্রন্থ Josiah রাজার যুগে রচিত হয়। খৃষ্টজন্মের ৬২১ বৎসর পূর্ব্বে, দেবালয়ের মহা-পুরোহিত Helkiah ঐ গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। "রাজাদের গ্রন্থে"-র ২২ পরিচ্ছেদে এই বিবরণের একটা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে। ইহার দ্বারা আরও এই কথা সপ্রমাণ হয় যে ইহুদি জাতি, বহু শতাব্দী কাল উহাদের আদিম বহুদেব-বাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। এখন পুরাতন বাইবেলের প্রামাণিকতার কথা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, পুরাতন গ্রন্থ আসলে যেমনটি তাহাই গ্রহণ করা যাক্।

খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সকল মুখ্য ভ্রম আছে তাহার মধ্যে একটি এই যে, ইহুদি জাতিই নির্ব্বাচিত জাতি—ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি।

নির্ব্বাচিত জাতি কেন?—খৃষ্টীয় আচার্য্যেরা বলেন, যে হেতু, পুরাকালে শুধু ইহুদি জাতিই একেশ্বরবাদী ছিল, ইহুদিরাই এক অদ্বিতীয় সত্তা ঈশ্বরকে জানিত।

এরূপ অভিমানের কথা আজিকার দিনে আর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে মিসর, চালডিয়া ও ব্যাবিলনের পুরোহিতেরা, তাঁহাদের দীক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেদ, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ, পারসিকদিগের আবেস্তা—এই সমস্ত হইতে পর্য্যাপ্তরূপে সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দু ও পারসিকেরা পরব্রহ্মের একত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিত।

অ্যারিস্‌টটেল তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—"যে সকল উপদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহা পুরাণের আকারে ভবিষ্যদ্‌ বংশের নিকট উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে ঈশ্বরই জগতের সর্ব্বাদিম মূলতত্ত্ব এবং ঈশ্বরেরই শক্তি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, ইতর সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ও সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, গল্পচ্ছলে সংযোজিত হইয়াছে।"

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, সমস্ত পুরাকালে, ধর্ম্মের গুহ্য মত কেবল অল্পসংখ্যক দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই ব্যক্ত করা হইত; প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই, ধর্ম্মের গুহ্যাংশ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ও ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ সাধারণ লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এমন-কি, প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেণ্ট-পিটার ও সেণ্ট-পাউলের মধ্যে যে বাদবিসম্বাদ চলিয়াছিল তাহা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয়: সেণ্টপাউল গুহ্যধর্ম্ম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেণ্টপিটার তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই কারণে তাহাদের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হয়। আরও বহুকাল পরে, বিশপ Synesius এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন:—"জনসাধারণ নিতান্তই চাহে যে তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা হয়। তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা ছাড়া আর উপায় নাই। মিসরের পুরাতন পুরোহিতেরা এইরূপ ব্যবহারই করিত; লোক ভুলাইবার জন্যই তাহারা দেবালয়ের মধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং সেই খানে থাকিয়া লোকের অগোচরে গুহ্য ব্যাপার সকল প্রস্তুত করিত। এ কথা লোকেরা

যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই রুষ্ট হইত। তাই, সাধারণ লোকের সহিত সাধারণ লোকের মতই ব্যবহার করিতে হয়। আমি নিজে চিরকাল তত্ত্বজ্ঞানীর মতই থাকিব, কিন্তু লোকের নিকট আমি কেবলই পুরোহিত।"

অতএব পুরাতন মিসরের লোকেরা যে কেবল জীব-জন্তুরই উপাসক ছিল এই অসঙ্গত কাহিনীটা নিতান্তই অমূলক সন্দেহ নাই। আমরা আরও একটু বেশী দূর যাইব: ইহুদি জাতিকে যে ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জাতি বলা হয়, আমরা দেখাইব, ইহুদি জাতি সে সম্মানের যোগ্য নহে। যে ঈশ্বরের জন্য ইহুদি জাতি এত গর্ব্বিত, সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ ছিল? তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের ভাবে দেখিত; তাহাদের ঈশ্বরের কল্পনা মানব সাদৃশ্যমূলক কল্পনা; ইহুদিদের ঈশ্বর শরীরী ঈশ্বর। সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, ঈশ্বর মানুষকে নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বর পার্থিব স্বর্গে বিচরণ করেন; তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন, তিনি অনুতাপ করেন, বিস্মৃত হয়েন, তিনি স্মরণ করেন। মূসার বহির্যাত্রার (Exodus) প্রকরণে, ঈশ্বর, নিয়মাবলী স্বহস্তে লিখিয়াছেন। কি প্রস্তর খোদিত করিয়া, কি চিত্র কর্ম্মের দ্বারা, তাঁহার মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। এই ঈশ্বর উচ্ছেদকারী ঈশ্বর—যিনি পিতা মাতার অপরাধের জন্য, তাহাদের সন্তানের উপর তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত, প্রতিশোধ লয়েন; এই ঈশ্বর ইহুদি জাতিরই ঈশ্বর, অন্য জাতির ঈশ্বর নহেন। এবং যখন তিনি ইহুদি জাতির প্রতি রুষ্ট হইলেন, মূসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, -"আমাকে নিরস্ত করিও না, আমার প্রজ্জ্বলিত রোষানল ইহুদি জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলুক।" এইত ইহুদিদিগের একেশ্বরবাদের ধারণা; তাছাড়া একেশ্বরবাদের ধারণাকে তাহারা বজায় রাখিতে পারে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা বিদেশী দেবতাদের নিকট বলি দিত, ইহুদিদিগের ভবিষ্যদ্‌বক্তারা ও ইহুদিদিগের ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন যে ইহুদিদের "মাথাগুলা নিরেট।" ইহুদি জাতি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভাব এতই কম বুঝিত যে, ওলড্‌টেষ্টেমেণ্ট খুঁজিয়া আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে একটী কথাও পাওয়া যায় না; পুরাকালের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহুদিদের ইতিহাস,—চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, খুন, লোকহত্যা, আরও অন্যান্য জঘন্য আচরণের সুদীর্ঘ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা ইহুদি জাতিকে জানে না তাহারা যদি ওলড্‌টেষ্টেমেণ্টের একটা প্রতিলিপি করে এবং তাহা হইতে ইহুদি নাম গুলা বাদ দেয়, তাহা হইলে তাহারা ন্যায্য রূপে মনে করিতে পারে, যে জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা অসভ্য জাতি, বর্ব্বর জাতি। ইহুদি জাতির উৎপত্তির কথা ধরিতে গেলে, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? এ বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না। মূসার সময়ে, ইহুদি জাতি, মিসরের তাড়িত জাতিচ্যুত পারিয়া মাত্র ছিল। মিসরের আদিম কালের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য Ptolemee Philadelph যাঁহার উপর ভার দিয়াছিলেন, সেই মিসরের পুরোহিত Manethon এইরূপ বলেন;—"ইহুদি জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে—এমন কি মিসরের পুরোহিত জাতি সমূহের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উহাদের অনাচার, উহাদের অপবিত্র আচরণ, উহাদের কুষ্ঠ রোগ—এই সকলের দরুণ, উহাদিগকে রাজা Amenoph মিসর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন।" উহাদিগকে Jacobএর বংশধর বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

* * * *

এক্ষণে ইহুদি জাতির ঈশ্বরের ধারণার সহিত, আর্য্য-জাতির ঈশ্বরের ধারণার তুলনা করিয়া দেখা যাক্‌।

ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে ব্রহ্ম, ক্লীবলিঙ্গ, নামহীন, মনের অগম্য, ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। মনুর লক্ষণানুসারে,—"যিনি স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ, বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য, নিত্য, বিশ্বের অন্তরাত্মা তিনিই ব্রহ্ম।" তিনিই পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, উপাধিহীন, নির্ব্বিশেষ। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন, জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তিনি ব্রহ্মা নামের বাচ্য হইলেন; পুংলিঙ্গবাচক এই ব্রহ্মা সৃজনশক্তিরূপে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত।

পারস্য দেশীয় আর্য্যদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে এই একইরূপ ধারণা:—Zervane—Ackerne ইনিও

নিষ্ক্রিয়, শান্ত, পরিপূর্ণ; আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতেই শুভ ও অশুভের মূলতত্ত্ব—অর্মজদ্ ও আহরিমান নিঃসৃত হইয়াছে। পারসিকদিগের দ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে যে ভ্রম সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই ভ্রমটি প্রসঙ্গক্রমে এই খানে সংশোধন করিয়া দিই। জের্ব্বান — আকেরেন এক অদ্বিতীয় বস্তু; কিন্তু অর্মজদ্ আহরিমান এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব, যমজ হইলেও সমান নহে। ফলতঃ মঙ্গলের মূলতত্ত্ব অর্মজদ্ প্রথমে জন্মগ্রহণ করে; অর্মজদ্ আহরিমান অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্ এবং কল্পকালের অন্তে, আহরিমান একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। আর গ্রীক্ আর্য্যদের কথা যদি বল, সকলেই জানে,—পিথাগোরাস, সক্রেটিস্ ও প্লেটো, পরমেশ্বরের একত্ব অবগত ছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে উপদেশও দিতেন। প্লেটো ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াছেন; অ্যারিষ্টটেল বলিয়াছেন, "তিনি সেই চিৎ---যাহা আপনাকে আপনি চিন্তা করে।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্য্যদিগের অতীন্দ্রিয় ধারণা ও ইহুদি-দিগের মানবিক ধারণা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উহার মধ্যে একটি যেমন উন্নত ও দার্শনিক, অন্যটি তেমনি স্থূল ও সীমাবদ্ধ। এখন, একেশ্বর বাদের উপর স্থাপিত যে শ্রেষ্ঠতার জন্য ইহুদিরা বড়াই করে, সেই স্পর্দ্ধাবাক্যে আমরা বেশী আশ্চর্য্য হইব কিংবা যে আর্য্যবংশধর খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়া ইহুদিরা আপনাদিগকে "নির্ব্বাচিত জাতি" বলে—সেই খৃষ্টানদের অজ্ঞতায় বেশী আশ্চর্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না। মিসরের "পারিয়া" হইতে যাহাদের উদ্ভব, যাহারা অবিরত নিজ প্রতিবেশীগণের গ্রাম নগর লুটপাট করিত; জয়লাভ করিলে, যাহারা আবালবনিতা সকলকে হত্যা করিয়া, শুধু মূসা-শ্রেণী পুরোহিতদিগের ব্যবহারের জন্য কুমারীদিগকে রাখিত; পায়গম্বরদের নিষেধবাণী সত্ত্বেও, যাহারা নিজ পৌত্তলিক দেবতাদের নিকট পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিত; যাহারা স্বকীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন আপনাদের মধ্যে না পাইয়া, ইজিপ্ট ও চ্যাল্ডিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; যাহাদের না আছে শিল্পকলা, না আছে দর্শন, যাহারা কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যোগ্যতা দেখাইয়াছে এবং যাহারা শুধু নিজ ঐতিহাসিকদের কলাকৌশলে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই ক্ষুদ্র ইহুদি জাতি মিসর, চ্যাল্ডিয়া, ভারত প্রভৃতি দীপ্তগৌরব প্রাচীন সভ্য দেশের সমক্ষে, এই কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলে কি না—তাহারা ঈশ্বরের "নির্ব্বাচিত জাতি"! ভারত প্রভৃতির যখন উন্নত অবস্থা তখন ইহুদি জাতির অস্তিত্বই ছিল না, এমন কি, উহারা প্রাচীন গ্রীক্-দিগেরও পরে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের এই স্পর্দ্ধাবাক্যের ভিত্তি কি?—না, উহারাই কেবল ঈশ্বরকে জানিত। আর সে ঈশ্বর কিরূপ ঈশ্বর?—তিনি মহাশক্তিমান্ ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর, সৈন্য সামন্তের ঈশ্বর, সর্ব্বোচ্ছেদক, যথেচ্ছাচারী, বৈরনির্যাতক, নিষ্ঠুর ঈশ্বর; মিসরে মহামারী আনয়ন করিবার উদ্দেশেই এই ঈশ্বর "ফ্যারাও"র হৃদয়কে পাষাণ-কঠিন করিয়া দিয়াছিলেন; মনুষ্যের কোন এক বংশকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনুতাপ হইল এবং সেই বংশকে তিনি প্রলয় বন্যায় ডুবাইয়া মারিলেন। যে "লেভিটে"রা স্বকীয় ভ্রাতা, পুত্র, জনক জননীদের হত্যা করে সেই লেভিট্‌দিগকে, মূসার (Moses) মুখ দিয়া এই ঈশ্বরই আশীর্ব্বাদ করেন। এইরূপ তাহাদের ঈশ্বর-নিন্দামূলক ঈশ্বরের কল্পনা! এই ঈশ্বর তাহাদেরই ঈশ্বর, আর কাহারও ঈশ্বর নহেন। এখন খৃষ্টানেরা তাঁহাদের মধুর-প্রকৃতি মহাপুরুষ যিশু-খৃষ্টকে এই ঈশ্বরেরই পুত্র বলিয়া কি স্বীকার করিতে পারেন? হায়! অষ্টাদশ শতাব্দী কালব্যাপী অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে কত ভ্রমই বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে! কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে; বিজ্ঞান, খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জটিলতার নিরা-করণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আর্য্যজাতির মতবাদের কিয়দংশ, খৃষ্টধর্ম্ম আলেকজান্দ্রিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে, এবং অল্প অংশই সেমিটিক জাতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা প্রাচীনকালের আর্য্য ধারণার অনেকটা কাছাকাছি; সেই ঈশ্বর বিশ্বের ঈশ্বর, তিনি শুদ্ধাত্মা ও পরিপূর্ণ। এবং খৃষ্টবাদও আর্য্য মতবাদ, উহা সেমিটিক্ মতবাদ নহে। ফলত, ইহুদিদের "মেসায়া" (ওল্ড-টেষ্টেমেণ্টে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত খৃষ্ট) পার্থিব মেসায়া, ডেভিডের বংশধর, একমাত্র ইহুদিদিগেরই মেসায়া; যে ঈশ্বরের পুত্র জগতের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছেন এ সে

মেসায়া নহে। তাহার প্রমাণ, ইহুদিরা সাইরস্‌কে "ঈশ্বরের খৃষ্ট" বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহার অনেক পরে, যাদুকর সাইমন্, সাইরস্‌কেই মেসায়া বলিয়া চালাইয়াছিল।

তা ছাড়া ইহুদিরা যিশুকে মেসায়া বলিয়া জানিত না, কেননা, যিশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন। সেন্ট-জনের মতানুসারে, যে Evangile গ্রন্থে খৃষ্টধর্ম্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট আছে, কাল-গণনার হিসাবে, চারিটা Evangile-গ্রন্থের মধ্যে উহাই শেষ গ্রন্থ; কেননা, উহা ১৬০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়, এবং কেবল ঐ এভ্যাঞ্জিল-গ্রন্থেই খৃষ্টকে দেবপ্রতিম, বিশ্বজনীন মেসায়া বলা হইয়াছে— যিনি জগতের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছেন। শব্দবাদ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। সেন্টজন স্বীকার করিয়াছেন যিশুর বহুপূর্ব্বে শব্দবাদ (শব্দব্রহ্ম) লোকের জানা ছিল এবং কিয়ৎ শতাব্দী ধরিয়া অ্যালেকজান্দ্রিয় সম্প্রদায়গণ শব্দবাদের কথা প্রকাশ্যভাবে বলিতেন।

অবতারবাদও আর্য্য মতবাদ -উহা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ায়, Hypostases নামে এই মতবাদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। এই মতবাদ হইতেই "একে তিন, তিনে এক" এই ত্রিত্ববাদের জন্ম হইয়াছে। বাইবেলের পূর্ব্বভাগে, এরূপ কোন মতবাদই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহুদিধর্ম্মের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই। তাছাড়া, Burnouf তাঁহার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান" গ্রন্থে কি বলেন শোনো:—"খৃষ্টানদের সমস্ত দার্শনিক মতবাদই জেন্দা-বেস্তার মধ্যে আছে:--যথা, এক ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, অন্তরাত্মা, ঈশ্বর ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, পিতৃজাত পুত্র, শরীরের প্রাণ ও আত্মার পাবন। পতনবাদ, উদ্ধারবাদ, আরম্ভে ঈশ্বরের সহিত অসীম আত্মার সমবায়, যে অবতারবাদ ভারতে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সেই অবতারবাদের কিঞ্চিৎ আভাস, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, Amschaspand ও Darvend নামক শুভ ও অশুভ দেবদূত, আমাদের অন্তরে যে ঈশ্বরের বাণী অবস্থিত সেই বাণীর প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুক্তির আবশ্যকতা—এই সমস্ত কথাও উহার মধ্যে পাওয়া যায়। আবেস্তা-ধর্ম্মে পশুবলি নাই। ইহুদিরাও খৃষ্টীয় পুনরুত্থান উৎসবে মেষ-বলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে মানসিক বলি প্রবর্ত্তিত করে। মতবাদ ছাড়িয়া, যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠান, সাংকেতিক চিহ্ন, ও ধর্ম্মভোজ আদির (sacrament) কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহুদি ধর্ম্ম অপেক্ষা আর্য্য ধর্ম্মাদি হইতেই উহার অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে:--যথা অগ্নি ও সুরাপাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন, ক্রুসের চিহ্ন, খৃষ্টের পুনরুত্থান উৎসবে ব্যবহার্য্য মোম-বাতি, কোন কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তৈল, এই সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের সামগ্রী। অবগাহন-সংস্কার (baptism), দোষ স্বীকার প্রথা, আচার্য্য-নিয়োগ-অনুষ্ঠান, মস্তক মুণ্ডন—এ সমস্ত ব্রাহ্মণিক ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। সকল আর্য্য ধর্ম্মের মধ্যেই বিবাহ সংস্কার প্রচলিত ছিল। পুরোহিতদিগের চিরব্রহ্মচর্য্য, দোষস্বীকার, অনুতাপ,--এই সমস্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মঠ, সঙ্ঘ, ধর্ম্মপ্রচার --এই সমস্তের জন্য খৃষ্ট-মণ্ডলী বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ঋণী। Saint Basile বৌদ্ধ মঠের আদর্শে তাঁহার বৃহৎ ধর্ম্মসমাজ গঠিত করিয়াছিলেন।

আর সন্ন্যাসী তপস্বী সম্প্রদায়ের কথা যদি বল, যিশু-খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে, ঐ সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণিক ভারতে ছিল। ক্যাথলিক পাদ্রিদের মধ্যে যে শ্রেণীর সোপানপরম্পরা আছে তাহার অবিকল আদর্শ বৌদ্ধ-তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ডালাই-লামা আছে,---লামাদের সভায় সেই ডালাই-লামা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই লামারা তাহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে, ক্রুস ধারণ ও "metre" টুপি, শাদা আলখাল্লা প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকে। চীনের ক্যাথলিক পাদ্রি father Bury চীনের পুরোহিতদিগকে, ক্যাথলিক পাদ্রির মত মুণ্ডিত-মস্তক দেখিয়া, ও জপমালা ব্যবহার করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন:--"আমাদের মধ্যে এমন একটিও পরিচ্ছদ নাই, পৌরোহিত্যিক কর্ম্ম নাই, ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই,—সয়তান যাহার নকল এ দেশে করে নাই।" "গৌতম সম্বন্ধে আলোচনা" নামক গ্রন্থে Gerson da Cunha আরও এই কথা বলেন:—"এই সম্প্রদায় (যাহারা "মহা-যান" মতাবলম্বী) অনেক বিষয়ে রোমান ক্যাথলিক-দিগের সহিত উহাদের মিল দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদের

মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মঠ আছে, শুধু তাহা নহে, ধর্ম্মপদবীতে উন্নত ভিক্ষুশ্রেণী আছে, মস্তক মুণ্ডন প্রথা, চিরব্রহ্মচর্য্য ও স্মারক চিহ্নের পূজা ও পাপস্বীকার পদ্ধতিও উহাদের মধ্যে আছে। উহাদের মোচ্ছব আছে, সমবেত উৎসব-যাত্রা আছে, প্রার্থনা-সংহিতা আছে, ঘণ্টা আছে, জপমালা আছে, শান্তিজল আছে এবং উহারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যবর্ত্তিতায় বিশ্বাস করে।" উৎপত্তির হিসাবে ইহুদিধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্য ধর্ম্মসমূহের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে অধিক যোগ তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সেমিটিক ধর্ম্মসমূহের সহিত ইহুদি ধর্ম্মের একটা তুলনাত্মক সমালোচনা করিলেই ইহুদি ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ইহুদিধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। আসীরীয়দিগের ঈশ্বর যেমন জিহোবা, মুসলমানদের ঈশ্বর যেরূপ আল্লা, ইহুদিদের ঈশ্বর সেইরূপ জিহোবা। সমস্ত সেমিটিক জাতির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা একই প্রকার: ইলু (যাহা হইতে এলোহিয়, আল্লা, এল উৎপন্ন) যাহার অর্থ মহাশক্তিমান,— কি পুরাতন কি আধুনিক, সমস্ত সেমিটিক জাতির ঈশ্বর এই নামেই পরিচিত: এই ঈশ্বর আদেশ-প্রচারক প্রভু; আসীরীয়দিগের মধ্যে ইনিই অস্সুর, এবং দেশের রাজা ইহাঁরই মন্ত্রী; ইহুদিদের মধ্যে ইনিই জিহোবা এবং মূসাই তাঁহার প্রবক্তা; মুসলমানদের মধ্যে ইনিই আল্লা, এবং মহম্মদই আল্লার "নবী" বা প্রবক্তা।

অস্সুর, জিহোবা ও আল্লা, বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; নরহত্যার দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রচারিত হয়, এবং তলোয়ারই তাঁহাদের সাংকেতিক চিহ্ন ছিল। তাঁহাদের লইয়া যে যুদ্ধ তাহা দিগ্‌বিজয়ের যুদ্ধ ও ধর্ম্ম-প্রচারের যুদ্ধ; এইস্থলে দিগ্‌বিজয় ও ধর্ম্মপ্রচারের মধ্যে একটা দুশ্চেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। "লেশমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবে না"—ইহাই তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল। এই জন্যই এই সকল ঈশ্বর বিশ্বজনীন ঈশ্বর হইতে পারে নাই; অস্সুর, চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; জিহোবার উপাসকেরা পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে মুসলমান ধর্ম্ম কত কত সভ্যতার ভগ্নাবশেষের উপর স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারও প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছে। মধ্যযুগে যে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম য়ুরোপের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই ধর্ম্ম আজ পরাভূত হইয়াছে। কি স্পেন, কি আফ্রিকা, কি ইজিপ্ট কি তুর্কি, কি ভারতবর্ষ এই সমস্ত দেশের আর্য্যদের নিকট ঐ ধর্ম্ম হটিয়া গিয়াছে। এইরূপ রোমকগণ কর্ত্তৃক ইহুদিরা ও আর্য্য-পারসিকগণ কর্ত্তৃক আসীরীয়েরা বহিষ্কৃত হইয়াছে।—

ইহুদিদের সাংকেতিক চিহ্ন সকল, আসলে ইহুদিদের নিজস্ব ছিল না। "মৈত্রী-তোরণ" মিশর দেশের একটা সাংকেতিক চিহ্ন এবং যে দুই দেবশিশু উহাকে আগলাইয়া থাকিত,—উহা আসীরিয়া-দেশের সাংকেতিক চিহ্ন। জেরুসালেমের দেবালয়,—যুগপৎ মিসর ও ফিনিসিয়া দেশীয়: অনেক বিষয়ে ইহুদি ও সেমিটিক্ জাতি যে এক-সূত্রে বদ্ধ,— তুলনা করিয়া তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেখাইবার আর প্রয়োজন নাই। আমি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাহি যে, ইহুদিজাতি হইতে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। উহাদের সভ্যতা অতীব সীমাবদ্ধ; মিশর দেশ হইতে বাহির হইবার সময়, মিশর দেশ হইতে, এবং যে ব্যাবিলোনিয়া ও পারস্য দেশ উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল,—ঐ দুই দেশ হইতেও উহারা কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হয়। উহাদের একেশ্বরবাদ, অন্যান্য সেমিটিক জাতির একেশ্বর-বাদেরই অনুরূপ; এই একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতার কথা দূরে থাক্, বরং উহার অপকৃষ্টতাই সপ্রমাণ হয়; কেন না, উহাদের ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাদের ঈশ্বর ইহুদিজাতিরই ঈশ্বর—সীমাবদ্ধ ঈশ্বর, উহাদের ঈশ্বর-কল্পনা অতীন্দ্রিয় একতায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, কেননা উহারা পশ্চাৎশিরস্ক (Occipital) জাতি,—অর্থাৎ ঐ সকল জাতির মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ, পুরোভাগ অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট। উহাদের দৈহিক বৃদ্ধির দ্রুততা প্রযুক্ত, মাথার খুলির অস্থিগুলা, ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই, পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে যোড় লাগিয়া যায়; সুতরাং মস্তিষ্কের ধূসর অংশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আর্য্যজাতীয় লোকের করোটীর (মাথার

লী) অস্থিখণ্ডগুলা বেশী বয়সে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে যোড় লাগে এবং এই কারণে উহাদের নড়াচড়ার ব্যাঘাত হয় না। এই দেহতাত্ত্বিক প্রভেদপ্রযুক্ত, কোন সেমিটিক জাতির পক্ষে, কোন প্রকার সমুন্নত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। উহাদের সাহিত্যিক কীর্ত্তিগুলিই ইহার প্রমাণ।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রসাদেই ইহুদি জাতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এত উচ্চ আসন দখল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি-বিবরণ ইহুদি জাতির সহিত যুড়িয়া দেওয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম এখন বিপদে পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের আলোকে চোখ্ ফুটিলেও, আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম ঐ দুর্ব্বহ বোঝাটাকে স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না। সত্য কথাটা প্রকাশ করিবার কিন্তু এখন সময় হইয়াছে। যে প্রাচ্যভূখণ্ডকে এত কাল কেহ আমলে আনে নাই—সকলেই কেবল "দূরছাই" করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহার ন্যায্য সিংহাসন, স্বকীয় পুরাতন কিংবদন্তী অনুসারে ইহুদিজাতি ১৮০০ বৎসর ধরিয়া জোর দখল করিয়া বসিয়া আছে, সেই প্রাচ্যখণ্ডকে এখন তাহার প্রাপ্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।

বিভিন্ন সভ্যতা, একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে আবিভূ্ত হয়; প্রত্যেক সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি গ্রহণ করিয়া, তাহার নিজের বিশেষ প্রতিভার দ্বারা আবার তাহা হইতে নূতন পরিণাম-পরম্পরা উৎপাদন করে। অতএব, এইরূপ সহসা মনে হইতে পারে যে, প্রাচীন সভ্যতা সমূহের উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্য প্রাচীন সভ্যতা সমূহ হইতে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না। কোন জাতির শ্রেষ্ঠতা তিন জিনিসের উপর নির্ভর করে:—দর্শন, ধর্ম্মনীতি, ও শিল্পকলা। বৈষয়িক সভ্যতা, জ্ঞান ধর্ম্মের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ্, কাণ্ট, দেকার্ত্ত্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফিথ্‌তে, স্পেন্‌সার, শপেন্‌হৌয়র পর্য্যন্ত, আমাদের মধ্যে এমন একটিও দর্শনতন্ত্র নাই যাহা আমাদের নিজস্ব রত্নখনি হইতে উৎপন্ন; আমরাও এখনও গ্রীক্ দর্শন সম্প্রদায়ের দর্শনাদির অনুশীলন করিয়া থাকি; আবার এই গ্রীকেরা তাহাদের দার্শনিক তত্ত্বসকল গোড়ায় মিসরদেশীয় পুরোহিত ও ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত দর্শন শাস্ত্র আসিয়া, অ্যালেক্‌জান্দ্রীয় দর্শনসম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; এবং সমস্ত পাশ্চাত্যখণ্ড সেই ভাণ্ডার হইতে আপন আপন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। Saint Jerome, Magnusকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এইরূপ আছে:—"খৃষ্টধর্ম্মের আচার্য্যদের কথা আর কি বলিব, যে প্রাচীনদিগের মত তাহারা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত, সেই প্রাচীনদিগের অন্নেই তাহারা পরিপুষ্ট।"—যত কিছু উন্নত নীতি উপদেশ তাহা ভারত ও চীন হইতেই আসিয়াছে। পীত-জাতির মধ্যে আবার এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, উহারা ঈশ্বরের কল্পনা বর্জ্জন করিয়া, শুধু ধর্ম্মনীতির ভিত্তির উপর, উহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। আমার প্রণীত "মনু ও ভগবদ্ গীতা" গ্রন্থে আমি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের অতীব উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই মধুর প্রকৃতি শাক্যমুনির এই সকল নীতি সূত্র যথা "কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে ক্ষমা করিবে", "ক্ষুদ্রতম জীবকেও হিংসা করিবে না," "দরিদ্র ও ধনীকে সমভাবে দেখিবে" এই সকল উপদেশ বাক্য অতিবড় নিষ্ঠুর জাতিদিগকেও সভ্য করিয়া তুলিতে,—কোমল ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এ কথা সত্য, অবনতিগ্রস্ত ভারত, পারস্য, গ্রীশ ও রোমের চিত্র যাহা আমাদের সম্মুখে এখন রহিয়াছে তাহা বড় একটা গৌরবজনক নহে; কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি না, আমাদের সভ্যতার চিত্র উহাদের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট।

ধর্ম্ম সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, পাষণ্ড-দলনী বিচার-সভা, (Inquisition) দাসত্বপ্রথা এই সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার রক্তময় কলঙ্ক; আরও কাছাকাছি সময়ের কথা যদি ধর,—৮৯র রাষ্ট্র বিপ্লব—স্বাধীনতা ও ন্যায়ের যুগ উদ্‌ঘাটন করা যাহার উদ্দেশ্য ছিল - সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের রক্তাপ্লুত আতিশয্য ও অত্যাচার, বুদ্ধদেবের শান্তিময় বিপ্লবের কথা মনে করাইয়া আমাদের চিত্তকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে।

লোকে যাহার এত নিন্দা করে সেই হিন্দুদের বর্ণ-ভেদ প্রথাও আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র,—উহাদের অপব্যবহার সত্ত্বেও,—সভ্যতাকে যে অনেক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তহাতে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া, যে

অবিনশ্বর মূলতত্ত্বগুলির উপর বর্ণভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত সেই বর্ণভেদপ্রথা কি য়ুরোপেও আজিকার দিনে রহিত হইয়াছে? রহিত যে হয় নাই, তাহার সাক্ষী—য়ুরোপের সোশ্যালিষ্ট ও অ্যানার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের আন্দোলন। বর্ণভেদ প্রথা যে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু যে মূলতত্ত্ব হইতে বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি সেই মূলতত্ত্বটি নিজে ন্যায়ানুমোদিত এবং তাহার পরিণামও মহৎ ও বহুফলপ্রসূ। সভ্যতা-সমূহের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু মানুষ সেই মানুষই থাকিয়া যায়। শব্দের পরিবর্ত্তন হইতে পাবে, কিন্তু তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রাহ্মণ্যিক ভাবতে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু হইলেও, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী; ঊনবিংশতি শতাব্দীর য়ুরোপে, ধনপতিই প্রভু,—পাণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীও নহে। "ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—" আজিকার দিনে সৈনিকতার (militarism) এক-শেষ, অসির শাসনতন্ত্র, ন্যায় ধর্ম্মের উপর বলের প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বৈশ্যের স্থান বড় বড় কারখানাওয়ালারা অধিকার করিয়া, তাহাদের মূলধনের চাপে ক্ষুদ্র বণিক-দিগকে নিষ্পেষিত করিতেছে। এখনকার শূদ্র—শ্রমজীবী, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া, উত্থান করিয়াছে ও Socialism-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনকার চণ্ডাল, পারিয়া, সেই দরিদ্রগণ যাহারা ন্যায় বিচার পায় না, সেই আইরিশ্ লোক,—নিজ ভিটা-ভূমির উপর যাহাদের কোন অধিকার নাই—যাহারা একপ্রকার রাষ্ট্রিক মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে যাহারা তপ্ত-লোহার ছ্যাঁকা-দেওয়া দাগী গোলাম! মনুর সমস্ত নীতি-উপদেশ অনুসারে, নিক্তির ওজনে কাজ হইত না সত্য, কিন্তু একথাও নিশ্চিত, যে জাতি ওরূপ উচ্চ রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধার্ম্মিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাহাদের সেই কল্পনাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার সাক্ষ্য দিতেছে। কোন্ রাজা কিংবা কোন্ পার্লেমেণ্ট আজিকার দিনে ব্যবস্থা সংস্কারের নেতৃত্ব সাহসপূর্ব্ব গ্রহণ করিতে পারে?—জুয়া খেলা ও কপাল-ঠোকা বাজির খেলা নির্ভীকভাবে নিষেধ করিতে পারে? মনু কিন্তু তাহা করিয়াছেন। আমাদের ব্যবহার-চরিত্রও দূষিত হইয়া পড়িয়াছে; কাঞ্চনের প্রলোভনে আমাদের রাষ্ট্রশাসক লোকেরা, আমাদের লেখকেরা, আমাদের শিল্পীরা, আমাদের পাদ্রিরা, আমাদের অভিজাত-বর্গ, নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখন বাকী রহিল শিল্পকলা; এবিষয়ে একটু তারতম্যের বিশেষত্ব আছে। পুরাকালে, বাস্তুশিল্প বিষয়ে,—মিসর, আসীরিয়া, ও গ্রীশের সর্ব্বপ্রধান আসন ছিল, এখনও উহাদের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ছুঁচাল খিলানের শিল্প ছাড়া, পাশ্চাত্য খণ্ড, এই বিষয়ে কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, কেবলই দাসবৎ নকল করিয়াছে। ভাস্কর-কর্ম্মে গ্রীকেরা চিরকালই আমাদের শিক্ষাগুরু; গ্রীক্‌দের ও এত্রুরিয়া-বাসীদের মৃণ্ময় পাত্রাদি আমাদের নিকট বিশেষ প্রশংসার জিনিস। তবে, আমাদের শ্রেষ্ঠতা (ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে) সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উন্নতি সাধনে; কেবল এই বিষয়েই নিজত্ব ও নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়া আমরা পুরাতন জগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধার সহিত উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ইহাই তুলনাসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত চিত্র। অবশ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান-রাজ্যের বড় বড় আধুনিক আবিষ্কার সকল, আমাদের প্রধান সম্বল ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক, কিন্তু আসলে উহাদের মূল কোথায়? ন্যায়তঃ যাহার যে প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত: অতএব প্রাচ্যখণ্ডকে ভাল করিয়া বুঝিলে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, প্রাচ্য খণ্ডই সেই সূর্য্য যেখান হইতে আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কুলপতির ন্যায় প্রাচ্য-ভূমিকে আমাদের ভক্তি করা উচিত, যেহেতু আমরা তাঁহারই বংশধর। একথাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই, যে সময়ে আমরা পশুচর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া, য়ুরোপের বিস্তীর্ণ অরণ্যে, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই সময়ে প্রাচ্যখণ্ড, সভ্যতার দীপ্ত আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"হারামণির অন্বেষণ"।*

(সার সংকর্ষণ ও সমালোচনা।)

'হারামণির অন্বেষণ' নামক একখানি পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। গ্রন্থকার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি যে কেবল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেই পারদর্শী তাহা নহে, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রেও ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এবং ইনি নিজেও একজন দার্শনিক। সুতরাং ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে ইনি যাহা বলেন তাহাই মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

গ্রন্থকার একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। লোকে পাছে তাঁহার মত পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে না পারে এইজন্য তিনি "অদ্বৈতবাদের সমালোচনা" নামক গ্রন্থে আপনাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা পাঠকগণকে এই 'সমালোচনা' পাঠ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। পুস্তকখানি স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত, জ্ঞানগর্ভ এবং অতি উপাদেয়। 'হারামণির অন্বেষণ' অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে যদি পাঠকগণ এই 'সমালোচনা'খানি পাঠ করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে গ্রন্থকারের মতামত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থখানি এতই উপাদেয় হইয়াছে যে ইহার সার সংকলন করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিতেছি এবং যে যে স্থল অস্পষ্ট আছে সেই সেই স্থল সুস্পষ্ট করিবার জন্য 'সমালোচনা' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব।

গ্রন্থে (১) কি আছে ও কি চাই, (২) ব্যক্তাব্যক্ত রহস্য, (৩) ত্রিগুণ রহস্য, (৪) দ্বন্দ্ব রহস্য এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(১)

কি আছে? কি চাই? ইহার উত্তর 'আছে সত্য—চাই মঙ্গল'। "সত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই -সুতরাং সত্য আপনিই চা'ন, সত্য আপনাকেই চা'ন, সত্য আপনি আপনাকে পা'ন, সত্য আপনাতে আপনি বিহার করেন—এই সত্যই মঙ্গল"।

কথার ভাবে মনে হইতেছে পরমাত্মাই সব তবে জীবাত্মার স্থান কোথায়? জীবাত্মারও স্থান আছে; কারণ "সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা জীবাত্মা লইয়াই একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্য"। পৃঃ ৬৩। কথাটা কিছু অস্পষ্ট সেই জন্য "অঃ সঃ" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল:—

"দ্বৈতাদ্বৈত বাদই আমার সমগ্র মত; প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তা ছাড়া অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অদ্বৈতবাদী; দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। যে অদ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈত হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন হস্তের ন্যায় নির্জ্জীব, শুষ্ক এবং অকর্ম্মণ্য'। পৃঃ ৪৫। 'ঈশ্বর দ্বৈতাদ্বৈত মতের কেন্দ্র স্বরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ। সূর্য্যের যেমন করাবলী, কেন্দ্রের তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি আত্মপ্রভাব, পরমাত্মার তেমনি ঐশী শক্তি। প্রাজ্ঞ জীবমণ্ডলী পরিধি স্বরূপ এবং এক একটী প্রাজ্ঞ জীব এক একটী অরের বহিঃপ্রান্ত স্বরূপ। (চক্রের পরিবর্ত্তে কুণ্ডলীর বা আবর্ত্তের উপমা দিলে আরো ঠিক হইত। কেননা কুণ্ডলীর বেষ্টন পথের যে কোনো স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া—একদিক দিয়া চলিলে আবর্ত্ত মুখে পতিত নৌকার ন্যায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়—আর একদিক দিয়া চলিলে কেন্দ্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয়। চক্রের বেষ্টন রেখাস্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী, কিন্তু কুণ্ডলীর বেষ্টন রেখাস্থিত বিন্দু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে, কেহ বা অল্পদূরে অবস্থিতি করে। এই জন্য জীবগণের উত্তমাধম শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুণ্ডলীর দৃষ্টান্ত সবিশেষ উপযোগী। যাহাই হউক্-আমার বর্ত্তমান মন্তব্য কথা বুঝাইবার পক্ষে চক্রের উপমাই যথেষ্ট।) অরাবলী—কেন্দ্র এবং পরিধির ব্যবধান ও বন্ধন দুয়েরই সম্পাদক;- প্রকৃতি একদিকে তমোগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া রাখিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সত্ত্বগুণ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবেশ্বরের মধ্যে বন্ধন ঘনীভূত করে। সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রকে গণনা হইতে বর্জ্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপরেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন অরাবলীকে মায়াবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।...অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাভেদ সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রকৃতিকে একবারেই নস্যাৎ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী একদিকে বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ, আর একদিকে বলেন যে তিনি মায়ারূপে উপাধিতে অধিরূঢ় হইয়া ঐশী শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি একান্ত পক্ষেই শক্তিহীন হ'ন তবে তিনি কিরূপে মায়াতে অধিরূঢ় হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হইবেন। আর, যদি বল যে, গোড়া হইতেই নির্গুণ ব্রহ্ম 'স্বগুণৈ র্নিগূঢ়ং' আপনার গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই সগুণ ব্রহ্ম সমগ্র সত্য—নির্গুণ ব্রহ্ম বীজ সত্য। এপিট ওপিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এপিটে লিখিতেছি তখন এপিটই দেখিতেছি কিন্তু তাহা বলিয়া একথা বলিতে পারিনা যে এই কাগজের এপিট আছে ওপিট নাই; কেননা যদি ওপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তি-সমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তথাপি সেই মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে পারিনা কেননা তখন স্বয়ম্ভু পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।" পৃঃ ৬০-৬৩। "যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন-- তবে তাহার উত্তরে আমি বলি, এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্ব, প্রতিবিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড় দ্বারা একমেটে করিলেন; এবং জীবচৈতন্য দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি, তাহা থাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান"। পৃঃ ৪২।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থকারের দর্শনে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্থান আছে। পরমাত্মা নিত্য সত্য এবং জীবাত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ও পরমাত্মারই অঙ্গীভূত এই জন্য জীবাত্মাও সত্য। গ্রন্থকার বলিতেছেন হে মানব "আমি কেমন করিয়া বলিব তুমি সত্যের কেহই না, বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি ত আর অসত্য নহ, তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান। তুমি যদি অসত্য হইতে তবে

* হারামণির অন্বেষণ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক S. K. Lahiri & Co., 54, College Street, Calcutta. মূল্য চারি আনা মাত্র।

কে তোমাকে পুছিত?' তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই হ'ক, আমার নিকটই হ'ক আর 'তৃতীয় ব্যক্তির নিকটেই হ'ক, যাহার নিকটই হ'ক প্রকাশ পান তিনি সত্যেরই নিকটে,-আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকট আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি।"

ইংরাজীতে Appearance এবং Reality নামক দুইটী কথা আছে। Reality=সত্তা, Appearance=প্রকাশ। কিন্তু Appearance কথাটী বড়ই হেয় হইয়া পড়িয়াছে কেবল ইউরোপে নহে--ভারতবর্ষেও। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে 'আভাস' বা 'অবভাস' বলা হয় তাহাই Appearance। কথাটা এই —সত্তার প্রকাশ হইলে যেন 'সত্তা'র আর 'সত্তাত্ব' থাকে না। 'সত্তা' অর্থাৎ সত্য যেন অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ। অন্দরেই ইঁহার চির বসতি; বাহিরে উনি কখন দেখা দেন না। দিলেও স্বরূপে নহে- বস্ত্রাবগুণ্ঠিত 'কিস্তুত কিমাকার' বেশে গুটিপোকার গুটিরূপে। সত্যের প্রকাশ যেন অসম্ভব --পেচকরাজের ন্যায় সত্য যেন চিরদিনই অন্ধকারে বিরাজমান। ক্যাণ্ট (Kant) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন Noumena কখন প্রকাশিত হন না। বেদান্তেও তাহাই। এই জগৎ এবং এই মানবের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়--অর্থাৎ এই বহির্জ্জগৎ ও এই অন্তর্জগৎ এই দুইটাই জ্ঞানলাভের উপায় অথচ এ দুইটাই অবিদ্যামূলক। এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? বেদান্তে আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সত্য কথা কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে মানবের আত্মাও অবিদ্যাগ্রস্ত। সুতরাং এই আত্মা যে বিষয়েই যে সিদ্ধান্ত করুক্ না কেন, সেই সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক হইতে পারে। যদি কেহ বলেন 'নির্ম্মল আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন' এ সিদ্ধান্তও গ্রহীতব্য নহে। কারণ এ সিদ্ধান্তও মানবাত্মারই সিদ্ধান্ত। মানবাত্মাই যখন অবিদ্যাগ্রস্ত তখন তাহার সিদ্ধান্তের মূল্য কি? প্রকৃত কথা এই বেদান্তের 'অবিদ্যাবাদ' গ্রহণ করিলে ব্রহ্মবিষয়ে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এই জগৎ অবিদ্যামূলক নহে -ইহা ব্রহ্মেরই। ইহা অবিদ্যার খেলা নহে 'রজ্জু সর্প' নহে — ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আমাদের গ্রন্থকারও এই মতই পোষণ করেন। ব্রহ্মের প্রকাশ বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—"সত্য যদি কস্মিন্ কালেও কাহারো নিকটে প্রকাশিত না হ'ন, না আপনার নিকটে না অন্যের নিকটে, কাহারো নিকটে কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনো কালে যে প্রকাশিত হইবেন মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে; তাহা হইলে 'সত্য আছেন'—কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে আছেন তাহা কে বলিল? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর তবুও যদি তুমি বলো 'সত্য আছেন', তবে তোমার সে কথার মূল্য এক কাণা কড়িও নহে।"

২। ব্যক্তাব্যক্ত রহস্য।

"যে চেতন আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে লুকাইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না.—আমাদের স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনাবশে ছিন্ন ভিন্ন ভাবে ছুটিয়া বাহির হয়, আবার জাগরণ কালে সেই চেতনই অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত চিদাকাশে ঈশনার (...বলবতী ইচ্ছার) জয় পতাকা উড্ডীয়মান করে।...প্রথমাবস্থার অব্যক্ত চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রাণ; মাঝের অবস্থার অৰ্দ্ধস্ফুট চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম মন; তৃতীয় অবস্থার সুব্যক্ত চেতনের নাম জ্ঞান"। "মনোবৃত্তি মাত্রেই—জ্ঞান, মন এবং প্রাণ তিনই —এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে কোথাও বা জ্ঞানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা মনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা প্রাণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। যেখানে জ্ঞানের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই জ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মোটামুটি জ্ঞান শব্দের বাচ্য, যেখানে ইচ্ছা বা মনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব সেখানে সেই মনঃপ্রধান অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মোটামুটি মনঃ শব্দের বাচ্য, আর যেখানে প্রাণের বা অব্যক্ত সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব সেখানে সেই প্রাণপ্রধান, অন্তঃকরণ বৃত্তিই মোটামুটি প্রাণ শব্দের বাচ্য"।

আত্মার এই তিনটী অবস্থার যে তিনটী নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্তই গা'জুরি বলিয়া মনে হয়। এই মত সমর্থনের জন্য কোন প্রকার যুক্তি দেওয়া হয় নাই। স্বপ্নাবস্থাতেই যে মনের অধিকতর স্ফূর্ত্তি এ কথাটা নিতান্তই অযৌক্তিক। বরং ইহা বলাই সঙ্গত যে স্বপ্নে জ্ঞান ও মন উভয়ই অৰ্দ্ধস্ফুট অবস্থায় কার্য্য করে এবং জাগ্রতাবস্থাতে উভয়েরই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা, যে সমুদয় মনোবৃত্তির সাহায্যে স্বপ্নজগৎ রচনা করে, জাগ্রতাবস্থায় তাহার প্রত্যেক বৃত্তিই সুব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান (Psychology) এই কথাই বলিতেছে। গ্রন্থকারও প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন; কারণ তিনি বলিয়াছেন যে জাগরণ কালে সেই চেতনই ঈশনার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে। এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনার বশীভূত হয়। প্রভুত্বপ্রধান (অর্থাৎ প্রবলা) ইচ্ছার নাম ঈশনা এবং অধীনতাপ্রধান (অর্থাৎ অবলা) ইচ্ছার নাম বাসনা। আবার গ্রন্থকারের মতে ইচ্ছা—মন। জাগ্রতাবস্থায় ঈশনার প্রভুত্ব এবং স্বপ্নাবস্থা বাসনা ক্ষেত্র। সুতরাং বলা হইতেছে যে জাগ্রতাবস্থায় মন প্রবল এবং স্বপ্নাবস্থায় মন দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সুতরাং কি করিয়া বলিব যে স্বপ্নাবস্থাতে মন অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করে?

৩। ত্রিগুণ রহস্য।

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো ও তমো, এই তিন গুণের ক্রীড়াক্ষেত্র। সত্ত্ব গুণ প্রকাশাত্মক, রজো গুণ চেষ্টাত্মক এবং তমো গুণ প্রতিবন্ধকাত্মক। এখানে প্রথম বক্তব্য এই যে নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন দীপালোক পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেমি প্রকাশ পরিস্ফুট হয়। আবার রাত্রিকালে শয়ন ঘরের প্রদীপ নিভিয়া যাইবার সময় বিগত আলোকের প্রতিযোগে যেমন আগত অন্ধকার পরিস্ফুট হয় তেমি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ পাইয়া উঠে'। 'অতএব এটা স্থির যে প্রকাশের সঙ্গে কোনো না কোনো অংশে অপ্রকাশের অঞ্জন বা বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়া থাকা চাই ই চাই, তাহা নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে পারেনা'। 'দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে সবগুণই যেমন ক্রিয়ার ফল, প্রকাশ ও অপ্রকাশ গুণও তাই। যাহা প্রকাশ পায়, তাহা ক্রিয়া যোগেই প্রকাশ পায়; যাহা অপ্রকাশ হয়, তাহা কর্ম্মোদ্যম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের আপাদ মস্তক সবটাই যদি এক উদ্যমেই প্রকাশ পাইয়া চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একাই যে কেবল ঘুচিয়া যায় তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে প্রকাশের প্রকাশত্বও ঘুচিয়া যায়।...প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রিয়াশক্তির উদ্দাম প্রকাশ পায়; প্রকাশের তিরোভাবে ক্রিয়াশক্তির সংযম প্রকাশ পায়; আবির্ভাব, তিরোভাব ভাবাভাবেরই ওলোট্-পালোট্; অভাব হইতে ভাবে উত্থান করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নাবিয়া পড়িয়া অভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব।" সুতরাং 'দেখা যাইতেছে প্রকাশ গুণের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটা গুণ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটা হচ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী

ড়তা গুণ এবং আর একটা হচ্চে শক্তির প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সাপান্নরূপী ক্রিয়া গুণ।"

সুব্যক্ত চেতনক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অর্দ্ধস্ফুট চেতন-ক্ষেত্রে রজোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব এবং অব্যক্ত চেতন-ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিন গুণ একসঙ্গে বাস করে এবং একসঙ্গে কাজ করে; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ আর দুইগুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের মাথা হইয়া দাঁড়ায়। রজোগুণের ক্ষেত্রে রজোগুণ অপর দুই গুণকে দাবিয়া রাখিয়া বল প্রকাশ করে। তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রে তমোগুণ অপর দুইগুণের উপরে প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। একসঙ্গে থাকে সবাই সর্ব্বত্র; তবে কি না কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার পায়ের নীচে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাথার উপরে, কোথাও বা কেহ কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাঝের জায়গায় আসন পাড়িয়া বসিয়া যায়। যেখানে যেগুণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করে, সেখানে সেই গুণেরই নাম কীর্ত্তিত হয়, অপর দুইগুণ গণনার মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়।"

এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন তাঁহারা বলেন 'মূল প্রকৃতি এক প্রকার জড়ধর্ম্মী ক্রিয়াশক্তি - তমঃপ্রধান রজোগুণ'। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন প্রকৃত কথা তাহা নহে 'মূল প্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী ঐশী শক্তি। মূল প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো; যেহেতু তোমার আমার মুখের কথায় প্রকৃত সত্যের কিছুই আসে যায় না—কিন্তু এটা অবশ্য তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যে অজ্ঞান তাহা জ্ঞানভরা অজ্ঞান। তার সাক্ষী পশুপক্ষীরা যখন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাদের সব কাজই পাকা পোক্ত জ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয়। বলিতে পারো যে, মৌমাছি স্ব স্ব প্রকৃতির অন্ধ উত্তেজনায় শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদর পূর্ত্তি করিবার জন্য মধু সঞ্চয় করে; কিন্তু এটাও তো তোমার দেখা উচিত যে, তাহাদের সেই নিজের নিজের অন্ধ প্রকৃতির ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল প্রকৃতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে; সেই বিশ্বব্যাপিনী মূল প্রকৃতি মৌমাছির মধু সঞ্চয়ের ছদ্মবেশে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু চলাচলি করিতে থাকে আর সেই গতিকে ফুলের গর্ভসঞ্চার হইয়া পুষ্পবৃক্ষের বংশ যুগযুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে। মৌমাছির নিজের অন্ধ প্রকৃতির সহিত ফুলের মধুর শুদ্ধ কেবল ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ; মূল প্রকৃতির স্পর্শমণির সংস্পর্শে সেই ভক্ষভক্ষ্যক সম্বন্ধ রক্ষ্যরক্ষক সম্বন্ধরূপে পরিণত হইতেছে - ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণের দেখা কথা। মৌমাছি সচেতন জীব, আর, পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ, এরূপ অবস্থায় পুষ্পবৃক্ষের বংশরক্ষার জন্য মৌমাছির এত মাথা-ব্যথা কেন? ফলকথা এই মাথাব্যথা মৌমাছির নহে-- মাথাব্যথা মূল প্রকৃতির। উদ্ভিদ্‌প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতির মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে মূল প্রকৃতির কাছে সে বৈষম্য মূলেই নাই। মূল প্রকৃতি ঈশ্বরা-ধিষ্ঠিতা ঐশী শক্তি সুতরাং জ্ঞানময়ী।"

ত্রিগুণের সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ তাহা 'অদ্বৈতবাদের সমালোচনা' গ্রন্থে অতি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সে অংশ উদ্ধৃত হইল :--"ঐশী শক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ এবং বিচেষ্টা এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে, সে প্রতিবন্ধক তাঁহার ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম··· জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ স্ফূর্ত্তি তাঁহার আপনারই নিয়মের অধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছার স্বীয় চেষ্টা বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে তিনি কাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে? শরীরের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়, সর্ব্ব-জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয় – সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহা-কাশের ন্যায় অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর অপনার সমগ্র ভাব কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ করিবেন? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে পারা অসম্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্তভাব প্রকাশ না করিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্ব্বিপত্তি এবং অশান্তি হইতে শান্তির দিকে যথাক্রমে ও যথানিয়মে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু আবার ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্ব্বজয়ী যে, অজ্ঞানকে দমন করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই— পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই নানা প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই। কেন না ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি? না জীবাত্মার বুদ্ধিস্থ জ্ঞানালোক; কেন না জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি? না তমোগুণ। তমোগুণ কি? না ঈশ্বরের আপন ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম ঈশ্বরের হস্তের রাশ; কেন না ঈশ্বরের প্রকাশ স্ফূর্ত্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেনা। এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশী শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা তাই ত্রিগুণাত্মিকা।" পৃঃ ৬৪-৬৬।

(৪) দ্বন্দ্ব রহস্য।

এই প্রকরণে সমাধির কথা বলা হইয়াছে। "মনঃ সমাধান করিলে যাহা বুঝায় তাহাই সমাধি। গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গার সর্ব্বস্ব তেমনি মানস বলিয়া একটা মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সার-সর্ব্বস্ব। মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন, একই। এই মানস সরোবরের দুই পার। এক কূলে প্রাণ, অপর কূলে জ্ঞান। মানস সরোবরের জ্ঞানর্ঘ্যাসা কিনারাটী প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা 'পাওয়া-প্রধান' ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা; আর মনের যে যায়গাটী প্রাণের কূল ঘেঁসিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস সরোবরের সেই প্রাণর্ঘ্যাসা কিনারাটী অভাবাত্মক বা অধীনতাপ্রধান, বা 'চাওয়া-প্রধান' ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী উপদ্বীপ আছে, সেইটীর নাম সমাধি উপদ্বীপ। সমাধি উপদ্বীপের মাঝখানে একটী ফোয়ারা আছে, সেই ফোয়ারাটীর চারিধারে একটী পদ্মবন-সুশোভিতা পুষ্করিণী আছে। ফোয়ারা এবং পুষ্করিণীর জলের আদান প্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই। পুষ্করিণী বারাবর ফোয়ারাতে জল সঞ্চার করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে এবং বারান্তরে ফোয়ারার জলে ভরাট হইয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীটির নাম হৃৎপদ্মিনী এবং ফোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস। জ্ঞানের-পাওয়া (অর্থাৎ ঈশনা) এবং প্রাণের চাওয়া (অর্থাৎ বাসনা) মানস সরোবরের চখাচখী। বিচ্ছেদের সময় চখা এপার হইতে (প্রাণের কূল হইতে) ডাকাডাকি করে, চখা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে, সাড়া দ্যায়। মিলনের সময় চখা এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং চখা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া সমাধি উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে একত্রে মিলিত হয়; আর অম্নি আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। চাওয়া ও পাওয়ার (অর্থাৎ বাসনা ও ঈশনার) বিচ্ছেদ মিলনের এই যে রহস্য ইহারই নাম দ্বন্দ্ব রহস্য।"

যিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের প্রস্রবণ তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ প্রস্রবণ। এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্তা ভিন্ন আর কিছুতেই মনুষ্যের সমগ্র জ্ঞান মন প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেনা। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে; আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে, 'নাই' শব্দই সেখানে নাই। তাঁহারই একতমা শক্তি যাহা আমাদের স্বশক্তিরূপিণী সেই অহমাত্মিকা অপরা শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং আর যে শক্তি সেই দিব্যাপরা শক্তি আমাদের মন হইতে যাহা ভ্রম প্রমাদ মোহের নিবিড় অন্ধকার সরাইয়া দিবে, সে শক্তি তাঁহারই শক্তি। সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং, সে শক্তি জগতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে; ভূগর্ভে অগ্নিরূপে কার্য্য করিতেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্য্য করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধিরূপে কার্য্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতিরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষেরা সেই শক্তিরই ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতেন, তাঁহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে 'সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ যাহা ভূ-ভূর্ব-স্ব-রূপী বিশ্ব ভুবনের সার সর্ব্বস্ব—সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি- তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আমাদের জ্ঞানের সম্মুখ হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে।—সে আড়াল আর কিছুই না কেবল আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ঘুমের ঘোর এবং বাসনার স্বপ্ন—তাহা সরিয়া গেলে—। সাক্ষাৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ, জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি এবং আর যাহা কিছু আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে- আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবেনা। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিব যে হারামণি আমাদের অন্তরতর আমি, তোমার আমার- চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম আমি; তাহা হারাইবার জিনিষই নহে। তখন দেখিয়া আমাদের আনন্দ ধরিবেনা—যে, যাহার জন্য আমরা বৎসহারা গাভীর ন্যায় সারা রাজ্যে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলাম তাহা কোথাও যায় নাই, তাহা আমাদের নিকট হইতে নিকটে হাতের মুঠার মধ্যে; আত্মা তিনি, প্রাণ তিনি, জ্ঞান তিনি, আনন্দ তিনি।"

সংক্ষেপে ইহাই গ্রন্থকারের মত। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি—আশা করি পাঠকগণও প্রীত হইবেন।

আমরা এক অর্থে ব্রহ্ম হইতে পৃথক, অন্য অর্থে অপৃথক। প্রাণ, মন, জ্ঞানাদি সমুদয়ই আত্মা, কিছুই আত্মার বহির্ভূত নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তিসমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম। তিনি জ্ঞানময় ও প্রেম স্বরূপ। এ জগৎ তাঁহারই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির পরিচয়। ইত্যাদি মতের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু গ্রন্থকারের দুই একটী মত নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতেছে। স্বপ্নান্ত চৈতন্যকে মন বলা হইয়াছে। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে এই মনই সমাধির স্থল। তবে কি সমাধি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অস্ফুট চৈতন্য? এমত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। সমাধি জ্ঞানের নিম্ন ভাগে নহে।

গ্রন্থের আরও দুই একটী ত্রুটী আছে। প্রথমতঃ 'হারামণি' নামটী উপযোগী হয় নাই। আমি কি পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত চাহিয়া জ্ঞান দ্বারা লাভ করিয়াছিলাম? তাহার পর কি এই মণি হারাইয়াছি? ইহা যদি না হয় তবে 'হারামণি' নামের উপযোগিতা কোথায়? দ্বিতীয় ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। গ্রন্থকার বহুস্থলে কলিকাতার অপভাষা ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। এ সমুদয় ত্রুটী সত্ত্বেও গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিবাহবৈচিত্র্য।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কচিছেলেরাই ঠাকুরমার মুখে তাহার ভবিষ্যতের রাঙ্গা বউ ও বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে ঘুমাইয়া পড়ে। বিবাহের প্রতি মানুষের রক্তের টান; কাজেই অমন সুমিষ্ট কথা—কেবল বালক কেন, কবি দীনবন্ধুর রাজীব মুখোপাধ্যায়ও শুনিতে ভালবাসেন। অন্যদেশের ছেলের বিবাহের কথায় ঘুম পায় কিনা, জানি না; কিন্তু পেঁচোর মা যত নিন্দা রটাইলেও অনেক নামজাদা দেশের বুড়াও সুবিধা পাইলে বিবাহের উদ্যোগ করিতে ছাড়ে না। ক্ষুধা এবং প্রেম, এই দুইটি স্তম্ভের উপরই সমাজের স্থিতি; কাজেই আহার এবং বিবাহে বৈরাগীরও বৈরাগ্য হয় না।

আহার এবং প্রেম সমাজবন্ধনের মূলে; কাজেই নর-সমাজের সর্ব্বত্রই বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। মানুষের যখন সমাজতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিবার বয়স হয় নাই, বিবাহাদি অনুষ্ঠানের ইতিহাস আবিষ্কারের ক্ষমতা জন্মে নাই, তখনও মানুষে এক একবার ভাবিত, যে বিবাহ প্রথাটা কেমন করিয়া জন্মিল, এবং ঐ প্রথা না থাকিলে চলিতে পারিত কি না। সৃষ্টির একটা তত্ত্ব খাড়া করিতে হইলে যেমন ধরিয়া লইতে হয়, যে এক সময়ে কিছুই ছিল না; এবং তার পর কারণ জানিলে যা হোক একটা কিছু ঘটিল; তেমনি বিবাহের একটা তত্ত্ব গড়িতে হইলেও প্রথমে উহা ছিল না বলিয়াই লোকে কল্পনা করে। তাই মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, যে এক সময়ে রমণী স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, পরে ঘটনাবশে শ্বেতকেতু বিবাহের আইন জারি করিয়া দিলেন। মিসর এবং মহা-চীন ভারতের মত প্রাচীন দেশ; সে দেশেও শ্বেতকেতুর স্থলে যথাক্রমে মেনেস্ এবং ফাউ-হির উদ্ভাবনার কথা শুনি।

স্বেচ্ছাচারের পর বিবাহ, একথা মেক্‌লিনেন্, লাবক্, লিতর্নো প্রভৃতি একালের সমাজতত্ত্ববিদেরাও কতকগুলি কুপরীক্ষিত ঘটনা-অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। এই সমাজ-তত্ত্বজ্ঞদিগের মত অনুসরণ করিয়া আমি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রেমবিকাশ নামক কবিতা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ফিন্-

লাণ্ডের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ওয়েষ্টারমার্কের সযত্ন বিচারে ব্যভিচারটা নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই তাঁহার উপপত্তি * যথার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। যে সকল তর্কে ও দৃষ্টান্তে ঐ উপপত্তি উপস্থাপিত, তাহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে,—বিবাহ প্রথা কেমন করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিল, তাহাও জানিবার পূর্ব্বে, একালে যত রকম বিবাহ আছে তাহার সহিত পরিচয় লাভ করার প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই ঋষি জাবাল নহেন; বানরসদৃশ অতি পূর্ব্বপুরুষেরাও বিবাহে বদ্ধ হইত, এ সংবাদটা ভাল।

কত রকমের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে পারিলে যে সমাজে যে বিবাহ আছে সেই সমাজের ইতিহাস এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বিবাহের প্রকৃতি এবং বিকৃতির সমালোচনা করা চলে। দৃষ্টান্ত বিদেশী হইলে এদেশের পাঠকদের পক্ষে ঘটনার কিম্বা উপপত্তির সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য কেবল ভারতবর্ষের আর্য্যেতর জাতির বিবাহ বৈচিত্রের-কথা বলিব। আশাকরি একালের শিক্ষিতেরা অনার্য্যের বিবাহসভায় উপস্থিতির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবেন না।

বঙ্গদেশে বহুশ্রেণীর অনার্য্য জাতির বাস; কিন্তু উহারা এখন সম্পূর্ণ রূপে আপনাদের প্রাচীন প্রথা পদ্ধতি পরিহার করিয়া, আর্য্যাদিগের সকল অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে। কাযেই খাঁটী বঙ্গদেশে অনার্য্য বিবাহ প্রথার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে না। ওড়িষা প্রদেশেও আর্য্যসমাজ-ভক্ত অনার্য্যেরা দুচারিটি প্রথা ভিন্ন সকল বিষয়েই আর্য্য প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা করে নাই, তাহারা, প্রায়শঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্য্যের গণ্ডির বাহিরে বাস করে।

ওড়িষা এবং গঞ্জামের আরণ্য এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে কন্দ জাতি এখনও, বিবাহপ্রথায় প্রাচীনত্ব বজায় রাখিয়াছে। আর্য্যের স্মৃতি শাস্ত্রে যাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে তামিল ভাষায় সেই প্রকার বিবাহ প্রথার নাম ইরুরাকধন্। কন্দদিগের মধ্যে এখন বিবাহের পূর্ব্বে সম্বন্ধ স্থির করা প্রথা হইয়াছে, এবং পাত্রীর সুলভতার অভাবে "গস্তি" বা শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাচীন স্বাধীন ভাব দূর হয় নাই এবং এখনো রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত আছে। অনুষ্ঠান গুলির আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রণ, পাঠকেরা নিজে দেখিয়া লইবেন; আমি কেবল একটি একটি করিয়া বিবাহ প্রথার বর্ণনা করিব।

কন্দ বিবাহ।

কন্যা বয়স্কা না হইলে বিবাহ হয় না, কিন্তু বিবাহ স্থির করিবার ভার সাধারণতঃ পিতামাতার উপর। কন্যার মূল্যের জন্য অবস্থা বিচারে কোন একটি দ্রব্য "গস্তি" স্বরূপে দিতে হয়; যথাঃ একটি মহিষ কিম্বা একটি শূকর কিম্বা একখানি পিতলের পাত্র। সকল অনার্য্যদের মধ্যে গোত্র ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; এই গোত্র পরিচয় এখানে দিতে পারিব না। কন্দদিগের গোত্র প্রায়শঃ "মুতা" বা গ্রামসীমায় বদ্ধ থাকে। আপনার "মুতা"য় বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কন্যার বিবাহ পিতৃগৃহে হয় না। কন্যার মাতুলের ঘাড়ের উপর চড়িয়া কন্যাকে বরের গ্রামে যাইতে হয়; এবং কন্যাযাত্রী কেবল গ্রামের যুবতীরাই থাকে। বাজনা বাজাইয়া এবং মামা-ঘোড়ার কাঁধে চড়িয়া যখন কন্যা বরের গ্রামের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বরের গ্রামের যুবকেরা লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া কন্যা লুঠিতে যায়। অমনি যুবক যুবতী দলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কন্যার পক্ষের যুবতীরা ঢিল পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে এবং বর পক্ষের যুবকেরা লাঠির আঘাতে সেগুলি উড়াইয়া দেয়। এই লাঠিখেলায় বেশ কৌশল আছে; কিন্তু কখন কখন যুবতীর হাতের ঢিল পাথর অনেক বলিষ্ঠ যুবককে কাহিল করিয়া দেয়। লবঙ্গলতার দোলনিতে সমীরণ ললিত হয় শুনিয়াছি, কিন্তু যুবতীর হাতের ঢিল হয়ত বড় ললিত হয় না। যাহা

* Theory কথার বাঙ্গালা উপপত্তিই বেশ। একেলে ন্যায়ের কচ্‌কচি ছাড়িয়া সাহিত্যে উহার অর্থ এইরূপ।—(১) ষষ্ঠ শতাব্দীর কিরাতার্জ্জুনীয়ে reason, ground অর্থে ব্যবহার আছে; যথা—প্রিয়েষু যৈঃ পার্থবিনোপপত্তেঃ। তাহার পর তর্কের সহিত উপস্থাপিত কথাও ঐ গ্রন্থে উপপত্তি; যথাঃ—উপপত্তি মদূর্জ্জিতং বচঃ। (২) সাহিত্য-দর্পণের ৪৮২ কারিকায় কিরাতে ব্যবহৃত শেষ অর্থ আরও পরিষ্কার।

হউক, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে বরের মাতুল আসিয়া কন্যাটি ছিনাইয়া লইয়া বরের ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়।

অনার্য্যদেব প্রথাব প্রভাবে বঙ্গদেশে একটি রীতি জন্মিয়াছে যে, বধূকে মামাশ্বশুরের মুখ দেখিতে নাই। কন্দ সমাজের মামাশ্বশুরের উক্তবিধ কন্যা সংগ্রহের মূলে, এমন কোন লুকান ইতিহাস নাই ত, যাহার জন্য ঐ প্রথার উৎপত্তি? যাহা হউক রাত্রে আহাব, মদ্যপান এবং নৃত্যের পব, প্রেমসম্ভাষণে বর কন্যাব বিবাহ সমাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিবাহ মাতা পিতা স্থির কবেন, কিন্তু পার্ব্বত্য কন্দেরা আপনারাই স্থির কবিয়া থাকে। এক গ্রামেব অবিবাহিত এবং অন্য গ্রামের অবিবাহিতাগণ, যাহাতে পূর্ব্বরাগে উদ্দীপ্ত হইতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা আছে। উভয় গ্রামের বাহিরে একটি ঘরে বহুসংখ্যক কুমার কুমাবী একত্রে রাত্রি যাপন কবে। প্রণয় সঞ্চারের পব বিবাহ স্থির হইয়া গেলে, "গস্তি" প্রভৃতি দিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত মতে বিবাহ হয়।

শবর বা শহরা বিবাহ।

আর্য্যেরা প্রাচীনকালে বিন্ধ্যপ্রদেশের সকল অনার্য্যকেই শবর বলিতেন বলিয়া মনে হয়। সম্বলপুর অঞ্চলের শবরেরা আপনাদের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, এবং অনেক বিষয়েই হিন্দু প্রতিবেশীব প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এখনও শবর এবং গোঁড়েরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ কবে না। ওড়িষায় জগন্নাথ দেবেব ইতিহাসে পাই, যে এই শবরজাতির ঘবেই জগন্নাথ ঠাকুর ছিলেন। যাহা হউক, ওড়িষায় একদল শবর, ঠাকুবের কৃপায় এখন প্রায় ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণিত। গঞ্জাম প্রদেশের শববেরা অনার্য্যত্ব সমান বজায় রাখিয়াছে বলিয়া, তাহাদের বিবাহেব কথাই বলিব। ১৮৮৮ সালের সোসাইটির পত্রিকায় ফসেট্ নামক এক ইংরেজ ইহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

শবর যুবক যুবতীর পূর্ব্বরাগ জন্মে পথে-ঘাটে; কিন্তু বিবাহার্থী বরকে, কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতে হয়। বিবাহার্থী বর, আপনার মনোনীতা পাত্রীর গৃহে, তীর ধনুক, এক হাঁড়ি মদ, এবং এক জোড়া পিতলের খাড়, লইয়া উপস্থিত হয়। কন্যার পিতা আসিয়া বলেন, "বাপু, যদি আরো মদ দিতে পার, তবে তোমার সঙ্গে কথা কহিব।" যাহা হোক, এক হাঁড়ি মদেই সকলকে মুখর করিয়া তোলে। বিবাহার্থী তখন ঘরের চালে তীর বিঁধাইয়া দিয়া কন্যার মাতার হাতে খাড়, পরাইয়া দেয়। তীর বিঁধাইবার অর্থ, ভূতের উপদ্রব নাশ করা, প্রেমশর নিক্ষেপের অভিনয় নহে। ইহার পর বিবাহার্থী আব একদিন পাত্রীর গৃহে যায়; সেদিন কন্যাব পিতা উহাকে দু এক ঘা প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। তাহার পর বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে, বর কয়েকজন যুবক সঙ্গী লইয়া পাত্রীব গ্রামের কোন জলাশয়ের তীরে বসিয়া থাকে। পাত্রী কলসী কাঁকে জল আনিবার ছল করিয়া যায়, এবং বর ও বরযাত্রীরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলাইয়া যাওয়ার অভিনয় কবে। গ্রামেব লোক "ধর ধর" বলিয়া পিছনে ছোটে; কিন্তু ধরে না। ছুটিতে ছুটিতে সকলে বরের গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করে। বিবাহের সময়ে অবিবাহিতা মেয়েরা গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়, সধবাবা কন্যাকে নূতন কাপড় পরায়, এবং গ্রামের যুবকেরা অমঙ্গল নাশের জন্য চাবিদিকে শর পুঁতিয়া দেয়। বিবাহের পর বর কন্যা তীর ছুঁড়িয়া চালে বিঁধাইয়া গৃহে প্রবেশ করে।

মালজাতির বিবাহ।

গোদাবরী জেলায় মালজাতিব মধ্যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কন্যাহরণ প্রচলিত আছে। যুবতী কুমারীকে পথে ঘাটে ধরিয়া বাড়িতে লইয়া যে বিবাহ হয়, তাহাতে কুমারীর সম্মতি থাকে না। বিবাহের পর কুমারীর পিতামাতাকে শুল্ক না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, এই পর্য্যন্ত। অল্প দিন পূর্ব্বে, বিদেশী পুলীশ, উহার একটা ঘটনা দণ্ডবিধির অপরাধ মনে করিয়া বরকে ফৌজদারীতে চালান দিয়াছিল। কোইম্বাটুরের ওড্ডে এবং উরালি জাতির মধ্যে এই প্রকার বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাদাগা বিবাহ।

নীলগিরির বাদাগা জাতির বিবাহার্থী প্রথমে গ্রামের লোককে জানায়, যে যদি অমুক কুমারীকে সে বিবাহ করিতে না পারে, তবে সে আত্মহত্যা করিবে। গ্রামের লোকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গিয়া কুমারী চুরি করিয়া আনে; বলা বাহুল্য যে কেহ বাধা দেয় না।

গদবা বিবাহ।

বিজগাপত্তনের গদবা জাতির বিবাহের রীতি এই, যে বিবাহ প্রস্তাবের পর বরকন্যাকে একটি জঙ্গলে যাইতে হয়। কন্যাটি সেখানে একখানা কাঠে আগুন ধরাইয়া বরের গায়ে চাপিয়া ধরে; এ দাহ সহ্য করিয়াও যদি বর চীৎকার না করে, তবে বিবাহ হয়; নচেৎ নহে। হাড় জ্বালাইবার পূর্ব্বেই কুমারীরা যে এই অনুষ্ঠান করেন, সেটা ভাল। হইতে পারে যে কন্যার অভিরুচি অনুসারে এই দাহ-প্রক্রিয়া কোথাও অল্প হয়, কোথাও বা চীৎকার করাইবার জন্য বেশি মাত্রায় হয়।

পল্লন বিবাহ।

পল্লনেরা তামিল-কৃষক। বিবাহ সভায় বরকে কৃত্রিম অভিমান দেখাইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিতে হয়, "আমি আর সংসারে থাকিব না; এবারে বনবাসে চলিলাম।" কন্যার পিতা তখন আসিয়া বলেন,--"যাক্, বনে গিয়া কাজ নাই; আমার মেয়েটিকে তোমায় দান করিতেছি।" রাগ মিটিয়া যায়; এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। হিন্দুভাবাপন্ন কমসলা জাতির মধ্যেও এই প্রথা আছে; সম্ভবতঃ উহারা মূলতঃ পল্লনের মত কোন জাতি। কমসলা বর একটা ভাঙ্গা ছাতা এবং একটি ঘটি হাতে করিয়া বলে, "আমি ব্রহ্মচর্য্য করিতে কাশী চলিলাম।"

হেগ্‌গড়ে বিবাহ।

কাণাড়া (কর্ণাট) দেশের এই জাতিটার নাম বড় বিদ্‌ঘুটে; কিন্তু ইহাদের বিবাহে একটুখানি কবিত্ব আছে। বরকে কন্যার একটি আংটি চুরি করিয়া পলাইতে হয়। কন্যা বলে, যে চোর তাহার অলঙ্কার চুরি করিয়া পলাইয়াছে। তখন বাড়ীর লোককে "চোরের" অনুসন্ধানে বাহির হইতে হয়। খুঁজিলে ত পাইবেই; যখন চোর ধরা পড়ে, তখন তাহাকে কন্যার সমক্ষে চুরি কবুল করিতে হয়। বিচারে যে সাজা হয়, তাহা আর্য্য-অনার্য্য সকল সমাজেই এক; যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য সকলেই লালায়িত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সিয়ার্-উল্-মুতাখ্খরীন্

এই গ্রন্থ বাঙ্গলার এক অমূল্য ইতিহাস। ইহাতে ১৭০৭ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৌনে এক শতাব্দী কালের অতি সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। আওরাংজীবের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া, মোঘল রাজবংশের দ্রুত অবনতি, বাঙ্গলার নবাবদের স্বাধীনতা অবলম্বন ও ধন-জন-বল-বৃদ্ধি, ইংরাজ বণিকদিগের উন্নতি এবং বঙ্গে রাজার উপর রাজা হওয়া, উত্তরভারত-ব্যাপী মহাযুদ্ধ, এবং শেষে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক ভারতে ইংরাজশক্তি প্রধান ও স্থায়ী করা,-- এই সমস্ত প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ঘটনা ইহাতে যেমন বর্ণিত হইয়াছে এমন আর কোন মূল গ্রন্থে হয় নাই। ইহার রচয়িতা সৈয়দ ঘোলাম হোসেন (আল তবা তবাই আল্ হুসেনী) একজন সম্ভ্রান্ত দিল্লীর মুসলমান। তিনি ও তাঁহার পিতা হেদাএৎ আলি খাঁ বাঙ্গলার নবাবদের রাজ-সভায় অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঘোলাম হোসেন এই ইতিহাসের অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন, এবং আরও অনেকগুলি সেই সেই ঘটনার অভিনেতাদের নিকট শুনেন। (ফারসী গ্রন্থের ভূমিকা)। অনেক ইংরাজ কর্ম্ম-চারীর সঙ্গেও গ্রন্থকারের বন্ধুতা ছিল। সেনাপতি হেক্টর মনরো তাঁহাকে লেখেন "আপনি যদি যোগাড় করিয়া রোহতাস দুর্গ ইংরাজদের হাতে দিতে পারেন তবে আপনার সহিত আমাদের বন্ধুতা আরো বাড়িয়া যাইবে!" (মূল ফারসী বহির ৩৩৮ পৃষ্ঠা)। গুর্গীন খাঁর সঙ্গে তাঁহার কথা-বার্ত্তা ৩০৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজ উভয় পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকায় সেই শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে ঘোলাম হোসেন যেরূপ সুবিধা পান সেরূপ সুবিধা আর কাহারই হয় নাই। সুতরাং সমসাময়িকতা ও মৌলিকতার হিসাবে এ গ্রন্থ অমূল্য।

দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রচুর উপাদান আছে। গ্রন্থকার শাহআলম বাহাদুর শাহ হইতে ৭ জন দিল্লীর বাদশাহের ইতিহাস কতকটা সংক্ষেপে দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সকল অসার অক্ষম রাজ-পুত্তলিকার দীর্ঘ বিবরণ আবশ্যক নহে। তাহার পর আলীবর্দ্দি হইতে বাঙ্গলার নবাবদের বিবরণ এত দীর্ঘ এত সূক্ষ্ম ও বিবিধ ঘটনাপূর্ণ যে তাহা হইতে

ইতিহাস কেন, সমাজের অবস্থা, দেশের দশা, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন, জনসাধারণের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সেই সময়কার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির এক একটি দীপ্ত ছবি পাঠকের মানসপটে আসিয়া পড়ে। ইহার পাশে রিয়াজ্-উস-সালাতীনকে স্কুলের ছেলেদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসারের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া বোধ হয়।

তৃতীয়তঃ ইহা আমাদের দেশের লোকের লেখা দেশের ইতিহাস। আমরা ইংরাজ-লিখিত ইতিহাসই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করি। "অপর পক্ষ" কি বলেন জানি না, জানিতেও চেষ্টা করি না। সুতরাং আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, আংশিক সত্য মাত্র। যে অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাগুলি বঙ্গের—বঙ্গের কেন, সমস্ত ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিল, তাহা তখনকার একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও চিন্তাশীল ভারতবাসীর হৃদয়ে কেমন লাগিয়াছিল একথা বুঝিতে হইলে সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন পড়িতেই হইবে। গ্রন্থকার সরাজ্-উদ্-দৌলার নিমকহারাম কর্ম্মচারীদের নির্ভয়ে নিন্দা করিয়াছেন (ফার্সির ২৩০ পৃষ্ঠা); শুজা-উদ্-দৌলা যে আলস্য ও অসাবধানতায় বক্সারে মুষ্টিমাত্র ইংরাজসেনার নিকট পরাস্ত হইলেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন (৩৩১ পৃঃ); মীর কাসিমের বিবরণে সেই তেজস্বী ও দক্ষ নবাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়াছেন।

অথচ ঘোলাম হোসেন ধর্ম্মান্ধ ক্ষুদ্রচেতা কূপমণ্ডুক ছিলেন না। গ্রন্থের শেষ দিকে মোঘলরাজ্যের অধঃপাতের কারণ, ইংরাজ ও মুসলমান শাসনের তুলনা প্রভৃতি কয়েকটী চিন্তাপূর্ণ অধ্যায় আছে। অতি কম ফার্সি গ্রন্থে এইরূপ ইতিহাসের দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophy of History) দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব কারণে বিজ্ঞ সমাজে এই পুস্তকের বড়ই আদর। গ্রন্থ লেখা হইবা মাত্র বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহার অনুবাদ করাইবার জন্য ব্যগ্র হন।

So valuable was it deemed on its first appearance, that Mr. Warren Hastings became extremely anxious to have it translated into English. *(Briggs's Siyar-ul-Mutakherin*, iv.)

এ অনুবাদ মুস্তাফা নামক একজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ফরাসী রচনা করেন। তাহার পর শিক্ষাসমিতির আজ্ঞায় (by order of the General Committee of Public Instruction) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হাকিম আব্দুল-মজিদ্ কর্ত্তৃক আসল গ্রন্থের এক বৃহদাকার মূল্যবান্ ও সুন্দর সংস্করণ কলিকাতায় মেডিকাল প্রেসে ছাপা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের বিখ্যাত Oriental Translation Fund নামক সমিতির উদ্যোগে কর্ণেল ব্রিগ্‌স্ আর এক ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড বাহির করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

The work is written in the style of private memoirs, the most useful and engaging shape which history can assume; nor, excepting in the peculiarities which belong to the Mahomedan character and creed, do we perceive throughout its pages any inferiority to those of the historical memoirs of Europe. The Duc de Sully, Lord Clarendon, or Bishop Burnet, need not have been ashamed to be the authors of such a production. (p. iv.)

অর্থাৎ "এই গ্রন্থ লেখকের সমসাময়িক বিবরণের আকারে লেখা। এই প্রকারের ইতিহাস সব চেয়ে বেশী কার্য্যকর এবং মনোরম। মুসলমান লেখকের নিজ চরিত্র ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে বিশেষত্ব আছে তাহা বাদ দিলে এই পুস্তক ইউরোপীয় সমসাময়িক বিবরণ গুলি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ফরাসীরাজা চতুর্থ হেনরির মন্ত্রী ডিউক অব সালী, প্রথম চার্লসের মন্ত্রী এবং ইংলণ্ডের রাজবিদ্রোহের ঐতিহাসিক লর্ড ক্লেরেণ্ডন, তয় উইলিয়মের প্রিয়পাত্র এবং কাহিনীলেখক বিশপ বার্ণেটও এরূপ গ্রন্থ লেখা অগৌরব মনে করিতেন না।" প্রাচীন ধরণের ইতিহাসের ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চ প্রশংসা করা যাইতে পারে?

সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীনের বাঙ্গলা অনুবাদ বিশেষ আবশ্যক। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে হাজী মুস্তাফা নামধারী একজন ফরাসী সাহেব মুসলমান কেরাণী ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (*A translation of Seir Mutaqharin*, 3 vols quarto, Calcutta, 1789)। এই অনুবাদের প্রায় সমস্ত খণ্ডই কলিকাতা হইতে বিলাত যাইতে জাহাজ-ডুবি হইয়া লোপ পাইয়াছে। আজি কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার ক্যাম্বে এণ্ড কোং ইহার অবিকল পুনর্মুদ্রণ

রিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবাদে অনেক দোষ আছে; লে স্থলে ভুল লেখা হইয়াছে, কারণ মুস্তাফা ফারসীর ঠিক র্থ বুঝিতে পারেন নাই, কতকগুলি টিপ্পনীও অশুদ্ধ। শষ মোগলদের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রত-ইতিহাসে অতুলনীয় জ্ঞানসম্পন্ন লেখক উইলিয়ম র্ভিন সাহেব, মুস্তাফার অনুবাদ কলিকাতায় আবার ছাপা ইতেছে শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, "আমি আশ্চর্য্য ইলাম যে এই অনুবাদের অবিকল পুনর্মুদ্রণের জন্য গবর্ণ-ণ্ট সাহায্য করিতেছেন। অগ্রে ইহার ভ্রম সংশোধন রা উচিত, বিশেষতঃ মুস্তাফার অশুদ্ধ ও অশ্লীল টিপ্পনীগুলি দ দেওয়া আবশ্যক।" এলিয়াট ও ডাউসন তাঁহাদের সিদ্ধ মৌলিক ভারত-ইতিহাসের ৮ম খণ্ডে এই অনুবাদ াত্মক বলিয়াছেন। তাহার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল গস্ যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা অসম্পূর্ণ; ইহাতে ধু নবাব সরফরাজ খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে। এখানি ূন অনুবাদ নহে, কেবল মুস্তাফার ইংরাজীটুকু সংশোধন রা হইয়াছে। অনুবাদের সব ভ্রমগুলিই রহিয়াছে। এলিয়াট্ ও ডাউসন ৮ম খণ্ড।)

প্রায় ৩০ বৎসর গত হইল গৌরমোহন মৈত্রেয় মহাশয় য়ার-উল্-মুতাখ্‌খরীনের এক অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ না করেন। তাঁহার পুত্রেরা এখন উহা ছাপাইতেছেন। ল বাঙ্গালী পাঠকেরই এই অনুবাদ লওয়া উচিত। ার প্রথম গুণ এই যে অনুবাদ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। আমি সল ফার্সি বহির সহিত তাঁহার অনুবাদের প্রথম তিন ্যায় মিলাইয়া দেখিয়াছি যে অনুবাদ পদে পদে ঠিক, টি কথাও ছাড়া যায় নাই অথবা কোন স্থানে গোঁজা-ন দিয়া অর্থ করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ মৈত্রেয় মহাশয় হাকিম আবদুল মজিদের ৩৩ খৃষ্টাব্দে ছাপান ফার্সি বহি হইতে অনুবাদ করিয়াছেন; সংস্করণ অত্যন্ত যত্নে ও পণ্ডিত লোকদের তত্ত্বাবধানে া হয়। ছাপার শুদ্ধতা ও আবদুল মজিদের বিজ্ঞতা ন্ধে হরেস্ হেমান্ উইলসন্, ডাক্তার টিট্‌লার, অধ্যাপক প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সাহেবেরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। ফা হস্তলিপি হইতে অনুবাদ করেন। ফারসী হস্তলিপি ারণতঃ কত ভ্রমপূর্ণ ও অস্পষ্ট তাহা সকলেই জানেন। আসলের দোষগুলি সম্ভবতঃ মুস্তাফা এড়াইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে এ বঙ্গানুবাদের শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে।

মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষা গম্ভীর ও তেজস্বী। সাহিত্য-পরিষদের সুধী কর্তৃপক্ষ হস্তলিপি পড়িয়া ইহা ছাপাইতে অনুমোদন ও উৎসাহ দিয়াছেন। আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে এই গ্রন্থের যথেষ্ট আদর হইবে।

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্ এ,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

নিয়াঙ্গুতে ফায়া পোয়ে।

সে দিন নিয়াঙ্গুতে ফায়া পোয়ে। বাঙ্গালা ভাষায় "ফায়া" কথার অর্থ দেবতা, আর "পোয়ে" কথার অর্থ আমোদ প্রমোদ। নিয়াঙ্গুর ফায়া পোয়ে, নিয়াঙ্গু বৌদ্ধমন্দিরের বাৎসরিক উৎসব মাত্র। যেমন আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কোনও কোনও প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে পূজা অর্চ্চা হয়, দশ জায়গার লোক আসিয়া মিলিত হয়, কুড়ি পঁচিশ খানা দোকান বসে, দুই চারিজন রসিক নাগরিক সঙ্ সাজিয়া রঙ্গ করে, এবং দুই একদল যাত্রা বা কীর্ত্তনওয়ালা খোলকরতাল বেহালা মন্দিরা লইয়া আসর খুলিয়া দেয়, ব্রহ্মদেশেও ফায়া পোয়ে তেমনি। প্রথম যেদিন নিয়াঙ্গুতে পোয়ে দেখিতে গেলাম সেদিন দেখিলাম—কেবল ছোট বড় কতকগুলি দোকান রেলগাড়ীর মত সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া আছে, লোকজনের হট্টগোল নাই, কোনো রকম গান বাজ্‌না নাই, অন্যান্য আমোদ প্রমোদেরও কোনো বন্দোবস্ত নাই; দোকানগুলি সবেমাত্র ঘর খুলিয়াছে, এখনো যেন পাকাপাকি বসে নাই। মেলার প্রথম দুই একদিন সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে সেদিনকার ফায়া পোয়েও তেমনি—সকলি প্রস্তুত অথচ কিছুই প্রস্তুত নহে।

মেলার দোকান পসার আমাদের দেশেও যেমন এখানেও তেমনি। ঘরগুলির উপরে ছনের পাতলা ছাউনী, পাশে বনের বা চাটাইর বেড়া, সম্মুখে ধারার দুইখানি তিনখানি দরজা, আর ভিতরে রাশি রাশি জিনিষপত্র। মালমসলাও আমাদের দেশের ন্যায়। দেশ—ব্রহ্মদেশ;

কিন্তু জিনিষ বিদেশী আগাগোড়া বিদেশী; শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সুটী পর্য্যন্ত বিদেশীর হাতে অর্পিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের খাস আমদানী লইয়া লইয়া যাহারা দোকান করিয়াছে, তাহারা অতি অনাদৃতের ন্যায় একটা কোণে বসিয়া আছে। বিলাতী জিনিষের চাকচিক্য অতদূরে যাইয়াও তাহাদিগকে নৈরাশ্য বিলাইয়া আসে; কিন্তু দোকানীরা জানে যে ঘৃণার দৃষ্টি তাহাদের শির পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে; কাজেই তাহার প্রতিদানে স্বীয় কাতর দৃষ্টি টুকু নিক্ষেপ করিয়াই তাহারা নিরস্ত হয়।

মেলায় কাপড়ের দোকানই বেশী, কাপড়ের গ্রাহকও যথেষ্ট। তাই দেশী বিদেশী নানা রকমের কাপড় দোকানে দোকানে রাশীকৃত হইতেছিল। বর্ম্মারা বড় বর্ণপ্রিয়, যত দিন ভিতরে রঙ্গ রস থাকিবে ততদিন ইহারা রঙীন কাপড় ছাড়ে না; সুতরাং প্রত্যেক দোকানেই রক্ত পীত নীল হরিৎ প্রভৃতি নানা রঙের কাপড় গাদায় গাদায় ক্রেতাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। আর সুধু কাপড়ের সমৃদ্ধি ছাড়া প্রত্যেক কাপড়ের দোকানেই আরও একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণের আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক দোকানেই একটী দুইটী করিয়া "আপিয়ো" (অবিবাহিতা যুবতী) বিক্রেত্রী; তাহাদের গা-ভরা গয়না, মুখ-ভরা হাসি, মাথা-ভরা চুল, আর আঁখি-ভরা অভিবাদন। একবার কাপড় কিনিতে গেলে ইহাদের মিষ্টিকথায় কাপড়ের মহার্ঘতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়, মনে হয়—"যাক দুটো পয়সা, জিনিষটী না কিনিলে বুঝি এমন সুন্দর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে।" সত্য সত্যই বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রথম আসিয়া এদের মুখে ঝলক ঝলক হাসি, সুচতুর বাক্যবিন্যাস, ও বিলাসব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া হয়ত একটু লঘুচিত্তই হইতে হয়; কিন্তু দুই তিন দিনেই মনের সে অবস্থা চলিয়া যায়; বাজারে বসিয়া হাসিয়া কথা কহিলেই যে স্ত্রীলোকের স্বভাব দুষ্ট হইবে সে ভাবটা তখন আর থাকে না। কারণ, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথা নাই; সুতরাং সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই বাহিরে চলাফিরা ও কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন।

এখানে আসিয়া এক কাপড়ওয়ালীর সহিত আমাদের চেনা পরিচয় হইয়াছিল। সেও নিয়াঙুর ফায়া পোয়েতে দোকান লইয়া আসিয়াছে। তাহার দোকানের নিকট দিয়া যাইতেই সে আমাদিগকে ডাকিল। আমরাও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম তাহার অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ করিয়া দোকানে প্রবেশ করিলাম।

দোকান জুড়িয়া একখানি পাটি পাতা; তার উপর একখানি মাঝারি আকারের সুন্দর গালিচা; আমরা সেই গালিচার উপর উপবেশন করিলাম। কাপড়ওয়ালী চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে একটী পানের বাক্স আমাদের সম্মুখে বসাইয়া দিয়া নম্রভাবে বলিল—"বাবু পান খাও"। বর্ম্মার পানের বাক্সগুলিতে ৩।৪টী করিয়া ডালা থাকে। একটীতে পান, একটীতে সুপারী ও জাতি, আর একটীতে খয়ের, চূণ, ও অন্যান্য মসলাদি থাকে। আমরা বাঙ্গালী, গৃহিণীর হাতের সাজা গোলাপী খিলি খাওয়া আমাদের অভ্যাস, আমরা বর্ম্মাদের মতন শিরা ফেলিয়া সুপারী কাটিয়া, পান সাজিয়া খাইতে পারিব কেন? আমি পানের বাক্সটী ভট্টাচার্য্য সাহেবের নিকট ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম—"খাও দাদা, পান খাও।" ভট্টাচার্য্য সাহেবও "মহাজিম্বু খেম্বিয়া" বলিয়া পানের বাক্সটী অন্য একটী বন্ধুর নিকট ঠেলিয়া দিলেন। তিনি কিছু গৃহস্থ কিসিমের লোক; আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মদেশেই পড়িয়া আছেন, পরিবার দেশে বাড়ী পাহারা দিতেছেন, কাজেই দায়ে পড়িয়া তাঁহার সবই শিখিতে হইয়াছে। তিনি বেশ মেয়ে মানুষের মত ধীরে ধীরে গুটিকতক পান তৈয়ারী করিলেন; তখন আমি ও দাদা দুই জনেই ভদ্রলোকের মত অর্থাৎ অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে পারিব না বলিয়া তাঁহার পরিশ্রমের ফলে অংশ বসাইলাম।

একটু পর আমরা মেলার অন্য দিকে চলিলাম। সে দিকে কয়েকটী মুদী দোকানে চাল ডালের পিরামিড তুলিয়া নিরুদ্বিগ্নভাবে বসিয়াছিল। সবে মাত্র পহেলা দিন, দোকানে বিক্রী নাই, লোকজনের তত ভিড় নাই, দুই চার জন ক্রেতামাত্র মধুর মাছির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দোকানওয়ালী আয়নাতে মুখ দেখিতেছিল। আমরা কাছে আসিতেই, সে আয়নাখানি নীচে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বা লো জিন্দ্‌লে বাবুজি?" উত্তরে দাদা কি একটা মাথামুণ্ডু বলিলেন, সে আবার আয়নাখানি হাতে,

লইয়া নিজের মুখ দেখিতে লাগিল। কতকগুলি জল খাবাবের দোকানও মেলার পশ্চাদ্দিকে টেবল পাতিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তা'দেব কিন্তু অবসর নাই, মুখে তানাখা মাখিবার জন্যও ততটা ব্যস্ততা নাই। নাকে মুখে কালী, কাল ময়লা লুঙ্গি, গায়ে ছাতাপড়া এঞ্জি; বঙ্গিনীগণ ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালনে উত্তপ্ত তৈলকটাহে ত্রিশীর্ষ "তবৌছা"গুলিকে ছেঁচ্ড়া পোড়া কবিতেছিলেন আব ধূম্রা-কুলিতনেত্রে প্রত্যেক আগন্তুকের প্রতি প্রশ্নময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। গন্ধে প্রাণ যায়, কাব সাধ্য সেখানে এক মিনিটও দাঁড়ায়; তবু সে সব দোকানে ভিড় কত!

পরদিন সহবেব বাজার নিয়াগুতে বদলী হইল, আমবাও আবার মেলায় বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম—সান্ মেয়েরা টুক্বী ভরিয়া তবকারী আনিয়াছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজব, সালগম, নানারকম শাক, আলু, টমাটো, সাদামূলা, লালমূলা, নীলমূলা, হল্দে মূলা, প্রভৃতি অনেক বকমের শাক সবজীতে বাজাব পবিপূর্ণ। পাহাড়েব উপব জায়গাব অভাব নাই, শাক সব্জীবও অভাব নাই। যে পাবশ্রম কবে, তারই প্রাঙ্গণে কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শ্যামল সম্পদ ফল পুষ্পে সুশোভিত, আর তারই ঘবে লক্ষ্মী দেবীব বেতের ঝুড়িটুকু টাকা পয়সায় পরিপূর্ণ। যারা অশক্ত অর্থাৎ বৃদ্ধ রোগী বা সহায়হীন তারাই গরীব; তারা কেউবা চারিটী কাঁচা লঙ্কা, কেউ বা কয়েকখানি আদা, কেউ বা কতকগুলি কাঁচা তেঁতুল, আর কেউ বা গরম গরম ভাত আর শাক পাতার ঝোল লইয়া ক্রেতাগণের অনুগ্রহেব অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদের কাছে বেশী দরদস্তুর করিতে হয় না, এরা বড় মন-খোলসা লোক; কাউকে ঠকাইবার মতলব রাখে না, তোমার যে দামে পোষায় তুমি বলিয়া দেখ, সে দিবার হয় দিবে, না দিবার হয় "ম ইয়াবু" বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। আর যদি ঠকিতেও হয়, তবে এদের কাছেই ঠকা ভাল; এরা বড় গরীব লোক; দু'চাব পয়সা যা' পায়, তাতেই এদের দিন চলে। এদের কাছে এক আধ পয়সা ঠকিলে, সে পয়সায় এদের অন্ন সংস্থান হয়।

অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী পুরুষ—বর্ম্মা, জেরবাদী, ফিরিঙ্গি—সে দিন মেলায় বাজার দেখিতে আসিয়াছে। মেলাব জিনিষের চেয়ে, তাদের শোভাই চমৎকার। যে দিকে চাও, সেই দিকেই চোক্ লাগিয়া থাকে। জিনিষেব দাম করিতেছে, কেউ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেউ হাতে-সাজি, মুখে সেলেই ঘবে ফিরিতেছে, আবাব কে বা চাঁপা আঙ্গুলে চক্‌চকে মনিব্যাগটী খুলিতে খুলিতে বলিতেছে—"Oh God, how dear"! শুনিয়াছিলাম নিয়াগুর ফায়াপোয়েতে ফিবিঙ্গিনীদের মধ্যে প্রণয়িসম্মিলনের মাহেন্দ্রযোগ; জোড়ায় জোড়ায় অনেক যুবক যুবতীও দেখিলাম। এরা আসাতে মেলাব সমৃদ্ধি যে খুব বাড়িয়াছিল তার আর সন্দেহ নাই।

বেলা দশটা এগারটা হইতে বাজার মন্দা ধরিল। বাবটার পর হইতেই মন্দিরে পূজা আরম্ভ হইবে। সদ্যঃস্নাতা বর্ম্মা ও সানবমণীগণ উজ্জ্বলবর্ণে উজ্জ্বলবসনে উদ্যানবর্ত্ম ঝলসিত করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। গায়ে ইস্তিবীকরা সাদা এঞ্জি, তাবউপব সোণার দু-লহরী সূর্য্যহাব, হাতে লতানো বলয়, কাণে মণিখচিত সোণাব ফুল, মুখে তানাখাব পাত্‌লা প্রলেপ, পায়ে রক্ত মখমলেব "কানা", মাথায় কুণ্ডলীকৃত কেশভাব, আব পবনে রেশমেব রঙ্গীন লুঙ্গি। প্রায় সকলেরই বাঁ হাতে একটী করিয়া ফুলের সাজি, তা'তে একরাশি মনোমত ফুল; আর ডান হাতে ছোট একটী নৈবেদ্য পাত্র, তাহাতে বিবিধ উপহার দ্রব্য থরে থরে সুসজ্জিত। যে যাহা ভালবাসে, সে আজ তাহা ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদনের জন্য লইয়া আসিয়াছে, যেন সেই টুকু দিলেই হৃদয়েশ্বর তৃপ্ত হইবেন।

মাউঙ্ লুডিনেব ছয়াকাডোও আজ নিয়াগুতে পূজা দিতে আসিয়াছেন। জেন English Churchএর দলভুক্ত; তিনি আসেন নাই। কন্যা মা টিন ছোট একটী ফুলের সাজি হাতে করিয়া মাতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। আমি ছয়াকাডো মা মিয়াইকে অভিবাদন করিয়া দু'চার কথার পর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ ফুল ও চিনির পুতুলে আপনার দেবতা খুসী হবেন তো?" ছয়াকাডো হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আপনি হিন্দু, আপনিও এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" আমি বলিলাম—"তা' বটে; আমাদের ধর্ম্মেও এরকম ফুল নৈবেদ্য দিবার রীতি আছে, কিন্তু আপনাদের ধর্ম্মে এ সম্বন্ধে কি মত? দেবতাকে ছেলে-ভুলানো চিনির খেলনা আর রসগোল্লা দেওয়াটা যেন কেমন কেমন!"

ছয়াকাডো যেন হৃদয়ে একটু আঘাত পাইয়া বলিলেন—"না বাবু, সেটা কেমন কেমন নয়, বরং আমার কাছে ভালই বোধ হয়। যাঁকে ভাল বাসিলাম, তাঁকে আমি যা' ভালবাসি তাই দিলে তবে নিজের মনটা খুসী হয়। প্রিয়জনকে তাঁহার অভীপ্সিত জিনিষ সকলেই দেয়, কিন্তু যেখানে অনুরাগের আধিক্য, সেখানে সুধু প্রার্থিত জিনিষের সম্প্রদানেই মন শান্তি লাভ করে না; এটা তার ভাল লাগিবে, ওটা সে ভালবাসে, সেটা সে ভাল বলিয়াছিল, সেখানে সে ভাল থাকিবে, এইরূপ নানা প্রকার অযাচিত সুখ প্রদানের ইচ্ছা মনে অত্যন্ত বলবতী হয়। তখন হইতেই স্বার্থত্যাগ আরম্ভ হয়, নিজের সুখ ও প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়েশ্বরের প্রীতি অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা ঈশ্বরপ্রেমের শৈশব অবস্থা মাত্র।" বলিতে বলিতে মা মিয়াই হঠাৎ সঙ্কুচিত হইলেন বোধ হয় ভাবিলেন—"বড় একটা বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে",—তাই সসঙ্কোচে পুনরায় বলিলেন—"বাবুজী, আপনারা হিন্দু, আপনারা কি আর এ জানেন না; আমাকে পরীক্ষা কচ্ছেন বই তো নয়।"

"পরীক্ষা নয়, ছয়াকাডো, এ সম্বন্ধে আপনাদের মত সত্য সত্যই চমৎকার।" আমি ভাবিলাম মা মিয়াই বুঝিবা মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি "তা' নয় বাবুজি তা' নয়" বলিতে বলিতে হাসির ঝলকে রাস্তা প্লাবিত করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নিয়াণ্ডু মন্দির বর্ম্মার অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ মন্দিরের ছাঁচে তৈয়ারী হইয়াছে। মন্দিরে একটী সিংদরজা ভিন্ন দরজা জানালা নাই, আবার সে সিংদরজাটীও একখানি ছোট খাট জানালাহীন কোঠা মাত্র। কাজেই মন্দিরের ভিতরে ঈষৎ অন্ধকার, বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি সেই প্রশান্ত অন্ধকারের মধ্যে ধ্যাননিমগ্ন। আজ পার্ব্বণের দিন; মন্দিরের অভ্যন্তরে কয়েকটী কারাউন ডাই জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাদের মিষ্টি আলোতে বোধি বুদ্ধের সমাধি-মূর্ত্তি আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। উঁহার চতুস্পার্শ্বে ভক্তগণ শিখো আসনে জপনিরত; তাঁহাদের পরিধানে পীত চীনাংশুক, মস্তক মুণ্ডিত, হাতে জপমালা, নয়ন মুদ্রিত, মনে মনে জপিতেছেন "আনেইছা, ডুখা আনাট্টা"—"এ জড়জগতে সকলই নশ্বর, সবই অনাত্মা, এখানে কেবলই দুঃখ, কেবলই কষ্ট। এ মোহে মজিওনা, মজিওনা।"

এসব দেখিয়া শুনিয়া মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। দাদার পায়ে বুট ছিল, তিনি ভিতরে আসিতে পারেন নাই; অন্য বন্ধুটীও ভিতরে আসিতে ইচ্ছা করিলেন না, একা আমিই কৌতূহলের বশে ভিতরে আসিয়াছিলাম। আমার আর বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলনা, একটী কোণায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম বহিঃস্থ জনকোলাহল সে তপোগহ্বরে প্রবেশ করেনা, জড়জগতের বিলাসভাণ্ডার সে অন্ধকার হইতে নয়নগোচর হয়না, ভিতরে গেলেই ইচ্ছা করে সম্মুখস্থ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সমাধি দ্বারা এজীবনটি "নির্ব্বাণে" মিশাইয়া দেই। মনটা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া একটী কোণে বসিয়া রহিলাম।

যখন বাহির হইলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। দাদাতো চটিয়াই লাল; বরং বলা উচিত গাঢ় কালো; কেননা দাদা রঙে কৃষ্ণবর্ণ, রাগ করিলে তিনি আরো কাল হইয়া যান। তিনি বলিতে লাগিলেন—"এমন মানুষ নিয়ে কেউ কোথাও যায়, কোথায় গেল কি হলো ভেবে ভেবে অস্থির, ভিতরে গিয়ে চুপ করে বসে আছে, কিছু বলতে হয়না?" আমি শুধু দাদাকে বলিলাম—"দাদা ভিতরে তো যাও নাই, মজাটাও পাও নাই, সেখানে গেলে আর আস্‌তে ইচ্ছা হয় না।" দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন—"হয়েছে, এসো এখন বাড়ী যাই।" আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল; আমি বলিলাম—"কিছু খাওয়া হবে না, দাদা?" আমাদের খাবার জিনিষ বাজারে কিছুই নাই। দাদা কয়েকটা কলা কিনিয়া একটা লেমনেডের দোকানে বসিলেন। কলা কয়েকটী আমি একটী একটী করিয়া উদরসাৎ করিলাম। দাদা এক গ্লাস লেমনেড পান করিলেন; আমাকেও একগ্লাস দিলেন। আমারও বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল, লেমনেড খাইয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

মন্দিরের পার্শ্বে একটী পটমণ্ডপের নীচে বহু ব্রহ্মরমণী উপবাসী অবস্থায় জপ করিতেছিলেন। কেউ বা বালিকা কেউ বা কিশোরী, কেউ বা যুবতী, আর অধিকাংশই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। সকলেই সুবেশা। হাতে অনতিদীর্ঘ জপমালা,

ব্রহ্মদেশীয়া নারী—মন্দির পথে

জিগন ফায়া চাউং—একটি ব্রহ্মদেশীয় মন্দির

মস্তক. দেবতার সম্মুখে সন্নত, আর নয়ন?—তাহা এ জগতের বাহিরে না জানি কোন চিরসৌন্দর্য্যের নিত্য ভাণ্ডারে নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া আছে। যাঁদের মনে ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোক মাত্রেরই সম্বন্ধে কুধারণা, তাঁহারা একবার উপাসনা-মন্দিরে আসুন, দেখিবেন—সমাজের শিথিলতায় যে জাতি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, ধর্ম্মের উদারতায় তাহা এখনো কত মহৎ।

তবে ধর্ম্মের ভিতর জাল জুয়াচুরী অন্যান্য দেশেও যেমন আছে ব্রহ্মদেশেও তেমন না আছে তা' নয়। মেলার পশ্চাৎদিকে একটী "নাৰুডো" অর্থাৎ নাটসিদ্ধা স্ত্রীলোক একটী সুবৃহৎ আস্তানা খুলিয়া পয়সা উপার্জ্জনের ফাঁদ পাতিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে একবার এক "নাৰুডোর" সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চারি আনা পয়সা দণ্ড দিয়া আসিয়াছিলাম; সুতরাং ইহাদের উপর আমার যে ক্ষুদ্র বিশ্বাস টুকু ছিল তাহাও এখন ছিলনা। তবু ভট্টাচার্য্য দাদাকে এই মজার ব্যাপারটা দেখাইবার জন্য তিনজনে মিলিয়া নাট্ দেখিতে গেলাম।

আমাদের যেমন ভূত ডামর ডাকিনী যোগিনীতে বিশ্বাস, বর্ম্মারাও তেমনি নির্ব্বাণের উপাসক হইলেও ভূত ডামরে বিশ্বাস রাখে। বর্ম্মা ভাষায় এই সমস্ত যক্ষ রক্ষ ভূত পিশাচের সাধারণ নাম "নাট্।" আমাদের দেশে যেমন বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রদেবের, রোগ শান্তির জন্য সূর্য্যাদি গ্রহগণের, ধন সম্পত্তির জন্য লক্ষ্মী দেবীর, জলের জন্য বরুণ দেবের বা মহামারী হইতে পরিত্রাণের জন্য কালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে, ব্রহ্মদেশেও সেইরূপ কোনও নাট রোগ শান্তির জন্য, কেহ বা শস্যবৃদ্ধির জন্য, কেহ বা ধন দানের জন্য, আর কেহ বা প্রেমাস্পদের প্রেম লাভের জন্য পূজিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও নাট অতিশয় জাগ্রত দৈবতা বলিয়া দূর দূরান্তরেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, দিবারাত্রি ইহাদের নিকট কাল মুরগী, কাল পাঁঠা, চিনির মিঠাই ও ধূপদীপাদি নানাপ্রকার উপচার দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিয়াঙুতে যে নাটসিদ্ধা শ্রীপাট স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার দখলে প্রায় পনর ষোলটী নাট। তাহার কোনোটী ঘোড়ায় চড়িয়া তরোয়াল হাতে লইয়া কল্কি অবতারের মত সর্ব্বদাই ধাবনশীল, কোনওটী বাঘের মত মুখ, ঘোড়ার মত পা, ও কুকুরের মত শরীরধারী একটা কিম্ভূত, কিমাকার জানোয়ারের উপর সওয়ার হইয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখচ্ছবির দ্বারা সম্মুখস্থ ভক্তবৃন্দকে নিরন্তরই ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, কোনটী বা প্রশান্তভাবে উপবেশন করিয়া ভক্তের করপুটে অন্ন প্রদানের জন্য মা অন্নপূর্ণার ন্যায় সর্ব্বদাই লোহার হাতা উদ্যত করিয়া রহিয়াছেন, আবার কোনওটী বা চতুর্ম্মুখে চারিদিকে নয়ন প্রসারিত করিয়া কোন্ গ্রামে, কোন্ সহরে মহামারী রূপে আবির্ভূত হইবেন তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন।

আমরা শ্রীপাটে উপস্থিত হইবামাত্রই "নাৰুডো" দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মিশিরঞ্জিত দন্তমালায়, রঘুবংশের সিংহের মত একটা অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিলেন। মুখের ও কপালের রেখাগুলি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের চঞ্চল বিজলীরেখার ন্যায় সহসা চমকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে হাস্য, সে কুঞ্চনমালা, বিলীন হইয়া মুখে বর্ষণোন্মুখ বারিদবৃন্দের অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল। তখন নেত্র স্থির ও গম্ভীর, দৃষ্টি যেন কোনও অতল সাগরের তল স্পর্শের জন্য ডুবিয়া যাইতেছে, ঠোঁট দুইখানি যেন কোনও দুরূহ মানসিক পরিশ্রমের আনুষঙ্গিক স্নায়বিক বিক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য কুঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে আর কপালের রেখাগুলি কোনো সময় আকুঞ্চিত, কোনো সময় প্রসারিত, কোনো সময় বক্রীভূত, কোনো সময় বা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া নাৰুডোর অসীম মনোবিকার বিকাশ করিতে আরম্ভ করিল। আমরা সেখানে না বসিতেই এতখানি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল! ভাবিলাম—পরে যেন কতই কি আছে। দাদা তো সে অমানুষিক মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত; সেরূপ বেদে নাই পুরাণে নাই, আগমে নাই নিগমে নাই, তন্ত্রে নাই মন্ত্রে নাই—সুতরাং তাহা বেদাগমের অতীত; সে চেহারা—সে কাল, এ কাল, আসে কাল—এ ত্রিকালের কোনো কালেই কেউ কখনো দেখে নাই, দেখিতেছে না ও দেখিবে না, সুতরাং তাহা ত্রিকালাতীত; সে আকার ইঙ্গিত, শ্মশানে মশানে, বনে জঙ্গলে, তুমি আমি, "দাদা" ভাই, বন্ধু বান্ধব কোন লোকেই কোনো দিন সাক্ষাৎ পায়নাই—কোনদিন পাইবে কি না সন্দেহ সুতরাং তাহা লোকাতীত। এমন নভূত নভাবী হাবভাব দেখিয়া

চমৎকৃত না হইবে এরূপ মানুষ সংসারেই কিছু দুর্লভ। নাক্কডো তাহার লম্বা লম্বা চুলগুলিতে একটা বিবাশি সিক্কার ঝাঁকি মারিয়া একখানি টুলের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় সেই হাস্য— সেই আগের মত এক অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিলেন। আমি একবার নাটগহ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, কাজেই সে সব বদনভঙ্গী আমার কাছে বড় নূতন নহে; কিন্তু এ মহীয়সীর ভাবচক্র আয়োজন নিয়োজন দেখিয়া আমিও কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমরা ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে পূর্ব্ব প্রদর্শিত টুল খানির উপর বসিলাম। নাক্কডো সহসা নয়ন মুদ্রিত করিয়া "কালী কালী" রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে এক কৃষ্ণবর্ণ জেরবাদী পুরুষ সম্ভবতঃ গঞ্জিকা সেবনে চক্ষু লাল করিয়া এক পাশে বসিয়াছিলেন। ইনি নাক্কডোর দোভাষী। তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাটের নিকট কি অভিপ্রায়ে আগমন?" দাদার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আমার গা টিপিয়া ইসারা করিলেন—"উত্তর দেও।" আমি দাদার দিকে চোক্ ঠারিয়া দোভাষী মহাশয়কে বলিলাম—"ইঁহার অদৃষ্ট গণনা করিতে হইবে।" দোভাষী নাক্কডোকে আমাদের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন।

নাক্কডো তখন গম্ভীরভাবে নাটের দিকে পাশ ফিরিয়া বসিলেন। দোভাষী মহাশয় ডুম্বুরাকৃতি একখানি ১ হাত উচু টেবল তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে ৭টী কড়ি ছড়াইয়া দিলেন। নাক্কডো ইত্যবসরে ভূত প্রেত যক্ষরক্ষ দৈত্যদানব যিনি যেখানে থাকেন তাঁদের আহ্বান করিয়া পালি ও বর্ম্মা মিশ্রিত মন্ত্রবাজি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উদাত্ত অনুদাত্ত ও প্লুত স্বরে নাটগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কপালের ও মুখের রেখাগুলি আবার গিরি নির্ঝরিণীর কুটিল আবর্ত্তের ন্যায় উন্মত্তভাবে চমকিত বিথারিত ও প্রলুপ্ত হইতে লাগিল, কুঞ্চিতকোণ নয়নদ্বয় কোনো সময়ে উর্দ্ধক্ষিপ্ত কোনো সময়ে অধঃপ্রেরিত, কখনো বা পার্শ্বস্থ, আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ গতিতে নিমীলিত হইতে লাগিল। তাম্বুল-রাগ রক্ত অধরে ফিক্ ফিক্ হাসি যেন সংলিপ্তই রহিল, যেন সেগুলি প্রদত্ত-যৌবন নাটসমূহের প্রীতি-সম্ভাষণ হইতেই স্খলিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ মাত্র পাঠ করিয়া তিনি পুনরায় স্থির হইয়া বসিলেন এবং বর্ম্মা ভাষায় দাদাকে বলিলেন—"সম্মুখে বসো"। দাদা নিঃশব্দে সেই ডাইনীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এখানে চর্ম্মপাদুকার প্রবেশনিষেধ দেখিতে পাইলাম না দাদা বুট লইয়াই উপবেশন করিলেন।

নাক্কডো বলিতে লাগিলেন—"তোমার প্রশস্ত কপাল আছে, ডাগর ডাগর চোক্ আছে, চোকের ভিতর লালের আভা আছে, —ঐ —ঐ—কপালের ঐ উঁচু যায়গায় প্রতিভাদেবীর আসন আছে—টাকা পয়সার জন্য বর্ম্মাতে আসা হইয়াছে,—তা—হবে—হবে না?"

দাদা কি মনে ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন।

নাক্কডো স্থির দৃষ্টিতে দাদার দিকে একবার তাকাইলেন; তারপর বলিলেন "কয়েক বছর বড় সুখে গেছে—তা' হবে—বন্ধুবান্ধবেরা বর্ম্মা আস্‌তে নিষেধ করেছিল; তোমার অদৃষ্ট এখানে নিয়ন্ত্রিত এখানে সোণা ফলবে"।

"হে—হে—হে—নাটেরা ঐ বলছে শোন—তোমাদের যেমন স্বভাব—দেখ! হৃদয়ের ভিতর এ জ্বালা পুষতেছ কেন! সে তোমার হবে না।" নাক্কডো আবার পূর্ণ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিলেন।

বলিলেন—"সে তোমার হবে না। তোমার যে সে এ দিকে বসিয়া আছে, এই এই, এই উত্তর দক্ষিণ দিকে খোঁজ খোঁজ, মিলবে।"

ইহার পর আবার মন্ত্র পাঠ আরম্ভ হইল; দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; নাক্কডো একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এখনও চাকুরী হইতেছে না; আরও কিছু দিন কষ্টে যাবে। প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে ত?"

বলা দরকার—দাদার ব্যবসা ওকালতী; দু পয়সা হয়, চাকুরীর অনুসন্ধান করিতে হয় না।

নাক্কডো বলিতে লাগিলেন, "সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে; দেশে পরিবার রাখিয়া আসিয়াছে—সে ভাবিতেছে।"

টিপ্পনী করা আবশ্যক—দাদার পরিবার দাদার সঙ্গে বরমায় অবস্থিতি করিতেছেন।

"কিন্তু তা হোলো—তোমার বড়ই বিপদ দেখিতেছি। চাকুরীর সম্বন্ধেও বিষম গোলযোগ। সে অঙ্গীকারটীও ভুলিয়া গিয়াছ।"

দোভাষী বলিলেন—"বাবুজি। তোমার যে অঙ্গীকার ছিল, সে অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়াছ।"

দাদা ক'নের মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অঙ্গীকার?"

নাক্কড়ো বলিলেন—"পূজার অঙ্গীকার!! কালী মায়ের নিকট পূজার অঙ্গীকার; কালী মায়ের মাথার জন্য একখানি রেশমী রুমাল দিতে হইবে। তবে তিনি তুষ্ট হইবেন।"

দাদা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"হুঁ। আচ্ছা আমার একটা অভিলাষ আছে; দেখুন দেখি ফলিবে কি না?"

নাক্কড়ো সম্মুখস্থ টেবিলের উপর দুই তিনবার কড়ির চে'ল দিলেন। সহাস্য বদনে নাটের দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—"পথে কণ্টক; আত্মীয়ই শত্রু; তিন মাস ১৫ দিন বাদে আশা পূর্ণ হবে। নাট্‌কে ভোগ দিও।"

নাক্কড়ো আরও দুই একটী বাজে কথা বলিয়া অদৃষ্ট গণনা সমাপ্ত করিলেন।

আমি একদিন চারআনা পয়সা নাক্কড়োর পোড়া মুখে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলাম। আজ দাদা ধীরে ধীরে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা টাকা বাহির করিলেন। একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন—মানে—"কত দিব"? আমি বলিলাম—"দেও—একটা কিছু যা'হয়"। দাদা আবার পকেটে হাত দিলেন, সম্পূর্ণ পকেটটা এধার হইতে ওধার দুই তিনবার জালছাবা করিলেন—পুঁটি চাঁদা মিলিল না; দাদা মুখ বেঁকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেজ্‌গী হবে"। আমি দাদার কাঁধে চাপিয়া মেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম, সুতরাং স্পষ্টাক্ষরে বলিলাম—"কিছুই না"। দাদা অগত্যা আবার পকেট হইতে পাঁচটা আঙ্গুলে ধরিয়া ১টা টাকা তুলিলেন—যেন জমিদারের লোককে বেকারের মাছ দিতে হইবে। টাকাটা ধুপ্‌ করিয়া নাক্কড়োর আসনের উপর চিৎ হইয়া পড়িল। আমরাও নাক্কড়োর আস্তানার দিকে পিঠ ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; আকাশের রঙ্গীন মেঘগুলি হইতে প্রোজ্জ্বল প্রভাচ্ছটা ভূতলে ছাইয়া পড়িয়াছে; চারিদিকে পাহাড়, তাহার নীল পীত লোহিত কত রঙ্গের চূড়া সেই উজ্জ্বল আলোকে ঝল্‌ ঝল্‌ করিতেছে; যে পাহাড় গুলি অনেক দূরে; তাহাদের গায়ে গভীর কালো ছায়া; দেখিলে মনে হয় এক একটা ভুটিয়া কম্বল গায়ে দিয়া আফিংখোর জঙ্গলী-সানের মত চৌপ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তখনো সন্ধ্যা হয় নাই, তবুও নিকটের পাহাড়গুলি বাষ্পের মোটা মোটা লেপগুলি মাথার উপর টানিয়া টানিয়া রাত্রির প্রচণ্ড শীতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা চিরদিনই বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রের শ্যামল শোভা ও বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষঃস্থল দেখিতে অভ্যস্ত। আমাদের চোখে এ দৃশ্য কত নূতন, কত সুন্দর, কত মনোহর।

আমরা স্বভাবের সেই অভিনব মাধুরী চড়া গলায় আলোড়ন আন্দোলন করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছি, এমন সময় অপর বন্ধুটী হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—"আ-এই যে।" তিনি অঙ্গুলী হেলাইয়া দেখাই-লেন—একটা গাছের নীচে কতকগুলি লোক জড় হইয়াছে, মধ্য হইতে একটী সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে তানলহরী ছড়াইয়া উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। বন্ধুটী বলিলেন "এ সেই লোকটা"। আমি অদ্ধ অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করিলাম "কোন্‌ লোক্‌"? "কেন, তোমাকে একদিন এর কথা বলিয়াছিলাম মনে আছে, সেই 'জইয়ার' নিকটে?" আমি বলিলাম "বটে, চল দেখে আসি"।

গাছের তলায় যাইয়া দেখিলাম একটী কাশ্মীরী যুবক একটী সারঙ্গের সহিত গজল গাহিতেছে। চারিদিকে কতকগুলি বর্ম্মা বর্ম্মী জেরবাদী ও হিন্দুস্থানী জমিয়া গিয়াছে। মাঝখানে একখানি কম্বলাসনে বসিয়া গায়ক মধুরকণ্ঠে গাহিতেছে—

জাহির মে কঁহি রহতে হ্যায়
বাতিন্‌ মে কঁহি হ্যায়
ইয়েহ্‌ ওয়াম্প উন্‌হি মে হ্যায়
কেঁহ হ্যায় আউর নেহি হ্যায়।

যুবকের বয়স বড় জোর ২২ বৎসর; মুখে ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজির গভীর রেখা, চক্ষু বিশাল, তাহাতে কৃষ্ণরোম-নিচয় কতই সুন্দর! আমি নভেল লিখিতে বসি নাই; নয়নমনোহর নায়ক অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা আমার নাই; যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি; আর যাঁহারা কাশ্মীর-

বাসী যুবকগণের কাশ্মিরমণ্ডিত দেহ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও অবিশ্বাস করিবেন না তাহাদের লাবণ্যময় শুভ্রমুখমণ্ডলে কৃষ্ণগুম্ফের শোভা কত মধুর, তাহাদের বিশাল চক্ষু ও উন্নত নাসিকা কত গর্ব্বের জিনিষ, তাহাদের উদারতা ও সরলতা আরও কত মনোহারী। যুবক ভাবে বিহ্বল হইয়া গাইতেছিল—

> হাম রঙ্গ্ গুলে তাজা ভ
> হাম্ নিগ্ হতে গুলসান্
> হাম নব্ মায়ে বুল বুল হ্যায়
> হাম আওবাজে হার্জি হ্যায়॥

গানের প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে মধু বর্ষিত হইতেছিল, প্রতি গমকে ও কুন্তনে দেশের কত সম্মোহন দৃশ্য স্বপ্নের ছবির ন্যায় বিচিত্র চিত্রে অঙ্কিত করিতেছিল, হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কেমন যেন মাদকতাময় প্রকম্পন তুলিয়া দিতেছিল। ভাই, তোমরা স্বদেশে রহিয়াছ—মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের আদর সোহাগ সম্ভোগ করিতেছ, আমার মত দেশত্যাগীর মনোবেদনা তোমরা বুঝিবে না। দেশে অন্ন জুটে নাই—মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডারে আমার মত ক্ষুদ্র সন্তানের জন্য দু'বেলা দুটী শাকভাত মিলে নাই বলিয়াই দেশের সেই শস্যভরা শ্যামল প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছি ; আর এক কাশ্মীরী যুবকও—সে হতভাগারও দেশে অন্ন জুটে নাই বলিয়া—একটী সারঙ্গ হাতে লইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে—ভাই, তোমরা আমাদের মনোবেদনা বুঝিবে না—দেশের একগাছি তৃণকেও আমাদের মত দেশত্যাগীর নিকট মৃত মাতার দগ্ধাস্থির ন্যায় পরম পবিত্র ও প্রীতিকর মনে হয়, স্বদেশের একটু সুখবর যে দেয় তাকে পরম সুহৃদ বলিয়া মনে হয়, দেশের একজন লোক দেখিতে পাইলে মনে হয়—এতদিনে হারানো রত্ন কুড়াইয়া পাইলাম—আকুল চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—"ভাই দেশের অবস্থা কেমন"? একটু ভাল সংবাদ পাইলেই মন কত খুসী! তাই বলিতে ছিলাম, একটুখানি সারঙ্গের বাজ্না—যাহা তোমরা নিত্যই শুন, তাহাতে আমাদের মনে কত আলোড়ন বিলোড়ন হয় তাহা তোমরা বুঝিবে না। মায়ের কোলে বসিয়া কি কোল-ছাড়া পরিত্যক্ত সন্তানের দুঃখ বুঝিতে পারিবে?

কিছুক্ষণ গান শুনিয়া আমরা ঘরে ফিরিলাম। পথে ছোট হাকিম মাউণ্ড্ লুগলের সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি বলিলেন "রাত্রিতে পোয়ে দেখিতে আসিও"। কিন্তু সে রাত্রিতে আর আসা হইল না।

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

নুরজাহান।

গ্রীক্‌জাতির কবিকল্পিত হেলেনের মত, মোগল-ইতিহাসের নুরজাহানের নামে, বেশ একটু ভেল্‌কি আছে। নাম করিলেই কমনীয় যৌবন-সম্বদ্ধা মোহিনীর কথা মনে পড়ে। কাব্যে এবং ইতিহাসে জরার তুষারপাতের কথা থাকিলেও, পাঠকের কল্পনায় চিরদিন স্থির-যৌবনার ছবিই ফুটিয়া উঠে। কত কাব্যে, কত ইতিহাসে, কত মোহিনীর কথা আছে, কিন্তু সকল নায়িকার কপালে চিরযৌবন লাভ ঘটে না। ইহার কারণ এই যে, যে সকল নায়িকার স্মৃতি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন-সম্ভোগের কথার সহিত গাঁথা পড়ে, তাহাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের তরুণতার কথা মনে জাগে। আত্মারাম সরকার, বিলাসের পাপমন্ত্রসিক্ত হাড় খানি না ঘুরাইয়া, উহাদের ঐতিহাসিক ছবির দিকে তাকাইতে দেন না বলিয়াই এই ভেল্‌কির সৃষ্টি। সীতার চরিত্রে পাপের দাগ নাই বলিয়া, রূপ ও বয়সের সহিত অসম্পর্কিতা এক দেবীমূর্ত্তিই মানসপটে অঙ্কিত হয় ; এবং সেই মূর্ত্তির চারিদিকের বিক্ষিপ্ত আলোকে, অননুভূত অপার্থিবতা চ্ছুরিত হয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যখন তাঁহার এই নাটকের ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে তিনি আদর্শচরিত্র গড়িবেন না, তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নুরজাহান, উপযুক্ত আখ্যান-বস্তু বটে। কবি এই মোহিনীর চরিত্রচিত্রে কুত্রাপি ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই ; এত বড় প্রসিদ্ধ ঘটনার কথায়, তাহা করিলেও ভাল হইত না। আদর্শ গড়িতে গেলেই অনেক বদ্‌লাইতে হয় ; এবং মনের মত পরিবর্ত্তন করিয়া কাব্য গড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। প্রকৃতিতে যাহা যথার্থতঃ ঘটিয়াছে, তাহার তথ্য বুঝিয়া লইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত কাব্যটুকু ফুটাইয়া তোলা কঠিন কার্য্য। সকল

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যসংঘটিত কার্য্যের মধ্যেই কবিতা আছে; কিন্তু বড় কবি ভিন্ন সকলে তাহা ধরিতে পারে না। তাই নবীন কবিরা সংসারটা পায়ের তলায় ফেলিয়া একেবারে আকাশে উধাও হইয়া কেবল মেঘের মেলা এবং বিজুলির খেলা বর্ণনা করেন; বড়জোর পৃথিবীর ঘাসের উপরকার শিশিরবিন্দুটুকু অরুণ আলোকে ভাস্বর করেন।

এই নাটকের কাব্যকৌশল সম্বন্ধে কবি একটি কথা নিজেই লিখিয়াছেন; এ দৃশ্যকাব্যে "স্বগত" নাই। শ্রব্য কাব্যে অনেক কথা বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চলে বলিয়া, শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য রচনা একটু শক্ত; তাহার উপর আবার স্বগত অবলম্বনে যে সাহায্যটুকু পাওয়া যায়, তাহাও যদি না থাকে, তবে সুকৌশলের প্রয়োজন খুব অধিক হইয়া পড়ে। কবি যে এই সুকৌশল সম্পূর্ণরূপেই দেখাইয়াছেন, তাহা কাব্য না পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে না; সমালোচনায় উহা বুঝাইতে গেলে, কোন একটা বড় দৃশ্যের উদাহরণ দিয়া, অনেক উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়, যে যে সকল স্থানে স্বগত থাকিতে পারিত, সেখানে তাহা না থাকায়, কাব্যের মর্ম্ম দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। কাজেই এ বিচারের ভার পাঠকদের উপরেই রহিয়া গেল।

প্রথম দৃশ্যে, নুরজাহান অথবা মেহের-উন্নিসাকে দেখিতে পাই, স্বামী কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী লইয়া "অতুল চিত্তবিমোহন সুন্দর সুরধামে"। মেহেরের মনে যে তখন কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বীজ ছিল, পতি ব্যতিরিক্ত কোন পুরুষের ছায়া খেয়ালের ফলেও যে তখন তাহার শতস্মিত প্রেমালোকের পার্শ্বে কাঁপিতেছিল, তাহা গভীর প্রণিধান না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। অদ্বিতীয় কবি ভবভূতির উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কে যে অপূর্ব্ব নাট্যকৌশল, এখানেও তাই। এই কৌশলটুকু বুঝিতে না পারিলে নাটক পড়া বৃথা হয় বলিয়া আমরা বক্তব্যটুকু পরিষ্কার করিতেছি।

উত্তর চরিত পড়িতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় যে রাম এত প্রগল্ভ বাক্যে সীতার সমক্ষেই সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন কেন? যথার্থ প্রণয়ী ত কখনো এমন করে না? গুপ্তচর আসিয়া রামচন্দ্রকে যাহা পরে জানাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে তাহা জানিতেন, তাহা গুপ্তচর নিয়োগ হইতেই বুঝিতে পারি। তিনি সংপূর্ণ বুঝিয়াছিলেন, যে প্রজারঞ্জনের জন্য, আজ হউক কাল হউক, তাঁহার হৃদয়ং দ্বিতীয়ং কে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তিনি অন্তরে অন্তরে বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। তাই জনকের গমনের পর অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন নাই; তাই কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় সীতাদেবীর মূর্দ্ধিস্থিতির কথা বলিয়া সীতাকে লজ্জিতা করিতেছিলেন।

নুরজাহানের মনে দুঃস্বপ্ন ছিল, তাই সে অত সুখ সহিবে না ভাবিতেছিল; তাই জোর করিয়া আপনার পারিবারিক সুখের কথা অত করিয়া আলোচনা করিতেছিল; তাই শিশুদের সৌন্দর্য্যের কনকরশ্মিতে আপনাকে ডুবাইতে চাহিয়াছিল। যে সৌন্দর্য্যের ভিতরে থাকে, সুখের ভিতরে থাকে, সে কদাপি অত প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্য্য এবং সুখ দেখিতে পায় না। আগ্রার নামে চমকটুকু ঠিক এই দৃশ্যে না থাকিলেও চলিত; কবি বরং উহাতে নুরজাহানের মনের ভাব একটু বেশিরকমেই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

মেহেরের পতি শের খাঁ সরলস্বভাব, উদারপ্রকৃতি, সাহসী, বীর এবং ধর্ম্মভীরু। মেহের সেই দেব-প্রীতি সাধনায়, স্বপ্ন ও ছায়াশূন্য সমাধি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; সে তর্পণে দেবতা তৃপ্ত হইতেছিলেন। কোন ছিদ্র দিয়া শনি আসিয়া স্কন্ধে চাপে তাহা কেহই জানে না; এত বড় রাজা শ্রীবৎসও জানিতে পারেন নাই। বালিকা সৌন্দর্য্যের দম্ভে ও যৌবনের খেয়ালে, একটুখানি রঙ্গলীলা করিয়াছিল বইত নয়? কিন্তু কবি বুঝাইয়াছেন, যে আমাদের অতি ক্ষুদ্র রঙ্গের অভিনয়টুকুও বিরাট নাট্য-মঞ্চে অভিনীত মহানাটকের অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে গাথা। খেয়ালের ধারা হউক, বর্ষার ধারা হউক, কেবল "রাশি রাশি হাসি ফুটাইয়া"ই শেষ হয় না, কখনো উহার ফলে—"অন্তরে দারুণ জ্বালা, জ্বলে যায়—জ্বলে যায়"। কথায় বলে, শনির দৃষ্টি একবার পড়িলে, না পোড়াইয়া ছাড়ে না। লালসা এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার হুতাশন হইতে, চিত্রিত পতঙ্গটি বহু দূরে ছিল; নিয়তির বাত্যাতাড়নে সে আগ্রায় গেল।

শেরখাঁর মত বীরের পত্নীর মনের মধ্যে ছায়া লুকাইয়া ছিল, এ কথা—মেহেরের পক্ষে ঘুণাক্ষরে কাহারো কাছে

প্রকাশ করা অসম্ভব; অত্যন্ত বিশ্বস্ত সখীকেও এমন কলঙ্কের আভাষ দেওয়া স্বাভাবিক নয়। তবুও মেহের-উন্নিসা আগ্রায় এক সখীকে ডাকিয়া, সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সদ্‌বুদ্ধির উপদেশ চাহিল। এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটির কৌশলময় অবতারণায় কবি বুঝাইয়া দিলেন, যে সুন্দরীর অন্তরেব মধ্যে এমন ঝড় বহিতেছিল, যে সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছিল না। ছায়া ও দুঃস্বপ্নেব কথাটা, মুখ ফুটিয়া একবার বলিয়া ফেলিলে যদি লজ্জা প্রভাবে উহাবা ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এই আশা। আবর্ত্তে পড়িয়া একটা তৃণ ধরিয়া প্রাণ রক্ষার মত একবাব বিশ্বস্তা সখীব উপদেশ ভিক্ষা; এই মাত্র। চতুর্থ দৃশ্যটি পড়িয়া দেখ, উহার একটি কথায় কোন জোর নাই, রমণীর উপদেশে কিছু বিশেষত্ব নাই এবং মেহেরেব প্রতিজ্ঞাব মধ্যেও কোন তেজ নাই। কিন্তু গভীরভাবে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, যে নুরজাহান যত বাহ্যিক স্থিরতা দেখাইলেও তাহাব মনেব মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। ব্যাধমন্ত্রে চঞ্চলা বিহঙ্গিনী একবার প্রাণপণে পাখা নাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র নীড়ের দিকে চলিল। নিঃশব্দে অল্প কথায় এমন করিয়া অন্তরেব ছবি ফুটাইয়া তোলা সহজ ক্ষমতাব কথা নয়।

শেবখা বুঝিয়া ফেলিলেন তাহাব সুখ গিয়াছে; তিনি তখন মৃত্যুর আহ্বানে অগ্রসব হইলেন। প্রথম অঙ্কেব অষ্টম দৃশ্যে এই মর্ম্মান্তিক কাহিনী। যে কথাগুলি কহিয়া শেবখা পত্নীব নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা যদি স্বতন্ত্র একটি গীতি কবিতায় রচিত হইত, তবে বাঙ্গালার ঐ শ্রেণীব কবিতাব ভাণ্ডাবে একটি অমূল্য বস্তু সঞ্চিত রহিত। নিয়তি-প্রজ্জ্বলিত বহ্নির দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত মর্ম্মবেদনার করুণায় সিক্ত, সেই সরস ও সুকোমল প্রীতির হতাশগীতি, অনেক বাব পড়িয়াছি। উপমার ভাবব্যঞ্জকতায়, প্রীতির মাধুর্য্যে এবং ধীরোদাত্তেব চাঞ্চল্যহীন কাতরতায়, কবির বর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে: "আমি মানুষ দুর্ব্বল মানুষ মাত্র। আর সে আমার প্রথম যৌবন, মেহের! প্রথম যৌবন! যখন আকাশ বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই শ্যামল; যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার স্ফুলিঙ্গ, গোলাপ ফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত; যখন কোকিলের গান একটা স্মৃতি, মলয় সমীরণ একটা স্বপ্ন যখন প্রণয়ীর দর্শন উষার উদয়, চুম্বন সজল বিদ্যুৎ, আলিঙ্গন আত্মার প্রলয়। সেই যৌবনে আমি তোমার রূপেব সুধা পান করেছিলাম।"

ইহার পর যখন শেরখাঁ মরিয়া গেল; তখনো নুরজাহানের অন্তর্বিরোধ ছিল। কেননা লয়লার মুখে শুনিতে পাই, যে মেহের পোষাপাখীটির মত ধরা দিয়াছিল। লয়লার সন্দেহের কারণ ছিল; নচেৎ সে হ্যামলেটের মত ক্রমাগতই হতভাগিনীর মনে পিতৃস্মৃতি জাগাইয়া দিতে আসিত কেন কিন্তু যখন নুরজাহান পিতা ও ভ্রাতার সুখসম্পদের কথায়ও বিবাহে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু শেষে প্রতিহিংসার সুবিধার কথায় নূতন আলোক পাইয়া উৎসাহিতা হইয়া উঠিল, তখন কি বালিকা লয়লার অনুমান অস্বীকার করিতে হইবে? না। সে কথা বিস্তৃতভাবে পরে বলিতেছি। নুরজাহান অবশ্য বলিয়াছিল, যে সে শয়তানীর প্রভাব প্রায় দমন করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সে কথাটা সহজ অর্থে গ্রহণ করিলে, প্রতিহিংসার জন্য অতটা উৎসাহের ভাব বোঝা যায় না। শেরখাঁর পত্নী নাবা বই নয়; তাহার পক্ষে মাঝে মাঝে চরণ-তলে-নিক্ষিপ্ত ভাবতবাজ্যের কথা ভাবা আশ্চর্য্য নয়। ইঙ্গিতে তাহা বুঝিয়া লয়লাও রাগ করিতে পারে; শেরখাঁর মত দেবতার কথা স্মরণ করিয়া বিবাহে স্বীকৃতা নুরজাহানও সে ভাবটাকে শয়তানী বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উহার যথার্থ সিদ্ধান্ত, মনুষ্যচরিত্রের জটিলতায় অনুসন্ধান করিতে হয়। কেবল প্রতিহিংসার জন্য নুরজাহান বিবাহ করে নাই; মুখে যাহাই বলুক, কথা তাহা নয়। মনকে যখন আমরা চোখ ঠারিয়া কাজ করি, তখন ক্ষুদ্র একটা বাহানাকেই বড় করিয়া তুলিয়া থাকি. জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া লইয়া, পরে একথা আবার বলিতেছি।

রেবা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, পুণ্যময়ী, পতিভক্তিপরায়ণা; কোন স্বামীর পক্ষেই স্ত্রীর এত গুণের মধ্যে, তাহার প্রতিদিনের ঘরসংসার-করা-প্রেমের অন্তরালে, প্রেমের পূর্ব্বরাগের মধুরতা মাখানো একটু চকচকে প্রেমের অভাব, লক্ষ্য করা সহজ নয়। কিন্তু যাহার চিত্ত প্রথম হইতেই লালসাদীপ্ত, তাহার কাছে ঐ গুণসমষ্টি লাবণ্যহীন অঙ্গ

সৌষ্ঠবের মত। প্রথমযৌবনের নবদীপ্তিতে নয়নের যে বিলাসলীলা, অবগুণ্ঠনের সহসা উন্মোচনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তাহা কদাচ ভুলিতে পারেন নাই; ভোগের তীব্র লালসায় পুণ্যময়ীর সংযত প্রেম, মধুর হইতে পারে না। সেই জন্য এরূপ স্থলে অনেক হতাশেরা মদ খাইয়া মরে। আমি সম্রাট, ক্ষমতাশালী; আমি কি আমার কাম্যপদার্থ-উপভোগে বঞ্চিত থাকিব? এ ভাবটিও জাহাঙ্গীরের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি ছলে, বলে, কৌশলে, অমানুষিক নরহত্যা পর্য্যন্ত করাইয়া, নুরজাহান লাভ করিয়াছিলেন। লালসার প্রবল উত্তেজনায়, ভোগের গভীর সাধনায়, পাপ পুণ্য তুচ্ছ করিয়া যাহা লাভ করা যায়, মানুষ সকল স্থলেই তাহার গোলাম হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান জাহাঙ্গীরও তাই নুরজাহানের গোলামীতে বুঝিয়া সুঝিয়া আপনার ও দেশের মঙ্গল দলিত করিয়াছিলেন। এই স্বাভাবিকতার জন্যই, প্রথমতঃ জাহাঙ্গীরের ভীষণ পাপানুষ্ঠানে ক্রুদ্ধ হইয়াও পরে তাঁহার নিঃসহায়তা এবং পতন দেখিয়া দুঃখিত হই। কিন্তু নুরজাহান? সেই কথাই বলিতেছি।

নুরজাহানের শয়তানী কি কেবল তাহার গৌরব-লালসা? এবং বিবাহে সম্মতি কি কেবল প্রতিহিংসা সাধনের সুগমতা লাভে? পুরুষের মরণ কোথায়, প্রায় সকল রমণীই তাহা বুঝিতে পারে; বুদ্ধিমতী নুরজাহান, উদ্‌ভ্রান্ত জাহাঙ্গীরের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, যে সম্রাটের ক্ষমতা তাহার পদতলে; এবং ইচ্ছা করিলে সে তাহার তর্জ্জনীসঞ্চালনে রাষ্ট্রনীতির সকল অবস্থা হেলাইতে দোলাইতে পারে। কেবল কি সেই ক্ষমতার পিপাসায় সে উত্তেজিতা? মূলে কি ভোগ-লালসা ছিল না? লয়লার অনুমান কি মিথ্যা? এই জটিল কথা কবি অতি দক্ষতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তবে একটু বুঝিয়া লইতে হয়।

কবি, শেরখাঁকে দেবতার মত করিয়া গড়িয়াছেন; কিন্তু নুরজাহান তাঁহাকে ভক্তিই করিত, নারীর প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত না। একথা নুরজাহান নিজেই বলিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অঙ্গরাজ অযোগ্য না হইলেও ইন্দুমতী তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই;—"নাসৌ ন কাম্যো, নচবেদ সম্যক্; দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। উল্টাদিক দিয়াও ঐ কথা। "সুজন, সুন্দর, বীর, ছিল প্রিয়পতি," তথাপি আর্য্য-রমণী কৃষ্ণকায় দস্যুর প্রেম চাহিয়াছিল। সে বলিয়াছিল:—

> সুন্দর আমার স্বামী, কিন্তু মুখে তাঁর
> কামনা লালসা মাখা হাসি রাশি নাই;
> শুধুই বৈদিক নিষ্ঠা, শুদ্ধ সদাচার,
> নিয়মিত হাসি কথা আমি নাহি চাই।

একটু লালসার বাতাস না বহিলে, শুধু যৌবনগর্ব্বে, শুধু খেয়ালে, মুখের কাপড় উড়িয়া যাইত না। কিন্তু নুরজাহান যে-সে মেয়ের মত চপলা নয়, তাহার আত্মসম্মান বোধ ছিল, সে বুদ্ধিমতী ছিল; নহিলে এতবড় রাজ্য শাসন করিতে পারিতনা। তাই সে প্রাণপণে দেবতা লইয়া ঘর সংসার করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যথেষ্ট যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু ঘটনা তাহার অনুকূল হয় নাই। সে দেখিয়াছিল, যে ক্রমাগতই নিয়তির তাড়নায় সে যেন ফাঁদে পড়িতেছিল। একদিকে আত্মসম্মান রক্ষা, অন্যদিকে ভোগলালসার প্রচ্ছন্ন বহ্নি, এবং গৌরব-আকাঙ্ক্ষার বাতাস; এস্থলে জয় পরাজয় কাহার হয়, তাহা বলিতে হইবে না। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছিল; এবং স্বাভাবিকতা প্রদর্শনই কাব্যের কার্য্য। প্রবল আত্মসম্মান বোধ, এবং লয়লার তিরস্কার চারি বৎসর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি, যে, পাপের পথ বড় পিচ্ছিল; প্রতিপদে পতনশীলের গতিবৃদ্ধি হয়। পূর্ণ ক্ষমতা মুষ্টিগত করিবার জন্য নুরজাহান প্রতিদিন যাহা অনুষ্ঠান করিতেছিল, তাহার ভীষণতায় একদিন নিজেই কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। নুরজাহান যে লয়লার একদিনকার হঠাৎ রাগের কথায় বড় একটা পাপকার্য্য করিয়াছিল, তাহা নয়; অনুষ্ঠিত পাপ, "প্রতিহিংসার" নাম দিয়া ঢাকিতে গিয়া অর্থাৎ মনকে চোখ ঠারিতে গিয়া, পুণ্যময়ী লয়লার কথা আপনার নজীর বলিয়া খাড়া করিতে চাহিয়াছিল। অতি ক্ষুদ্র, লুকানো, নিস্তেজ পাপও একবার প্রশ্রয় পাইলে সকল পুণ্য গ্রাস করিতে পারে; তাই নুরজাহান বিষম আবর্ত্তে পড়িয়াছিল।

সমাজতত্ত্বের একটা অতি সূক্ষ্ম ও শিক্ষাপ্রদ সত্যের কথা বলিতেছি। কোন জাতি (যত উচ্চ হইলেও,) অন্য জাতিকে (অতি হীন ও দুর্ব্বল হইলেও) পরাজয় করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করা দূরে থাকুক, বরং শেষ ফলে নিজেই হটিয়া যায়। এদেশের আর্য্য-অনার্য্য সংঘর্ষণের পর আমাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, উহার মূলে ঐ সত্যটি লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সমাজতত্ত্ববিৎ ষ্টুয়ার্ট গ্লেনির ভাষায় ঐ কথাটি এই ভাবে আছে:

In the conflict of races, the conquerors are often the conquered, becoming merged in and modified by those whom they physically subdue. This is a truth of great sociological importance.

হয়ত এই ফল এড়াইবার জন্য একালের জেতারা অনেক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভাগ্যচক্র মানুষের চালাকি উপেক্ষা করিয়া ঘুরিয়া যায়। বিস্তৃত সমাজ সম্বন্ধে যাহা সত্য, প্রতি মনুষ্যের ইতিহাসেও তাহাই সত্য; কেননা মানবের সমষ্টিই সমাজ।

নুরজাহান যে প্রতিদিন বুদ্ধি করিয়া একটা নীতিজাল (১) রচনা করিয়া, প্রতিহিংসার জন্য, সেইটি ফেলিতেছিল ও তুলিতেছিল, একথা এ নাটকে নাই। কেননা কথাও তাহা নহে। আপনার সুখের মাত্রা চড়াইতে গিয়া, আপনার ক্ষমতা অটুট রাখিতে গিয়া, সে যত পাপ করিয়াছিল, তাহাতে সে একদিন নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী যেদিন মদমত্ততার আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুর-জাহান তুমি দেবী না মানবী?" সেদিন নুরজাহান বিকৃত কণ্ঠে বলিয়াছিল, "আমি পিশাচী।" এই রকমের গোটা-কতক কথা, নুরজাহানচরিত্রের অসীম সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জাগিয়া উঠিয়া সমুদ্রের প্রসার দেখাইয়া দিতেছে; নাহলে অবিশ্রান্তপ্রসার আয়ত্ত করা যাইতে পারিত না।

নুরজাহান যদি প্রতিহিংসার জন্যই কাজ করিতেছিল, এবং গৌরবের জন্যই লালায়িত ছিল, তাহা হইলে মহাবতের কাছে পরাজিতা হইয়া সে কাঁদিয়া কাটিয়া প্রাণ রক্ষা করিত না। যাহারা ক্ষমতার জন্য পাগল, এবং প্রতিহিংসায় উত্তেজিত, তাহারা অতি যৎসামান্য পরাজয়েই আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। কবি যদি একবার নুরজাহানকে এ অবস্থায় না কাঁদাইতেন, তবে এই বিষম জটিল চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না।

নুরজাহান সুন্দরী, নুরজাহান মোহিনী; তাহার রূপ-মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য ঘূর্ণিত হইয়া-ছিল। যে দিন নিয়তির নির্ম্মম ফুৎকারে সে ভেলকি উড়িয়া গেল, এবং নিজের উত্তোলিত আবর্ত্তে পড়িয়া নুর-জাহান ক্ষমতার তৃণ মাত্র ধরিয়া দাঁড়াইতে চাহিল কিন্তু পারিলনা, সেদিন সে পাগল হইয়া গেল। তীব্র লালসার (২) এই শেষ ফল, তাহার ঐরূপ পরিণাম, মড্‌সলের মস্তিষ্ক-রোগ গ্রন্থেও দেখিতে পাই। এই স্থানে অভিমানিনী লয়লার নূতন রূপ দেখিতে পাই। লয়লা, মোগল পরিবারের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিল, যে সম্পদজনিত সুখের অর্থ অপবিত্রতা। তাই সে দুঃখের দিনে অসহায় অন্ধ স্বামীকে, এবং সম্পদহীনা ভিখারিণী জননীকে বুকে টানিয়া সুখিনী হইয়াছিল। আমি নুরজাহান নাটকের সমালোচনায় কেবল নুরজাহানের কথাই বলিয়াছি। ইহাই বক্তব্য; কেননা অন্য চরিত্রের কথা কেবল নুরজাহানের চরিত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাত্র।

প্রত্যেক অঙ্কের টীকা না করিলে, অঙ্কে অঙ্কে যে সংযোগ আছে, তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। কিন্তু যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই সুস্পষ্ট হয় নাই কি, যে নুরজাহান চিত্রে কবি যে চরিত্র জটিলতা আঁকিয়াছেন, তাহার প্রতিরেখা বর্ণ-বৈচিত্রে এবং ভাবের উদ্বোধনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে? এ গ্রন্থে মানবচরিত্র বিশ্লেষণে কবি যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শিল্পের সহিত মিলিয়া মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

(১) নীতি শব্দ প্রাচীনের মত policy অর্থেই ব্যবহার করিলাম।

(২) মোগলগৃহের তীব্র লালসার কথা, বার বার বলিয়াছি। কিন্তু ঐ গৃহের বিদ্যাচর্চ্চার কথা বলি নাই। সারাসেনদিগের সভ্যতা এবং বিদ্যাচর্চ্চা, পূর্ণ মাত্রায় মোগল পরিবারে ছিল। দারা উপনিষদ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন; গ্রীক্ বিদ্যার পণ্ডিতেরাও মোগলদরবারে উপস্থিত থাকিত। শাজাহানের মুখে প্লেটোর গ্রন্থের কথা সেইজন্য এ গ্রন্থে অস্বাভাবিক নয়।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতি।

এক শক্তির অপর কোনো এক শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটা প্রধান বিশেষত্ব। সাম্রাজ্যমদমত্ততার আবেগে এক একটা জাতি কোটি কোটি প্রাণিহত্যা করিয়াও যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে ক্ষান্ত হয় নাই। নরশোণিতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, তবু পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। জগতের সম্মুখে আপনার শক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া তুলিবার এই আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জাতিকে অত্যন্ত স্ফীত ও সংকীর্ণমনা করিয়া রাখিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহের Rule, Britannia, জর্ম্মানরাজ্যের Deutschland uber Alles অর্থাৎ Germany over everything ইত্যাদি সংগীত তাহার পরিচায়ক।

কিন্তু এই "উৎকট" স্বদেশপ্রীতির শতাব্দীর মাঝে শান্তি ও সংযমের বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সমগ্র মনুষ্যজাতির ভিতরে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিবার জন্য যথার্থ চেষ্টা আজ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির ভিতরে দৃষ্ট হইতেছে। The Hague Peace Conferenceএর উদ্যোগিগণ, জর্ম্মান সোসিয়ালিষ্টগণ, ফ্রান্সের সোসিয়ালিষ্টগণ, জগতে সুদিনের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যাতে এক জাতি অপর জাতির সুখদুঃখে যথোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে, এক জাতি অপর জাতির প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে, যাতে একে অপরের রক্ত শোষণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ না করে, সেই জন্য আজ জগতের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র চেষ্টা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। এই প্রবন্ধে যে সমিতির কথা উল্লেখ করিব তাহারও সৃষ্টি এই মহৎ চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিবার জন্য।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতি বৎসরই বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক যুবক অধ্যয়ন করিতে আসেন; এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালী ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার মহা সুযোগ বিভিন্ন দেশ হইতে যুবকদিগকে এখানে আকৃষ্ট করে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্রস্থলে আশা ও আনন্দ লইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল যুবক আসেন, তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য বহুদিন অবধি একটী সমিতির অভাব বোধ হইতেছিল। সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতা বিদ্বেষ ভাব ও 'উৎকট' স্বদেশপ্রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঔদার্য্যে, সার্ব্বভৌমিক প্রীতিতে দীক্ষিত হন এই উদ্দেশ্য লইয়া একটী সমিতি স্থাপনের চেষ্টা হইল। ক্ষুদ্র চেষ্টার ভিতর দিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদ কত বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠে, সার্ব্বরাষ্ট্রিক (Cosmopolitan) সমিতির জন্ম তাহার একটী জ্বলন্ত প্রমাণ। উইস্কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রথমে এই সমিতি স্থাপনের সংকল্প করিলেন—স্বপ্নপ্রহেলিকার ন্যায় এই সংকল্প সুধু জাগিয়াই মিশিয়া গেল না, ইহা বিদেশী ছাত্রদিগকে যথার্থই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। ১৯০৩ সালের ১২ই মার্চ্চ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলটী বিদেশী ছাত্র কারল্ কাবা কামি (Karl Kawa Kami) নামক একজন জাপানী ছাত্রের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মিলিত হইলেন। একাদশটী বিভিন্ন জাতির মিলনের সৌন্দর্য্য তাঁহাদের হৃদয়ের আশা আনন্দ ও উৎসাহকে আরো যেন উন্মুখ করিয়া তুলিল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে উইস্কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে বিদেশী ছাত্রগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্বে সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বিদেশবাসকাল আনন্দে যাপন করিতে পারেন, যে স্থলে বিভিন্ন জাতি পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া জানিতে পারে। সেইদিনকার সেই সভাতেই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সভাপতি, ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। একজন আরমেনিয়ান সভাপতি, একজন নরউইজিয়ান্ সহকারী সভাপতি, একজন জাপানী সম্পাদক, একজন আমেরিকান্ ধনাধ্যক্ষ, একজন জর্ম্মান হিসাবপরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন; ষোলজন সভ্য লইয়া সমিতির সূচনা করা হইল। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সমিতি বেশী দিন চলিবে না। কিন্তু যে সংকল্পে বিধাতার মঙ্গলস্পর্শে এত শক্তি, এত উদ্যম, এত উৎসাহ লইয়া আইসে তাহা জয়যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। আশা

নিরাশা, জয় পরাজয়, সফলতা নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া এই ক্ষুদ্র সমিতিটী আজ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমিতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০ জন ইহার সভ্য। দুঃখের বিষয় আমাদের ভারতবর্ষীয় কোনো ছাত্র এখানে নাই; উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয় গোয়ালার ব্যবসায় (Dairy farming) শিক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট স্থান। আমাদের যুবকেরা যাহারা ঐ বিদ্যা ও ব্যবসায় শিখিতে চান, উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী যুবকেরা এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের অন্যান্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রগণের সম্মুখে এক নব আদর্শ স্থাপন করিলেন। ইহাঁদের দৃষ্টান্তে একে একে এরূপ সমিতি আজ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমি সংক্ষেপে আরো দু একটী সমিতির ইতিহাস আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে আমাদের দুই তিন জন বন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। এখনও একাদশটী ভারতবর্ষীয় যুবক এই স্থলে অধ্যয়ন করিতেছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একজন উৎসাহী আরগেণ্টাইন্ রিপাব্লিকান্ (Argentine Republic, S. A.) যুবকের নাম বিশেষ ভাবে যুক্ত। ইহার নাম মডেষ্টো কুইরোগা (Modesto Quiroga) কর্নেলের কোনো ভারতবর্ষীয় বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি কুইরোগা বিশাল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের নম্রতা, চরিত্রের মাধুর্য্য, কর্নেলের ছাত্র-মণ্ডলীকে তাঁহার ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তিনি যথার্থই জীবনে সাধনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন "Above all nations is humanity." উইস্কন্সিনের দৃষ্টান্তে বিদেশী যবকদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করিবার জন্য কুইরোগা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি কালেজের কোনো কোনো অধ্যাপক ও বন্ধুদের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ১৯০৪ সালের ১০ই নভেম্বর বারন্ হলে এক মহতী সভা আহুত করিয়া তাহার প্রস্তাবকে সফল করিয়া তুলিলেন; কর্নেলের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফেসার কমষ্টক, বেইলি, বিষ্টল, প্রভৃতি মনীষিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে কুইরোগার এই মহৎ চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; এক পক্ষ মধ্যে আর একটী সভা আহুত হইল; রুসিয়ার একজন ছাত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; কর্নেলের বহুসংখ্যক অধ্যাপক, ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাকে মহাগৌরব দান করিয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে একখানি গৃহ ভাড়া করিয়া সমিতির কেন্দ্র-স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। সভাপতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহখানিকে সুসজ্জিত করিলেন; বিভিন্ন জাতির পতাকা সংগ্রহ করিয়া গৃহে রক্ষিত হইল; এমন মিলন, এমন বিচিত্র সমাবেশ, জগতের সুদিনের মহাশান্তির সম্ভাবনাকে ঘোষণা করিতেছে।

এদেশে যতগুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কর্নেলের সমিতি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার মোট সভ্যসংখ্যা ৩৫০ জন। ভারতবর্ষীয় যুবক বাবু ইন্দুভূষণ দে মজুমদার কিছুদিন এই সমিতির সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতিটীর বিবরণ কিছু লিখিব।

আমেরিকার নয়টী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইলনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয় একটী। এদেশে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃষিকালেজের খুব খ্যাতি আছে। এতদ্ব্যতীত Engineering, Ceramics প্রভৃতি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত এখানে বেশ ভাল। এই শিক্ষা-কেন্দ্রে বিদেশী যুবকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিল। কতিপয় উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় ১৯০৬ সালের ২৭শে অক্টোবর সমিতি স্থাপিত হইল; আমাদের তিনজন বাঙ্গালী যুবক তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে-ছিলেন। তাঁহারা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে যোগদান করিলেন। বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে সমিতিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটী প্রধান স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে। কতিপয় অধ্যাপকের

ইলিনয় সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতি

এই চিত্রে চীন, মেক্সিকো, আর্জেণ্টাইন রিপব্লিক, স্পেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ-আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও গ্রীসদেশের ছাত্র, এবং অধ্যাপক ট্, সী, বল্ডউইন আছেন। কেবল তাঁহারই গোঁফ আছে। তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট লেখক শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রথীন্দ্রনাথের ঠিক পশ্চাতে বা উপরে দণ্ডায়মান শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। উপর হইতে দ্বিতীয় সারির সর্ব্ব দক্ষিণে দণ্ডায়মান শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজনগরের একুশ রত্ন মঠ

সহানুভূতিতে, সভ্যদের উৎসাহে সমিতিটীর কার্য্য অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষীয় যুবকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিনটী বাঙ্গালী যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে সার্ব্বরাষ্ট্রিক সমিতি উত্তরোত্তর প্রাধান্যলাভ করিতেছে। বিগত ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি হইতে প্রতিনিধিদিগকে লইয়া উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। এ দেশের সমিতিগুলিকে আরো সতেজ করিয়া তুলিবার জন্য এই সভা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাতে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয় তন্নিমিত্ত এই সভা বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি The Hague Peace Conferenceএ আমেরিকার প্রতিনিধি মাননীয় এনড্রু ডিঃ হোয়াইট্ (The Hon. Andrew D. White) আমাদের সমিতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যে কার্য্যে, যে উদ্দেশ্যে Hague Conference নিযুক্ত, তোমরাও সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ।"

আমাদের সমিতির কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে এখনো কিছু উল্লেখ করি নাই। সাধারণতঃ জনসাধারণের জন্য মাসিক একটী করিয়া সভা আহূত হয় এবং বিভিন্ন দেশের এক একজন যুবককে তাহার নিজের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলিতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের কাহিনী, নানাপ্রকার সঙ্গীত, ইত্যাদিতে সভাগুলি খুবই উপাদেয় হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীগণ উৎসাহের সঙ্গে ইহাতে যোগদান করেন।

মাঝে মাঝে এক এক জাতিকে এক একদিনের সমস্ত কার্য্যপ্রণালীর ভার লইতে হয়। এই "series of national nights" আমাদের সমিতির একটী বিশেষত্ব। এদেশের ছাত্রছাত্রীগণ খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সকল অভিনব ব্যাপারে যোগদান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রগণ 'Indian night" সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় পতাকা ও দেশোৎপন্ন দুএকটী দ্রব্য দ্বারা গৃহখানি সজ্জিত করিয়া সমবেত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ভারতের কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন; একজন যুবক এস্রাজের সুমধুর ঝঙ্কারে উৎসবের অঙ্গকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সে দিনকার সে উৎসবের মাধুর্য্য উপস্থিত জনসাধারণের স্মৃতিতে আজো স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আজো বহুজনের কাছে এস্রাজ যন্ত্রের ব্যাখ্যা ও গুণকীর্ত্তন করিতে হয়।

সাধারণ সভা ব্যতীত মাঝে মাঝে সভ্যগণ একত্র হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। বৎসরে একবার বহু আড়ম্বরে সমিতির ভোজ হয়। এতদ্ব্যতীত কখনো কখনো বন-ভোজন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বদাই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নির্দ্ধারণ করেন। যাহাতে বিভিন্ন জাতি ও দেশকে আমরা যথার্থ খাটি ভাবে বুঝিতে পারি, যাহাতে একে অপরের কোনো প্রকার স্বতন্ত্রতার জন্য ঘৃণা পোষণ না করে, আমাদের শিরায় শিরায় যে একই রক্ত প্রবাহিত ইহা আমরা যাহাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি, আমাদের সমিতির কার্য্যকলাপ সেইদিকেই চালিত হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য, ও নব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের সমিতি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ক্ষুদ্র হইতেই বৃহতের সৃষ্টি হয়। কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জাপানী ছাত্রের কক্ষে যে সমিতিটী ষোলটী মাত্র সভ্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আজ অতি অল্পকাল মধ্যে এদেশের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহা নব নব আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যসংখ্যা নয় শত। যে উদ্দেশ্য, যে আকাঙ্ক্ষা এতগুলি প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা যে জগতে মহাকল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমস্ত দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, নিষ্পেষণ ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসানে মানব জাতির ভিতরে যে মহাশান্তি বিরাজ করিবে,—এই সকল

ক্ষুদ্র চেষ্টা সেই ভবিষ্যতের সুদিনের সম্ভাবনাকে সূচিত করিতেছে। সমিতির সভা গৃহে যখন জাপান, চীন, ফিলিপাইন, পারস্য, গ্রীস্, স্পেইন, ইতালী, জর্ম্মানি ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আগত বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হই, তখন যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারি—"মোরা মিলেছি সব মায়ের ডাকে।"

স্বপ্নরাজ্যের গান।*

লুকায়ে রেখেছিলাম হৃদয় আমার
রবি-দৃষ্টি হ'তে দূরে গোলাপের নীড়ে,
দুগ্ধ-ফেন হ'তে সেই অতি সুকোমল
গোলাপের অন্তরালে মোর মনটিরে!
ঘুমায় না মন কেন, চমকিয়া উঠে,
একটি গোলাপপাতা যদিও না দুলে?
ঘুম কেন অকারণ থাকি থাকি টুটে?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে!

চুপ কর, বলিলাম, পেলব পল্লব
তীক্ষ্ণ-রবিকরজাল দিয়েছে ঢাকিয়া;
তোর চেয়ে অশান্ত সে বায়ুর তাণ্ডব
ঘুমে পড়ে সাগরের উরসে ঢলিয়া।
কণ্টকের সূচীমত কোনো কি আঘাত
জাগায় অশান্তি তোর, বল্ দেখি খুলে।
অথবা হতাশা করে ঘুমের ব্যাঘাত?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে!

মাতৃভূমি—যার নাম সুজলা সুফলা,
স্বপ্নরাজ্য সম যার অগণিত সুখ,
ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাহিয়া কমলা
অচেতনে ভরেছিল আমাদের বুক!
জাগানিয়া গান এবে যার কণ্ঠে ঝরে,
হৃদয় ঘুমাতে নারে, জাগে ঢুলে ঢুলে।
শোনে না কাহারো বাণী, কি হয়েছে ওরে?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

* সুইনবর্ণের কবিতার ভাবানুবাদ।

একটী লাভজনক ব্যবসায়।

সে দিন আমরা নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত "ভওয়ালী" নামক একটী স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা নানা কারণে নাইনিতাল-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের আকর্ষণের স্থল। বাঙ্গালী-গৌরব শ্রীমৎ সোহহং স্বামীর আশ্রম এই স্থানে অবস্থিত। এই আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী পূতসলিলা গিরিনদীর তটভূমি হিন্দুদিগের চির-বিশ্রামের স্থল। সোহহং স্বামী এই শ্মশানের অধিষ্ঠাতা দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করিয়া মৃতের সৎকারে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রম শোকার্ত্তের শান্তিস্থল। এই ভওয়ালীর পথ দিয়াই বদ্রীনাথ, কেদারনাথের যাত্রিগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন। সম্মুখে বিশালবপু গর্গাচলশ্রেণী অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। এক্ষণে ইহার পৌরাণিক নাম ঘুচিয়া "গাগররেঞ্জ" নাম হইয়াছে। ইহারই এক স্থানে মহামুনি গর্গের আশ্রম ছিল। তাঁহার পদরেণু মাখিয়া এই শৈলভূমি চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে; শত শত বর্ষের বারিপাতেও তাহা যেন বিধৌত করিতে পারে নাই। এই গর্গাচল-পাদমূলে বিবিধ বন্যবৃক্ষ, লতাগুল্ম এবং অরণ্য-পুষ্পতরুশোভিত ক্ষুদ্র শৈলরাজীপরিবেষ্টিত একটী উপত্যকা-ভূমি আছে। এই উপত্যকাভূমিতেই ফলপুষ্পোদ্যান-সংলগ্ন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর আশ্রম রহিয়াছে। আমরা সেই চির-নবীনা চিরবিস্ময়োৎপাদিকা, নয়নের চিরতৃপ্তিদায়িনী মনোমোহিনী প্রকৃতি সতীর সৌন্দর্য্য-জগতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা উদ্দেশ্যহারা হইয়া ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছিলাম। অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত ভূমিতে পদার্পণ করায় ক্ষণকালের জন্য এই সংসার-তাপ-তপ্ত শুষ্ক আমাদেরও হৃদয় সরস হইয়া উঠিয়াছিল; বিষয়-বিষদিগ্ধ চিন্তাক্লিষ্ট মনও ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ শান্ত হইয়াছিল। আমরা ক্রমে "সপ্ততাল", "ভীমতাল" এবং শ্বেতশতদলশোভিত "নবকুচিয়া তাল" দেখিতে দেখিতে পুনরায় ভওয়ালীর পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম বটে কিন্তু ১৬।১৭ মাইল পার্ব্বত্য প্রদেশের পথশ্রমে ইতি-মধ্যেই আমাদের মোহ ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার উপর ভওয়ালী প্রত্যাগমন করিয়া তথাকার তার্পিনের কারখানায়

প্রবেশ করিলাম। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রের মৃত্তিকার কঠোর স্পর্শে, প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর উত্তাপে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহের ফুটন্ত তার্পিনের তীব্র গন্ধে এবং কারখানার ঘর্ঘর ধ্বনিতে আমাদের কল্পনার ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছিল। তখন কারখানার কার্য্য পরিদর্শন করিতে করিতে তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়কে চীড় গাছ (Pinus Longifolia) হইতে রস নিষ্কাসন, রস হইতে তৈল বহিষ্করণ এবং তাহার ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন পরম্পরায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। তিনি ধীরে ধীরে স্বীয় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আমাদের তখন এই পাইনবৃক্ষবহুল প্রদেশে তার্পিনের কারবার বেশ লাভজনক বলিয়া ধারণা জন্মিল। চীড়গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। তাড়িওয়ালারা যেরূপ তাল গাছ হইতে রস গ্রহণ করে চীড়গাছ সেইরূপ ক্ষত (tap) করিয়া রস লইতে হয়। একটী চীড়গাছ হইতে গড়ে ২॥ সের ১১ পোয়া আন্দাজ রস বাহির হয়। মার্চ্চ মাসের ১৫ই হইতে নভেম্বর ১৫ই পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৎসরে ৮ মাস কাল এই কার্য্য চলিতে থাকে। একটা গাছ হইতে ৫ বৎসর রস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রস গামলায় জমা করা হয়, পরে তাহা টিনের কেনেস্তারায় করিয়া কারখানায় পাঠান হয়। সেই কাঁচা ও অসংস্কৃত (crude) আঁঠা তখন গলাইয়া ময়লামাটি বাহির করিবার জন্য ছাঁকিয়া লওয়া হয়। অতঃপর সেই কাঁচা আঁঠা একটী ঢাকনিদার (cylinder boiler) বাষ্পস্থালী বা পাকপাত্রে জ্বাল দেওয়া হয়। ভাঁটিতে যখন উহা বেশ ফুটিয়া উঠে তখন একটী 'ইউ' আকৃতির ফানল (U shaped funnel) দিয়া অল্প অল্প জল তাহাতে দেওয়া হয়। ফানলটা বাষ্পশরণি বা বাষ্পনিঃসারণ দ্বারের কাজ করে। এই অল্প অল্প জল সংযোগে উহা বাষ্পাকারে একটী লম্ব-নালী (tube) দিয়া বাষ্পগাঢ়কারক যন্ত্রে (condenser) গিয়া পড়ে। এই লম্ব-নালীর সহিত বাষ্পগাঢ়কারক যন্ত্রমধ্যস্থ একটী কুণ্ডলীকৃত নলের (coiled tube) যোগ আছে। কণ্ডেন্সরের বাহিরে যে পিত্তল-পাইপ (brass cock) আছে তাহার ভিতর দিয়া বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল ও তার্পিনে পরিণত হয়। ঐ মিশ্র পদার্থ একটী তাম্র পাত্রে গৃহীত হয়। ঐ তাম্রপাত্র-সংলগ্ন, দুইটী পিত্তল-পাইপ আছে। একটী নিম্নে ও একটী মধ্যভাগে। তার্পিন জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে এবং জল নিম্নস্থ পাইপ দিয়া বাহির হইয়া যায়। তৈলাংশ তখন মধ্যস্থ পিত্তলনালী দিয়া বোতলে ধরা হয়। তখনও ঐ তার্পিন বিশুদ্ধ নহে, কারণ তখনও উহাতে অতি সামান্য জলীয় পদার্থ থাকিয়া যায়। এজন্য বোতলগুলি রৌদ্রে রাখা হয়। সূর্য্যের রশ্মিযোগে তার্পিন পরিষ্কার হইতে থাকে এবং জলীয়ভাগ তলায় পড়িয়া যায়। তখন ফানলের মুখে ব্লটিং কাগজ রাখিয়া বোতলস্থ তৈল টিনের কেনেস্তারায় ছাঁকিয়া রাখা হয়। এই সকল টিনের মুখ বন্ধ করিয়া দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

উপরে তার্পিনের সঙ্গে মিশ্রিত যে জলের কথা বলা হইল, তাহা সাধারণ জল নহে। উহাতে Acetic Acid, Pyroligneous acid ও Wood spirit থাকে, কিন্তু ইহাদের পরিমাণ এত অল্প যে তাহা কোন লাভ জনক কাজে লাগান যাইতে পারে না। চার মণ কাঁচা (crude) আঁঠা হইতে ২৪ গ্যালন বা ২ মণ ২৮ সের তৈল ও ৩৫।৩৬ সের হইতে ১ মণ পর্য্যন্ত রজন উৎপন্ন হয়। চার মণ কাঁচা আঁঠা হইতে ২ মণ ২৮ সের তৈল বাহির হইলে ভাঁটির কাজ বন্ধ করা হয় এবং ভাঁটির গায়ে সংলগ্ন পিত্তল নালি দিয়া রজন বাহির করিয়া লওয়া হয়। সে সময় রজন অতিশয় তরল থাকে। উহা বাহির হইবার কালে ছাকনি কাপড়ের ভিতর দিয়া একটী লৌহ কটাহে পড়ে এবং তাহা হইতে কেটো বা বারকোসে রাখা হয়। ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে উহা জমাট বাঁধিয়া রজন হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া বস্তাবন্দী করা হয়। রজন ছাপার কালি (Printing ink), বার্ণিস, ছিট (Calico printing) এবং দেশী গালার চুড়ীতে ব্যবহৃত হয়। তার্পিন-ও রং, বার্ণিশ, এবং ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। এই ভওয়ালীর কারখানার কার্য্য ১৮৯৬-৭ অব্দে আরম্ভ হয়। তখন বৎসরে ৭ শত গ্যালন তার্পিন ও প্রায় সাড়ে তিন শত মণ রজন প্রস্তুত হইত। তখন এই কারখানা শ্রীযুক্ত হরিদত্ত জোষী রেঞ্জর ও ডেপুটী-রেঞ্জর শ্রীযুক্ত রবিদত্তের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৯ অব্দে ইহার মাল খারাপ হওয়ায় কাজের উন্নতি হয় নাই। তখন কার্য্য চলিবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকের

সন্দেহও হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইয়া অনেক ব্যবসায়ই উৎসন্ন গিয়াছে। এমন কি এই তার্পিনের ব্যবসায়ই পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জেলায় আশাজনক বলিয়া বোধ না হওয়ায় বন্ধ হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ ১৯০৬ অব্দের ১৪ই মে তারিখের পাইওনিয়র পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"The Punjab Government has tried the distillation of turpentine on a small scale at Nurpur, in the Kangra District, as an experiment. The Forest report of the last year announces the closing of the small Nurpur factory without giving any explicit reason for the same. Two reasons are assigned (1) that the trade in the raw material is more profitable than the distillation of the turpentine oil, (2) that the tapping is injurious to the life of the trees. When the consumption of turpentine is obviously so great, there seems no reason why the manufacture of the last product out of a raw material in this case should be less paying than the trade in the raw material itself. Having devoted some time to this industry, I am of positive opinion that the turpentine distillation cannot but be very profitable, especially when the Government itself takes the industry in hand because of the great pine forests at its disposal. In France and America enormous quantities of this oil are distilled and very little injury is done to the life of the tree. In Japan, I have seen, with my own eyes, the operations of such a distillery and their experience in tapping says nothing against the life of the trees. * "

ভওয়ালীর কারখানার ভার ১৮৯৯ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী Forest Ranger মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় উহা স্থায়ী হইয়া যায়। তিনি ডেপটী কনজারভেটর শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেবের উৎসাহ পাইয়া ৬ বৎসরের শ্রম ও যত্নে ইহাকে একটী বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেন। তাঁহার চেষ্টায় এই কারখানা হইতে বার্ষিক আট হাজার গ্যালন তার্পিন ও তিন হাজার ছয় শত মণ রজন উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রথমে ইহাতে খরচ পড়িত ১২।১৩ শত টাকা আর আয় হইত ১৪।১৫ শত টাকা। সুতরাং দুই শত বা আড়াই শত টাকা মাত্র লাভ থাকিত। সেইস্থলে এক্ষণে ১৭।১৮ হাজার টাকা খরচে ৩২।৩৩ হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। এখানকার উৎপন্ন তার্পিন রেলওয়ে এবং অর্ডনান্স তোপখানায় (arsenal) অধিক সরবরাহ হয়। যৎসামান্য যাহা বাকি থাকিয়া যায় (প্রায় ২০০ গ্যালন) তাহা খুচরা বিক্রয় হয়। এই উন্নতির কারণ তিনকড়ি বাবুর অভিজ্ঞতা। তিনি এই শিল্পবিজ্ঞানে স্বয়ং পরিপক্ক। হাতে কলমে কাজ করিতে সমর্থ। তাঁহার জ্ঞানের সহিত ক্যাম্বেল সাহেব ও লভগ্রোভ সাহেবের উৎসাহ এই উন্নতির অন্যতম কারণ। এই তার্পিন বিলাতী হাব্বকের তার্পিন হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে অথচ মূল্যে গ্যালন প্রতি প্রায় ৸০ হইতে ১৲ সস্তা পড়ে। এখানকার রজন মার্কিন রজন হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কানপুরে মার্কিন রজনের আমদানি আছে। ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় উহা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানকার রজন মণ প্রতি ৫৲ টাকা ও তার্পিন এক গ্যালনে (৪৷৷০ সের) ২৸০ পড়ে। পাইকারদিগকে ২৷০ হইতে ২৷৷০ টাকা গ্যালন হিসাবে দেওয়া হয়। রজন প্রায় সমস্তই কানপুরস্থ এজেন্টের নিকট প্রেরিত হয় এবং তথায় বাজার দরে বিক্রয় হয়। তথায় গড়ে মণ প্রতি ৫৷৷০ হইতে ৬৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত পড়ে।

নাইনিতাল হইতে কিছু দূরে ক্ষুরপাতাল প্রভৃতি স্থানে এবং আলমোড়া প্রভৃতির জঙ্গলে অতি উৎকৃষ্ট তার্পিন গাছ জন্মে। এখনও এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অল্প। যদি চীড় জঙ্গল জমা লওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে তার্পিনের কারখানা খুলিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হয়। অন্যথা এখানকার কোন কোন স্থানের পার্ব্বত্য ভূমি ক্রয় করিয়া বা খাজনা লইয়া তাহাতে চীড় গাছের চাষ করিয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। অবশ্য এজন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন; এবং যিনি স্বয়ং এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা বা হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেন নাই তাঁহার সিদ্ধিলাভেও সন্দেহ আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

দুঃখ।

দুঃখ একাকী রোদে বরষায়
চষিয়া প্রাণের ভূমি,
কর্কশ হাতে বুনে চলে যায়
প্রেম বীজ। শেষে তুমি,
ওরে সুখ, এসে চোরের মতন
ফসল লুটিবে পরে ?
গচ্ছিত আমি রাখিব এ ধন
রাজাধিরাজের ঘরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাজনগর।

অত্যুত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুলা বিভীষিকাময়ী পদ্মার দক্ষিণ তটে প্রায় পঁয়ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল বিলদাওনিয়া, তখন উহা বিলপরিপূর্ণ বিরল-বসতির একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদরায় কেদার-রায়ের বড় সাধের শ্রীপুর নগরী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর, রাজনগরের ন্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

রাজনগর সে সময়ে সত্য সত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা "নবরত্ন", "পঞ্চরত্ন" "সপ্তদশরত্ন" বা "শতরত্ন" ও "একবিংশরত্ন" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও স্থপতি-কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্যে বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যিনি এ সমুদয় অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না! কিন্তু হায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকাসমূহ চিরদিনের জন্য পদ্মার রাক্ষসী-উদরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। পদ্মার তরঙ্গপ্রহারে বিক্রমপুরের যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। বিক্রমপুরের যাহা কিছু দেখিবার এবং গৌরবের ছিল সে সমুদয় গ্রাস করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" এই অপনাম লাভ করিয়াও ক্ষুধিতা পদ্মার ভীষণ ক্ষুধার শেষ হয় নাই, এখন বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের শেষ কঙ্কাল-চিহ্ন, বঙ্গের শেষবীর চাঁদরায় কেদার রায়ের মাতার শ্মশানোপরি বিনির্ম্মিত রাজাবাড়ীর সুবিখ্যাত মঠটি গ্রাস করিবার জন্য এই রাক্ষসী অত্যন্ত ব্যগ্র;—পদ্মা বর্ত্তমান সময়ে এই মঠের দুই তিন খানা মাত্র ক্ষেত্রের অন্তর দিয়া প্রবাহিতা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্ত্তি-গরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। যখন রাজনগর নির্ম্মিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মার চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলে নৃত্য করিবে! শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা রাজনগরের বহু উত্তর দিক্ দিয়া ক্ষীণ কলেবরে পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইত। সে সময়ে জনসাধারণে ইহাকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিত করিত। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে এইক্ষুদ্র খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জন-সাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রথের চক্রের আবর্ত্তনে কালক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ার জেনেরেল

জেমস রেনেল, এফ্, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে পদ্মানদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেন্দিগঞ্জ নামক স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন রাজনগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একটী খাল থাকায় এস্থানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও "রাজসাগর", "পুরাতন দীঘি", "কালীসাগর", "কৃষ্ণসাগর", "মতিসাগর", "শিব পাড়ার দীঘি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় সমূহ এস্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত অন্য দিকে আবার তেমনি "নারিকেলতা", "মান্দারিয়া", "চাক্‌লাদার পল্লী," "ভরদ্বাজ পল্লী", "রাইয়ত-পাড়া" প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লীসমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্ব্বদাই আমোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের ঘরেই মরাই-ভরা ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি তরোয়াল খেলা নয়ত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদে দিন কাটাইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্ত্তমানের ভয়ঙ্করী অন্নচিন্তায় কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না। এস্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক্, গন্ধবণিক্, তন্তুবায় প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের যত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়েও বিক্রমপুরের কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না।

সেকালের রাজনগরবাসিগণের কেবল যে আমোদ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, শিক্ষার প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবিষয়ে তাঁহারা সবিশেষ মনোযোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারসী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্য বাংলা শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভির নিকট পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভার্থ দুইবেলা পুঁথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে যাইত। অন্তঃপুরেও শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিদুষী আনন্দময়ী ও গঙ্গাদেবীর সুমধুর কবিত্বঝঙ্কারে বর্ত্তমান বিদুষী মহিলাগণও গৌরবান্বিতা বোধ করিতেন না। শ্রীযুক্তবাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থেও এই বিদুষী কবিদ্বয়ের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান হৃদয়ঙ্গম করা মানববুদ্ধির অগোচর। বিক্রমপুরবাসীর দুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্ত্তিনাশার তরঙ্গ-প্রহারে রাজনগর চিরদিনের জন্য লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে রাজনগরের দ্রষ্টব্য জলাশয় গুলি ও ইমারতাদির বিবরণ প্রদান করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই মহারাজা রাজবল্লভের বাসগ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্ব্বদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই "রাজসাগর" নামক একটী হ্রদের ন্যায় প্রকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও সুপেয় ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ-বধূগণের জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর থাকায় এস্থান সর্ব্বদাই জন-কোলাহলে মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিমতটে স্থপতিকৌশলের নিদর্শন স্বরূপ

নানা কারু-কার্য্য-খচিত দুইটি দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটিতে "মহাপ্রভু" নামক দেবতা ও অপরটিতে 'জগন্নাথদেব' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে এই বিগ্রহের অর্চ্চনা ও যথারীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার গগন-ভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অন্যান্য তীরে নানাজাতীয় বণিকবৃন্দ পরমানন্দে বাস করিত। এই সরোবরের বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদি ইহার এক তীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত তবে অপরতীর হইতে তাহা শুনা যাইত না। মৃদু পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত।

পুরাতন দীঘি।

আমরা পূর্ব্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে পুরাতন দীঘি নয়ন-গোচর হইত। রাজসাগর অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই দীঘির পশ্চিমতটে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত দুইমাস কাল স্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা "কাল-বৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের কার্ত্তিকবারুণীর মেলা অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থানে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ব্ববঙ্গের আর কোথাও সেরূপ হইত না। শতাধিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ষোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকস্থ অগণন দর্শকবৃন্দের কল কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত।

পুরাতন দীঘি ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে মহারাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীর তোরণ দ্বার দৃষ্টি অবরোধ করিত। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আবাসবাটীও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দীঘির পশ্চিমতীরের উত্তর দিক হইতে একটি রাস্তা বরাবর পশ্চিমদিকে গিয়াছিল। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথটি রাজনগরের "পুরাতন দরজা" নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিমদিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বাড়ী ছিল। এখানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে "নবরত্ন" নামক রমণীয় প্রাসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

নবরত্ন।

একটি চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকার হলের চারিদিকে চারিটি ও প্রত্যেক কোণে এক একটি চতুষ্কোণ মঠ ও দুইটি মঠের প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটি "ঝিকটি ঘর" (যে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের দোচালা ঘরের ন্যায় চাল) সন্নিবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুর্দ্দিকস্থ ঝিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হাত উচ্চ ছিল। এই অট্টালিকা ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উহার প্রাচীরের গায়ে নানা প্রকার লতা, পাতা ও ফুল ফল অঙ্কিত থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত।

একবিংশরত্ন।

ইহাই রাজা রাজবল্লভের বাড়ীর সিংহ দরজা বা তোরণ-দ্বার ছিল। পুরাণ দীঘির পশ্চিমতটস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই এই সুবিশাল তোরণদ্বার দৃষ্টিগোচর হইত। এই তোরণদ্বার একটি ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথম তলের নিম্নে সিংহদ্বার, ইহার ছাত অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে নির্ম্মিত ছিল এবং ইহার নিম্নস্থ পথ এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটি হস্তী হাওদাসহ পাশাপাশিভাবে যাতায়াত করিতে পারিত। এই দ্বারের দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদী ছিল, উহাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

এই তোরণদ্বারপার্শ্বস্থ উভয়দিকের একতল অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে রাজকীয় সৈন্যগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতি কোণে এক একটি মঠ ও সম্মুখস্থ দুই মঠের

মধ্যাংশে ও সিংহ দরজার উপরে তিনটি "ঝিকটি" ঘর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পূর্ব্বগগন লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যখন বিহঙ্গম কুল বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া মনের আনন্দে সুমধুর স্বর-লহরীতে চারিদিকে সুধাবর্ষণ করিত, তখন এ সকল ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের সুমধুর প্রভাতীরাগিণী সানাইয়ের মোহিনী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার করিয়া দিত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটি মঠ ও ত্রিতলের ছাতের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয় পার্শ্বের মঠগুলি ক্রম-নিম্ন থাকায় দূর হইতে ইহাকে ধনুকের উপবার্দ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

পশ্চিমদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একাকী দ্বিতল অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ এস্থান হইতে বাদ্যধ্বনি করিত। সেঘরার উত্তরদিকে কারুকার্য্যখচিত একটি ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজা রাজবল্লভ এককোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া তাহার উপরে ঐ ঘরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রথম তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণদ্বার। ইহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে "রঙ্গমহাল" নামক সুসজ্জিত ও কলা-নৈপুণ্য-পূর্ণ বৈঠকখানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটি মন্দিরে বাসুদেব নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল। সেই সিংহদ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ "সপ্তদশরত্ন" বা "শতরত্ন" নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

সপ্তদশ রত্ন বা শত রত্ন।

একটি উচ্চ চারিতল অট্টালিকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত ছিল যে প্রত্যেক উর্দ্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল, এবং প্রতিতলের কোণে এক একটি সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ-উচ্ছৃঙ্খলতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুই দল বাঁধিয়া গানের প্রতিযোগিতা চলিত সে সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে ঐ সর্ব্বোচ্চতলস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজবল্লভের স্থাপিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কুম-রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই বাসোপযোগী এক একটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদূর্দ্ধতলে আরোহণ করিবার জন্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী নির্ম্মিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইত। বিশাল মহীরুহরাজি ছোট ছোট গুল্মের ন্যায় এবং অদূরস্থ রথখোলার নদীকে একখানি শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেড় শত হাত উচ্চ ছিল। শতরত্ন মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্টালিকায় বৈষয়িক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইত ও সেঘরের পার্শ্বস্থ একটি ঝিকটি ঘরে মাতা সর্ব্বমঙ্গলা শরতে পূজিতা হইতেন। পদ্মার অপর তীর হইতে লোকে শতরত্ন মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা নদীতে পাড়ি ধরিত।

পঞ্চরত্ন মঠ।

এই প্রাঙ্গণেই পঞ্চরত্ন নামক সুন্দর শিল্প-চাতুর্য্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনগরের মধ্যে শিল্পচাতুর্য্যে ও স্থপতি-নৈপুণ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহাকে "পঞ্চরত্ন" মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটি মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণ দেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটি মন্দিরের প্রত্যেকটির প্রাচীর গাত্রেই নানাবিধ দেবদেবী ও লতাপাতার চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে

রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তঃপুরখণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর খণ্ডের চারিধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার ভিতরেই বহু প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। উত্তরভাগের অট্টালিকাটি ত্রিতল ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলি একতল ছিল। ত্রিতল অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে মহারাজার শয়ন-কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া সে স্থানেই বাস করিতেন।

রাজবল্লভের বাড়ীর পশ্চিমদক্ষিণ কোণে তাঁহার গুরু কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাসভবন ছিল। ইঁহার বাড়ীতেও তোরণদ্বার এবং মনোহর অট্টালিকা সমূহ বিরাজমান থাকিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

আমরা পূর্ব্বে রাইতপাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরান্তর্গত যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছি সে সব স্থানেও বিস্তৃত সরোবর, মঠ ও বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। হাণ্টার সাহেব তৎসংকলিত ঢাকার Statistical Accountএর একস্থানে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাকে "Splendid residence" বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে ক্ষুদ্র রথখোলার নদী ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য রাজনগরের অতুল গৌরব-প্রভা প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চিরদিনের জন্য যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার স্মৃতি আর কতদিন থাকিবে? মহারাজা রাজবল্লভের এসকল কীর্ত্তিস্তম্ভ যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। রাজনগরের এই দারুণ দুর্গতির সময় শ্রীহট্টনিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন। তিনি রাজনগরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের দুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন। আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; নচেৎ পাঠকদিগকে সে কবিতার রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রাখিতাম না, আর সামান্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে বলিয়া বিরত হইলাম।

মহারাজা রাজবল্লভকে ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণেই চিত্রিত করুন না কেন তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কেহ কোনওরূপ আপত্তি করিতে পারেন না। রাজবল্লভ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার কন্যা অভয়ার অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যা রাজবল্লভের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া বিশেষ আদরের ছিল। কিন্তু বিধাতার লীলা মানববুদ্ধির অগোচর। এই বালিকা বিবাহের অত্যল্পকাল পরে বিধবা হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু-সমাজের পৈশাচিক অত্যাচার দূর করিবার জন্য ও তাহাদের পুনর্বিবাহের নিমিত্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মতামত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা বাল বিধবাগণের বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পাতি দিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শঠতায় নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ মত দেওয়ায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে নাই। কারণ সেকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্য্যই শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই একটি মাত্র মহৎকার্য্যের সূচনার জন্যও সমাজের সংস্কারেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তাঁহার নাম গৌরবের সহিত অঙ্কিত থাকিবে।*

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

* আমাদের একুশ রত্ন মঠের চিত্রখানি প্রায় চল্লিশ বৎসরের পুরাতন। ইতিপূর্ব্বে কোনও মাসিক পত্রিকাদিতে কিংবা কোনও গ্রন্থে ইহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানি না। "গোকার-দপ্তর" প্রণেতা আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ সুকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয় এই ফোটো খানার সন্ধান বলিয়া দেন। পরে আমার বাসগ্রামস্থ বিক্রমপুরান্তর্গত মূলচর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার কল্যাণ-ভাজন শ্রীযুক্ত ভজহরি সরকারের যত্নে ইহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের এই অযাচিত উপকারের জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই চিত্রখানা দৃষ্টে পাঠকগণ রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদাবলীর গঠন-নৈপুণ্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এখানে আর একটা কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করি। অনেকের বিশ্বাস যে পদ্মার প্রবল তরঙ্গে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিধ্বংস হওয়ার পর হইতেই পদ্মার নাম "কীর্ত্তিনাশা" হইয়াছে। কোন কোন সাহিত্যসেবীকেও এইরূপ লিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু ইহা ভুল—চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিনাশ হেতুই ইহার নাম কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। পরে রাজবল্লভের কীর্ত্তিরাশি ধ্বংস করায় উহা আরও দৃঢ় হইয়াছে। ১২৭৬ সনে রাজনগর কীর্ত্তিনাশায় প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সার্ভে ম্যাপেও পদ্মার নামের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তিনাশা লেখা আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত "A sketch of the topography and statistics of Dacca" নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে "The first of these channels, which is represented as the Calliganga in Rennel's Maps, is now called the Kirtinessa, or Seeripore river." অতএব বিক্রমপুরের সন্নিকটস্থ পদ্মার নাম "কীর্ত্তিনাশা" যে রাজবল্লভের রাজনগরের ধ্বংসের পূর্ব্বে চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তিগ্রাস করায় হইয়াছে ইহাই ঠিক।—লেখক।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস?

একদিন যে শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাঁহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মত সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে বিচিত্র, আলোকময়, উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি, শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্য্যরা অনার্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্য্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখনো অনার্য্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তারপর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে একথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্য্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্য্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্ব্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে? বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে যে বিশ্বকর্ম্মা মানবসমাজকে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহঙ্কারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন?

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড় করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকীল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে। অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয় ইংরেজ, নয় আর কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান গাড়ি করিয়া বসিবে একথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহাই নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে,—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই ব্যক্তি হিসাবেই হউক্ আর জাতি হিসাবেই হউক্ জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কি? রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্ব্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল তাহাতে রোমকের অহঙ্কার অসম্পূর্ণ

হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে? গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে; ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ আকারটিকে একবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনো মতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট ক্ষুদ্রকে সেই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবেনা, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে, হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষ ভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর কেহ পদার্পণ করিবেনা, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্ব্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা ত পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্ত্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে? পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের

সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের নানা পরিবর্দ্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্ত্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে পর্য্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে পর্য্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে পর্য্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে? বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে? একি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালী, না মারাঠা, না পাঞ্জাবী; হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড "আমরার" মধ্যে যে কেহই মিলিত হউক্, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে কেহ আসিয়াই এক হউক্ না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন; ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে দেশেই যে কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মত তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মত বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব্বপশ্চিমের সেতু-বন্ধনকার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা শক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহার-বিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের যে উপকরণ

ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়; যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতা সাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যেদিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব্ব পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমনি করিয়া, যে জিনিষটা বড় তাহাকে আমরা ছোটর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই মিলন চেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ত কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন কি, অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করিব? তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই? কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানাশক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্ত্তমান বিরোধের আবর্ত্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল? এই বিরোধের তাৎপর্য্য কি তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলন সাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না।

এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জ্জনের অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যেভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সেভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্ব্বিচারে নির্ব্বিরোধে দুর্ব্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিষ পোষাকী জিনিষ হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্ত্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্ব্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মত আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে শক্তি নব্য-ভারতের আদি অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরেজ ভারতবাসীর যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব;—ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে ঝাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি; যে ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্ব্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে

ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড্ হেয়ারের মত মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজ জাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্ব্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না; তাহারা গ্রাস করে তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্স্পীয়র বায়রণের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, সদাগর বল, পুলিসের কর্ত্তা বল, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না— সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভাল আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন ত মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্ত্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্ত্তে পাথরেরই মত। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্যক্ মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দ্দাম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই জন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে এ সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্য ভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই—এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সে জন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরীর লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংগত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপ-প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত

অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয়, তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্ত ভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্য্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ সমাজ হয় সিভিলিয়ান সমাজ, নয় বণিক সমাজ, নয় সৈনিক সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কার সকল সর্ব্বদাই তাহাদের চারিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এদেশের হাওয়ায় কেবলি কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না; এই জন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে, তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে বিচারে ন্যায়ধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি দুর্ব্বলতা বশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেই জন্যই যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড় সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্ব্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সে জন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতা দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য, আমাদের সমস্ত সামর্থ-প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতির সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তা বশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের

৭ই আগষ্ট কলিকাতায় বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীপ্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতি

শ্রীযুক্ত আবদুল হালিম গজনবী।

জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারতবর্ষ কেবলি বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্ম্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এই জন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এই জন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন বর্ত্তমানে ভারত ইতিহাসের যে পর্ব্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এখন ভয়ের দ্বারা শাসন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত লোকদিগকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কি ক্ষতি তাহা বলিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সরকার নিজের ভালমন্দের বিচার নিজেই করেন, আমাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য ডাকেনও না, আমাদের পরামর্শের অপেক্ষাও রাখেন না: বরং আমরা গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিলে ভাবেন, লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, তাই আমাদিগকে লৌহদণ্ড তুলিয়া রাখিতে বলিতেছে। অতএব কঠিন শাস্তিতে আমাদের ক্ষতিলাভ কি, কেবল তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

মানুষ যখন অসাড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আঘাত করিলে হয় সে সংজ্ঞালাভ করে, সচেতন হয়, জাগে, নয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুইয়ের এক বা অন্য ফল জীবনীশক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, সে আঘাতে মরে, যাহার কিছু জীবনীশক্তি আছে, সে জাগিয়া উঠে। আমরা কঠিন শাস্তির আঘাতে মরিব, না জাগিব, তাহাই বিচার্য্য। যদি না জাগি, তাহা হইলে তিলক, চিদাম্বরম্ প্রভৃতির উপর অবিচার আমাদের কোন উপকার করিবে না; তিলক যে বলিয়াছেন যে "এক মহাশক্তি জাতিসমূহের ভবিতব্যের বিধাতা, তিনি আমার মুক্তি অপেক্ষা হয়ত আমার শাস্তি দ্বারাই আমার জাতির অধিক উপকার করিবেন", তাহা হইলে সেই মহাশক্তি আমাদিগকে নিজ হস্তের উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিবেন না, আমাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু আমাদের আশা হইতেছে, ক্ষণিক ভয় যাহার যত হউক, আমরা জাগিব।

তেষট্টি বৎসর বয়স্ক দিনাজপুরের সম্ভ্রান্ত উকীল, "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকের লেখক, শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রেলগাড়ীতে উঠিয়া অকারণ দুজন ইংরেজের প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয় ত বা চুরি করিতে গিয়াছিলেন, এই অপবাদে হাইকোর্টের দুইজন জজ তাঁহাকে চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন! তিনি কোন রাজনৈতিক অপরাধ করেন নাই; কিন্তু সকলেই মনে করিতেছে যে বিচারটা রাজনৈতিক রকমেরই হইয়াছে। এই তথাকথিত "বিচারে" আমাদের যেরূপ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ও অপমানবোধ হইয়াছে, তাহা বলিয়া লাভ কি? রোদন, এবং প্রতিকারে অসমর্থের ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ, সমর্থের বিদ্রূপ উৎপাদক কাপুরুষতা মাত্র। আমাদের সমুদয় শক্তি ও সমুদয় হৃদয়ের আবেগ প্রতিকারের চেষ্টার জন্য সঞ্চিত থাকুক। প্রতিকার আর কিছু নয়, দেশের আইন প্রণয়ন ও দেশের বিচার কার্য্যকে আমাদের আয়ত্তাধীন করা।

৭ই আগষ্টের বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠার উৎসব দেশের নানা স্থানে হইয়াছে। কলিকাতায় খুব উৎসাহ দেখিলাম। কাগজে দেখিতেছি যে মেদিনীপুর ব্যতীত অন্যান্য প্রধান প্রধান সহরে এই বার্ষিক উৎসব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা এই আন্দোলনের গোড়া হইতেই আছে, চেষ্টার মাত্রা যাহাতে প্রবলবেগে ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। এই আন্দোলনে কোথাও কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, কাহাকেও জোর করিয়া বিদেশী ছাড়ান এবং দেশী ধরান হয় নাই, কোথাও আইনের সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই, ইহা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের ধারণা যে মোটের উপর বল প্রয়োগ ও আইন লঙ্ঘন খুব কম স্থলে হইয়াছে।

ক্ষুদিরামের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। আমরা তাহার বিচারক হইবার অযোগ্য। কারণ, তাহার কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও, তাহার হৃদয়ে দেশভক্তি উৎকট বিদেশীদ্বেষে পরিণত হইলেও, ইহা সত্য যে দেশভক্তি যেমন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, উহা তেমন করিয়া আমাদিগকে

গ্রাস করে নাই। তাহার জীবন যেমনই হউক, সে মরিয়াছে বীরের মত। তাহার বিপথচালিত ব্যর্থ জীবন আমাদিগকে বিষাদ ও চিন্তায় আকুল করিয়াছে। মানুষ তাহাকে সুপথে চালিত করিবার উপায় করিতে পারিল না, ভগবান করিবেন। বিধাতা অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের সৃষ্টি করেন; আমরা বিশ্বাস করি, এ ক্ষেত্রেও তাহা করিবেন। নিরপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোক চটির আত্মা তাহার আত্মাকে ক্ষমা করিবে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হামারী স্ত্রীয়োঁ কী উন্নতি শিক্ষা ভূমিহার ব্রাহ্মণ মহাসভা যে যথার্থই সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কুমার সরযূপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র হিন্দী নিবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্ত্রী-শিক্ষা না হইলে পারিবারিক উন্নতি হয় না, এবং আমাদের অর্দ্ধ শরীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকে, এ সকল কথা অতি সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক সভার সকলকে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আশাকরি সভাগণ লেখকের অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। প্রবন্ধটি যখন বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে, তখন উহার বহু প্রচার প্রার্থনীয়।

২। মা বা আকৃতি—জাতীয় গীতিকাব্য - শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা মাত্র। কবিতাগুলিতে আবেগ আছে, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে, গীতের ঝঙ্কার ও কমনীয়তা আছে, তবে বক্তব্য সকল স্থলে স্পষ্ট নহে, কেমন প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট। তথাপিও বহু কবিতা কবিত্বপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

৩। অহল্যাবাই শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি,এ, সঙ্কলিত। তৃতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইর চিত্রসম্বলিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। পবিত্রচরিত সাধ্বী মহিলার জীবনাখ্যায়িকা অনাড়ম্বর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহার তৃতীয় সংস্করণই ইহার গুণের পরিচায়ক। এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন, কন্যাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যদ্গৃহিণীপদের উপযুক্ত হইতে পারিবেন এবং অতি দুর্বিনীত অবিশ্বাসী পুরুষচিত্তও নারীমহিমায় শ্রদ্ধান্বিত হইবে। এইরূপ চরিতাখ্যান আত্মার স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ। তেজস্বিতায় উগ্র অথচ দয়াতে কোমল এমন করুণকঠোর চরিত্র সংসারে দুর্লভ, সকলের অনুধ্যানের সামগ্রী।

৪। আর্য্য ধর্ম্ম নিত্য - শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন প্রণীত, ক্রাউন অষ্টাংশিত ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। আর্য্য ধর্ম্ম যে নিত্য ধর্ম্ম তাহা এই গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদ, আশ্রম, বর্ণভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। যাহা সত্য তাহা সর্ব্বসমাজ, সর্ব্বসম্প্রদায় নিরপেক্ষ। আর্য্যধর্ম্ম এই সার্ব্বজনীন মহৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই তাহার চরম লক্ষ্য। সাধনের প্রকার ভেদ থাকিতে পারে কিন্তু উপায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সুন্দর সরস ভাষায় এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহা পাঠ করিলে আপনাদের বহু কুসংস্কার ও ক্ষুদ্রতা বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের আভাস পাইবেন। ইহা সকল সম্প্রদায় নিরপেক্ষ নিত্যধর্ম্মের ব্যাখ্যান পুস্তক ইহা সকল সম্প্রদায়েরই নিজস্ব হইতে পারিবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

৫। উপকথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি,এল, প্রণীত। কলিকাতা সিটিবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৫৪ পৃষ্ঠা। সুন্দর কাপড়ের মলাটে বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহাতে ২৬টি গল্প আছে। শিশুরা ইহার একবার নাগাল পাইলে নিজেদের আটপৌরে কথায় এতগুলি গল্পের পরিচয় পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবে। ভাষার মধ্যে কারিগরি বা কবিত্ব নাই, চলিত সরল ভাষায় গল্পগুলি বলা হইয়াছে, পড়িতে ভাবোদ্রেক না হইলেও ক্লান্তি বোধ হয় না। ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার। ছেলেদের পাঠ্য বই বড় হরপে ছাপিলে ভাল হইত। একঘেয়ে স্মলপাইকা হরপ যেন আমাদের বাংলা বইগুলাকে পাইয়া বসিয়াছে।

৬ ৭। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর। কলিকাতা সিটিবুক সোসাইটি হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার যথাক্রমে ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ৯২ ও ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেকেরই পাঁচ আনা করিয়া। ভারতগৌরব মহাত্মাদিগের জীবনী প্রকাশ এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য; ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধু ও মনস্বীদিগেরও জীবনী প্রকাশিত করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। পুস্তক দুইখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব, জীবনের যাহা কিছু মহৎ ও গৌরবের তৎসমস্তই এই অল্প পরিসরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ চরিত্র-চিত্রণ আমাদের জাতীয়জীবন সংগঠনে সহায়তা করিবে, পাঠকের মন প্রসন্ন উদার করিবে। বইগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে বলিয়া কিছু ত্রুটিরও উল্লেখ করিব। রামমোহন রায় যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার ভাষা সুন্দর, কিন্তু বড় জিনিসকে অল্প পরিসরে ভরিবার নিপুণতার অভাব বোধ হইল; প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ যেন শুধু গুণ ও কার্য্যতালিকার মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবন এমনই চমৎকার ও কৌতূহলোদ্দীপক যে এই ত্রুটি সত্ত্বেও রামমোহন রায় সুখপাঠ্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর রচয়িতার ভাষায় সরসতা আছে, কিন্তু বর্ণনার ঢংটা হইয়াছে উপন্যাসের মত ইহা জীবনচরিতের বর্ণনায় একেবারেই বেমানান হইয়াছে। একই পর্য্যায়ের সকল পুস্তকই একই রীতিতে রচিত হওয়া উচিত; বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনভঙ্গী অনুসৃত হইলে সমতা রক্ষিত হয় না। বিভিন্ন লোক দিয়া বিভিন্ন পুস্তক রচনা করানই যুক্তিসঙ্গত; এবং বিভিন্ন লোকের লিখন ধারা বিভিন্ন হইবেই; কিন্তু সেই বিভিন্নতার মধ্যে সমতা দিবার জন্য একজন সাধারণ সম্পাদক থাকা প্রয়োজন। এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় বলিয়াই ইংরাজি এক পর্য্যায়ের পুস্তক বিভিন্ন লোক দ্বারা লিখিত হইলেও সমতা রক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ প্রকাশ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই গ্রন্থমালা একবিধ ও নিখুঁত হইতে পারে। যাহাই হউক এইরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠে স্ত্রী পুরুষ আবালবৃদ্ধ সকলেই সুখী ও উপকৃত হইবেন। ইহার জন্য যোগীন্দ্র বাবু ধন্যবাদের পাত্র।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজা রামমোহন রায়

Three colour blocks by U. Ray.　　Kuntaline Press, Calcutta

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৮ম ভাগ। | আশ্বিন, ১৩১৫। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গোরা।

৩১

ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় পরেশ বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনের ভাবটা কি তাহা ষ্টীমারে উঠিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বিনয় নিশ্চিত জানিত না। ললিতার সঙ্গে বিরোধেই তাহার মন ব্যাপৃত ছিল। কেমন করিয়া এই দুর্ব্বশ মেয়েটির সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে কিছুকাল হইতে ইহাই তাহার প্রায় প্রতিদিনের চিন্তার বিষয় ছিল। বিনয়ের জীবনে স্ত্রীমাধুর্য্যের নির্ম্মল দীপ্তি লইয়া সুচরিতাই প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মত উদিত হইয়াছিল। এই আবির্ভাবের অপরূপ আনন্দে বিনয়ের প্রকৃতিকে পরিপূর্ণতা দান করিয়া আছে ইহাই বিনয় মনে মনে জানিত। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো যে তারা উঠিয়াছে এবং জ্যোতিরুৎসবের ভূমিকা করিয়া দিয়া প্রথম তারাটি যে কখন্ ধীরে ধীরে দিগন্তরালে অবতরণ করিতেছিল বিনয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

বিদ্রোহী ললিতা যেদিন ষ্টীমারে উঠিয়া আসিল সেদিন বিনয়ের মনে হইল ললিতা এবং আমি একপক্ষ হইয়া সমস্ত সংসারের প্রতিকূলে যেন খাড়া হইয়াছি। এই ঘটনায় ললিতা আর সকলকে ছাড়িয়া তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা বিনয় কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। যে-কোনো কারণে, যে-কোনো উপলক্ষ্যেই হউক্, ললিতার পক্ষে বিনয় আজ অনেকের মধ্যে একজন মাত্র নহে— ললিতার পার্শ্বে সেই একাকী—সেই একমাত্র; সমস্ত আত্মীয়স্বজন দূরে, সেই নিকটে। এই নৈকট্যের পুলকপূর্ণ স্পন্দন বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের মত তাহার বুকের মধ্যে গুরু গুরু করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে ললিতা যখন ঘুমাইতে গেল তখন বিনয় তাহার স্বস্থানে শুইতে যাইতে পারিল না—সেই ক্যাবিনের বাহিরে ডেকে সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ষ্টীমারে ললিতার প্রতি কোনো উৎপাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু বিনয় তাহার অকস্মাৎ নূতনলব্ধ অধিকারটিকে পুরা অনুভব করিবার প্রলোভনে অপ্রয়োজনেও না খাটাইয়া থাকিতে পারিল না।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়,' মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে ইহার মাঝখানে ললিতা

নিদ্রিত : আর কিছু নয়, এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকেই ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মত রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। পিতামাতা ভাই ভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শান্তভাবে গতায়াত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণ-কোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপরে পড়িয়া আছে; কুসুম-সুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতি-চেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল; শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমির-বেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেম্নি একটিমাত্র ঐশ্বর্য্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। "আমি জাগিয়া আছি" "আমি জাগিয়া আছি" এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মত উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

এই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আরো একটা কথা কেবলি বিনয়কে আঘাত করিতেছিল—আজ রাত্রে গোরা জেল-খানায়! আজ পর্য্যন্ত বিনয় গোরার সকল সুখ দুঃখেই ভাগ লইয়া আসিয়াছে, এইবার প্রথম তাহার অন্যথা ঘটিল। বিনয় জানিত গোরার মত মানুষের পক্ষে জেলের শাসন কিছুই নহে কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে গোরার কোনো যোগ ছিল না—গোরার জীবনের এই একটা প্রধান ঘটনা একেবারেই বিনয়ের সংস্রব ছাড়া। দুই বন্ধুর জীবনের ধারা এই যে এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—আবার যখন মিলিবে তখন কি এই বিচ্ছেদের শূন্যতা পূরণ হইতে পারিবে? বন্ধুত্বের সম্পূর্ণতা কি এবার ভঙ্গ হয় নাই? জীবনের এমন অখণ্ড এমন দুর্লভ বন্ধুত্ব! আজ একই রাত্রে বিনয় তাহার এক দিকের শূন্যতা এবং আর একদিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের সৃজন-প্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গোরা যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল দৈবক্রমেই বিনয় তাহাতে যোগ দিতে পারে নাই, অথবা গোরা যে জেলে গিয়াছে দৈবক্রমেই সেই কারাদুঃখের ভাগ লওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে, একথা যদি সত্য হইত তবে ইহাতে করিয়া বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারিত না। কিন্তু গোরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল এবং বিনয় অভিনয় করিতেছিল ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে। বিনয়ের সমস্ত জীবনের ধারা এমন একটা পথে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ব্ব বন্ধুত্বের পথ নহে, সেই কারণেই এতদিন পরে এই বাহ্য বিচ্ছেদও সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু আজ আর কোনো উপায় নাই—সত্যকে অস্বীকার করা আর চলে না; গোরার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন একপথ অনন্যমনে আশ্রয় করা বিনয়ের পক্ষে আজ আর সত্য নহে। কিন্তু গোরা ও বিনয়ের চিরজীবনের ভালবাসা কি এই পথভেদের দ্বারাই ভিন্ন হইবে? এই সংশয় বিনয়ের হৃদয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। সে জানিত গোরা তাহার সমস্ত বন্ধুত্ব এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকে এক লক্ষ্য পথে না টানিয়া চলিতে পারে না। প্রচণ্ড গোরা! তাহার প্রবল ইচ্ছা! জীবনের সকল সম্বন্ধের দ্বারা তাহার সেই এক ইচ্ছাকেই মহীয়সী করিয়া সে জয়-যাত্রায় চলিবে বিধাতা গোরার প্রকৃতিতে সেই রাজমহিমা অর্পণ করিয়াছেন!

ঠিকা গাড়ি পরেশ বাবুর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নামিবার সময় ললিতার যে পা কাঁপিল এবং বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময় সে যে জোর করিয়া [illegible]কে একটু শক্ত করিয়া লইল তাহা বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ললিতা ঝোঁকের মাথায় এবার যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অপরাধ যে কতখানি তাহার ওজন সে নিজে কিছুতেই আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না। ললিতা জানিত পরেশ বাবু তাহাকে এমন কোনো কথাই বলিবেন না যাহাকে ঠিক ভর্ৎসনা বলা [illegible]ইতে পারে—কিন্তু সেই জন্যই পরেশ বাবুর চুপ করিয়া থা[illegible]কে [illegible]সে সব চেয়ে ভয় করিত।

ললিতার এই সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনয়, এরূপ স্থলে তাহার কি কর্ত্তব্য ঠিকটি ভাবিয়া পাইল না। সে সঙ্গে থাকিলে ললিতার সঙ্কোচের কারণ অধিক হইবে কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে একটু দ্বিধার স্বরে ললিতাকে কহিল "তবে এখন যাই।"

ললিতা তাড়াতাড়ি কহিল—"না, চলুন, বাবার কাছে চলুন।"

ললিতার এই ব্যগ্র অনুরোধে বিনয় মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার পর হইতেই তাহার যে কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই—এই একটা আকস্মিক ব্যাপারে ললিতার সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটা বিশেষ গ্রন্থি বন্ধন হইয়া গেছে—তাহাই মনে করিয়া বিনয় ললিতার পার্শ্বে যেন একটু বিশেষ জোরের সঙ্গে দাঁড়াইল। তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মত তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল ললিতা যেন তাহার ডান হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল পরেশ বাবু ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় রাগ করিবেন, ললিতাকে ভর্ৎসনা করিবেন, তখন বিনয় যথাসম্ভব সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইবে—ভর্ৎসনার অংশ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে, বর্ম্মের স্বরূপ হইয়া ললিতাকে সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু ললিতার ঠিক মনের ভাবটা বিনয় বুঝিতে পারে নাই। সে যে ভর্ৎসনার প্রতিরোধক স্বরূপেই বিনয়কে ছাড়িতে চাহিল না তাহা নহে। আসল কথা, ললিতা কিছুই চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। সে যাহা করিয়াছে তাহার সমস্ত অংশই পরেশ বাবু চক্ষে দেখিবেন এবং বিচারে যে ফল হয় তাহার সমস্তটাই ললিতা গ্রহণ করিবে এইরূপ তাহার ভাব।

আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর মনে মনে রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসঙ্গত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে—কিন্তু অসঙ্গত বলিয়াই রাগটা কমে না বরং বাড়ে। ষ্টীমারে যতক্ষণ ছিল ললিতার মনের ভাব অন্যরূপ ছিল। ছেলেবেলা হইতে সে কখনো রাগ করিয়া কখনো জেদ করিয়া একটা না একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এবারকার ব্যাপারটি গুরুতর। এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়াতে সে একদিকে সঙ্কোচ এবং অন্যদিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া মথিত হইয়া উঠিতেছিল। একজন বাহিরের পুরুষকে সে আজ এমন করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয়-সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল—কিন্তু বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল। যে বিনয় তাহাদের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা আমোদ কৌতুক করিত, যাহার কথার বিরাম ছিল না, বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গেও যাহার আত্মীয়তা অবারিত এ সে বিনয় নহে। সতর্কতার দোহাই দিয়া যেখানে সে অনায়াসেই ললিতার সঙ্গ বেশি করিয়া লইতে পারিত সেখানে বিনয় এমন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল যে তাহাতেই ললিতা হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে আরো নিকটে অনুভব করিতেছিল। রাত্রে ষ্টীমারের ক্যাবিনে নানা চিন্তায় তাহার ভাল ঘুম হইতেছিল না;—ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এক সময় মনে হইল রাত্রি এতক্ষণে প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনো নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে—এইমাত্র একটি শীত বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নীচের তলায় এঞ্জিনের খালাসীরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ললিতা ক্যাবিনের বাহিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ঐখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে! এতই নিকটে, তবু এত দূরে! ডেক্ হইতে তখনি ললিতা কম্পিত

পদে ক্যাবিনে আসিল; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যূষে সেই অন্ধকারজড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; সম্মুখের দিক্‌প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতার কাছে সে যে-দেবতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে সেই দেবতা যেন দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আজ স্পর্শ করিলেন এবং এই নদীর উপরে এই তরুপল্লবনিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্রসভায় কোন্‌ একটি দিব্য সঙ্গীত অনাহত মহাবীণায় দুঃসহ আনন্দ-বেদনার মত বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় ঘুমের ঘোরে বিনয় হাতটা একটু নাড়িবামাত্রই ললিতা তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার হাত পায়ের তলদেশ শীতল হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ললিতা মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া রেল ধরিয়া দাঁড়াইল। বিনয়ও পূর্ব্বেই জাহাজের বাঁশির আওয়াজে জাগিয়া প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বতীরে প্রভাতের প্রথম অভ্যুদয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ললিতা বাহির হইয়া আসিবামাত্র সে সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ললিতা ডাকিল—"বিনয় বাবু!"

বিনয় কাছে আসিতে ললিতা কহিল, "আপনার বোধ হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।"

বিনয় কহিল, "মন্দ হয়নি।"

ইহার পরে দুইজনে আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনো দিন দেখে নাই। আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই—আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময়নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুই জনের চিত্তে চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে, সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়েগায়ে ঠেকাঠেকি হইল। কেহ কোনো কথা কহিল না।

ষ্টীমার কলিকাতায় আসিল। বিনয় ঘাটে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া ললিতাকে ভিতরে বসাইয়া নিজে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল। এই দিনের বেলাকার কলিকাতার পথে গাড়ি করিয়া চলিতে চলিতে কেন যে ললিতার মনে উল্টা হাওয়া বহিতে লাগিল তাহা কে বলিবে! এই সঙ্কটের সময় বিনয় যে ষ্টীমারে ছিল, ললিতা যে বিনয়ের সঙ্গে এমন করিয়া জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বিনয় যে অভিভাবকের মত তাহাকে গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে ইহার সমস্তই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ঘটনাবশতঃ বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল! রাত্রের সেই সঙ্গীত দিনের কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া কেন এমন কঠোর সুরে থামিয়া গেল!

তাই দ্বারের কাছে আসিয়া বিনয় যখন সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি তবে যাই" তখন ললিতার রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল যে, "বিনয় বাবু মনে করিতেছেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি।" এ সম্বন্ধে তাহার মনে যে লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই ইহাই বলের সহিত প্রমাণ করিবার এবং পিতার নিকট সমস্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করিবার জন্য সে বিনয়কে দ্বারের কাছ হইতে অপরাধীর ন্যায় বিদায় দিতে চাহিল না।

বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে সে পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়—মাঝখানে কোনো কুণ্ঠা, কোনো মোহের জড়িমা রাখিয়া সে নিজেকে বিনয়ের কাছে খাটো করিতে চায় না।

৩২

বিনয় ও ললিতাকে দেখিবামাত্র কোথা হইতে সতীশ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া

উভয়ের হাত ধরিয়া কহিল—"কই, বড় দিদি এলেন না?"

বিনয় পকেট চাপড়াইয়া এবং চারিদিকে চাহিয়া কহিল—"বড় দিদি! তাই ত, কি হল! হারিয়ে গেছেন।"

সতীশ বিনয়কে ঠেলা দিয়া কহিল—"ইস্, তাই ত, কখ্খন না! বল না, ললিতা দিদি!"

ললিতা কহিল "বড় দিদি কাল আস্‌বেন।" বলিয়া পরেশ বাবুর ঘরের দিকে চলিল।

সতীশ ললিতা ও বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—"আমাদের বাড়ি কে এসেচেন দেখ্‌বে চল!"

ললিতা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "তোর যে আস্থক্ এখন বিরক্ত করিস্‌নে। এখন বাবার কাছে যাচ্চি।"

সতীশ কহিল, "বাবা বেরিয়ে গেছেন, তাঁর আস্‌তে দেরি হবে!"

শুনিয়া বিনয় এবং ললিতা উভয়েই ক্ষণকালের জন্য একটা আরাম বোধ করিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—"কে এসেচে?"

সতীশ কহিল "বল্‌ব না! আচ্ছা, বিনয় বাবু বলুন দেখি কে এসেচে! আপনি কখ্খনোই বল্‌তে পারবেন না। কখ্খনো না, কখ্খনো না!"

বিনয় অত্যন্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত নাম করিতে লাগিল—কখনো বলিল, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, কখনো বলিল রাজা নবকৃষ্ণ, একবার নন্দকুমারেরও নাম করিল। এরূপ অতিথি-সমাগম যে একেবারেই অসম্ভব সতীশ তাহারই অকাট্য কারণ দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিল—বিনয় হার মানিয়া নম্রস্বরে কহিল, "তা বটে, সিরাজউদ্দৌলার যে এবাড়িতে আসার কতকগুলো গুরুতর অসুবিধে আছে সেকথা আমি এপর্য্যন্ত চিন্তা করে দেখিনি। যাহোক্ তোমার দিদি ত আগে তদন্ত করে আসুন তার পরে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ডাক দিলেই আমি যাব।"

সতীশ কহিল, "না, আপনারা দুজনেই আসুন।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ঘরে যেতে হবে?"

সতীশ কহিল, "তেতালার ঘরে।"

তেতালার ছাদের কোণে একটি ছোট ঘর আছে, তাহার দক্ষিণের দিকে রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য একটি ঢালু টালির ছাদ। সতীশের অনুবর্ত্তী দুইজনে সেখানে গিয়া দেখিল ছোট একটি আসন পাতিয়া সেই ছাদের নীচে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক চোখে চষমা দিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেছেন। তাঁহার চষমার একদিককার ভাঙা দণ্ডে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি তাঁহার কানে জড়ানো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে। মাথার সাম্‌নের দিকে চুল বিরল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু গৌরবর্ণ মুখ পরিপক্ক ফলটির মত এখনো প্রায় নিটোল রহিয়াছে;—দুই ভ্রূর মাঝে একটি উল্কীর দাগ—গায়ে অলঙ্কার নাই, বিধবার বেশ। প্রথমে ললিতার দিকে চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি চষমা খুলিয়া বই ফেলিয়া রাখিয়া বিশেষ একটা ঔৎসুক্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; পরক্ষণেই তাহার পশ্চাতে বিনয়কে দেখিয়া দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মাসিমা পালাচ্চ কেন? এই আমাদের ললিতা দিদি, আর ইনি বিনয় বাবু। বড় দিদি কাল আসবেন।" বিনয় বাবুর এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট হইল; ইতিপূর্ব্বেই বিনয় বাবু সম্বন্ধে আলোচনা যে প্রচুর পরিমাণে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে সতীশের যে কয়টি বলিবার বিষয় জমিয়াছে কোনো উপলক্ষ্য পাইলেই তাহা সতীশ বলে এবং হাতে রাখিয়া বলে না।

"মাসিমা" বলিতে যে কাহাকে বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিয়া ললিতা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় এই প্রৌঢ়া রমণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই ললিতা তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

মাসিমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে একটি মাদুর বাহির করিয়া পাতিয়া দিলেন এবং কহিলেন—"বাবা বোস, মা বোস।"

বিনয় ও ললিতা বসিলে পর তিনি তাঁহার আসনে বসিলেন এবং সতীশ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। তিনি সতীশকে ডান হাত দিয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে তোমরা জান না, আমি সতীশের মাসী হই—সতীশের মা আমার আপন দিদি ছিলেন।"

এইটুকু পরিচয়ের মধ্যে বেশি কিছু কথা ছিল না কিন্তু

মাসিমার মুখে ও কণ্ঠস্বরে এমন একটি কি ছিল যাহাতে তাঁহার জীবনের সুগভীর শোকের অশ্রুমার্জ্জিত পবিত্র একটি আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। "আমি সতীশের মাসী হই" বলিয়া তিনি যখন সতীশকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন তখন এই রমণীর জীবনের ইতিহাস কিছুই না জানিয়াও বিনয়ের মন করুণায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিনয় বলিয়া উঠিল, "একলা সতীশের মাসিমা হলে চল্‌বে না; তা হলে এত দিন পরে সতীশের সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। একে ত সতীশ আমাকে বিনয় বাবু বলে, দাদা বলে না, তার পরে মাসিমা থেকে বঞ্চিত করবে সে ত কোনো মতেই উচিত হবে না।"

মন বশ করিতে বিনয়ের বিলম্ব হইত না। এই প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী যুবক দেখিতে দেখিতে মাসিমার মনে সতীশের সঙ্গে দখল ভাগ করিয়া লইল।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার মা কোথায়?"

বিনয় কহিল, "আমার নিজের মাকে অনেক দিন হল হারিয়েছি কিন্তু আমার মা নেই এমন কথা আমি মুখে আন্‌তে পারব না।"

এই বলিয়া আনন্দময়ীর কথা স্মরণ করিবামাত্র তাহার দুই চক্ষু যেন ভাবের বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল।

দুই পক্ষে কথা খুব জমিয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে আজ যে নূতন পরিচয় সে কথা কিছুতেই মনে হইল না। সতীশ এই কথাবার্ত্তার মাঝখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চেষ্টা করিলেও ললিতা নিজেকে সহজে যেন বাহির করিতে পারে না। প্রথম পরিচয়ের বাধা ভাঙিতে তাহার অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া, আজ তাহার মন ভাল ছিল না। বিনয় যে অনায়াসেই এই অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল ইহা তাহার ভাল লাগিতেছিল না; ললিতার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বিনয় তাহার গুরুত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ না করিয়া যে এমন নিরুদ্বিগ্ন হইয়া আছে ইহাতে বিনয়কে লঘুচিত্ত বলিয়া সে মনে মনে অপবাদ দিল। কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া বিষণ্নভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই বিনয় যে ললিতার অসন্তোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইত তাহা নহে;—তাহা হইলে নিশ্চয় ললিতা রাগিয়া মনে মনে এই কথা বলিত "আমার সঙ্গেই বারার বোঝা-পড়া, কিন্তু বিনয় বাবু এমন ভাব ধারণ করিতেছেন কেন, যেন উঁহার ঘাড়েই এই দায় পড়িয়াছে।" আসল কথা, কাল রাত্রে যে আঘাতে সঙ্গীত বাজিয়াছিল, আজ দিনের বেলায় তাহাতে ব্যথাই বাজিতেছে—কিছুই ঠিকমত হইতেছে না। আজ তাই ললিতা প্রতিপদে বিনয়ের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়াই করিতেছে; বিনয়ের কোনো ব্যবহারেই এ ঝগড়া মিটিতে পারিত না—কোন্ মূলে সংশোধন হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

হায় রে, হৃদয় লইয়াই যাহাদের কারবার সেই মেয়েদের ব্যবহারকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দিলে চলিবে কেন? যদি গোড়ায় ঠিক জায়গাটিতে ইহার প্রতিষ্ঠা থাকে তবে হৃদয় এম্‌নি সহজে এম্‌নি সুন্দর চলে যে যুক্তিতর্ক হার মানিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকে কিন্তু সেই গোড়ায় যদি লেশমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে তবে বুদ্ধির সাধ্য কি যে কল ঠিক করিয়া দেয়—তখন রাগবিরাগ হাসিকান্না, কি হইতে যে কি ঘটে তাহার হিসাব তলব করিতে যাওয়াই বৃথা।

এদিকে বিনয়ের হৃদয়যন্ত্রটিও যে বেশ স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল তাহা নহে। তাহার অবস্থা যদি অবিকল পূর্ব্বের মত থাকিত তবে এই মুহূর্ত্তেই সে ছুটিয়া আনন্দময়ীর কাছে যাইত। গোরার কারাদণ্ডের খবর বিনয় ছাড়া মাকে আর কে দিতে পারে! সে ছাড়া মায়ের সান্ত্বনাই বা আর কে আছে! এই বেদনার কথাটা বিনয়ের মনের তলায় বিষম একটা ভার হইয়া তাহাকে কেবলি পেষণ করিতেছিল—কিন্তু ললিতাকে এখনি ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে আজ সেই যে ললিতার রক্ষক, ললিতা সম্বন্ধে পরেশ বাবুর কাছে তাহার যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে তাহা শেষ করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে এই কথা সে মনকে বুঝাইতে-ছিল। মন তাহা অতি সামান্য চেষ্টাতেই বুঝিয়া লইয়া-ছিল; তাহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতাই ছিল না। গোরা এবং আনন্দময়ীর জন্য বিনয়ের মনে যত বেদনাই থাক্ আজ ললিতার অতি সন্নিকট অস্তিত্ব তাহাকে এমন

আনন্দ দিতে লাগিল—এমন একটা বিস্ফারতা, সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটা বিশেষ গৌরব—নিজের সত্তার সে এমন একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে লাগিল যে তাহার মনের বেদনাটা মনের নীচের তলাতেই রহিয়া গেল। ললিতার দিকে সে আজ চাহিতে পারিতেছিল না—ক্ষণে ক্ষণে চোখে আপনি যেটুকু পড়িতেছিল, ললিতার কাপড়ের একটুকু অংশ, কোলের উপর নিশ্চল-ভাবে স্থিত তাহার একখানি হাত—মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহাই তাহাকে পুলকিত করিতে লাগিল।

দেরি হইতে চলিল। পরেশ বাবু এখনো ত আসিলেন না। উঠিবার জন্য ভিতর হইতে তাগিদ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল—তাহাকে কোনো মতে চাপা দিবার জন্য বিনয় সতীশের মাসীর সঙ্গে একান্তমনে আলাপ করিতে থাকিল। অবশেষে ললিতার বিরক্তি আর বাঁধ মানিল না; সে বিনয়ের কথার মাঝখানে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আপনি দেরি করচেন কার জন্যে? বাবা কখন্ আস্‌বেন তার ঠিক নেই। আপনি গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?"

বিনয় চমকিয়া উঠিল। ললিতার বিরক্তিস্বর বিনয়ের পক্ষে সুপরিচিত ছিল। সে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া একমুহূর্ত্তে একেবারে উঠিয়া পড়িল—হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গেলে বাণ যেমন সোজা হইয়া উঠে তেমনি করিয়া সে দাঁড়াইল। সে দেরি করিতেছিল কাহার জন্য? এখানে যে তাহার কোনো একান্ত প্রয়োজন ছিল এমন অহঙ্কার ত আপনা হইতে বিনয়ের মনে আসে নাই—সে ত দ্বারের নিকট হইতেই বিদায় লইতেছিল—ললিতাই ত তাহাকে অনুরোধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল—অবশেষে ললিতার মুখে এই প্রশ্ন!

বিনয় এম্‌নি হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল যে, ললিতা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, বিনয়ের মুখের স্বাভাবিক সহাস্যতা একেবারে এক ফুৎকারে প্রদীপের আলোর মত সম্পূর্ণ নিবিয়া গেছে। বিনয়ের এমন ব্যথিত মুখ, তাহার ভাবের এমন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ললিতা আর কখনো দেখে নাই। বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই তীব্র অনুতাপের জ্বালাময় কষাঘাত তৎক্ষণাৎ ললিতার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে উপরি উপরি বাজিতে লাগিল।

সতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মিনতির স্বরে কহিল—"বিনয় বাবু, বসুন, এখনি যাবেন না! আমাদের বাড়ীতে আজ খেয়ে যান! মাসিমা, বিনয় বাবুকে খেতে বল না। ললিতা দিদি, কেন বিনয় বাবুকে যেতে বল্লে!"

বিনয় কহিল—"ভাই সতীশ, আজ না ভাই! মাসিমা যদি মনে রাখেন তবে আর একদিন এসে প্রসাদ খাব। আজ দেরি হয়ে গেছে।"

কথাগুলো বিশেষ কিছু নয় কিন্তু কণ্ঠস্বরের মধ্যে অশ্রু আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তাহার করুণা সতীশের মাসিমার কানেও বাজিল। তিনি একবার বিনয়ের ও একবার ললিতার মুখের দিকে চকিতের মত চাহিয়া লইলেন—বুঝিলেন অদৃষ্টের একটা লীলা চলিতেছে।

অনতিবিলম্বে কোনো ছুতা করিয়া ললিতা উঠিয়া তাহার ঘরে গেল। কত দিন সে নিজেকে নিজে এমন করিয়া কাঁদাইয়াছে।

কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব।

মাটির গুণ এবং জলবায়ুর উপর ফসল নির্ভর করে; কাজেই ফসলের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে জল বায়ু এবং মাটির প্রকৃতি বুঝিয়া লইতে হয়। বঙ্গদেশের যে বিশেষত্বের ফলে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাস বা খণ্ড-সমালোচনায় তাহার আলোচনা হয় নাই। একালের দুইজন প্রধান কবি,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য সমালোচনা করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াই দেখিলাম, যে "বাংলার ফলের" কথা বলিবার পূর্ব্বে, "বাংলার মাটি বাংলার জল" সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লওয়া চাই। নহিলে কাব্যের স্বাভাবিক বিকাশ এবং বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায় না।

এ কালের বঙ্গসাহিত্যের নেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (১) লিখিয়াছিলেন :—"বঙ্গসাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত।" বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস এক সময়ের লোক ছিলেন; এবং ঐ কবিদ্বয়ের পরস্পরে যথেষ্ট পরিচয় এবং সৌহার্দ্দ ছিল। বঙ্কিম বাবু যদি মিথিলার বিদ্যাপতির নাম না করিয়া চণ্ডীদাসের নাম করিতেন, ভাল হইত। পবিত্রতায়, ভাবগাম্ভীর্য্যে, সৌন্দর্য্য অনুভূতিতে এবং আকাঙ্ক্ষার সরস ও সরল অভিব্যক্তিতে চণ্ডীদাসের রচনা যখন বিদ্যাপতির অনেক উচ্চে, তখন নাম-মাহাত্ম্যেও কিছু বাধা হইত না।

বাঙ্গালার কবিতাবাহুল্যের প্রতিও বঙ্কিম বাবু কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই; ওবিষয়ে বাঙ্গালীর একটু অপবাদ না আছে তা নয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তীব্র পরিহাসে আছে—"আমরা বক্তৃতায় যুঝি, ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব "ঢুঁ-ঢুঁ-ৎ"। তা হোক্, যে দেশে যে জিনিস বেশি জন্মে সে দেশে মন্দ অংশটা চোখে একটু বেশি ঠেকিবেই। বাঙ্গালা দেশ কাব্যভারে যত পীড়িত হইলেও কবিতা রচনা মাত্রেই, কিম্বা সুকবিতা রচনায় এ দেশের বিশেষত্ব বলিলে, অন্য প্রদেশের প্রতি অবিচার করা হয়। ভাষা রচনার আদি ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিব।

সংস্কৃত হইতে যে সকল প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি (২) উহার কোনটিতেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের রচনার নমুনা পাওয়া যায় না। মাড়ওয়াড়ের 'শিবসিংহ সরোজ' গ্রন্থের মতে, উজ্জয়িনীর পুষ্য কবি ৮ম শতাব্দীতে যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই নাকি 'ভাষা কা জড়'। কিন্তু ঐ রচনা হিন্দিতে হইয়াছিল, কি না, তাহার প্রমাণ নাই। নবম শতাব্দীতেও 'খুমানসিংহ চরিত' যে ঠিক কি প্রকার ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা জানা দুঃসাধ্য; কারণ ১৬শ. শতাব্দাতে উহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নববিধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে, সকল প্রদেশেই ভাষা সাহিত্য বিকাশের সূত্রপাত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভাবের এই নব সাহিত্য যে "নব গৌড়ী রীতিতে" লিখিত হইতেছিল, তাহা বঙ্গভাষাবিদ্বেষী গ্রিয়ার্সনও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে গৌড়ী রীতির গৌড় দেশ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও বঙ্গদেশ গৌড় আখ্যা পায় নাই। সে সময় পর্য্যন্ত নেপালের দক্ষিণ সীমান্তস্থিত এবং মিথিলার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের নাম ছিল গৌড়। (১) পরবর্ত্তী সময়ে যখন মগধের পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত রাঢ় (প্রাচীন সুহ্ম) বরেন্দ্র (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং গৌড়ভুক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উত্তর-পশ্চিম অংশ) বঙ্গ, মিথিলা ও ওড্র দেশের অনেক অংশ, একত্রে যুক্ত হইয়া, প্রাচীন গৌড়ের স্মৃতিতে 'নব গৌড়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনো নব বৈষ্ণব ভাবের তরঙ্গ উঠে নাই। (২) তখনো বিহার বঙ্গ ও উৎকলে বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব প্রবল।

আর্য্যেতর জাতির ভূত প্রেতের মন্ত্র, যাদু বিদ্যা এবং জননেন্দ্রিয়সংস্পৃষ্ট ধর্ম্মসাধনা, যখন সুপবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটা বিকৃত মতের সহিত যুক্ত হয়, তখনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে। বঙ্গদেশ এবং উৎকল বহু কাল হইতেই অনার্য্যপ্লুত ছিল; এবং তখনও এই উভয় দেশের অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্যজাতীয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অন্য ফলের কথা এখানে আলোচনা করিব না; কিন্তু

(১) এই মন্তব্য প্রকাশের সময় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইংলণ্ড-প্রবাসী বিদ্যার্থী। তখন তাঁহার বাল্য রচনা 'আর্য্যগাথা ১ম ভাগ' বন্ধুবর্গের বাহিরে বেশি প্রচার লাভ করে নাই। 'পতাকা'য় প্রকাশিত রচনাতেও তাঁহার নাম মুদ্রিত হইত না। যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার অল্পপূর্ব্বে কেবল একটি সুন্দর কবিতা তাঁহার নামযুক্ত হইয়া "নব্য ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাটির নাম, 'দেবগৃহে সূর্য্যাস্ত' বলিয়া মনে হইতেছে।

(২) ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্বের কথায়, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম্ ও কাণাড়ার সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। ঐ সকল আর্য্যেতর ভাষার সাহিত্যের সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। পরোক্ষ সংবাদে অবগত আছি, যে কাণাড়ায় (প্রাচীন কর্ণাটে) অতি প্রাচীন ভাষাসাহিত্য আছে,—এবং হয়ত "বৃহৎ কথা" আন্ধ্র (প্রাচীন তেলেগু) ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

(১) শঙ্কর পাণ্ডুরাং পণ্ডিতের গৌড়বহো কাব্যের ভূমিকা, এবং R. A. S. ১৯০৬ সালের জর্ণালে মদীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) দেশসংস্থানের যে অবস্থা দেওয়া গেল, তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রমাণ সহ না লিখিলে পাঠকদের তুষ্টি জন্মিতে পারে না; কিন্তু এই প্রবন্ধে সে-কথা লিখিতে গেলে, প্রবন্ধ লেখাই বন্ধ করিতে হয়।

দেশব্যাপী অনার্য্যেরা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া, ইহাদের উপর প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়মের প্রভাব ছিল না। ধর্ম্ম সাধনায় এবং চিন্তায় দেশব্যাপী একটা স্বাধীনতা ছিল। সমাজের নিম্নস্তরই সমাজের যথার্থ ভিত্তি, উহাই সমাজের মাটি। আর্য্যেরা যখন আসিয়া ঐ মাটিতে নূতন সার দিয়াছিলেন, তখন উর্ব্বরতা বাড়িয়াছিল—কিন্তু মাটির প্রকৃতি বদলায় নাই। বরং অল্পসংখ্যক আর্য্যেরা অনার্য্যের প্রভাব প্রথমতঃ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম সেবায় এবং দেব পূজায় কেবল ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধিকার, এ কথা চালাইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদির স্বাধীন ধর্ম্ম চর্চ্চা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ গুরুরা নূতন ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্ম্মে শূদ্রাদি সকলকেই মন্ত্রদান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন; এবং মন্ত্রদীক্ষিতেরা নিজে নিজে ধর্ম্ম সাধনা করিতে পারিবে বলিয়া, একটা মিলন ও সন্ধিস্থাপন করেন। প্রাচীন মধ্য দেশে আর্য্যের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু চিরাগত নিয়ম পালনের অতিরিক্ত নূতন চিন্তার বিকাশ হয় নাই।

পরে যখন দক্ষিণ প্রদেশের নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম (ইহাও জনসাধারণের মধ্যে প্রথমে প্রচারিত) প্রবলতা লাভ করিল, তখন অন্য দেশের মত বঙ্গদেশেও উহা সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট আদৃত হইতে লাগিল। নিম্নস্তরের প্রভাবে সমাজের উচ্চস্তরেও এই নব ধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যে ধর্ম্ম কেবলমাত্র বৈদিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার সাধনায় সংস্কৃত বাঁধা মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; কাজেই সাধারণ লোকের সাধারণ ভাষায় "গীত" প্রস্তুত হইয়া, ও পুরাণ লিখিত হইয়া, এ ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল। ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে, প্রাচীন সংস্কৃত বা পালি, প্রাচীন বৈদিক ভাষা অগ্রাহ্য করিয়া নব বিকাশ লাভ করিয়াছিল; এই ধর্ম্ম-বিপ্লবেই যুগে যুগে সকল 'প্রাকৃত' ভাষার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। নব গৌড়ী রীতিতে প্রাকৃত ভাষায় রচনা ছাড়াও বঙ্গ সাহিত্যে যে যে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) নববৈষ্ণবধর্ম্মপ্রণোদিত নবগৌড়ী রীতির প্রথম কবি কে, তাহা হয়ত সম্পূর্ণ স্থির করা যায় না; কিন্তু এই রীতির বিকাশ এবং প্রচারে যে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রামবাসী বাঙ্গালী কবি জয়দেব চক্রবর্ত্তী প্রধান সহায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অক্ষর ছন্দ ছাড়িয়া কেবল গানের সুরে যখন গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল, তখন কবিতার ভাষা সংস্কৃত বলিয়া সকল প্রদেশেই অচিরাৎ উহার আদর হইয়াছিল। যে ছন্দ এবং পদলালিত্য গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই, মীরাবাই, সুরদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সকলেই তাহার অনুকরণে ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গভাষায় খুব প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাস যখন বঙ্গের, তখন বাঙ্গালার কবিতা মিথিলার ভাবে উদ্বুদ্ধ নহে।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষায় কাব্য রচনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যত্র সর্ব্বস্থলেই সংস্কৃত রীতি যথেষ্ট রক্ষিত হইতেছিল। সুরদাস প্রভৃতি কবির রচনা জয়দেবের প্রভাবে গানের ছন্দে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ পরিত্যক্ত হয় নাই। গুজরাটি এবং মহ্রাট্টি কবিতা ত আজিকালিও একেবারে নিখুঁৎ সংস্কৃত ছন্দে রচিত হয়; প্রাদেশিক নূতন কোন ছন্দ এ পর্য্যন্তও বিকশিত হয় নাই। উৎকলেও প্রথমতঃ গানের সুরে কবিতা লিখিবার প্রথা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখনও সেই প্রাচীন কালের সুর বা ছন্দে সকল কবিতাই রচিত হয়। বাঙ্গলা দেশের মত ওড়িষায় স্বাধীন নূতন ছন্দ জন্মিতেছে না। ওড়িষার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বিদ্যা-পতির দেশ মিথিলা সম্বন্ধেও সেই কথা। নব গৌড়ী প্রথার উদ্ভবের সময় মিথিলা এবং বঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

যে নূতনত্ব এবং নিরঙ্কুশতা কবিতার জীবন, একালের নব গৌড়ী প্রথায় তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। যে পূর্ব্ব-প্রদেশে অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ক্রিয়াকলাপময় ধর্ম্মের নবজীবনী শক্তিরূপে জনক-যাজ্ঞবল্ক-সংবাদে, উপনিষদের প্রথম উৎপত্তি; যে প্রদেশে জিন মহাবীর এবং ভগবান বুদ্ধদেব, প্রাচীন নিগড় ভাঙ্গিয়া মুক্তির নব মন্ত্র দান করিয়াছিলেন; সেই অবাধ স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই নবগৌড়ী

রীতিতে নব-সাহিত্যের অভ্যুদয়। বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তৈলঙ্গের প্রভাবে উৎকল সাহিত্য, এবং রক্ষণশীল মধ্যদেশের প্রভাবে মিথিলার সাহিত্য, নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না; জয়দেবের প্রভাব পাইয়াও হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু যাঁহারা গৌড়, মিথিলা এবং মগধ হইতে আসিয়া দ্রবিড়জাতিপরিপ্লুত বঙ্গদেশটিকে সুসভ্য করিয়াছিলেন, এবং দেশটিকে যাঁহারা যথার্থই দেশ-সংজ্ঞা-বাচ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কদাচ জাতিনিষ্ঠ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বঙ্গের দায়ভাগ সমগ্র ভারতবর্ষের স্মৃতির ব্যবস্থা নূতনভাবে গড়িয়া লইয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতায় সেকালে একালে বঙ্গদেশের একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের মূল যে ঐতিহাসিক অবস্থায়, এখানে সম্যকরূপে তাহার আলোচনা হইতে পারে না; কেবল সাহিত্যের হিসাবে একটা দিক দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

জয়দেব এবং চণ্ডীদাসের দেশে, কাব্য কখনো একটা নির্দ্দিষ্ট প্রথার নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া মলিন হয় নাই। জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দাশরথী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; পরে পরে দেখিয়া যাও, বাঙ্গলা সাহিত্য, ছন্দে, আখ্যানবস্তুতে এবং ভাবে, ক্রমাগতই নূতন পথে চলিয়াছে। কোন পরবর্ত্তী কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি অপেক্ষা নিকৃষ্ট রচনা করিতে পারেন, কিন্তু নূতনত্বে সকলেরই বিশেষত্ব আছে। যে কয়েকজন কবির নাম করিলাম, ইহাঁরা কেহই ইংরাজি প্রথার প্রভাবে কবিতা লেখেন নাই।

দেশব্যাপী পরাধীনতার দিনে মহারাষ্ট্রে নব রাষ্ট্র-নীতির অভ্যুদয় হইয়াছে, পঞ্জাব সামরিক দক্ষতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে উত্তরোত্তর কেবল কাব্য চর্চ্চাতেই নূতনত্ব বিকশিত হইয়াছে। সকলেই হয় ত একালে সামরিক গৌরবের পক্ষপাতী; কাজেই তাঁহারা ইহা বাঙ্গালার কলঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কলঙ্কের কথা হউক, অখ্যাতির কথা হউক, কিন্তু ইহাই যে বঙ্গের বিশেষত্ব তাহা বলিতেই হইবে। সাধারণ লোকের উপভোগের জন্য অতি প্রাচীন কালে যে শ্রেণীর যাত্রা অভিনয় ছিল, লোক বিশেষের জন্য যে শ্রেণীর কথকথা ছিল, মহারাষ্ট্রে এবং উত্তর-পশ্চিমে আজিও তাহাই, সেই প্রাচীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার যাত্রা, বাঙ্গালার ঢপ, বাঙ্গলার পাঁচালী, বাঙ্গলার কথকতা, একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। নিম্নশ্রেণীর দ্রবিড় জাতির "ডাল খাই" এবং 'তর্জা লড়াই' এখনো সম্বলপুর অঞ্চলে দূর পল্লীতে কষ্টে প্রাণধারণ করিতেছে; কিন্তু উহাই একটুখানি (বড় বেশি নয়,) বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া বাঙ্গালায় একদিন কবির গানের নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল। কাব্যের জিনিস—আমোদের জিনিস, বাঙ্গালী কখনো ফেলিয়া দিতে জানে না।

(২) বাঙ্গালার আর একটা বিশেষত্বের কথা বলিব; সেটা কাব্যে হাস্যরস। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসন এবং ভাণ ভিন্ন অন্য কাব্যে হাস্যরসের অবতারণা অধিক নাই। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন দেশের প্রাকৃত সাহিত্যে (হয়ত দেশনিষ্ঠ গাম্ভীর্য্যের ফলে) হাস্যরসের মাধুর্য্য দেখিতে পাই না। মর্হাট্টি নাটক শারদায় যে শ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা আছে গুজরাটি সাহিত্যেও তাহা পাই, কিন্তু বাঙ্গালার হাসি-বৈচিত্র বঙ্গের নিজস্ব। বাঙ্গালায় বীরত্বের আদর আছে কিনা পাঠকেরা জানেন, কিন্তু বাঙ্গালী যদি দেখে যে কোন ব্যক্তির হাস্যরস-অনুভূতির ক্ষমতা অল্প, অমনি তাহাকে কাট-খোট্টা বলিয়া গালি দেয়। কত দুঃখ কষ্টের ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তবু আমরা হাসিতে ভুলি নাই। তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই লিখিয়াছেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।" ধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য লিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের বারুই পাড়াতেও এ রঙ্গের অভাব নাই। রুচির কথা লইয়া যদি তর্ক না করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে ভারত চন্দ্র বর্ণিত, নারীগণের পতিনিন্দায় যে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য, অন্য কোন তৎসাময়িক প্রাদেশিক সাহিত্যে তাহা নাই। আকবরের সময়ে হিন্দি সাহিত্যে হাসির আমদানি হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে হাসি লালিকায় (Parody,) এবং কথায় উতর চাপানে (Pun) বদ্ধ ছিল। যে সভায় পৃথ্বীরাজ ও তান্‌সেন্ বাদসাহের প্রশস্তি রচনা করিতেন, সে সভায় রসিকতা যে ভাঁড়ামিতে দাঁড়াইবে, তাহার বৈচিত্র কি? (১)

(১) মোগল সম্রাট আকবরের সভায় তান্‌সেন গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন; একথা ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে স্বীকৃত। কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্যের

সরস, স্বাধীন, গালভরা হাসি, বাঙ্গালা সাহিত্যেই পাই। দাশুরায় এবং ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতে, একালের সুরুচিসম্পন্নেরাও মুগ্ধ। মাংসখাদ্য বাড়াইয়া বাঙ্গালী মোটা তাজা বীর হইতে পারিবে কি না, কংগ্রেস্ সভায় তাহার বিচার হউক। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, যে বাঙ্গালী যদি দুধে ভাতে থাকে, তবে তাহার কার্য্যানুরাগ এবং গালভরা হাসি, বজায় থাকিবে, এবং স্বদেশ বিদেশের লোক খুসি হইয়া বলিবে—চোখের জল ফেলিয়া বলিবে—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।"

(৩) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের জীবনচরিতের সমালোচনায় একালের প্রকৃতি এবং বিশেষত্বের কথা দক্ষতার সহিত লিখিয়াছেন। পাঠকদিগকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি। সে বিষয়ে অন্য দুচারিটি কথা বলিব। বঙ্গসাহিত্যের সেকাল ও একালের সন্ধিস্থলে, দাশরথি রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যাহা অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের বিষয় নহে বলিয়া উক্ত আছে, তাহা লইয়াও কবিতা লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরাও, দাশুরায়ের 'চারি ইয়ারি' সম্ভোগ করিতেন, এবং গুপ্ত কবির "এণ্ডাওয়ালা তপ্সী মাছ" প্রলোভনের সামগ্রী মনে করিতেন।

কবি মধুসূদনের সময় হইতে যখন বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি শিক্ষিতদের নেতৃত্বে চালিত হইতে লাগিল, যখন (উৎশৃঙ্খল হইলেও) নববিধ স্বাধীন ভাবের আঘাতে সমাজে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ কবিও বাসবদত্তার সৌন্দর্য্য ভুলিয়া, প্রকৃতির দিকে চাহিয়া 'পাখীসব করে রব' লিখিলেন। এখানেও একটা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; ভারতের সকল প্রদেশেই ইংরাজী শিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং হইতেছে; কিন্তু কোথায়ও ভাষার প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া, কোন কবি, বঙ্গের মধুসূদনের মত ইউরোপীয় ছাঁচে অমিত্রাক্ষর রচনা করিয়া, কাব্যবিকাশের নব পন্থা বাহির করেন নাই।

(৪) একালের বঙ্গসাহিত্যের চালক ইংরেজী শিক্ষিতেরা; একথায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়? ইংরেজী আমলের বিশেষ ব্যবস্থায়, ইংরেজী শিক্ষা ভিন্ন গতি নাই; নহিলে অন্নসংস্থান হয় না, মানসম্ভ্রম বজায় থাকে না। সম্পদ এবং সম্ভ্রমের জন্য কে না লালায়িত? কাজেই যাহাদের কিছুমাত্র সুবিধা আছে, তাহারা সকলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। যাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, বিদ্যায় অনুরাগ আছে তাহারা যখন প্রধানতঃ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সংস্কৃত টোলের জন্য যাঁহারা বাকি রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র হইবার ক্ষমতা কজনের রহিল? যাঁহারা বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ, সম্পদে পুষ্ট, এবং পদমর্য্যাদায় জ্যেষ্ঠ, তাঁহারা লকারার্থ নির্ণয়ে বিশেষ পটু না হইলেও, সমাজের নেতা এবং সাহিত্যের চালক হইলেন। স্বাভাবিকতাকে কেহ উল্টাইয়া দিতে পারে না। সমাজে যাঁহাদের পদমর্য্যাদা অধিক ছিল, তাঁহারা আদর করিতেন বলিয়াই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আদৃত হইতেন। রঘুর সভায় কৌৎস হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি লঘু সভায় কুৎসিৎ পণ্ডিত পর্য্যন্ত, সকলের পক্ষেই একই ব্যবস্থা। যে অবস্থায় আজিকালি পদমর্য্যাদা বাড়ে, তাহা ইউরোপ-প্রত্যাগতদিগের অধিক। তাহা ছাড়াও একালে যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার ফলে পদমর্য্যাদা লাভ করেন, টোলের হিসাবে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনাচার-দুষ্ট। এই উচ্চপদস্থেরা একালের স্মৃতির ব্যবস্থাদাতাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি বা বহুদর্শিতায় বড় মনে করেন না বলিয়া, আদর পাইবার যথার্থ স্থান হইতে পণ্ডিতদের আদর চলিয়া গিয়াছে।

মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ সকলেই ইংরেজিওয়ালাদিগকেই নেতা বলিয়া মানিয়া চলেন। রাষ্ট্রসমস্যায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিতৈষিবর্গের, বিচারালয়ে রাসবিহারী প্রভৃতি সুধীগণের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া, কাহারো পক্ষে আর নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় যাওয়া চলে না। যে কারণেই যাহা হউক, ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই দেখাইতেছি। একালের শিক্ষায় যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, সমাজের অন্তর্বিধ

বাসস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না। গোয়ালিয়রে সঙ্গীত শিক্ষা করার পর, মহম্মদ গৌসের সংসর্গ দোষে ইনি পতিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উঁহার যথার্থ নাম লুপ্ত না হইলে, নামের প্রকৃতি হইতেও বাসস্থান অনুসন্ধানের সুবিধা হইতে পারিত; কারণ আকবরের সময়ে প্রাদেশিকতায় নামের বিশেষত্ব জন্মিয়াছিল। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিলে উত্তর-পশ্চিমের লোক বুঝায় না, কি বৈজনাথ পাড়ে বলিলে বাঙ্গালী হয় না।

অবস্থা থাকিলেও, এই শ্রেণীর বুদ্ধিমানেরাই, আত্মগুণে যশস্বী হইতেন। ক্ষমতা ও বিদ্যা অর্জ্জনের সুবিধা লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, কোন কালের সমাজেই তাঁহাদের নেতৃত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না।

নূতন শ্রেণীর বঙ্গসাহিত্য বিকাশের প্রথম দিনে, শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে পদ্যকাব্যে মধুসূদন, ও গদ্যকাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র, এবং দৃশ্যকাব্যে দীনবন্ধু, যেরূপে বিদেশীয় নূতন নূতন ভাব, স্বদেশের সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া সাহিত্যে নব জীবন দান করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট ঋণী। ইচ্ছা করিয়া 'সমগ্র ভারতবর্ষ' কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গ্রন্থের মর্হাট্টি ও গুজরাটি অনুবাদের পর হইতেই, ঐ সকল দেশে ইংরেজি ধরনের নূতন সাহিত্য রচিত হইতে দেখিতেছি। একালে সর্ব্বত্রই সমান ভাবে ইংরেজি চর্চ্চা চলিতেছে বটে, কিন্তু বিদেশের জিনিষ দেশের মত করিয়া লইবার নূতনত্বটুকু বঙ্গদেশে বেশি দেখিতে পাই। অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ ধরিয়া, মেঘনাদবধ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের কাব্যত্ব নিরূপিত হয় না। পঞ্চসন্ধিসমন্বিত না হইলেও, নীলদর্পণখানি "অঙ্ক"(১) শ্রেণীস্থ একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক।

(৫) যাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাই ইংরাজী পড়ে; যাঁহারা শিক্ষিত এবং বহুদর্শী তাঁহারাই দেশের নেতা হয়েন। ইংরাজি-শিক্ষিতেরা বঙ্গসাহিত্যের নেতা হওয়াতে একালের সাহিত্য কি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই? ইউরোপের সভ্যতাকে যাঁহারা ম্লেচ্ছ যবনের হেয় সভ্যতা বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন, এবং ইউরোপের কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি ফুৎকারে উড়াইতে চাহেন, তাঁহারা বীর হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিমান নহেন। যাহা স্বাস্থ্য এবং পথ্য, তাহা ভারতবর্ষের একচেটিয়া নহে। সৌন্দর্য্য অনুভূতিতে, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে ইউরোপের যে নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে তাহার প্রভাব কি আমাদের সাহিত্যের উপর বাঞ্ছনীয় নয়? যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, যাহা জীবনপ্রদ, তাহা সকল জাতির পক্ষেই কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণীয়। কোন জাতিরই জীবনীশক্তি জাতি সংঘর্ষণ এবং জাতি সংমিশ্রণ ভিন্ন বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সমাজতত্ত্বের এই অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তটি আমরা ভুলিব কেন? উদ্ভাবনাশক্তি এবং চিন্তার সর্ব্বতোমুখ গতি, কোন জাতিতেই বহুদিন স্থায়ী হয় না; ক্ষয় এবং অবনতির দিনে নবজাতি সংঘর্ষণই উহার পুনরুদ্দীপনের উপায়।

হুন জাতির সংঘর্ষণ এবং সংমিশ্রণের পর, এবং চালুক্যাদি গুর্জ্জর জাতির অভ্যুদয়ের পর, যখন ভারতবর্ষ কেবল আপনাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিল, তখন হইতেই ভারতের অবনতির আরম্ভ। ভারতের আর্য্যজাতির জীবনী শক্তি বহুসহস্রবৎসরব্যাপী লীলার পর যখন ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইল, তখনকার সাহিত্যে কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ; কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। হস্তীর নাম করিতে গিয়াই মদস্রাবের বর্ণনা, রমণীর মুখের কথা বলিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রের উপর অত্যাচার, এই পতিত যুগের কবিতার অবলম্বন। বিরহের বর্ণনায় যখন কোকিলের নামে ২৭টি এবং মলয় সমীরণের নামে ২১টি কবিতা পড়া যায়, তখন দময়ন্তী অপেক্ষা পাঠকের কষ্ট অধিক হইয়া উঠে।

(৬) একথাও স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে সাহিত্যের ভার পড়িল, তখন এ দেশের প্রাচীনতার মধ্যে, যাহা সুন্দর এবং জীবনপ্রদ ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছিল, এখনো সে দোষ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু কাল-বশে হইবে, এরূপ আশা আছে। খাঁটি বিলাতি ধরণে এবং বিলাতি দৃষ্টান্তের বাহুল্যে বঙ্গ-সাহিত্য রচিত হইলে, বিলাতি অভিধানের সাহায্য ভিন্ন, তাহার অর্থবোধ হইতে পারে না; এবং ঐ অভিধানের তিরোধানের সঙ্গেই ঐ প্রকারের সাহিত্য দুর্ব্বোধ্য এবং অগ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু এরূপ কোন রচনা, এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

যাঁহারা এখন নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতচর্চ্চা লইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মানসিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির এখনো অভাব না থাকিতে পারে। কিন্তু সমষ্টি লইয়া তুলনা করিলে, অনায়াসে বলিতে পারি, যে মানসিকশক্তিসম্পন্নেরাই ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত; এবং একালের অবস্থার ফলে

(১) অঙ্কের প্রধান লক্ষণগুলি এই:—(ক) নেতারঃ প্রাকৃতনরাঃ; (খ) রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী, (গ) বহুস্ত্রী-পরিদেবিতং; (ঘ) প্রখ্যাতমিতি-বৃত্তকং, (ঙ) কবি-বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।

তাঁহারাই বহুদর্শিতা এবং বুদ্ধির বিকাশ বেশি লাভ করিতেছেন। এরূপ স্থলে যখন সাহিত্যসেবক ইংরেজি-শিক্ষিতেরা প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে প্রাচীন ভাষা-জ্ঞানের গৌরবটুকুও একালের শিক্ষিতেরা অপহরণ করিবেন। পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে, ভাউদাজি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি, টোলের গৌরব আত্মস্থ করিয়াছেন; অচিরাৎ বঙ্গেও সেই ফল ফলিবে।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না; কাল-ধর্ম্মে যাহা হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি। কেবল মাত্র সংস্কৃত জ্ঞানের ফলে যে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কোন নূতনত্বের বিকাশ নাই, এবং টোলের-পণ্ডিতের সমালোচনায় যে তীক্ষ্ণতা, গভীরতা, বা সর্ব্বদেশদর্শিতা নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। একালের জ্ঞানের সহিত ইঁহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; অথচ ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিতান্ত না বুঝিয়াই বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া খেলা করিতে চাহেন। কাজেই, একালের শিক্ষিতদের নিকটে উঁহারা "হিং টিং ছট্" বলিয়া পদে পদে উপহাসাস্পদ মাত্র হইতেছেন। সকল বিষয়ের নেতৃত্ব হারাইয়া, যে মোক্ষশাস্ত্র লইয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ ব্যাখ্যার ফলে, কেবল অভক্তি এবং হাসির সৃষ্টি হইতেছে। "গীতার একটি অধ্যায়ের মধ্যেই" সব আছে, মনে করিয়া, বিশ্বনাথের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের প্রকাশ অগ্রাহ্য করা চলেনা।

দুচারি জন বুদ্ধিমান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, পালি নামে খ্যাত প্রাচীন প্রাকৃত-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি। আশা করি উত্তরোত্তর ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বৈদিক ধর্ম্ম।

[জি-দে লার্ফোর ফরাসী হইতে]

বৈদিক যুগ—দিগ্‌বিজয়ের যুগ; এই যুগে, আর্য্যেরা সিন্ধুনদের প্রদেশে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত যাত্রা করে।

আর্য্য বংশের প্রথম দলেরা, স্বকীয় জন্মভূমি বাকৃত্রিয়ানা (বাহ্লিক) ছাড়িয়া, সিন্ধুনদ পার হইয়া, যখন এই বিশাল ভারত-প্রায়দ্বীপ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা এই দেশের ভূম্যধিকারী অধিবাসীদিগের সংস্রবে আসিল। এই আদিম অধিবাসিদিগের নাম দস্যু। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে, এই দস্যুগণ,—বৃষ-মুখ, নাসিকাহীন, হ্রস্ববাহু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আর্য্যেরা উহাদিগকে ক্রব্যাদ নামে অভিহিত করিত; ক্রব্যাদের অর্থ—মাংসভোজী রাক্ষস। আর্য্যেরা মাংস স্পর্শ করিত না। এই সকল বর্ব্বরেরা কোন দেবতা মানিত না, তাহাদের কোন ধর্ম্ম ছিল না। ইহারা কোন্ জাতীয় লোক?—বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। বেদে উহাদের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে পীতজাতির সহিত অনেকটা মিল হয়। এই অনুমানের ভিত্তি—উহাদের দৈহিক প্রকৃতি। দস্যুদের রং ছিল কালো; উহাদের চর্ম্ম রোমশ ছিল না—যাহা আর্য্যদের একটা বিশেষ লক্ষণ; উহাদের নাক ছিল চ্যাপ্‌টা। দস্যুদের কোন ধর্ম্ম ছিল না; ইহাও একটা বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে; এই লক্ষণটি পীতজাতির সহিত মেলে; পৃথিবীতে যতপ্রকার মানবজাতি আছে, তন্মধ্যে একমাত্র পীতজাতির মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কংফুচুর ধর্ম্ম ও লাও-ৎসুর ধর্ম্ম--নীতি ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম—যাহা নিরীশ্বর ধর্ম্ম—উহাই পীতজাতির অধিকাংশ লোক পরে অবলম্বন করে।

বেদে দেখা যায়,—দস্যুদের মধ্যে কতকটা ভৌতিক সভ্যতাও বিদ্যমান ছিল। এই বিষয়েও পীতজাতির সহিত একটু মিল আছে। পীতজাতীয় লোকেরা খুব কেজো, উহাদের সভ্যতা, নবোদ্‌ভাবিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রথম আর্য্যেরা, যাহাদেরই সংস্রবে আসিত তাহাদের সকলকেই নির্ব্বিশেষে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত। পরে তাহারা জানিতে পারিল যে দুই প্রকার দস্যু আছে; এক—পার্ব্বত্য দস্যু, আর এক মধ্য-দেশের দস্যু; প্রথমোক্ত দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ, ও দ্বিতীয়োক্ত দস্যুরা পীতবর্ণ।

"দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ, বন্য, ভীষণ হিংস্র, পর্ব্বতের মধ্যে

প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, মানুষ অপেক্ষা বানরেরই সহিত উহাদের বেশী সাদৃশ্য, উহারা সমস্ত দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত—বিন্ধ্যাচলে উহারা 'পিল পিল্' করিতেছে বলিলেও হয়।" —Marians Fontane তাঁহার "বৈদিক ভারত" গ্রন্থে উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, আর্য্যেরা যে এই দুই জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।...

এই আর্য্য কাহারা? কোথা হইতে উহারা আসিল? Burnouf তাঁহার প্রখ্যাত বেদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এইরূপ বলেন:-"আর্য্য শব্দ, চিরকালই ভারতবর্ষে, "শ্রেষ্ঠ"—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জর্ম্মান শব্দ Ehre, যাহা পুরাতন জর্ম্মান ভাষায় Ere—এইরূপ লিখিত হইত, উহা বোধ হয় এই আর্য্য শব্দেরই রূপান্তর এবং উহা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদিম জর্ম্মান শব্দ Ermann—জর্ম্মান বীরের নাম যাহাকে রূপান্তর করিয়া রোমকেরা Arminius বলিত, তাহাও বোধ হয় আর্য্য শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। য়ুরোপের পুরাতন ও আধুনিক আরও অনেক শব্দের মধ্যে এই আর্য্য শব্দের ছায়া লক্ষিত হয়; পাশ্চাত্য এসিয়ায় যে সকল শ্বেতবর্ণের লোক সেমিটিক্ নহে তাহাদেরই জাতিবাচক সাধারণ নাম—আর্য্য। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন আকারের এই আর্য্য নাম, ঐ সকল দেশের লোকের আপনাদেরই দেওয়া; অন্য দেশবাসীদিগের অপেক্ষা উহারা যে শ্রেষ্ঠ ইহাই ঐ শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। প্রাচ্যখণ্ডের পীতজাতিদিগের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব আর্য্যদিগেরই যে শুধু নিঃসম্পর্কতা তাহা নহে, ইন্দ-য়ুরোপীয় অন্যজাতিরাও ঐ পীতজাতিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারে। মূলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব আর্য্যদের পূর্ব্বপুরুষ একই।"

যে জাতি, সগর্ব্বে আপনাদিগকে "আর্য্য" বলিত, "বিশুদ্ধ" বলিত, "আলোকের শুক্লবর্ণ দুহিতার" বংশধর বলিত, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণ ছিল:-তাহাদের ফর্সা রং, তাহাদের কেশ ও শ্মশ্রু সূক্ষ্ম, তাহাদের গাত্র কোমল রোমে আচ্ছন্ন, তাহাদের নাসিকা সরল (সুশিপ্র), তাহাদের দেহযষ্টি পাতলা। পামিরের উচ্চ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ সাংকেতিক সামগ্রী। এই স্বল্প পুঁজি লইয়াই তাহারা চতুর্দ্দিকে সভ্যতা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ উন্নত সভ্যতা আর কোন জাতি কর্ত্তৃক কোনও কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে,—ভারতবর্ষে, এই আর্য্যেরাই ব্রাহ্মণিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। উহাদের বিপুল দার্শনিক ও সাহিত্যিক কীর্ত্তি;—যে দর্শন ও সাহিত্যের স্পষ্ট গ্রীশ ছাড়া আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে, ইরানী আর্য্যেরাই পারস্য-রাজ্যের সংস্থাপক। দক্ষিণে, গ্রীশ ও ইটালী দেশের আদিম আর্য্যেরা (Pelasges) গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে; এবং আর্য্যদের শেষ শাখাগুলি, উত্তরে গিয়া—পাশ্চাত্যখণ্ডে গিয়া—সপ্তসিন্ধুর আর্য্যদের প্রায় দুই তিন সহস্র কিংবা ততোধিক বৎসর পরে, আবার আপনাদের মধ্যে একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

অতএব সপ্তসিন্ধুর দেশেই, আমাদের আর্য্যশাখার প্রবর্ত্তিত সভ্যতা সর্ব্বপ্রথমে বিকশিত হইয়া উঠে; যে মহতী কীর্ত্তির উপর এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তাহা বেদ। এই বেদ—বৈদিক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মস্তোত্র সমূহের সংগ্রহ মাত্র। এই বৈদিক ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। বেদ শব্দের অর্থ—বিজ্ঞান, ইহাই আর্য্যদিগের পবিত্র গ্রন্থ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ।

ঋগ্‌বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য; আর তিনটি উহা হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের আর্য্যশাখার উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি। বুর্নুফ্ (Burnouf) অনুমান করেন, ন্যূনকল্পে খৃষ্টাব্দের ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়, কিন্তু কিংবদন্তী উহাকে আরও পুরাতন বলিয়া প্রতিপন্ন করে; ঋগ্‌বেদের সমস্ত মন্ত্র হইতে ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে, কেন না ঐ সকল মন্ত্রে ঋগ্‌রচয়িতাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম অবিরত কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"এসিয়াটিক রিসার্চ" গ্রন্থের বিবিধ স্থানে, কোল্‌ব্রুক্ বেদের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত্ব নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন:—"বেদগ্রন্থের যে সকল বচন এখন পাওয়া

গিয়াছে, উহার প্রামাণিকতা আমি সমর্থন করি…এই বেদগ্রন্থ প্রামাণিক; অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসর না হউক, অন্ততঃ শত শত বৎসর ধরিয়া—এই সকল গ্রন্থ, এই সকল রচনা, বেদ নামেই হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবত এই বেদগ্রন্থ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সংকলিত হয়, তাই দ্বৈপায়নের নাম ব্যাস অর্থাৎ সংগ্রহকর্ত্তা।”

কোলব্রুক্ বৈদিক জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—“যৎকালে বেদ-ব্যবহৃত পঞ্জিকার নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তখন প্রথম অয়নান্ত, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে ও দ্বিতীয় অয়নান্ত অশ্লেষা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে অবস্থিত ছিল এইরূপ গণনা করা হয়; অতএব খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, দিগ্‌বিভাগের এইরূপ অবস্থান ছিল। ইতঃপূর্ব্বে বেদের একটা বচন হইতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, মাস-পর্য্যায়ের সহিত ঋতুপর্য্যায়ের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃত একটা বচন হইতেও দেখা যায়, দিগ্‌-বিভাগের সহিতও উহার মিল আছে।” সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখিলে,—ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলি, বাহ্য প্রকৃতি কিংবা আর্য্যদিগের দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত। কিন্তু ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে, বাস্তব বিষয়ের পাশা-পাশি, যেন একটা রূপক-কল্পনায় জগৎ অধিষ্ঠিত। মন্ত্রগুলি যেখানে গীত হইত সেই সকল স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা, নৈসর্গিক ঘটনা, শত্রু লোকের মধ্য দিয়া আর্য্যদের যাত্রা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও গোর দিবার কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি—এই সমস্ত বিষয় ঋগ্‌বেদের মধ্যে আছে। ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও জানিতে পাই,—আর্য্যেরা তখন পিতৃশাসন তন্ত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত,—তাহারা পৃথক্ ভাবে একএকটা পরিবারের মধ্যে বাস করিত; তাহারা কোন নগর নির্ম্মাণ করিত না; যখন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইত তখন তাহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। পিতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্তা, ও মাতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না। বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগেও বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব ছিল। বর্ণভেদ প্রথা আদৌ ছিল না। মোটের উপর,—ঐ যুগের আর্য্য-ব্যবস্থাবলী আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্রের অনুরূপ ছিল। পুরোহিত-সম্প্রদায় মোটেই ছিল না; তখন পুরোহিতের আধিপত্য ও পিতার প্রভুত্ব একত্র মিশ্রিত ছিল,—কেননা, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোন গুহ্যভাব ছিল না, সমস্ত অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে হইত। এবং তখন মন্ত্র সমূহের সহিত ধর্ম্মমতও পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হইত; পিতাই নিজ সন্তানের উপদেষ্টা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও খুব সাদাসিধা ছিল: কোন দেবালয় ছিল না, কোন অনাবৃত স্থানে, শুধু এক-একটা ঘাসের চাপড়ায় যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইত, দুই কাষ্ঠ খণ্ডের সংঘর্ষণে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত; উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইত; পরে যখন আগুন জ্বলিয়া উঠিত, পুরোহিত দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্যস্বরূপ মোদক-আদি মিষ্টান্ন ও সোমলতা অর্পণ করিত এবং পুরোহিতের সহকারীরা বেদমন্ত্র গান করিত। এই সাদাসিধা অনুষ্ঠান, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া হইত: উষাকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সূর্য্যাস্তকালে। অনেক দিন পর্য্যন্ত, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্রের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মমত ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই;—অর্থাৎ, তাঁহারা বলিতেন,—প্রাকৃতিক শক্তিদিগকে আহ্বান করাই ঐ সকল মন্ত্রের একমাত্র কাজ; এক কথায়, উহা বহুদেব-বাদাত্মক ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মানুসারে আগুনের নামে অগ্নিদেবকে, আকাশের নামে ইন্দ্রদেবকে, সূর্য্যের নামে সূর্য্যদেবকে, জলের নামে বরুণ দেবকে উপাসনা করা হইত—সমস্ত মহাভূত ও সমস্ত আন্তরীক্ষিক ব্যাপারই—বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভূত দেব-মণ্ডলী। বৈদিক ধর্ম্মের আদি-যুগে, খুব সম্ভব, আর্য্যেরা বহুদেব-বাদী ছিল; যাই হোক্ বহুদেব-বাদ ও মহাভূতের উপাসনা—এই দুয়ের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে। স্বকীয় দেবপূজার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আর্য্যদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল; তাঁহাদের নিকট, বেদমন্ত্র প্রার্থনা বই আর কিছুই নহে। Burnouf বলেন:—“মনে হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল তাঁহাদের যে সকল প্রার্থনা মন্ত্রাকারে হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, উহা যে শুধু পরিবর্ত্তন-

শীল বায়ু ও বৃষ্টির উপর প্রভাব প্রকটিত করে তাহা নহে, পরন্তু উহা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও অধিকতর স্থায়ী প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহেরও অনুষঙ্গী ও সেই সকল ব্যাপারকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।" খৃষ্টধর্ম্মের (Rogation) পার্থিব সুখসম্পদের জন্য প্রার্থনা, ঐ একই বিশ্বাস হইতে কি উৎপন্ন নহে ?

বামদেবের রচিত মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই :—"কর্ম্মকার যেমন লৌহকে গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবতাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন।" অতএব বৈদিক মন্ত্রকারেরা স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহারা নিজেই দেবতাদের স্রষ্টা, সুতরাং মন্ত্র ব্যতীত দেবতাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, তাঁহারা দেবতাদিগকে বিশ্বাস করেন না। অতএব, বহুদেববাদের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য; এবং শব্দবাদ কিংবা বাণীবাদ (Logos) হইতে ইহার এক-পাদ মাত্র ব্যবধান। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়াছে।

কিন্তু "অসুর"-বাদ সম্বন্ধেই অর্থাৎ প্রাণের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই বৈদিক ধর্ম্ম, কূট দার্শনিকতার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত 'অসু'-শব্দের অর্থ প্রাণ এবং 'র'-অক্ষর যোগে "প্রাণের উৎপাদক" এইরূপ বুঝায়—ইহাই অসুর-শব্দের মূল-অর্থ। আর্য্যেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। তাঁহারা বলিতেন, প্রাণই প্রাণকে পোষণ করে। প্রাণীরা অন্য প্রাণীকে আত্মসাৎ করে; সেই সব প্রাণী আবার, বৃক্ষ লতাদি খাইয়া জীবনধারণ করে; বৃক্ষ লতারা আবার উদ্ভিজ্জ ও জীবশরীরের পরিত্যক্ত অংশের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বলে "চক্র,"—অর্থাৎ প্রাণের চক্রগতি। প্রকৃতি রাজ্যে, প্রাণ ও গতিশক্তি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ফলত, যাহার গতি-নাশ হয়—তাহারই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যুক্তির সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই, আর্য্যেরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অসুরেরা গতিমান্, তাহাদের শরীর দীপ্তিমান্—সুতরাং তাহারা সর্ব্বব্যাপী ও অমর।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই মতবাদটি, বহুদেববাদাত্মক; কিন্তু আর্য্যগণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা পরম-মূলতত্ত্বরূপ দার্শনিক একতার দিকে,—সেই প্রবণতাই উহাদিগকে একেশ্বরবাদে শীঘ্র উপনীত করিল। অগ্নিদেবের ধারণা হইতেই উহারা একেশ্বরবাদে আসিয়া পৌছিল। —"সমস্ত জগতের সত্তা তোমা হইতেই; কি হোম-পাত্রে, কি মানব-হৃদয়ে, কি জলে, কি অগ্নিকুণ্ডে, সমস্ত প্রাণের মধ্যে তোমার মহিমার মধুর লহরী প্রবাহিত হইতেছে।" —এইরূপ বামদেব বলিয়াছেন। অতএব অমূর্ত্তভাবাপন্ন (idealised) অগ্নিই এই বহুদেববাদের পত্তন ভূমি। ভরদ্বাজের বেদমন্ত্র শ্রবণ কর: "সমস্ত জীবের মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তৃ-শক্তি বিদ্যমান; সমস্ত দেবতারা মিলিয়া এই শক্তিমান পুরুষকে বেষ্টন করিয়া আছেন। যখন ভাবি, এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার অন্তরে রহিয়াছেন, তখন আমার কর্ণ ব্যথিত হয়, আমার চক্ষু কাঁপিতে থাকে, আমার মন সন্দেহে বিক্ষিপ্ত হয়। আমি কি বলিব ? আমি কি চিন্তা করিব ?" তবেই দেখ, ভৌতিক অগ্নি অমূর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ধারণার খুবই কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে এই অগ্নির আর বিশেষ অস্তিত্ব রহিল না; পুংলিঙ্গ-বাচক পরম পুরুষ ব্রহ্মা ইঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

দীর্ঘতম ঋষির (Dirghatamas) মহামন্ত্র ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে: "যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নি শরীর বিধান করিতেছেন—ইহা কি জন্মকালে কেহ দেখিয়াছে ? পৃথিবীর মন, রক্ত, আত্মা কোথায় ছিল ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই ঋষির কাছে কে আসিয়াছিল ? আমি দুর্ব্বল ও অজ্ঞ—আমি এই সকল রহস্য উদ্‌ভেদ করিতে চাহিতেছি···আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর আরম্ভ কোথায়, পৃথিবীর মধ্য কোথায় ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ফলবান অশ্বের মূলবীজটি কি ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের আদিম আশ্রয় কে ? এই পবিত্র ঘেরটিই পৃথিবীর আরম্ভ এবং এই যজ্ঞ হোমই জগতের কেন্দ্র। এই সোমই ফলপ্রসূ অশ্বের বীজ। এই পুরোহিতই বাক্যের আদিম আশ্রয়। আমি জানি না, কাহার সহিত এই জগতের সাদৃশ্য আছে। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, এবং আমি চিন্তাশৃঙ্খলে জড়াইয়া পড়িয়াছি···মৃত্যুর মধ্যেই অমৃত অবস্থিত; এই দুই নিত্য বস্তু সর্ব্বত্রই গমনাগমন করে; কেবল লোকে একটি না জানিয়া অন্যটিকে জানে··· যে ব্যক্তি পরমপুরুষকে জানে না, সে এ মন্ত্রের কিছুই বুঝিতে

পারিবে না; যে তাঁহাকে জানে, সে মৃত্যু ও অমৃতের সম্মিলনও অবগত আছে…"যে দেবতা সমস্ত আকাশে পরিভ্রমণ করেন, লোকে তাঁহাকে মিত্র বলে, বরুণ বলে, অগ্নি বলে; সদ্‌বিপ্রেরা এই অদ্বিতীয় পুরুষকে,—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্—এইরূপ বহুনামে ব্যক্ত করেন।"

অবশেষে প্রজাপতি জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন: তখন কিছুই ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। ভূও ছিল না, ভুবও ছিল না, স্বও ছিল না। এই আচ্ছাদনটি কোথায় ছিল?—কোন্ জলগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল? এই আকাশের গভীরতম প্রদেশ-সকল কোথায় ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। দিবা ও রাত্রির সূচনা করে এমন কিছুই ছিল না। একমাত্র তিনিই আপনার মধ্যে লীন থাকিয়া, বায়ুহীন নিঃশ্বাস নিঃশ্বসিত করিতেছিলেন। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। সেই আদিকালে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল; জলের কোন বেগ ছিল না; সমস্তই একাকার ছিল। এই বিশৃঙ্খল একাকারের মধ্যে পরমপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহার করুণাতেই এই মহাবিশ্বের জন্ম হইল। আদিতে তাঁহার প্রেম আপনার মধ্যেই ছিল, পরে তাঁহার জ্ঞান হইতেই আদি বীজ ছুটিয়া বাহির হইল। ঋষিরা তপস্যার বলে সৎ-এর সহিত অসৎ-এর যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন…এ সকল বিষয়ের জ্ঞাতাই বা কে? বক্তাই বা কে? এই সকল সত্তা কোথা হইতে আসিল? এই উৎপত্তি-ব্যাপারটা কি? দেবতারাও তাঁহা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সত্তা কিরূপে হইল? যিনি এই জগতের আদিস্রষ্টা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ইহা আর কে করিতে পারে? দ্যুলোক হইতে, যাঁহার চক্ষু জগতের উপর নিপতিত রহিয়াছে তিনিই ইহা জানেন। তিনি ব্যতীত এ বিজ্ঞান আর কাহার হইতে পারে?"

একজন ঋষি, আর এক মন্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছেন দেখিতে পাই:

"যিনি আত্মদা, বলদা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, দেবতারা যাঁহার শাসন অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার ছায়া মৃত্যু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? এই হিমবন্ত পর্ব্বত সকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহিমা, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার দ্বারা স্বর্গলোক, যাঁহার দ্বারা সুরলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অন্তরীক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যাঁহার পালনাশক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান এই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি? যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি?"

পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বৈদিক যুগের শেষ হইল; তাহার পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আরম্ভ। বেদের ভাষ্য যে উপনিষদ্—সেই সকল উপনিষদে পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত ও পরিপুষ্ট হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আর কিছু করিবার রহিল না, শুধু তাহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া সেই সিদ্ধান্তের উপরেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিশ্বব্রহ্ম-বাদের বীজমন্ত্রস্থাপন করিল।

আমি কেবল উপনিষদ্ হইতে—যজুর্ব্বেদের উপনিষদ্ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব; "এই জগৎ এবং এই জগতে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সমস্তই বিধাতা-পুরুষের শক্তি দ্বারা পূর্ণ; অতএব, পার্থিব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে অর্চ্চনা কর।… মানুষ স্বকীয় কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে; হে মনুষ্য! এই সকল কর্ম্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা কলুষিত না হয়। যাহারা পার্থিব সুখে আসক্ত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্যলোকে গমন করে। এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ চলেন না, অথচ তিনি মন হইতে বেগবান, তাঁহাকে দেবতারাও ধরিতে পারে না। তিনি বাহ্যইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তিনি অন্তরিন্দ্রিয়দিগকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করেন। তিনি সমস্ত আকাশে অচলভাবে অবস্থিত হইয়া

এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন! তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে! যিনি পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। বিশ্বাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত সর্ব্বজীব অবস্থিত—ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার অবিদিত কি আছে? তিনি সর্ব্বগত, শুভ্র নির্ম্মল, আকার, শিরা ও ব্রণহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি, তিনি মনীষী, তিনি পরিভূ, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথাযথ অর্থসকল বিধান করেন। যাহারা অবিদ্যাকে অর্চ্চনা করে তাহারা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে গমন করে, এবং যাহারা বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলেন, বিজ্ঞানের ফল একরূপ, অজ্ঞানের ফল অন্যরূপ; এই উপদেশ আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা একসঙ্গে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা প্রথমে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তাহার পর বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন। যাহারা সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে, যাহারা নশ্বর সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হয় তাহারা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে। ঋষিরা বলিয়াছেন, নশ্বর পদার্থের ফল একরূপ, অবিনশ্বর পদার্থের ফল অন্যরূপ। পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি নশ্বর পদার্থ ও লয়তত্ত্ব—এই উভয় জিনিস একসঙ্গে শিক্ষা করেন, তিনি প্রলয়ের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরে অকৃত পদার্থের দ্বারা অমৃত লাভ করেন। গৌরবান্বিত হিরণ্ময় অবগুণ্ঠনে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। জগৎ পোষণ হে সূর্য্য! আমার সমক্ষে সত্যকে প্রকাশ কর যাহাতে আমি তোমার চিরভক্ত হইতে পারি,—ন্যায়ের সূর্য্য ও সত্যের সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারি। হে লোক-পোষণ সূর্য্য! হে নিঃসঙ্গ তাপস! পরম প্রভু পরম নিয়ন্তা! প্রজাপতির পুত্র! তোমার দীপ্ত কিরণ বিকীর্ণ কর; তোমার প্রখর তেজ সংহরণ কর, যাহাতে আমি তোমার মোহন রূপ ধ্যান করিতে পারি, তোমার মধ্যে যে দিব্য পুরুষ বিচরণ করেন, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতে পারি! আমার প্রাণবায়ু যেন আকাশের বিশ্বাত্মা ও ভূতাত্মার মধ্যে বিলীন হয়! আমার এই ভৌতিক ও নশ্বর দেহ যেন ভস্মে পরিণত হয়! হে দেব! আমার প্রদত্ত হবি তুমি স্মরণ করিও, আমার যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিও। হে অগ্নি! সরল পথ দিয়া, আমাদের সমস্ত পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গন্তব্য স্থানে আমাদিগকে উপনীত কর। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই অবগত আছ, আমাদের পাপ সকল অপনীত কর। আমরা তোমাকে বন্দনা করি, আমরা তোমাকে প্রণিপাত করি!"

বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে উত্তীর্ণ হইবার পথে এই মহান উপনিষদই সন্ধিস্থান। এই উপনিষদ্‌ই বৈদিক মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার, এবং এই উপনিষদের মধ্যেই সেই সকল মতবাদের বীজ নিহিত ছিল যাহা পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের উদ্যমে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে।

বেদ যে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের চক্ষে এত পবিত্র, তাহার কারণ, বেদই সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের, দার্শনিকতত্ত্বের, সামাজিক ও রাষ্ট্রিকতত্ত্বের সূত্রস্থান; বেদ আসলে বিশুদ্ধ আর্য্য জাতির নিজস্বসামগ্রী, উহার মধ্যে কোন বিদেশী 'ভেজাল' প্রবেশ করে নাই, অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে যে আর্য্যজাতি আবদ্ধ ছিল,—বেদ তাহাদেরই জ্ঞানোন্নতির ফল; একমাত্র নিজ সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যজাতি কিরূপে জ্ঞানসভ্যতায় উন্নতিসাধন করিয়াছিল—বেদ তাহারই নিদর্শন। অতএব, আর্য্যধর্ম্ম-সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, যে সব সাংকেতিক সামগ্রী আছে, যে সব মতবাদ আছে—সে সমস্তের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, বেদের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই, আর্য্যবংশীয় পুরাণাদির ভিতরকার ভাব অনেকটা বুঝা যায়—তাহাদের মূল মর্ম্ম অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এবং একমাত্র বেদই,—গ্রীক্, ল্যাটিন, স্ল্যাভ, জর্ম্মান ও সেল্টজাতির পুরাণাদির প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

এখন দেখা যাক, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিরূপে বেদ হইতে জন্মগ্রহণ

করিল। দেশজয় করিতে করিতে, আর্য্যেরা যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজিত দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল, এবং সেই সব স্থানে স্থায়ী ভাবে বসতি করিতে লাগিল,—সেই পরিমাণে তাহাদের জীবন নির্ব্বাহের প্রণালীও একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

প্রথমে তাহারা এক এক পরিবার পৃথকভাবে বাস করিত, তাহার পর তাহাদের এক একটা মণ্ডলী হইল। প্রথমে পরিবারের অন্তর্গত পিতাই পুরোহিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পৌরোহিত্য কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য, কতকগুলি বিশেষ পরিবারের হস্তে গিয়া পড়িল।

ফলতঃ, বৈদিকযুগের আরম্ভকালে, যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্মের জন্য একজন পুরোহিত আবশ্যক হইত, পরে তাহার জন্য সাত জন পুরোহিতের আবশ্যক হইল; তা ছাড়া, দস্যুদের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইত বলিয়া, কতকগুলি রণদক্ষ নেতার প্রয়োজন হইল। এই দুই প্রয়োজন হইতেই, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি।

আর্যাদিগের মনে কতকগুলি দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা ভাবিল,—ঐ সকল সমস্যা, যে সকল ব্যক্তির জীবনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, কেবল তাহারাই ঐ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ। তা ছাড়া আর্য্যেরা দেখিল, তাহারা স্বল্প লোক—পীত ও কৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য লোকের মধ্যে বাস করিতেছে, যদি তাহারা ঐ সকল লোক হইতে পৃথক্ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য, বিজেতারা যাঁহাতে বিজিত জাতির মধ্যে একেবারে মিশিয়া না যায়, যাহাকে আর্য্যেরা সগর্ব্বে বলিত "অসুর-গর্ভজাত উৎকৃষ্ট জাতির নির্ব্বাচিত বীজ"—সেই বীজের বিশুদ্ধতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাহারা উদ্যমের সহিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অনার্য্য জাতিদিগের সহিত আর্য্যজাতির বিবাহ নিবারিত হইল, আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে, আপনাদের ধর্ম্মমত হইতে দূরে রাখিল, তাহাদের জন্য কেবল কতকগুলা নীচবিশ্বাস ও স্থূল উপধর্ম্ম রাখিয়া দিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের বর্ণভেদ-প্রথার উৎপত্তি। সকলের শীর্ষস্থানে দুই শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়; তারপর বণিক ও কারিগরশ্রেণী—বৈশ্য ও শূদ্র—ইহারা বিজিত লোক লইয়া গঠিত।

যে বর্ণভেদ-প্রথা পরে এত নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহাই হিন্দুসভ্যতার শৈশব-দোলা বলিলেও হয়; এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে,—যাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত, সমস্ত দার্শনিকসিদ্ধান্ত নিঃসৃত—সেই পরমাশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ্য-যুগের আবির্ভাবই হইত না; যাহার অনুপম সৌন্দর্য্য, যাহার বিচিত্র আকার সেই সংস্কৃত সাহিত্যের উদয়ই হইত না। এক কথায় এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে আর্য্যজাতির অস্তিত্বই থাকিত না; বহুকাল পরে, সমস্ত মানব-ব্যাপারে যাহা স্বভাবত ঘটিয়া থাকে—যখন প্রভুত্বের অপব্যবহার হইতে নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচার উৎপন্ন হইল তখনই শাক্যমুনি বুদ্ধদেব অবির্ভূত হইলেন এবং তিনি সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসার ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, শান্ত-ভাবে একটা সমাজবিপ্লব সংঘটিত করিলেন;—অনার্য্য-জাতির কিয়দংশ লোককে, আর্য্যজাতির নৈতিক মর্য্যাদার পদবীতে উত্তোলন করিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের নারী-সমাজ।

জাপান সম্বন্ধে বৈদেশিক নানা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলেও একখানিতেও জাপ-রমণীর সামাজিক অবস্থার বিষয় এবং প্রাচীন জাপানে তাহাদের কিরূপ প্রভুত্ব প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহাদের দ্বারা কি কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জাপানের সর্ব্বপ্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জিন্‌জো নরুসি (Ginzo Naruse) লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সমালোচকগণ জাপান-রমণীকে কদাচিৎ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহারা তাহাদিগকে চীন ও কোরিয়া দেশের রমণী-সমাজের ন্যায় এক অপ্রয়োজনীয় ও স্বতন্ত্রসত্তাহীনা সামাজিক-জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পুরাতন বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত জাপ-রমণীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত নহে।

তজ্জেতু এস্থলে প্রাচীন জাপানের রমণীগণের অবস্থার সহিত বর্ত্তমানকালের স্ত্রী-শিক্ষার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের শিক্ষার গতি কোন্‌ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি।

পুরাকালে বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং কন্‌ফিউসীয়-ধর্ম্ম জাপানে প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে রমণীগণের দ্বারা জাপানে নানা অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময় স্ত্রী-পুরুষের অবস্থা সমাজে একই প্রকার ছিল। পুরুষই যে সর্ব্বেসর্ব্বা এবং রমণী কিছুই নহে—নগণ্য, এ বর্ব্বরোচিত ধারণা তখনো জাপানে প্রচলিত হয় নাই। রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও রমণীরা ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে নয়জন রমণী জাপ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রমণীরা সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। সমর-ক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া তাহারা গৌরবান্বিতা ও প্রখ্যাতা এবং অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রাজি রচনাদ্বারা সাহিত্যজগতেও যশস্বিনী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নৈতিক-চরিত্র সর্ব্বথা কলঙ্ক-শূন্য ছিল না এবং তজ্জন্য সার্ব্বজনীন প্রশংসা বা সম্মান প্রাপ্ত হইত না। পক্ষান্তরে তাহাদের স্বাভাবিক-বৃত্তি বা মেজাজ আনন্দময় ও মনোজ্ঞ ছিল এবং তদ্দ্বারা পুরুষশ্রেণীকে সম্মোহিত করিতে সক্ষম হইত। সে কালের রমণীসমাজের এই ক্ষমতা, গুণপনা ও চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলে স্বভাবতই মনে উদিত হয় যে, পুরুষশ্রেণীর অনুরূপ প্রাচীন রমণীশ্রেণীও সুশিক্ষিতা হইয়াছিল,—যদিও সে সময় স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ইহাই জাপানের রমণীত্বের বসন্তকাল,—যখন উহা অবাধে ও অক্লেশে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাচীন জাপ সমাজের উপর অপ্রতিহত ও কার্য্যকরী শক্তির পরিচালন করিয়াছে। তার পর বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসীয় ধর্ম্মের প্রচলনে রমণীর অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। তবে ইহাও সত্য যে রমণীগণের প্রভাবেই জাপদেশে ঐ দুই ধর্ম্ম ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম প্রচারকই,—জাপ-রমণী, এবং এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্বানুসন্ধানের ভার তিন জন রমণীর প্রতিই অর্পিত হয়! তদনুসারে জেন্‌সিন্নি, জেন্‌জোন্নি এবং কেইজেন্নি নাম্নী তিন জন বিদুষী ভারতবর্ষে আগমন করেন। কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে নহে, বৌদ্ধ এবং কন্‌ফিউসীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইলেও—বহুদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও রমণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ের রমণীদের লেখনীপ্রসূত বহুতর প্রাচীন জাপানী-সাহিত্য-গ্রন্থ সঞ্জাত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নবাগত ধর্ম্মমতদ্বয়ের আবির্ভাবের বহু বৎসর পর পর্য্যন্তও যেমন রমণীগণের সর্ব্বতোমুখ প্রভাব জাপ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনি পক্ষান্তরে ঐ দুই ধর্ম্মমতের অনুপ্রাণনফলেই রমণীগণের অবস্থা ক্রমশ অবনমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ফিউডেল্ (Feudal) বা সামন্ত তন্ত্রের সময় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতে থাকে। তৎকালীন সামাজিক কুরীতি এবং বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসীয় ধর্ম্মমত একত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে রমণীগণের স্বাধীনতা হ্রাসের সহায়তা করিতে লাগিল। টোকুগাওয়া শাসনকালেও এইরূপ অবস্থাই চলিতে থাকে। এই সময় আবার সমাজে শ্রেণীবিভাগের কঠোরতা আরব্ধ হয়;—রমণী-সমাজ সম্পূর্ণরূপে গৃহকোণে বন্দী হয় এবং গৃহের বাহিরে তাহাদের কোন প্রভাবই ফুটিবার অবসর পায় না। স্ত্রী-শিক্ষা বলিয়া যদি কিছু সে সময়ের থাকে,—তবে তাহা কেবল রমণীদের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ। যথা,—সেলাই, বয়ন, রন্ধন, চা ও ফুল সরবরাহের কৌশল এবং লেখাপড়া বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা—ইহাই সে কালের স্ত্রী শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের মানসিক উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টাই হইত না এবং নৈতিক-শিক্ষা বিষয়ে সেই প্রাচীন তিনটী সূত্র আবৃত্তি করা হইত,—বাল্যকালে পিতামাতার অধীনে থাকিবে, বিবাহ-অন্তে স্বামীর অধীন এবং বিধবা-বস্থায় পুত্রের অধীন থাকিবে। এই মন্ত্রই প্রত্যহ রমণীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিত। এবম্প্রকারে রমণী জাতি এমনি শোচনীয় দশায় নীত হয়, যে তাহা হইতে উদ্ধারের আর কোনই উপায় পরিলক্ষিত হয় নাই। জাপানী রমণীত্বের ইহাই শীতকাল,—যখন তাহা কষ্টপ্রদ সামাজিক কুরীতিরূপ তুষারাচ্ছন্ন ভূমি-চাপে ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া উঠে।

তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তনে রমণীত্বের পুনঃ

'শিক্ষিতা জাপানী' মহিলাদের আধুনিক পরিচ্ছদ

একজন শিক্ষিতা জাপানী মহিলা

জাপানে প্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জিনজো নারুসে।

জাপানী নারীগণকে চা প্রস্তুত ও পরিবেশন করিবার প্রণালী শিক্ষা দান

জাপানী নারীগণের তরবারি ক্রীড়া শিক্ষা

বসন্ত উদিত হয় এবং যে শক্তি ও চৈতন্য এতকাল তিমির গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, তাহা যেন সুখ-সূর্য্যের মুখাবলোকনের অবসর প্রাপ্ত হয়। বসন্তসমাগমে ধরণীবক্ষ যেমন বিদীর্ণ হইয়া বীজের অঙ্কুর উদ্গমের সহায়তা করে, পাশ্চাত্য সভ্যতাও তদ্রূপ জাপানের কঠিন-মৃত্তিকারূপ সামাজিক প্রথা খণ্ডিত করতঃ সমাজে রমণীক্ষমতা পরিচালিত হইবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতাপ্রভাবে জাপানের প্রত্যেক বিষয়েই পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতিদের অনুরূপ ভাবে গঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর মূলেই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবস্থিত; সুতরাং কেবলমাত্র শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারেই জাপান ইয়ুরোপীয় সভ্যতার সমকক্ষতা করিতে পারিবে। এই ভাবে শিক্ষা-সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইতেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—যাহা একাল পর্য্যন্ত সকলে অবহেলা করিয়া আসিতেছিল,—তাহা সকলের বোধগম্য হইতে থাকে। দেশের চারিদিকে বালকদিগের সঙ্গে বালিকাদিগের নিমিত্তও নানাশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টিয়ান মিশনারীরাই সর্ব্বপ্রথম জাপানে বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও এই সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং ছয় হইতে বারো বৎসরের বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্য (Compulsory) করেন। নর্ম্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বালিকাদিগেরও প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে রমণীদিগের নিমিত্ত "সরকারী উচ্চ নর্ম্মাল স্কুল" স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানকালে স্থাপিত রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বকালের ইহাই সর্ব্ববৃহৎ বালিকা-বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত।

খৃষ্টাব্দ ১৮৮৪ হইতে ১৮৯১ সালের মধ্যে—সংস্কারের এই পূর্ণ যুগে স্ত্রী-শিক্ষা উন্নতির দৃঢ়-সোপানে আরূঢ় হয়। বালিকারা আধুনিক শিক্ষা পাইলেই উদার মতাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা হইয়া উঠে। তাহাদের জনক জননী প্রায়ই প্রাচীনমতাবলম্বী থাকায় কন্যাদের মতের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন বা তাহাদের মতের সহিত একমত হইতে পারেন না; তাহার ফলে গৃহের সুখশান্তির গুরুতর অন্তরায় এবং দুই বিভিন্ন মতের গুরুতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বালিকাদের শিক্ষার অপূর্ণতা কিছু থাকিলেও এবং তাহা হইতে অনর্থক গৃহ-কলহের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও, জাপানের বর্ত্তমান সংস্কারযুগে প্রাচীন ও আধুনিক মতের এই সংঘর্ষ কিছুতেই পরিহার করা সম্ভবপর নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবলি বর্ত্তমান শিক্ষার দোষারোপ করিয়া থাকে। এই সাধারণ মতের প্রাধান্য হইতেই স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হয় এবং কিয়দ্দিবস একই অবস্থায় অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। তারপর বালিকাদিগকে সৎপত্নী ও জননী হইতে উপদেশ দেওয়াই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিঘোষিত হয়। সে সময়ের জনসাধারণ ব্যাবহারিক শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিল। এই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। অনেক দিন এইরূপ অবস্থাই ছিল,—সে সময় বালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা-উন্নতি অবরুদ্ধ দশায় ছিল।

অধ্যাপক জিন্‌জো নরুসি লিখিয়াছেন যে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষার গুরু প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া,—প্রথমতঃ প্রকাশ্যে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত না করিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী অবগত হইবার নিমিত্ত আমেরিকায় গমন করেন। তথায় তিনি তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন; এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তর-প্রদেশের সমস্ত রমণীকলেজই দর্শন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনে ও পরিদর্শনে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাঁহার সংকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীও সুচিন্তিত প্রকারের হইবার সুবিধা পায়। ১৮৯৪ অব্দে অধ্যাপক জাপানে প্রত্যাবৃত্ত হন কিন্তু এক বৎসরকাল নীরবে কেবল দেশের সরকারী ও বে-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়গুলিই পরিদর্শন করিতে থাকেন। এবম্প্রকারে তিনি জাপানের স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক তাঁহার অভিমত গঠিত করিয়া 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। পুস্তকখানি অচিরকাল মধ্যেই জাপ-জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় এবং জনসাধারণ আগ্রহের সহিত তাঁহার অভিমতের পোষকতা করিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক এই সময় হইতেই জাপানে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার ও সূত্রপাত আরব্ধ

হয়। অধ্যাপকের গ্রন্থপ্রচারের ফলেই যে এরূপ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ বিষয় স্বীকার না করিয়া লিখিয়াছেন যে, জনসাধারণের মন উত্তরোত্তর স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ তদভিমুখেই ধাবিত হইতেছিল; এমন সময় তাঁহার 'স্ত্রী-শিক্ষা' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সাধারণ মতের কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। এই সংস্কারের প্রথম ফল—'কোটো জো গাক্কা' (উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা; প্রতি বৎসরই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। অতিরিক্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জাপানে বর্ত্তমানকালে যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় বা কলেজ আছে, তাহাতে শিক্ষার্থিনী সমস্ত বালিকার স্থান সংকুলান হইতেছে না। কাজেই সাম্রাজ্যের নানাস্থানে নানা উদ্দেশ্যে বে-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বালিকাদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। এই ভাবে জাপানে স্ত্রী-শিক্ষার স্মবর্ণ-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

দশ বৎসর হইল পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক তাঁহার চিরকল্পিত রমণীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন এবং এতদুদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি টোকিও নগরের জনসাধারণের সমক্ষে তাহার মহদুদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। ইহার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য সাধন কল্পে মারকুইস ইটো, মারকুইস সাইওন্জি, কাউণ্ট ওকুমা, ব্যারন উট্‌সুমি প্রভৃতি মনস্বীর সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই ভরসাতেই নরুসি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে জাপানের বর্ত্তমান রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেবল জাপানে নহে, সমগ্র প্রাচ্য দেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া জাপানবাসীরা শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটী বিভাগ আছে;—(১) হোম্ বা গৃহস্থালী বিভাগ (Home Department); (২) জাপানী-সাহিত্য বিভাগ; এবং (৩) ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হইবার সময়, উহার প্রতিষ্ঠাতারা প্রতি বিভাগে ৩০টী করিয়া ছাত্রী জুটিবার আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু অচিরেই ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়, প্রথম দুই বিভাগে একশত করিয়া এবং তৃতীয় বিভাগে পঞ্চাশটী, মোট আড়াই শত ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন Preparatory বিভাগে তিন শত ছাত্রী ভর্ত্তি হয়। সুতরাং প্রথম বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ শত হয় এবং দ্বিতীয় বৎসরে উহা আট শতে এবং তৃতীয় বর্ষে এক সহস্রে পরিণত হয়। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, জাপ-জাতি বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি কিরূপ অনুরাগী এবং জাপ বালিকারাও পাশ্চাত্য জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত কিরূপ উৎসুক।

তৎপর একটী গুরুতর প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান কালে যে ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ঐ ভাবেই চলিতে থাকিবে, না ভবিষ্যতে উহার শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

একাল পর্য্যন্ত রমণীগণের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি শাস্ত্রেই তাহাদিগকে পারদর্শিনী করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহা বস্তুত বড়ই ভুল। বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও রমণী-হৃদয় বিকশিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে; রমণীগণের আধ্যাত্মিক শিক্ষা কোন প্রকারেই ত্যাগ করিলে চলিবে না। রমণীগণের পর্য্যবেক্ষণ ও প্রয়োগক্ষমতা বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন; এইরূপ শিক্ষায় তাহাদের মন গঠিত হইলে পর, তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। যাঁহারা ভবিষ্যৎ স্ত্রী-শিক্ষার নিমিত্ত দায়ী তাঁহারা এই বিষয়টী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আর একটী বিষয় বিবেচ্য আছে। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি এ ভাবে পরিচালন করা কর্ত্তব্য যে, বালিকাদের স্কুল-জীবন কখনো যেন তাহাদের গৃহ-সুখের অন্তরায় না হয়। বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয় সমূহ দ্বারা একদিকে যেমন প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, অপর দিকে উহা তেমনি নানা দোষের আকর; এতন্মধ্যে প্রধান

দোষ এই যে, উহা বালিকাদিগকে ভবিষ্যতে সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য সমূহের প্রতি অমনোযোগিনী করিয়া তোলে। এই দোষ কি ভাবে পরিহার করা যায় এবং কি ভাবেই বা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহাই ভবিষ্যৎ চিন্তার বিষয় এবং জাপানের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহেও এই সমস্যা আলোচিত হইতেছে। বিদ্যালয় যত বড় হইবে, তাহা হইতে বিপদের আশঙ্কাও তত বেশী হইবে। এই বিপদ যত দূর পরিহার করা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নরুসি তাঁহার রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ বহুদূরদেশাগত প্রায় পঞ্চশত ছাত্রী অবস্থান করে, তথাপি প্রথম হইতেই প্রত্যেক ছাত্রী নিজ নিজ গৃহের ন্যায় তথায় স্কুল-জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে। জাপানের 'রমণী-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের' ইহাই বিশেষত্ব এবং সমগ্র দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক তাহা প্রশংসিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শয়নাগারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিং গৃহে বোর্ডারদের শয়নাগারে সপ্তদশটী প্রশস্ত কক্ষ আছে; প্রত্যেক কক্ষে ২৫টী ছাত্রীর বেশি থাকিবার ব্যবস্থা নাই। ছাত্রীরা শয়নাগারের ধাত্রীকেই জননীতুল্য এবং পরস্পর পরস্পরকে ভগিনীর ন্যায় বিবেচনা করে। রন্ধন, বস্ত্র-পরিষ্কার, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি যথা স্থানে সংরক্ষণ, কক্ষ সুসজ্জিত করণ এবং গৃহ সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য এই বোর্ডার ছাত্রীগণকেই সম্পন্ন করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন গৃহ-জীবনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় এবং গৃহ সুসজ্জিত এবং যথাস্থানে দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা বিষয়ে তাহারা ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। নরুসি বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলকাম হন নাই বটে, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই এবং ঐ মহা সমস্যা সমাধানের উপযোগী কোন নূতন ভাব বা প্রণালী ভবিষ্যতে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন এই আশায় তিনি পূর্ণ উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যে ভাবেই হোক্—ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, বালিকাগণের স্কুল-জীবন ও গৃহজীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা; তাহা নরুসি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমাদিগকে আরো মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের স্কুলসমূহে যে সকল ছাত্রী প্রবেশ করে, তাহারা সকলেই জাপ-বালিকা, একটীও অন্যজাতীয় নাই। এমতাবস্থায় তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী ও উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে, তাহাদের অতীত সাহচর্য্য, বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের অভাব সমস্তই একত্রে বিবেচনা করিতে হইবে। বালিকাদের স্বশ্রেণীর উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের ন্যায় বিজাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া, ভ্রমে পতিত হওয়া আমাদের উচিত নহে;—ইহাতেই শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইতেছে। আবার সংকীর্ণচেতা ও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের সমর্থিত শিক্ষা-প্রণালীও গ্রহণ করা উচিত নহে। আমাদের নিজেদের যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদের ভাল জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের বিধিদত্ত শক্তির পূর্ণবিকাশ এবং বৈদেশিক ভগিনীবৃন্দের সৎগুণরাজি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা—ইহাই জাপ-বালিকাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রমণী কেবল রমণীর ন্যায়ই শিক্ষিত হইবে না, পক্ষান্তরে সে যে সমাজের একজন সভ্য এবং গ্রামের একজন অধিবাসী—তদুপযোগী শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত জাপ বালিকাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই অংশে বড়ই অসম্পূর্ণ। এই শিক্ষার ফলে বালিকারা গৃহকার্য্য বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি নিপুণা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের কার্য্যে তাহারা উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারে না। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, রমণীরা সমাজের নিকটও তদ্রূপ কর্ত্তব্যপাশে বদ্ধ,—এ চিন্তা বা ভাব এযাবৎকাল উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং রমণীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণের সময় আমরা তাহাদিগকে প্রশস্ততর ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিব এবং নারীগণ যে সামাজিক জীব, সাধারণ সমাজের প্রতি পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে তাহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, এ ভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করাইতে প্রয়াস পাইব।

আরো প্রশস্ততর ভাবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমরা রমণীগণকে কেবলমাত্র সামাজিক সভ্যরূপে বিবেচনা

করিব না, তাহারা সমাজের প্রাণ এই ভাবিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিব। আমরা তাহাদিগকে কেবল বাহিরের পদার্থ—ব্যাবহারিক যন্ত্ররূপে গণ্য না করিয়া, তাহারা যে অতি পবিত্র পদার্থ—কায়িক ও মানসিক অতি অদ্ভুত ক্ষমতায় বিমণ্ডিতা, এই ভাবে তাহাদিগকে দর্শন করিব। আমরা যদি বালিকাদিগকে প্রথমতঃ সমাজের প্রাণরূপে এবং তাহার পর রমণীরূপে শিক্ষাদান না করি, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কখনো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।"

অতঃপর নরুসি ধর্ম্মক্ষেত্রেও রমণীদিগের অধিকারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মপ্রচাবকদিগের হস্তে শিক্ষাভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাঁহারা স্ব স্ব স্কুলের ছাত্রদিগকে স্ব স্ব প্রচারিত এক বিশেষ ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পান। এবং সময় সময় তাঁহাদের শিক্ষাদান ব্যাপার কেবলমাত্র বালক বালিকাদিগকে স্বধর্ম্মের পতাকামূলে আনয়ন করিবার কৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই প্রণালী দ্বারা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম উভয় বিষয়েরই লাভের অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। শিক্ষা এবং ধর্ম্মে গোলমাল বাধাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। একদিকে ধর্ম্মের ভাণ যেমন অনিষ্টকর, অপর দিকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধতাও তেমনি আপত্তিজনক। ধর্ম্মবিরোধী বা ধর্ম্মমত-শূন্য ব্যক্তিদের হস্তেও শিক্ষাভার প্রদত্ত হওয়া সঙ্গত নহে, কারণ তাহারা শিশুদের মনে নাস্তিকতা ঢুকাইয়া দেয় এবং এই ভাবে তাহাদের মত গঠিত করিয়া তোলে যে,—এই যে ধর্ম্মমত সকল ইহা কিছুই নহে—মাত্র কুসংস্কার বা অলীক কল্পনা। ধর্ম্মমতের উপর আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা শিক্ষার নাই; তদ্রূপ করিলে উহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে ক্রটী ঘটে। বিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা বা প্রচার যেমন অনুদার, তেমনি উহার বিরুদ্ধমত প্রকাশও নিন্দনীয়। শিক্ষাকর্ত্তাদের এই ভ্রম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিক্ষকেরা সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমান ভাব দেখাইবেন, এবং ছাত্রদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত ধর্ম্মমত স্বীকার করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম অর্থ কি—এই সকল বিষয় কোন ধর্ম্মবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষায় ছাত্রদের বিশ্বাস বাড়িবে এবং তাহারা মহাসত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের শিক্ষা বিদ্যালয়ে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার বেশি অগ্রসর হওয়া অনুচিত। 'রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়' এই লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। সমদর্শিতা এবং সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব—বিদ্যালয়ের গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে বিরাজিত থাকিবে। যাঁহারা পবিত্র শিক্ষা-কার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল সময়ে এই মতেরই পোষকতা করিয়া থাকেন।

আজকাল জাপানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু জাপান যেরূপ অধ্যবসায়বলে আত্মশক্তি লাভ করিয়াছে, সেরূপ অধ্যবসায় ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। জাপান প্রথমেই বুঝিয়াছিল স্ত্রী-শিক্ষা ও জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত; তাই প্রথমেই দেশ মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের - অভিনব জ্ঞানবিতরণের ব্যবস্থা করে। জাপান স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে কিরূপ আয়োজন করিয়াছে এবং সাধারণ শিক্ষাই বা কি ভাবে তথায় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর।

খুদাবক্সের কীর্ত্তি।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে সমস্ত ভারতের মধ্যে একটি অতুলনীয় জিনিষ বাঁকিপুরে আছে। এটি খুদাবক্স-পুস্তকালয়। পুরাতন ফারসী ও আরবী হস্তলিপি এবং মুসলমানকালের ছবির যেমন অপূর্ব্ব মূল্যবান সংগ্রহ এখানে আছে, এমন আর ইউরোপের বড় বড় রাজধানী ভিন্ন কোথায়ও নাই। এবং খুদাবক্সের কতকগুলি গ্রন্থরত্ন ইউরোপেও অপ্রাপ্য। এই সব হস্তলিপির সংখ্যা এখন পাঁচ হাজার; ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন শুধু তিন হাজার বহি ছিল, তখন তাহাদের দাম আড়াই লাখ টাকা স্থির করা হয়।

সুতরাং এখন দাম চারি লক্ষের কাছাকাছি হইবে। তা ছাড়া অনেকগুলি ছাপান ইংরাজী পুস্তক ও চিত্রসংগ্রহ আছে, তার দাম প্রায় এক লাখ টাকা। পুস্তকের ঘরটি রাজবাড়ীর মত সাজান, এবং ৮০,০০০৲ টাকায় তৈয়ারি। এ সমস্ত পুথি, মুদ্রিত পুস্তক, দালান এবং জমি খাঁ বাহাদুর খুদাবক্স, সি, আই, ই, সাধারণের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানের এমন দাতা আর ভারতে হয় নাই। বড্‌লী সাহেবের নাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরী চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তেমনি খুদাবক্স ভারতীয় বড্‌লী বলিয়া গণ্য হইবেন। সার্থক তাঁহার নাম খুদাবক্স, অর্থাৎ "ঈশ্বরের দান" (যেমন সংস্কৃত দেবদত্ত), কারণ এরূপ সাধারণের উপকারী লোক ক্ষণজন্মা, ঈশ্বরপ্রেরিত।

জীবনী।

ছাপরা জেলার একটি মুসলমান বংশে খুদাবক্স ২রা আগষ্ট ১৮৪২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা নির্ধন হইলেও জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের একজন, কাজী হায়বৎউল্লা, অন্যান্য মুসলমান পণ্ডিতগণের সহিত "ফতাওয়া-ই-আলমগিরী" সংকলনে সাহায্য করেন। খুদাবক্সের পিতা মুহম্মদ বক্স পাটনায় ওকালতী করিতেন। আরবী ও ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তিনি পৈত্রিক ৩০০ খানা হস্তলিপিকে বাড়াইয়া ১৫০০ খানা করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি খুদাবক্সকে আজ্ঞা করিলেন যে প্রত্যেক বিষয়েই গ্রন্থসংগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং ঐ গুলির জন্য একটি দালান করিয়া সাধারণকে দান করিতে হইবে। খুদাবক্স অম্লান বদনে এই আদেশ গ্রহণ করিলেন, যদিও তাঁহাদের পরিবারে তখন বড়ই অর্থকষ্ট ছিল, এবং মুহম্মদবক্স এক পয়সাও রাখিয়া যান নাই। খুদাবক্স-লাইব্রেরী এই আদেশ পালনের অমর দৃষ্টান্ত এবং এক মহাপুরুষের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

বালক খুদাবক্স কিছুদিন পাটনায় ও তারপর কলিকাতায় ইংরাজী পড়েন। কিন্তু ইতিমধ্যে পিতার পক্ষাঘাত রোগ হওয়ায় তাঁহাকে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল। সংসারের অবস্থা বড় খারাপ, এজন্য তিনি চাকরীর খোজ করিতে লাগিলেন। এক মুন্সিফের কাছারীতে নায়েব-গিরির প্রার্থনা করিয়া পাইলেন না; অথচ তিনিই আবার একদিন ভারতবর্ষের এক রাজধানীতে চিফ্ জাষ্টিস্ হইয়াছিলেন! কিছু দিন পরে যদি বা জজের পেষ্‌কার হইলেন, কিন্তু জজ মিষ্টার লাটুরের সহিত না বনায় বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি ১৫ মাস ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ হইয়া কর্ম্ম করেন। শেষে ওকালতী পরীক্ষা (প্লিডারশিপ্) পাশ করিয়া ১৮৬৮ সালে বাঁকিপুরের কাছারীতে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। আদালতে যাইবার প্রথম দিনই ১০১ খানি ওকালৎনামা সহি করিলেন। এমন সফলতা আর কোন উকীলেরই বিষয়ে শুনা যায় না। ওকালতীতে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল এবং তিনি প্রথম শ্রেণীর উকীলের মধ্যে গণ্য হইয়া শেষে সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খুদাবক্সের স্মরণ-শক্তি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে যদিও প্রত্যহ অসংখ্য মোকর্দ্দমা করিতে হইত অথচ শুধু একবার চোখ্ বুলাইয়া নথি অভ্যস্ত করিয়া লইতেন, বাড়াতে খাটিতে হইত না। একবার হাইকোর্টের এক জজ (বোধ হয় সার্ লুই জ্যাক্‌সন্) বাঁকিপুরে বেড়াইতে গিয়া আদালতে খুদাবক্সের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন যে উনি তাঁহার বাঁকিপুরে জজিয়তী করিবার সময়ে পরিচিত ও আদৃত উকীল মুহম্মদ বক্সের পুত্র তখন তিনি শয্যাগত মুহম্মদ বক্সের বাড়ী গিয়া দেখা করিলেন এবং খুদাবক্সকে একটি সবজজি দিতে চাহিলেন, এবং পরে ষ্টাট্যুটরি সিবিলিয়ান করিবারও আশা দিলেন। কিন্তু খুদাবক্সের তখন খুব পশার, তিনি চাকরী স্বীকার করিলেন না।

এ দিকে সাধারণ হিতের জন্য বিনা পয়সায় খাটিতে খুদাবক্স কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। স্কুল কমিটির সভ্য হইয়া জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য করায় ১৮৭৭ সালের দিল্লী-দরবারে তাঁহাকে সম্মানের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যখন লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্তশাসন স্থাপিত হইল, খুদাবক্সই পাটনা মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি পুরাতন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

অবশেষে ১৮৯৪ সালে নিজাম তাঁহাকে হায়দরাবাদের উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান জজ নিযুক্ত করিলেন; ভারতে ওকালতীর এই চরম উন্নতি ও সম্মান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর এবং ১৯০৩ সালে C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৯৮ সালে হায়দরাবাদের কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আবার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এবং শেষাশেষি মতিভ্রম ঘটে। গত ৩রা আগষ্ট বৈকালে ১টার সময় তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

খুদাবক্সের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ আবুল হসন্, বারিষ্টার, কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি। চারি পুত্রের মধ্যে মিঃ সালাহ্-উদ্-দীন, এম্ এ, বি, সি, এল্ (অক্সফোর্ড) বারিষ্টার, আরবীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মিঃ শিহাবুদ্দীন এখন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস; আরবী ফার্সী হস্তলিপি সম্বন্ধে ইনি অনেক সংবাদ রাখেন। তৃতীয় মুহীউদ্দীন এফ এ অবধি পড়িয়াছেন, কনিষ্ঠ ওয়ালীউদ্দীন স্কুলের ছাত্র।

মুসলমান লেখকদের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে খুদাবক্সের অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এই বিষয়ে তিনি বিলাতের নাইন্‌টীন্‌থ সেঞ্চুরী কাগজে এক প্রবন্ধ লেখেন; এবং নিজের সংগৃহীত হস্তলিপির অনেকগুলির বিস্তৃত বর্ণনাসহ এক কেটেলগ ফার্সীতে ছাপান (নাম মহবুব্-উল্-আল্‌বাব, হায়দরাবাদে ১৩১৪ হিজরীতে লিথো করা)। একদিন আমার সম্মুখে তিনি মুহম্মদের সময় হইতে ৮০০ হিজরী পর্য্যন্ত যত আরব জীবনচরিতকার ও সমালোচক হইয়াছে তাহাদের নাম ও গ্রন্থের ধারাবাহিক উল্লেখ করিলেন এবং প্রত্যেকের গুণ দোষ ও গ্রন্থ-সীমা বর্ণনা করিলেন। ইহার অনেকগুলিই তাঁহার পুস্তকালয়ের জন্য জোটাইয়াছেন। কিন্তু ভারতে মুসলমানদের মধ্যেই বা আরবীয় গভীর চর্চ্চা কয়জন করেন?

পুস্তকের গৃহ।

পিতৃ আজ্ঞায় খুদাবক্স যে লাইব্রেরী বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। বাড়ীটি দোতলা, চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। পশ্চিম বারান্দা, দুই সিঁড়ি এবং নীচের মেঝেগুলি মার্ব্বেল পাথরে মোড়ান, এবং নানা কারুকার্য্যে খচিত, কোথায় বা দাবা খেলার ঘরের মত, কোথায় বা নানারঙ্গের পাথর বসাইয়া ছক্ কাটা। আর আর বারান্দা ও মেঝে রঙ্গীন ইটে আবৃত, যেমন কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএর মেঝে।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে স্বপ্ন।

এই পুস্তকালয় খুদাবক্সের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়াছিল; জাগরণে স্বপ্নে তিনি এর বিষয় ভাবিতেন। এ সম্বন্ধে নিজের দুটি স্বপ্ন মধ্যে মধ্যে বলিতেন; তাহা এইরূপ:—

"প্রথমে আমি বড়ই কম পুথি পাই। কিন্তু একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে কে যেন আমাকে বলিল "যদি হস্তলিপি চাও তবে আমার সঙ্গে এস।" আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া লক্ষ্ণৌয়ের ইমাম্‌বারার মত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। পথপ্রদর্শক একেলা ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিল এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া আবার মধ্যে গেল। দেখিলাম যে ইমামবারার প্রশস্ত হলের মধ্যে এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ আবৃত, চারিপার্শ্বে তাঁহার সঙ্গিগণ উপবিষ্ট। পথপ্রদর্শক আমাকে দেখাইয়া বলিল 'এই লোকটি হস্তলিপি চায়।' মহাপুরুষ উত্তর করিলেন 'উহাকে দেও।' এর পর হইতেই আমার পুস্তকালয়ে নানাদিক হইতে হস্তলিপি আসিয়া জুটিতে লাগিল। [খুদাবক্সের স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ মুহম্মদ এবং তাঁহার চারিপাশে মুহম্মদের সঙ্গিগণ, আস্‌হাব্।]

"এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে পুস্তকালয়ের পাশের রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সকলে বলিল 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ তোমার পুস্তকালয় দেখিতে আসিয়াছেন, আর তুমি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলে!' আমি তাড়াতাড়ি উপরে পুথির ঘরে গিয়া দেখি যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুইখান হদীসের হস্তলিপি টেবিলের উপর খোলা রহিয়াছে; লোকে বলিল যে প্রেরিত-পুরুষ, এই দুখানি পড়িতেছিলেন। [এই দুই পুথির উপর খুদাবক্স

স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন "এ বহি কখনও পুস্তকালয় হইতে বাহিরে যাইতে দিবে না।"]

খুদাবক্সের সমস্ত হৃদয় সমস্ত মন এই পুস্তকালয়ে মগ্ন ছিল। শেষ বয়সে মতিভ্রমের সময় তিনি প্রায়ই পুস্তকালয় সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক বিপদ ভাবিয়া ব্যস্ত হইতেন। প্রতি পুস্তক যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে থাকিত। মৃত্যুর দুই দিন আগেও একখান "মসনদ" নামক গ্রন্থের আলমারী শেলফ্ ও স্থান ঠিক বলিয়া দিলেন!

শেষ বয়সে পুস্তকালয়ের বারান্দায় অথবা বাগানে খুদাবক্স প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা কাটাইতেন। সেই ধবল-কেশ ও শ্মশ্রুযুক্ত স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি এখনও যেন মানসচক্ষুতে দেখিতে পাই। বৃদ্ধ খাঁ বাহাদুর সাধারণ মত সাদা পোষাক পরিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন, তাঁহার হুঁকাটি একটি নীচু তিন-পায়া টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া; তিনি হয় ত দুই একজন আগন্তুকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন অথবা কোন হাতলিপির পাতা উল্টাইতেছেন,—এ দৃশ্য কতদিন রাস্তা হইতে দেখা গিয়াছে।

এই পুস্তকালয়ের জাতীয় আবশ্যকতা।

লাইব্রেরী এবং পাঠাগারের মাঝে একটি ছোট আঙ্গিনায় খুদাবক্সের সমাধি হইয়াছে। গোরটি নীচু এবং সাধারণ রকমের। ইহাই তাঁহার শেষ বিশ্রামের স্থল, যিনি ভারতবর্ষের জন্য রাজা রাজড়ার চেয়েও বেশী মূল্যবান দান করিয়া গিয়াছেন। প্রতি জেলাতেই খুদাবক্সের মত ৩।৪ জন প্রধান উকীল থাকেন; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি ভারতে অদ্বিতীয়। যতই আমাদের জ্ঞানের চর্চ্চা বাড়িবে ততই আমরা খুদাবক্স-পুস্তকালয়ের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিব। এখন আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ববিদগণের সংখ্যা বড় কম; তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ও পালীর চর্চ্চা করেন, ফার্সীর দিকে দুই তিনজন মাত্র গিয়াছেন, আরবীর দিকে কেহই না। একজন বিলাতী পণ্ডিত খুদাবক্স-লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া বলেন, "পুস্তকের জন্য কি সুন্দর গোর নির্ম্মাণ করিয়াছেন! ইউরোপ হইলে এই লাইব্রেরীতে প্রত্যহ শত শত লেখক তত্ত্বান্বেষণ করিত; কিন্তু এখানে একটিও পাঠক দেখিতেছি না।" কিন্তু ভারতবর্ষের কি চিরদিনই এই দশা থাকিবে? ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকজন দেশের প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। খুদাবক্স লাইব্রেরী স্থাপন হওয়ায় এই লাভ হইয়াছে যে দেশের অমূল্য অনেক গ্রন্থ চিরদিনের জন্য দেশে থাকিয়া যাইতেছে। অনেক মুসলমান ও হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাদের পৈত্রিক হস্তলিপিগুলি এই লাইব্রেরীতে দান করিয়া তাহাদিগকে সাধারণের ব্যবহারে লাগাইতে-ছেন এবং বিনাশ বা বিক্রয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ইংরাজদের একটি মহা গুণ এই যে তাঁহারা যেখানেই যান, হস্তলিপি, প্রাচীন কলাবস্তু, বৈজ্ঞানিক সামগ্রী প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করেন এবং তাহা নিজের দেশের মিউজিয়ম ও পুস্তকালয়ে দান করিয়া স্বজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করেন। বিলাতের বডলিয়ান্, ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ এবং ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে অনেক হস্তলিপি প্রাচীন য়্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান্ কর্ম্মচারীদের দান। সেই ব্রিটিশ রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময়ে তাঁহারা একদিকে এদেশ বিজয় ও শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপন করিতেন, আর অপর দিকে যত অমূল্য হস্তলিপি ও ছবি পারিতেন সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে কত কত সংস্কৃত ও ফার্সী পুথি একেবারে ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে। সেগুলি বিলাত না গেলে আর দেখিবার উপায় নাই। ভারত ইতিহাস লেখার মালমশলা বিলাতে যত সহজলভ্য ও প্রচুর, এদেশে তেমন নহে। প্রাচীন ইজিপ্ট জানিতে হইলে, লণ্ডন প্যারিস ও বার্লিনে যাইতে হয়, নব্য মিসরে নহে। ভারতের দশাও প্রায় তেমনি।

কিন্তু খুদাবক্স লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ায় এবং সাধারণের নামে লিখিত পড়িত করিয়া দেওয়ায় আমরা এই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইয়াছি: আর এসব গ্রন্থরত্ন হারাইবার সম্ভাবনা নাই। লাইব্রেরীটি দেশময় বিখ্যাত; সকল পুথির মালিককে যেন ডাকিতেছে,—"যদি তোমাদের গ্রন্থ নিরাপদ রাখিতে এবং সাধারণের সেবায় লাগাইতে চাও তবে আমাকে দেও; তাহা না করিলে ওগুলি হয় ধ্বংস হইবে না হয় অন্য দেশে চলিয়া যাইবে।" এইরূপে খুদাবক্স ভিন্ন অন্য লোকের দানেও লাইব্রেরী পুষ্ট হইতেছে। তার দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ভবিষ্যৎ গণনা করিবার জন্য এক-খণ্ড হাফিজের পদ্যাবলী হঠাৎ খুলিয়া যে ছত্রে প্রথম দৃষ্টি

পড়িত তাহার অর্থ লইতেন, এবং কোন্ ঘটনা সম্বন্ধে কোন্ তারিখে ঐ বহি দেখিলেন ও ভবিষ্যৎ বাণীর কি ফল হইল তাহা স্বহস্তে ছত্রটির পাশে লিখিয়া রাখিতেন! যেমন ইউরোপের মধ্যযুগে ভার্জিলের পদ্যগ্রন্থ লোকে দেখিত এবং এখনও অনেক মুসলমান কোরান দেখিয়া ভবিষ্যৎ জানিতে চাহেন, ঠিক সেই মত। এই জন্যই হাফিজের নামান্তর লিসান-উল্-ঘাএব্ (অদৃশ্য জিহ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-বক্তা)। এই অমূল্য পুথিখানি গোরক্ষপুরের মৌলবী সুভানউল্লা খাঁ বৎসর দুই হইল খুদাবক্স লাইব্রেরীতে উপহার দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাব দপ্তরী বইখানি বাঁধিবার সময় অনাবশ্যক বোধে মার্জিনে জাহাঙ্গীরের হস্তের লেখা এক ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া ফেলিয়াছে !!! আর দেরী করিলে বোধ হয় পুথিখানি একেবারে লোপ পাইত।

আবার আওরাংজীবেব মুন্সী (Secretary) ইনায়াৎ উল্লাখাঁর "আহকাম্—ই—আলমগীরী" এতদিন নামে মাত্র জানা ছিল; ভারতে বা ইউরোপের কোন সাধারণ পুস্তকালয়ে এখানি দেখা যাইত না, এবং কোন ঐতিহাসিক উহা পাঠও করেন নাই। ১৯০৭ খৃঃ পূজার ছুটিতে আমি রামপুর (রোহিলখন্দ) নবাবের পুস্তকালয়ে উহার এক বাদশাহী হস্তলিপি প্রথমে পাই এবং নকল লইবার বন্দোবস্ত করি। তারপর বাঁকিপুর ফিরিয়া দেখি কি না কিছুদিন পূর্ব্বে উহার আর এক হস্তলিপি (দিল্লীর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য লিখিত) খুদাবক্স লাইব্রেরীতে পাটনার সফদর নবাব দান করিয়াছেন! এইরূপে কত কত বহি এখানে আসিতেছে।

চিত্র ও লেখার কারুকার্য্য।

প্রাচ্য চিত্রবিদ্যার আদর্শ এখানে এত সংগ্রহ হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া মিঃ হ্যাভেল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মোঘল বাদশাহদিগের অনেক ছবির বহি ও সচিত্র ইতিহাসের হস্তলিপি, রণজিৎ সিংহের কতকগুলি সচিত্র বহি, এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের বড়লোকদের ছবির য়্যালবাম্ ("মুরাক্কা") এখানে অনেক আছে। অনেক বৎসরের পরিশ্রমের পর একখানি একখানি করিয়া ছবি সংগ্রহ করিয়া কোন কোন য়্যালবাম সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রথমে মধ্য এসিয়ায় চীনে চিত্রকরদিগের প্রাদুর্ভাব এবং মোঘল বাদশাহদের সঙ্গে মধ্য এসিয়া হইতে সেই চীনে চিত্রপ্রথার ভারতে আগমন, পরে ভারতীয় (হিন্দু) চিত্রবিদ্যার বিকাশ, অবশেষে বিলাতী আর্টের আধিপত্য,—এ সমস্ত এই ছবিগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এর অনেকগুলি ছবির ফটোগ্রাফ লইয়াছি, ক্রমে প্রবাসীতে বাহির হইবে। এবার সাধু কবীর দেওয়া গেল। এত যুগের এত দেশের এবং এত রকমের কাগজে এই সব পুথি লেখা যে এই লাইব্রেরীতে বসিয়া কাগজ তৈয়ারির ইতিহাস রচনা করা যায়। কতকগুলি কাগজ পেকিনের (নাম "খাঁবালিঘ"), কতক বুখারা ও সমরকন্দের, কতক কাশ্মীরী, বাদশাহদিগের নিযুক্ত কারিগরের প্রস্তুত।

খুদাবক্সের পুস্তকালয়ের ইংরাজী বইগুলিও মূল্যবান এবং অনেক। দাম প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। বিশেষতঃ তিনি বিলাতে এক সম্পূর্ণ লাইব্রেরী নিলামে কিনিয়া লন, তাহার চামড়ার বাঁধাই দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়।

গ্রন্থসংগ্রহের গল্প।

এই সব ফার্সী ও আরবী হস্তলিপি সংগ্রহের বিবরণ উপন্যাসের মত কৌতূহলজনক। মুসলমান রাজত্বের সময় যত সব শ্রেষ্ঠ হস্তলিপি দিল্লীর বাদশাহের নিকট আসিয়া জুটিত। কতকগুলি শত শত এমন কি হাজার মোহর দিয়া কেনা হইত; কতকগুলি বাদশাহের বেতনভোগী লেখক ও চিত্রকরদের দ্বারা রচিত হইত; কতকগুলি বা যুদ্ধের পর বিজিত দেশ হইতে আনা হইত (যেমন বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা হইতে); আর অনেকগুলি প্রথমে ওমরাহদের ঘরে ছিল এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পর অন্যান্য সম্পত্তির সহিত বাদশাহী সরকারে ভুক্ত হইত। আকবরের সভা-কবি ফৈজির মৃত্যুর পর তাঁহার ৪,৩০০ হস্তলিপি বাদশাহ জব্দ্ করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে এসিয়ায় সব চেয়ে বড় ও মূল্যবান পুস্তকালয় দিল্লীর বাদশাহদের ছিল। ১৮ শতাব্দীতে এর কতকগুলি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবেরা হস্তগত করেন। অবশেষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের রাজবাড়ী লুট হইল, পুরাতন পুথিগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রোহিলখন্দের নবাব ইংরাজদের পক্ষে ছিলেন। দিল্লী জয়ের পর তিনি ঘোষণা করেন যে প্রতি পুথির জন্য এক

খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর

KUNTALINE PRESS CALCUTTA

সাধু কবীর।

টাকা দিবেন; এইরূপে সিপাহী ও গোরারা তাঁহাকে কত বাদশাহী ও ওমরাহদের হস্তলিপি বেচিল।

অনেক দিন ধরিয়া এই নবাবের সঙ্গে খুদাবক্সের পুথি কেনা লইয়া পাল্লাপাল্লি চলে। অবশেষে খুদাবক্স মুহম্মদ মকী নামক একজন অত্যন্ত চতুর আরবজাতীয় পুথির দালালকে নবাবের পক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া আনেন, এবং আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন দিয়া, সিরিয়া, আরবা, মিসর, এবং পারস্যে পুথি খুঁজিতে ও কিনিতে নিযুক্ত করেন। এই লোকটি অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দেয়।

যে কোন হস্তলিপি-বিক্রেতা বাঁকিপুরে আসিত খুদাবক্স বহি কিনুন আর না কিনুন তাহাকে আসিবার যাইবার রেলভাড়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার নাম ভারতময় বিখ্যাত হইল এবং কোথায়ও কোন হস্তলিপি বিক্রয় হইতে গেলে প্রথমে তাঁহাকে দেখান হইত।

মজার বিষয় এই যে, একবার একজন পূর্ব্বতন দপ্তরী রাত্রে এই পুস্তকালয়ে ঢুকিয়া প্রায় ২০ খান মহামূল্য হস্তলিপি চুরি করিয়া লাহোরে একজন দালালের নিকট বেচিতে পাঠায়। দালাল সর্ব্বপ্রথমে খুদাবক্সকে সেগুলি পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কিনিবেন কি!!! এইরূপে চোর ধরা পড়িল।

আর একবার ঠিক এই মত ধর্ম্মের কাঠি বাতাসে নড়িয়াছিল। মিঃ জে, বি, এলিয়াট্ নামে পাটনার প্রাদেশিক জজ মুহম্মদ বক্সের নিকট হইতে কমালুদ্দীন ইস্মাইল ইস্ফাহানীর দুর্লভ পদ্যাবলী ধার লইয়া পরে ফিরিয়া দিতে অস্বীকার করেন, বলেন যত দাম চাও দিব। মুহম্মদ বক্স রাগিয়া এক পয়সা লইলেন না। পরে যখন এলিয়াট্ সাহেব পেন্সন লইয়া বিলাত যান তাঁহার সব ভাল পুথিগুলি কয়েকটি বাক্সে প্যাক করিয়া বিলাত পাঠান হইল। অকেজো কাগজ পত্র ও বহি নিলামে বিক্রয় করিবার জন্য অপর এক বাক্সে বন্ধ করিয়া পাটনায় রাখিয়া গেলেন। ধর্ম্মের এমনি কাজ ঐ কেড়ে লওয়া হস্তলিপি এবং আরও ৩৪ খানি অমূল্য পুথি (তার একখানিতে শাহ জাহানের সহী আছে!) ভ্রমক্রমে এই বাক্সে রাখা হয়, এবং নিলামে মুহম্মদ বক্স তাহা কিনিয়া লন!!! সাহেব বিলাত পৌঁছিয়া ভ্রম টের পাইলেন, কিন্তু তখন আর কি হইবে?

পুস্তক সংগ্রহ করা একটী নেশা। ইহাতে খুদাবক্সেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। পাটনার একজন প্রাচীনবংশের মূর্খ মুসলমানের নিকট একখান দুর্লভ হস্তলিপি ছিল। সে তাহার এক অক্ষরও পড়িত না অথচ কিছুতেই তাহা খুদাবক্সকে বেচিতে বা দান করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে খুদাবক্স ৩ দিনের জন্য পুথিখানি ধার করিলেন, এবং মলাট হইতে কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়া সেই মলাটের মধ্যে নিজের একখান সেই আকারের কিন্তু অসার হস্তলিপি সেলাই করিয়া ফেরৎ দিলেন; মালিক তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট!

ব্লকম্যান সাহেবের মৃত্যুর পর কলিকাতায় তাঁহার হস্তলিপি সংগ্রহের নিলামের সময় খুদাবক্স গিয়া জজ আমীর আলীর সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া দাম হাঁকিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "আজ দেখিব জজ জেতে কি উকীল জেতে।" অবশেষে জজ মহাশয়ই পিছাইয়া গেলেন।

একবার হায়দরাবাদে কাছারী হইতে ফিরিবার সময় খুদাবক্সের তীক্ষ্ণ চক্ষু দেখিতে পাইল যে এক মুদীর অন্ধকার দোকানের মধ্যে ময়দার বস্তার উপর কয়েকখান পুথি আছে। অমনি গাড়ী থামাইয়া সেগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মুদী উত্তর করিল, "এই সব পুরাতন কাগজ অন্য কাহাকেও হইলে ৩ টাকায় বেচিতাম। কিন্তু হুজুর যখন লইতে চান তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিষ আছে। আমি ২০ টাকা চাই।" খুদাবক্স সেই দামই দিলেন। পুথিগুলির মধ্যে একখান আরবী জীবনচরিত ছিল যাহা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। স্বয়ং নিজাম তাহা ৪০০৲ টাকায় কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু খুদাবক্স সে বহি ছাড়িলেন না।

শ্রেষ্ঠ পুথির বিবরণ।

এখন এই লাইব্রেরীর গ্রন্থরত্নের কতকগুলি বর্ণনা করিব। জাহাঙ্গীরের ভাগ্য-গণনার বহির কথা আগেই বলিয়াছি। তুর্কীর সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ-জয়ের বিবরণ এক মহাকাব্যের আকারে লিখিয়া সেই সচিত্র পুথি গ্রন্থকার

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান তৃতীয় মহম্মদকে উপহার দেন। তুর্কী রাজবাড়ী হইতে বইখানি চুরী হইয়া শাহ জাহানের রাজত্বকালে ভারতে আসে। পৃথিবীতে ইহার আর দ্বিতীয় নাই। এর একখানি যুদ্ধের ছবি প্রবাসীতে দিব।

ফার্সী লেখায় নূর আলী ভারতে সব চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নকল করা জামির কাব্য "ইউসুফ ও জুলেখা" বাদশাহ জাহাঙ্গীর হাজার মোহর দামে কেনেন। এখানি এখন খুদাবক্স লাইব্রেরীতে স্থান পাইয়াছে। শাহ জাহানের সহী করা দুইখানি বহি আছে, একখানির লেখা তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের। দারাশিকোর স্বহস্তে লিখিত "সাধুচরিত" (সফিনৎ-উল-আওলিয়া),—গোলকুণ্ডার সুলতানের দিউয়ান-ই-হাফিজ,—আমীর খসরুর "মসনবী" যাহা বুখারার সুলতান মীর আলীকে তিন বৎসর জেলে পুরিয়া রাখিয়া লেখাইয়া লন!—রণজিৎ সিংহের সৈনিক বিভাগের হিসাবের বহি (ফার্সী ও গুরুমুখী অক্ষরে লেখা), আলী মর্দ্দান খাঁ শাহ জাহানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় যে সচিত্র ফির্দ্দৌসীর "শাহনামা" বাদশাহকে উপহার দেন, সেখানি,—আমীর খসরুর গ্রন্থাবলী, আকবরের মাতা হামিদাবানুর মোহরযুক্ত,—হাতিফির কাব্য "শীরীন্ ও খসরু" বিজাপুর রাজ্যের জন্য অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা,—জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, যাহা তাঁহার আজ্ঞায় গোলকুণ্ডার রাজাকে উপহার দেওয়া হয় এবং পরে আওরাংজীব ঐ দেশ জয় করিয়া কাড়িয়া লইয়া আসেন, একখান অনেক চিত্র-পূর্ণ তাইমুর বংশের ইতিহাস, ভারতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবির আদর্শ সহিত শাহ জাহানের ইতিহাস,—এ সমস্ত খুদাবক্স সংগ্রহ করেন। শেষোক্ত দুইখানির অনেক ছবি প্রবাসীর জন্য ফটো লইয়াছি। আর কত বর্ণনা করিব? সবগুলির নাম করিতে গেলে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

আরবী বিভাগে তফ্‌সির্-ই-কবীর্ নামক কোরানের এক টীকা আছে, তিন প্রকাণ্ড বালুমে, অতি ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার ও আগাগোড়া এক রকমের অক্ষরে লিখিত। একজন লোক এত পরিশ্রম করিয়াছিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মুসলমান জগতের অনেক পণ্ডিত আন্দলুস্ অর্থাৎ দক্ষিণ স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। যখন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ অন্ধকারে আবৃত তখন এই মুর রাজত্বেই জ্ঞানের দীপ জ্বলিয়াছিল। আরব বৈজ্ঞানিক জোহরাবীর লেখা অস্ত্রচিকিৎসার এক পুথি আছে, তাহাতে সব অস্ত্রের ছবি দেওয়া! বিখ্যাত খলিফা হারুনের পুত্র মামুনের রাজত্বকালে ডিয়স্‌কোরাইডেস রচিত উদ্ভিদতত্ত্বের এক গ্রীক বহির আরবীতে অনুবাদ হয়, নাম "কিতাব-উল-হাশায়েশ"। ইহার এক অতি পুরাতন হস্তলিপি আছে, সমস্ত উদ্ভিদের রঞ্জিত ছবিযুক্ত, শিকড়টি পর্য্যন্ত আঁকা! একখণ্ড ভেড়ার চামের কাগজে (পার্চমেণ্টে) কতকগুলি কুফিক্ অক্ষর আছে, প্রবাদ যে সেগুলি মুহম্মদের জামাতা আলীর হস্তাক্ষর! যে সময়ে আরবীতে আকার ইকার উকারের চিহ্ন (জের্, জবর্, পেশ্) ব্যবহারে আসে নাই, সেই পুরাকালের লিখিত এক কোরান আছে; (মুর্শিদাবাদে নিজামৎ লাইব্রেরীতেও এরূপ আর একখান দেখিয়াছি।) রেসমের মত পাত্‌লা একখান সরু অথচ অতি দীর্ঘ পার্চমেণ্টে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে সমগ্র কোরান লেখা; অথচ সাধারণ চক্ষে পড়া যায়!

আর দুই খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবর বাদশাহের আরবী প্রার্থনা-পুস্তক, এবং ফারসীতে লিখিত "যীশুর কাহিনী" (দাস্তান্-ই-মাসিহ্।) শেষ পুথি খানির ভূমিকায় লেখা আছে যে বাদশাহ খৃষ্টধর্ম্মের সারমর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ক্যাথলিক পাদ্রী জেরো (অপ্সা জন্ত্র) এবং হম্‌নু গুটর খৃষ্টান, এই দুই জন বাইবেল হইতে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া এই ফার্সী বহি রচিয়া বাদশাহকে উপহার দেন; গ্রন্থখানি আকবরের মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে, ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে, লেখা।

গত দিল্লী দরবার হইতে ফিরিয়া লর্ড কার্জ্জন প্রথমেই বাঁকিপুরে আসেন। তখনও তাঁহার মনে মোঘল বাদশাহগণের গৌরবচিহ্ন জাগিয়া ছিল। খুদাবক্স লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি দিল্লীর দিউয়ান্-ই-খাসের সোণায় লিখিত পদ্যটি আবৃত্তি করিলেন:—

আগর্ ফির্দ্দৌস্ বরুয়-এ-জমীনস্ত।
হমিনস্ত ও হমিনস্ত ও হমিনস্ত॥

অর্থাৎ

ধরাতলে যদি কোথা স্বর্গলোক থাকে।
এই তাহা, এই তাহা, এই তাহা বটে॥

ইহাই খুদাবক্স-পুস্তকালয়ের প্রকৃত বর্ণনা।

শ্রীযদুনাথ সরকার,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

মা।

১

সুখচরের চক্রবর্ত্তীদের বধূ দয়াঠাকুরাণী যখন তাঁহার বহু মানত ও ব্রতসাধনার ফল একমাত্র পুত্র ষষ্ঠীচরণকে লইয়া বিধবা হইলেন, তখন ষষ্ঠীচরণের বয়স মাত্র তিন বৎসর, দয়াঠাকুরাণীর বয়স তখন ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ আপনার গৃহের গৃহিণী ও বিষয় আশয়ের কর্ত্রী হইয়া কিছু স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভাসুর রামরাম চক্রবর্ত্তী যখন অকস্মাৎ ভ্রাতৃবিয়োগে ব্যথিত হইয়া বধূমাতার বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন দয়াঠাকুরাণী তাঁহার এই পরোপকারব্রতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া বলিলেন, "থাক্ - সে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, ষষ্ঠীচরণ যতদিন না মানুষ হয়, ততদিন আমিই কোনো মতে চালিয়ে যেতে পারব।" রামরাম চক্রবর্ত্তী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সাহসিকা রমণীর নিন্দা প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া গেলেন। কুলপুরোহিত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য আসিয়া কহিলেন, "বৌমা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার ত' কিছুরই অপ্রতুল নাই, তুমি স্বামীর প্রীত্যর্থে সাবিত্রীব্রত ও পুত্রের কল্যাণার্থে কুক্কুটব্রত অনুষ্ঠান কর।" দয়াঠাকুরাণী বিনম্র বচনে বলিলেন, "স্বামীকে যদি তাঁহার জীবদ্দশায় শুধু প্রীতি দিয়া সুখী করিয়া থাকিতে পারি, পরলোকেও তিনি শুধু অন্তরের ভক্তি পাইয়াই তৃপ্ত হইবেন, প্রেমের নিষ্ঠাই আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর পুত্রের মঙ্গলের জন্য মার ব্যগ্র প্রাণ যাহা করিবে তাহা—শাস্ত্রাচার অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠ!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলেন। কৃপণ বিধবার নিকট তাঁহার প্রাপ্তির আশা আর রহিল না।

দয়াঠাকুরাণীর নিন্দা প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে স্নানের ঘাটে বিঘোষিত হইতে লাগিল। দয়াঠাকুরাণী শুনিতে লাগিলেন কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও দমিলেন না। নিন্দা কুৎসা গায়ে না মাখিবার মত তাঁহার চরিত্র স্বাধীন ও বলশালী ছিল।

গ্রামে তাঁহার আত্মীয়েরও অভাব ছিল না। যাহারা সকলের নগণ্য, যাহারা সকলের হেয়, যাহারা উপেক্ষিত, তাহারাই ছিল দয়া দেবীর আপনার জন। তিনি হাড়ি ডোম দুলে বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির বাড়ী মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাদের নোংরা ছেলে মেয়েদের ছুঁইয়া আদর করিতেন, কাহারো পীড়া হইলে তাহার মলিন শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন, বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিতেন না, অবস্থা বিশেষে শুধু হাত পা ধুইয়া, খুব বেশি, ত কাপড়খানা ছাড়িয়াই তিনি আপনাকে শুচি বোধ করিতেন, একটু গঙ্গাজল পর্য্যন্ত স্পর্শ করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। কেহ অন্তত পক্ষে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলে তিনি উত্তর করিতেন, "এক ঘড়া পুকুর জলে যদি আমি শুচি না হয়ে থাকি, এক ফোঁটা গঙ্গাজলে আর আমায় বেশি কি শুচি করবে?" এ উত্তরে পল্লী-বিধবাগণ অবাক হইয়া শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিত।

দয়া দেবীর অনাচারের জন্য যখন তথাকথিত ভদ্র-সমাজের নরনারী বিমুখ হইয়া তাঁহার ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ত্যাগ করিল তখনো তিনি ভীত হইলেন না, অথবা আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন না। সকল দরিদ্র, সকল নির্য্যাতিত, সকল উপেক্ষিত নরনারী তখন তাঁহার পরমাত্মীয়, এবং তাঁহার প্রেমবদ্ধ অনুচর সেবক অগণ্য।

দুলে বাগদির ছেলেরা অপর কোনো শুচিবায়ুগ্রস্তা রমণীকে দেখিয়া "ওরে বাম্‌নী আসছে, পথ ছেড়ে দাঁড়া" বলিয়া ম্লান কুণ্ঠিত মুখে অপথে গিয়া দাঁড়ায়; স্নানের সময় পাছে গায়ে জলের ছিটা লাগে বলিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভরে স্নান করে; আর দয়া দেবীকে দেখিয়া তাহারা মা বলিয়া হাসিয়া নাচিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে; শিশুহৃদয় সমগ্র গ্রামের মধ্যে কেবল একজনের কাছে হৃদয়ের পরিচয়, স্বাধীনতার সংবাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়। অন্ত্যজ পুরুষেরা দয়া দেবীর অভিলাষমাত্র তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে

কৃতার্থ জ্ঞান করে, নারীগণ আপনাদের গৃহপ্রাঙ্গণের তরীতরকারী দিয়া আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে প্রতিযোগিতা করে।

একদিন দয়া দেবী সমাগতা রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, মোছলমান বউ অনেকদিন এদিকে আসে নি কেন? তার কিছু খবর জানিস?"

একজন বলিল, "তার মা বড় ব্যামো, বাঁচে কি না বাঁচে। আহা মাগী মোলে তার ছেলেটার কি যে আবস্থা হবে কে জানে? আহা মাগী বড় ভালো মানুষ ছিল। মোছলমান ত' নয়, যেন হিঁদুর ঘরের বিধবা, এমনি তার নিষ্ঠে, এমনি তার মন।"

সমবেত রমণীগণ সকলেই সেই মোছলমান বউয়ের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়া দেবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দুলে বৌ, তুই একটু আমার সঙ্গে যাবি, আমি একবার মোছলমান বউকে দেখতে যাব।"

দুলে বউ বলিল, "তা কেন যাব না মা, কিন্তু সে যে অনেকটা পথ।"

"তা হোক আমি একবার যাব" বলিয়া দয়া দেবী যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া ছিড়িয়া তাহার কোণে কোণে কিছু সাগু, বার্লি, মিছরী, কিসমিস, একটু আমসত্ব বাঁধিয়া লইলেন, আর আপনার অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন পাঁচটি টাকা।

মুসলমান বধূটির গৃহ গ্রামান্তরে প্রায় এক মাইল পথ হইবে। মুসলমানী তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে পঁচিশ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র জহর আলিকে কোলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। সে নিঃস্ব চাষীর গৃহিণী ছিল, সে বিধবা হইয়া আপনার শিশুপুত্রটির লালন পালনের জন্য বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সামান্য চাষীর ঘরে জন্মিয়াও আসমানীর এমন একটি প্রস্ফুট অথচ স্নিগ্ধ শ্রী ছিল যাহা চাষীর ঘরে দুর্লভ, আর সেই ললিত শ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিল তাহার শ্রমপটু নিটোল স্বাস্থ্য ও কোমল মধুর প্রাণটি। এত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য যাহার তাহাকে আশ্রয় দিবার পুরুষের অভাব কখনই ঘটে না। অনেকে তাহাকে নিকা করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আসমানী সে সকল প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছিল, "খোদার দোয়াতে যাঁর ছেলেকে আমি কোলে পেয়েছি, তার ছেলেরই মা হয়ে আমি মরব, খোদাতালার দোয়াতে জহর আমার বেচে থাকুক।" অতঃপর আসমানী চিঁড়া কুটিয়া ধান ভানিয়া আপনার শিশু পুত্রকে পালন করিতে লাগিল।

আসমানী দয়াঠাকুরাণীর বাড়ী চাল চিঁড়ার উঠানা দিত। দয়াঠাকুরাণী যখন আসমানীর হৃদয়ের ইতিহাস শুনিলেন, তাঁহার নিজের পতিপ্রেমনিষ্ঠ মাতৃহৃদয় আর একটি হৃদয়ে আপনারই প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনুরক্ত হইল, সেই দিন হইতে মোছলমান বউ দয়াঠাকুরাণীর পরমাত্মীয় সখী হইল। গ্রামের লোক আরো ছি ছি করিয়া উঠিল।

দয়াঠাকুরাণী যখন আসমানীর দীন কুটীরে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন আসমানীর অন্তিমকাল। দয়াঠাকুরাণী তাহার শিয়রে বসিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিলেন, "মোছলমান বউ, আমি এসেছি। চিনতে পার?"

আসমানী চোখ মেলিয়া বলিল, "এ্যাঁ কে? দিদিঠাকরুণ এসেছ? খোদার বড় মেহেরবানি, দিদিঠাকরুণ আমার জহর রইল, তাকে দেখো, সে তোমার ষষ্ঠীর নফর।"

দয়া দেবী অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "জহর ষষ্ঠীর নফর নয়, ষষ্ঠীর ভাই। জহর, বোন, আমারই ছেলে।"

"এখন আমি সুখে মরতে পারব। দিদি, জহরকে আমার বুকে দেও, আমি মরে গেলে জহর তোমারই গলগ্রহ।"

পুত্রকে বুকে লইয়া আসমানীর মৃত্যু হইল, সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মির মত একটি ক্ষীণ হাস্যজ্যোতি তাহার সুখমৃত্যু ঘোষণা করিল।

২

জহর আলি এখন হিন্দুমাতার নিকট জহর লাল। সে ষষ্ঠীচরণের ক্রীড়া সহচর, সে অশনে বসনে, আদর মমতায় ষষ্ঠীচরণের সমকক্ষ, উভয়ে একত্রে পাঠশালে যায়, কিন্তু সেই শিশু আপনার মাকে কি ভুলিতে পারিয়াছিল?

দয়াঠাকুরাণী যথেষ্ট স্বাধীন ও কুসংস্কারমুক্ত হইলেও ঠিক সহজভাবে জহরকে আদর যত্ন করিতে পারিতেন

না। একই ঘরে হইলেও তাহার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিছানা ছিল, শয়নগৃহ যথাসাধ্য আসবাব শূন্য করা হইয়াছিল, পাছে জহর সে সকল স্পর্শ করে। অন্যান্য ঘরেও সর্ব্বদা সতর্কভাবে শিকল দেওয়া থাকিত, বালক জহর প্রবেশ না করে। আহারের সময় ষষ্ঠীচরণ ও জহরকে একটু তফাতে তফাতে বসানো হইত, ষষ্ঠীকে মা খাওয়াইয়া দিতেন এবং জহর অন্ন স্পর্শ করিবার আগেই তাহার ভাত মাখিয়া গ্রাস ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং বালক জহর ভালো করিয়া খাইতে না পারিলে দয়া ঠাকুরাণী একটু তফাতে বসিয়া বাক্যে ইঙ্গিতে তাহাকে উপদেশ দিতেন, কখন কখন বা বাড়ীর কৃষাণ আলিজানকে ডাকিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। খাইতে খাইতে এক একদিন শিশু জহর অকারণ কাঁদিয়া ফেলিত, তাহার সে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সহজে থামিতে চাহিত না। সেই শিশুচিত্তে স্নেহতারতম্য কি আঘাত করিত? শিশুচিত্ত কি এত সূক্ষ্ম অনুভবনশীল?

একদিন বর্ষার বিরস সন্ধ্যায় চারিদিক মেঘে গম্ভীর আচ্ছন্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়া ছিল; সিক্ত শীতল বায়ু একটু জোরেই বহিতেছিল। অঙ্গনে কর্দ্দম, গগনে অন্ধকার, এমনি দিনে নরনারীর প্রাণে একটা নিবিড় মিলন, একটা মধুর সঙ্গ, একটা প্রগাঢ় স্নেহ লাভ করিবার ব্যাকুল বাসনা জাগ্রত হয়। নিষ্কর্ম্মা শিশুচিত্ত আজ দোলাই জড়াইয়া ঘরের দাওয়ায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকাকে বড় ক্লান্তিকর মনে করিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জহর বসিয়া বসিয়া স্তব্ধ গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। দয়াঠাকুরাণী মালাজপ করিতে করিতে বলিলেন, "জহর, ঘুম পেয়েছে? যাও বাবা, ঘরে আপনার বিছানায় গিয়ে শোওগে, আমিও জপ সেরে যাচ্ছি।"

জহর শুধু বলিল, "এখনো ঘুম পায় নি।" শিশু-নেত্রের ঘুম আজ কিসে টুটিয়াছে?

দয়াঠাকুরাণী মালাজপ শেষ করিয়া আপনার নিদ্রিত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "চল জহর, ঘরে চল।"

জহর বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "শোও বাবা, শোও।"

জহর নড়িল না।

দয়াঠাকুরাণী আবার বলিলেন, "শোও বাবা, রাত হয়েছে, ঘুমোও।"

জহর তথাপি নির্বাক, নিশ্চল।

দয়াঠাকুরাণী ষষ্ঠীকে বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া আসিয়া জহরের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাহার দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, বল কি চাই?"

তখন সেই সাত বৎসরের বালক মাথা নীচু করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল বলে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া অতি করুণ মিনতির স্বরে বলিল "মা, তুই আমাকে একবার আপনার মার মত কোলে নে না।"

শিশুর মুখে এ কি নিদারুণ করুণ বাণী। দয়াদেবীর প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মত হইল, তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দু বাহু মেলিয়া জহরকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাহাকে কোলে উঠাইয়া তাহার মুখ চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, হিন্দুবিধবার সকল আচার আজ হৃদয়ের কাছে, প্রেমের কাছে, খর্ব্ব হইয়া গেল! জহরকে কোলে করিয়া দয়াদেবী বড় কান্নাটাই কাঁদিলেন, আর মাতৃস্নেহসন্তৃপ্ত জহর তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পরম সুখে হাসিমুখে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দয়াদেবী আপনারই শয্যার এক পার্শ্বে তাহাকে শোওয়াইয়া নিজে উভয় পুত্রের মধ্যে শয়ন করিলেন। সেদিন হইতে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। দয়াদেবী গ্রামে পতিতা হইলেন।

৩

ষষ্ঠী ও জহর বড় হইয়াছে। তাহারা উভয়েই এফ, এ, পাশ করিয়াছে। ষষ্ঠী ঠিক করিল সে বি, এ, পড়িবে; জহর বলিল, সে পুলিসের দারোগাগিরির পরীক্ষা দিবে। ইহা শুনিয়া ষষ্ঠী বলিল, "ছি ছি, যে চাকরী দেশের লোকের হেয়, তাই তোমার চরম অবলম্বন ঠিক করলে।" জহর গম্ভীর ভাবে বলিল, "না করে' করি কি? যত শীঘ্র হয় আমাকে উপার্জ্জন করতে হবে, আর কত কাল পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব!" ষষ্ঠী আর তাহাকে কিছু বলিল না, কথাটা মাকে বলিল।

দয়াঠাকরুণ জহরকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে জহর, আমি তোর পর; আর তুই আমার গলগ্রহ!"

জহর নিরুত্তর হইয়া শুনিল মাত্র। কিন্তু আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

শৈশবে মাতৃস্নেহ লইয়া উভয় শিশুর মধ্যে যে ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বঞ্চিত জহরের সেই ব্যথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এবং ক্রমশ জহরকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সে আজ স্বাধীন হইবার জন্য, ষষ্ঠীর মার অনুগ্রহ এড়াইবার জন্য অকস্মাৎ বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ষষ্ঠী থাকিতে না পারিয়া রাত্রে আবার জহরকে বলিল, "জহর ভালো করে ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। আজ যে-তোমাকে লোকে যতটা শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, সেই-তোমাকে কাল পুলিসের পোষাক পরা দেখে ততটা শ্রদ্ধা, ততটা বিশ্বাস করতে সঙ্কুচিত হবে, এমন ঘৃণ্য অধম যে জীবিকা তার চেয়েও কি মার স্নেহদান হেয়?"

"হেয় শ্রেয় আমি জানি না, অত কথার মারপেঁচও বুঝি না। দেশের হাজারো লোক পুলিসের কাজ করচে, আমিও করব। আর, পুলিসে যে কাজ করে সেই কি বদমাইস, ভালো লোক কি পুলিসে নেই?"

"থাকতে পারে। কিন্তু আমি জানি কত লোক দেবতার মত, পুলিসের কাজে গিয়ে পিশাচ হয়েছে। অনেকেই মন্দ বলেই ত' দুর্ণাম। আমাদের অন্ন যদি এই বারো বৎসর হজম হয়ে থাকে, তবে আরো কিছুদিন হজম হবে, তুমি মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাও।"

"ও বাবা, পাঁ—আঁচ বচ্ছর?"

"তবে বি, এ, পাশ করে বি, এল, দিয়ো।"

"সেও ত' চার বচ্ছর।"

"তবে পি, এল, পড়।"

"তবু দুবচ্ছর।"

"তবে মোক্তারী দেও।"

"এফ, এ, পাশ কোরে মোক্তার?"

"ক্ষতি কি। পুলিসের চেয়ে ভালো।"

"ছি! কক্‌খনো না।"

"তবে দারোগা হওয়াটা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়?"

"নিতান্তই।"

"বেশ!"

দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া গেল।

এবারে মার বুঝাইবার পালা। দয়াঠাকুরাণী জহরকে বলিলেন, "বাবা, চাকরীই যদি তোর নিতান্তই করতে হয়, অন্য চাকরী কর না; আরো ত' ঢের আপিস আছে।"

"অন্য চাকরীতে মা পয়সা নাই, পুলিসের চাকরীতে দুপয়সা তবু আছে।"

"ছি বাবা, একি তোর কথা? একি আমার ছেলের উপযুক্ত কথা! মাইনের অতিরিক্ত যে উপরি পাওনা সে ত' চুরি?"

"না মা চুরি না করেও পয়সা রোজকার করা যায়, অনেক জমিদার বড় লোকে ইচ্ছে কোরে মাঝে মাঝে উপহার দেয়।"

"সে উপহার নয়, ঘুষ।"

"ষষ্ঠী তোমায় এই রকমই বুঝিয়েছে। আমার কথা তুমি আর বুঝবে না। যাই হোক, আমি আর ষষ্ঠীর অন্নদাস হয়ে থাকচি নে। ষষ্ঠীর অনুগ্রহ পেয়ে জীবন ধারণ করা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

"ষষ্ঠীর অনুগ্রহ না মনে করে তোর মার স্নেহদান মনে করলেও ত' পারিস।"

"সে ত' কল্পনা, সত্য যে অন্যরূপ।"

দয়াঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, "সত্য কি তা' ভগবান জানেন, একদিন তুইও জানবি। জহর, তুই আমার বড় দুঃখের ছেলে, ঈশ্বর তোকে শুভমতি দিন।" তাঁহার মনে পড়িল এই জহরের জন্য তিনি কতখানি ত্যাগ, কতখানি নিন্দা, কতখানি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, সে কথা তিনি ষষ্ঠী বা জহর কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আজ সেই দুঃখপালিত জহরকে বিদ্রোহী দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে বেদনা জাগিয়া উঠিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

৪

জহর চারি বৎসর দারোগা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন নবাবগঞ্জে আসিল তখন ষষ্ঠী এম, এ, পাশ করিয়া নবাবগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

জহর, সুখচর ছাড়িয়া ষষ্ঠী বা তাহার মাতার কোনো সংবাদই রাখে না। এতদিন পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়া বিশেষ খুসি হইল না। জহর এখন পুরাদস্তর পুলিস, হৃদয় নামক পদার্থটা প্রশ্রয় না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নবাবগঞ্জ স্বদেশীভাবের প্রধান আড্ডা, জেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জহরকে ডেমি অফিসিয়াল চিঠি লিখিলেন, হুঁসিয়ার, জহর প্রত্যুত্তরে লিখিল, 'যো হুকুম খোদাবন্দ! জহর গোপনে গোপনে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি কাগজের পাঠকের নাম সংগ্রহ করিতে লাগিল; কে কে সাধ্যপক্ষে স্বদেশীব্রত পালন করিতেছে তাহাদের সন্ধান লইল; এবং বিশেষভাবে ষষ্ঠীচরণ কি করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল।

একদিন এক স্বদেশী-দ্রব্য-বিক্রেতা আসিয়া ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মাষ্টার বাবু, শুনেছি দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমায় যদি রক্ষা করেন।"

ষষ্ঠীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

দোকানদার বলিল, "দারোগাবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে বলেছেন, তাঁকে দুশো টাকা না দিলে তিনি আমার দোকান আর বাড়ী লুট করাবেন।"

শুনিয়া ষষ্ঠীচরণের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। ষষ্ঠী জহরের সঙ্গে দেখা করিয়া তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "জহর, তুমি অধঃপাতে গেছ জানি, কিন্তু একেবারে জাহান্নমে গেছ জানতাম না। এ সব কি ব্যাপার? দুর্ব্বল নির্দ্দোষীকে পীড়ন করায় তোমার কি পৌরুষ?"

এ ভর্ৎসনায় জহরও ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, "যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দেও গে যাও। আমি ত' আর তোমার ইস্কুলের ছাত্র নই যে চোখ রাঙানি দেখে ডরাব।"

ষষ্ঠীচরণ উদ্যত ক্রোধ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিল, "ষষ্ঠীচরণ, নবাবগঞ্জে থাকতে তুমি কোনো জুলুম করতে পারবে না।"

জহর একটু হাসিয়া বলিল, "সে দেখা যাবে।"

দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আরো বাড়িয়া গেল।

সেইদিন হইতে জহর সপ্তাহে সপ্তাহে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে ষষ্ঠীচরণের নামে নানাবিধ রিপোর্ট করিতে লাগিল। ষষ্ঠী স্কুলের ছাত্রদের লইয়া বাজারে লোককে বিলাতীদ্রব্য কিনিতে বাধা দেয়, ক্রীত বস্ত্র কাড়িয়া জ্বালাইয়া লোকসান করে, বিলাতী পণ্য-ব্যবসায়ীদিগকে মারপিট ও ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখায়, এবং সর্ব্বোপরি ষষ্ঠী কার্লাইল সার্কুলার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজদ্রোহে তালিম করিতেছে।

উপর হইতে গোপন হুকুম আসিল যেমন করিয়া পার ষষ্ঠীচরণকে জব্দ কর। জহর চিঠি পড়িয়া মুচকি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিল।

সেই দিন বাজারের মাতব্বর গোলদার সলিম-উল্লা দারোগা সাহেবের আহ্বানে থানায় গিয়া ঘণ্টা দুই গভীর পরামর্শের পর বড় গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রি প্রায় দুটার সময় সলিম-উল্লার বিলাতী-পণ্যের দোকানে আগুন লাগিল। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। বাজারে মহা চীৎকার, ব্যস্ততা ও সোরগোল লাগিয়া গেল, ষষ্ঠীচরণ এই গোলমালে ঘুম হইতে উঠিয়া দিগ্‌দাহকর বহ্নিশিখা দেখিলেন এবং অমনি তূর্য্যধ্বনি করিয়া স্কুলের ছাত্রগঠিত আশাবাহিনীকে আহ্বান করিলেন। স্কুলের প্রথম তিন ক্লাশের ছাত্রগণ চকিত মধ্যে ষষ্ঠীচরণের গৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ষষ্ঠীর পশ্চাতে পশ্চাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে নৈশ গগন ধ্বনিত করিয়া বহ্নিনির্ব্বাণ করিতে ছুটিল। ষষ্ঠীচরণের নেতৃত্বে আশা-বাহিনী হাটে পৌছিতে না পৌছিতে জহর আলির আদেশে কনেষ্টবলগণ তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। এই অকস্মাৎ বাধা পাইয়া ছাত্রবৃন্দ ক্ষেপিয়া গেল, পুলিশের সহিত "বন্দে মাতরম্" হাঁকিয়া মারামারি যুড়িয়া দিল। ষষ্ঠী ব্যাপার বুঝিয়া বালকদের থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই উভয় পক্ষেই রক্তপাত হইয়া গেছে, এবং সকলে পুলিস ও ক্রুদ্ধ দোকানীদের দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে গভীর রাত্রে বিলাতীপণ্যব্যবসায়ীর দোকান ঘর জ্বালানো, দোকান লুঠ, মারপিট ইত্যাদি বহুতর অপরাধের নালিশ সহ ষষ্ঠীচরণ ও ছাত্রবৃন্দ জেলায় চালান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার, আসামীদের জামিন নামঞ্জুর করা হইল।

দয়া ঠাকুরাণী পুত্রের বিপদের কথা শুনিলেন, তিনি

নিজেই জেলায় গিয়া হাজতে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিলেন। ষষ্ঠীচরণ মাকে দেখিয়া ক্ষোভে রোষে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "মা, জহর এই কাজ করেছে।"

মা শান্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই। তার প্রতি তুই রুষ্ট হোস না। সে আমাদের ছেড়েছে বলে' আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। তুই আপন কর্ত্তব্য করেছিস, ফলের ভার ভগবানের উপর। যে পবিত্র বন্দে মাতরম্ নাম গ্রহণ করে' তুই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিস, তাতে নির্য্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস, আমি আপনাকে ধন্য মনে করব। আর এক কাজ তোকে করতে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্মসমর্থন করতে হবে।"

ষষ্ঠীচরণ মার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কহিল, "আত্মসমর্থন করতে গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া ত' উপায় দেখি না।"

মা অকম্প কণ্ঠে কহিলেন, "তবে তোর আত্মসমর্থনে কাজ নাই। কিন্তু নিরপরাধী বালকগুলির কি উপায় হবে?"

অমনি কতকগুলি কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "মা, আমরা তোমার কুপুত্র নই, আমরা একটুও ভয় পাই নি, আমরা কেউ কিছু বলব না, আদালত যা খুসি, তাই করুক।"

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, বাপ সকল, এই হৃদয়বল লাঞ্ছনাতে দ্বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা করে' ব্রত গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।"

৫

আজ ষষ্ঠীচরণের বিচার। এজলাস লোকারণ্য। সরকারি উকিল যাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সকলের একই উত্তর, "বলিব না।" আসামী পক্ষে উকিল বলিলেন, তাঁহার মক্কেলরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না; সাফাই সাক্ষীও দিবেন না। আদালতের যাহা খুসি করিতে পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের কথা বিশ্বাস করিয়া এবং জহর আলি দারোগার কর্ম্মপটুতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া ষষ্ঠীচরণের ছয় মাস ও ৫ জন বালকের দুই মাস করিয়া কারাদণ্ড বিধান করিলেন। অন্যান্য বালকেরা সনাক্ত করার গোলমালে ও প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইল।

জহরলাল যখন উৎফুল্ল হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া থানায় ফিরিল, তখনই একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া থানায় লাগিল। গাড়োয়ান গিয়া সেলাম করিয়া দারোগা সাহেবকে জানাইল, একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। জহর আলির মনটা আজ প্রফুল্ল ছিল; সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইল এবং গাড়োয়ান গাড়ীর মুখের পর্দ্দা উঠাইয়া ধরিল।

জহর বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা!"

গাড়ী হইতে নামিয়া দয়া দেবী বলিলেন, "হাঁ বাবা জহর, তোর মা। আমি তোকে তোর মায়ের বুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।"

এই স্নেহের আহ্বান জহরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে মার পদতলে কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, "মা, এলে যদি তবে আর কিছু দিন আগে এলে না কেন?"

মা পদানত সন্তপ্ত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া বলিলেন, "এর আগে এলে তোকে ফিরাতে পারতাম না;—তুই মনে করতিস আমি বুঝি ষষ্ঠীকে বাঁচাবার কৌশল পেতেছি। আজ আমি পুত্রহারা, আজ তোকে ফিরতেই হবে, আজ ত' আর তোর মার স্নেহের শরিক নেই।"

জহর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল, "মা, আমি ফিরব, আবার তোমার ছেলে হব।"

মা পুত্রকে বুকে চাপিয়া বলিলেন, "জহর মানে রত্ন; এতদিন আমি মণিহারা হয়ে ছিলাম।"

জহর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি কি ভুলে গেলে যে জহরের আর এক মানে বিষ? আমি ঢের জ্বালিয়েছি, নিজে জ্বলেছি। কিন্তু আর না, এবার মা তোমার কোলে ফিরব!"

জহর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সাহেব তখন জহরকে ইন্স্পেকটর করিবার সুপারিশ লিখিতেছিল। জহর সাহেবকে পদত্যাগ পত্র দিল। সাহেব পরম বিস্ময়ে অবাক হইয়া জহরের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল কি এক প্রসন্ন দৃঢ়তা তাহার মুখে দীপ্তি পাইতেছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের গবেষণা।

বর্ত্তমান ভারতের কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে, যে কয়েকজন বিদ্যা ও জ্ঞানে বিদেশে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম প্রথমেই মনে পড়িয়া যায়। যে বিজ্ঞান আজ সমগ্র জগতের কর্ম্মকাণ্ড ও ভাবচিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া সেগুলিতে নূতন শক্তির যোজনা করিয়াছে, উভয়ে সেই বিজ্ঞানেরই গবেষণাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। বোধ হয় এই জন্যই ইহাঁদের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়।

ডাক্তার রায় এবং বসু মহাশয় জড়বিজ্ঞানের একই বিষয় লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন নাই। প্রাণী উদ্ভিদ্ এবং সজীব নির্জীবের মূলগত পার্থক্য আবিষ্কারের জন্য ডাক্তার বসু মহাশয় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জড় ও জীবতত্ত্ব যে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উপক্রম করিতেছে, পাঠক তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। ডাক্তার রায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত কেবল রসায়ন শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। দুই বা ততোধিক বস্তু যে বিধানানুসারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া পৃথক গুণবিশিষ্ট নানা পদার্থের রচনা করে, তাহাই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে বোধ হয় রসায়ন শাস্ত্রই অতি প্রাচীন। প্রাচীনতার দাবি সত্ত্বেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের হাতে পড়িয়া ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শত শত বৎসর নানা পরীক্ষা করিয়া পদার্থের বিচিত্র সংযোগ বিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রাচীন পণ্ডিতগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাহার অনেক ভ্রম ধরা পড়িয়াছে, এবং পুরাতনের স্থানে অনেক নূতন নিয়ম বসাইতে হইয়াছে। সুতরাং গত শতাব্দীতে জড়বিদ্যার এই বিভাগের যে সকল নূতন তত্ত্ব জানা গিয়াছে, তাহা লইয়া রসায়নশাস্ত্রকে একপ্রকার নূতন করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। দুই বা ততোধিক বস্তুর সংমিশ্রণে যে সকল নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে, পূর্ব্বপণ্ডিতগণ তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আধুনিক রসায়নবিদ্‌গণের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাঁহাতেও ভ্রম ধরা পড়িয়াছে। তা'ছাড়া পূর্ব্বপণ্ডিতগণ যে সকল পদার্থের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকেও পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য ইহাতে রসায়ন শাস্ত্রের প্রসার খুবই বাড়িয়া চলিতেছে, এবং রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের প্রকৃত নিয়মও ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার রায় মহাশয় তাঁহার গবেষণা দ্বারা সংযোগ বিয়োগের নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বপণ্ডিতগণ বহু চেষ্টাতেও যে সকল যৌগিক পদার্থের সন্ধান পান নাই, রায় মহাশয় সেগুলিকে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিবার কৌশল দেখাইয়া, রসায়নশাস্ত্রকে সম্পূর্ণতার দিকে অনেকটা অগ্রসর করাইয়াছেন। আজও তাঁহার গবেষণা শেষ হয় নাই। প্রতি বৎসরেই তাঁহার আবিষ্কৃত দুই চারিটি নূতন তত্ত্ব রসায়নশাস্ত্রের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে।

ডাক্তার রায় মহাশয় তাঁহার গবেষণা দ্বারা এপর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করা দুঃসাধ্য। তা' ছাড়া সেগুলি এতই জটিল যে, তাহাদের বিবরণ বিশেষজ্ঞ পাঠক ব্যতীত অপর কাহারো প্রীতিকর না হইবারই সম্ভাবনা। আমরা এই প্রবন্ধে ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত নানা তত্ত্বের মধ্যে কেবল কয়েকটি প্রধান বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিব।

গন্ধকদ্রাবকের (Sulphuric Acid) সহিত তাম্র লৌহ ও নিকেল্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া একজাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। তুঁতে বা তুথ এবং হীরাকশ প্রভৃতি যৌগিকগুলি এই জাতিভুক্ত পদার্থ। এই সকল বস্তু পরস্পরের সহিত মিশিলে, তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে কয়েকটি নূতন যৌগিকের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। ডাক্তার রায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তুঁতে-জাতীয় জিনিসের পরস্পর সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছিল। গত ১৮৮৮ সালে

এডিন্‌বরা রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে, সকলে রায় মহাশয়ের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। য়ুরোপ বা আমেরিকায় কোন উচ্চ উপাধি লাভ করিতে হইলে, মৌলিক গবেষণা দ্বারা উপাধি-প্রার্থীকে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে হয়। এই গবেষণাটিতে রায় মহাশয় D. Sc. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ সালে এসিয়াটিক্ সোসাইটির এক অধিবেশনে ডাক্তার রায় মহাশয় ঘৃত মাখন চর্ব্বি প্রভৃতির স্বরূপ ও বিশুদ্ধি নির্ণয়ের এক রাসায়নিক পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘৃত মাখন তৈল সকলই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। এই সকল খাদ্যের সহিত প্রতারক ব্যবসায়িগণ নানা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করে বলিয়া, বিশুদ্ধি পরীক্ষার একটা পন্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। য়ুরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের তৈল ঘৃত ও দুগ্ধাদির উপাদানের সর্ব্বাঙ্গীন মিল দেখা যায় না। এজন্য ঐসকল জিনিসের বিশুদ্ধি পরীক্ষার বৈদেশিক পন্থা ভারতবর্ষে খাটিত না। গ্লিসারিনের (Glycerine) সহিত Fatty Acids নামক অঙ্গারযুক্ত দ্রাবকের সংযোগ হইলে, অধিকাংশ তৈলজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। Fatty Acid নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটা হইতে এক এক পৃথক জাতীয় তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। ডাক্তার রায় মহাশয় তৈল-জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংগঠনের এই পার্থক্যটিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার গবেষণা করিয়াছিলেন। আলি-পুর-জেল হইতে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল এবং আণ্ডামান দ্বীপ হইতে খাঁটি নারিকেল তৈল আনাইয়া, তাহাদের তুলনায় বাজারের সাধারণ তৈল কি পরিমাণে অবিশুদ্ধ ডাক্তার বসু মহাশয় তাহা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৯৬ সাল হইতে ডাক্তার রায় মহাশয় পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় ইহাঁর খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পারদ জিনিসটা লইয়া আমাদের দেশে যত আলোচনা হইয়া গেছে, বোধ হয় আর কোন দেশেই সে প্রকার হয় নাই। এই ভারত-বর্ষ হইতেই অতি প্রাচীনকালে ইহার গুণ ও মাহাত্ম্য সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। পারদসংযুক্ত নানা পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হইতে দেখিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শেষে ভবনদী পার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত এই জিনিসে আরোপ করিয়া, প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাকে "পার-দ" নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। "রসেন্দ্র চিন্তামণি" নামক প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতা "রসবিদ্যা শিবেনোক্তা" পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল পারদতত্ত্ব স্বয়ং ভগবানই জগতে প্রচার করিয়াছেন। তান্ত্রিক মতে পারদ মহাদেবেরই অংশস্বরূপ এবং পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত। তাই "রসার্ণব" নামক তন্ত্রগ্রন্থে পারদকে "পঞ্চ-ভূতাত্মকঃ সূতস্তিষ্ঠত্যেকঃ সদাশিবঃ" বলা হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার নানাগুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক পারদকেই অবলম্বন করিয়া—তাঁহারা "রসেশ্বর দর্শন" নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। পারদ জিনিসটা অম্লজান (Oxygen) ও গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সহিত মিলিলে বিচিত্র বর্ণের বহু যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার এই গুণটির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। "নানাবর্ণং ভবেৎ সূতং বিহায় ঘনচালম্" এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* যখন জগতের অপরাংশে রসায়ন শাস্ত্রের অঙ্কুরও দেখা যায় নাই, সেই সময়ে যে ভারতে পারদতত্ত্ব লইয়া এত আলোচনা হইয়াছিল, ডাক্তার রায় মহাশয় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আধুনিক প্রথায় পারদের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে পিতামহদিগের উপযুক্ত বংশধর বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এখন ডাক্তার রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণার আলোচনা করা যাউক। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, পারদ জিনিসটা অনেক দ্রাবকেরই সহিত মিশ্রিত হয় সত্য, কিন্তু সোরকাম্লের (Nitric Acid) সহিত এটি

* পারদ লইয়া প্রাচীন ভারতবাসিগণ কি প্রকার পরীক্ষাদি করিয়া-ছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ কাহারো জানা ছিল না। এক ডাক্তার রায় মহাশয়েরই চেষ্টায় নানা দুর্লভ গ্রন্থাদি হইতে সেই বিষয়ের উদ্ধার হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে সুদূর কাশ্মীর ও নেপাল অঞ্চল হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে পারদতত্ত্ব কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক রায় মহাশয়ের "Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন।

যত সহজে মিশে অপর কোন দ্রাবকের সহিত সে প্রকারে মিশিতে পারে না। এই প্রকারে দ্রবীভূত করিতে হইলে, পারদে উত্তাপ প্রয়োগেরও আবশ্যক হয় না। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদ হইতে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায়। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই সকল যৌগিকের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু দ্রাবণের ঠিক্ অব্যবহিত পরে পারদ কোন্ যৌগিক পদার্থটিকে উৎপন্ন করে তাহা অজ্ঞাত থাকায়, বৈজ্ঞানিকদিগের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় অতি অল্প দিন গবেষণা করিয়া সেই অজ্ঞাত যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) সন্ধান পাইয়াছিলেন। ধাতুর উপর সোরকাম্লের ক্রিয়া যে রহস্য-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল, এই আবিষ্কারে তাহা অপসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

চক্ষের সম্মুখে যে সকল জিনিস রহিয়াছে, তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করিয়া কোন তত্ত্বাবিষ্কার করিবার শক্তি ভারতবাসীদিগের নাই বলিয়া একটা অপবাদ কিছুদিন পূর্ব্বেও বিদেশীদিগের নিকট শুনা যাইত। ভারতবাসী বহুকাল এই অপবাদের ভার নীরবে বহন করিয়া আসিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র আমাদের ঐ জাতীয় কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছেন, এবং সুযোগ পাইলে ভারতবাসীও যে মৌলিক গবেষণায় য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন তাহাও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা পারদঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিকে বহুকাল নাড়াচাড়া করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারেন নাই, হিন্দু রাসায়নিক রায় মহাশয় অতি অল্প দিনের গবেষণাতেই তাহাই পাইয়াছিলেন। টোকিয়ো এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব, রায় মহাশয়ের গবেষণার ফল জানিতে পারিয়া ভারতবাসীর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও পরীক্ষাকুশলতার প্রশংসা করিয়া অবিকল পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই বলিয়াছিলেন।

পারদঘটিত নূতন যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) আবিষ্কার বৃত্তান্ত, সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পত্রখানিকে কখনই বৈজ্ঞানিক পত্র বলা যায় না। কিন্তু ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কারের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জর্ম্মান্ রসায়নবিদ্‌গণ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই আমূল অনুবাদ করিয়া, জর্ম্মানির সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে তত্ত্বাবিষ্কারে পেলিগট্ (Peligot), নিম্যান (Niemann) ও ল্যাঙ্ (Lang) প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌গণ পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন, একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিককে তাহাতেই জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া, জর্ম্মান্ সুধীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং আবিষ্কারককে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে তাম্র, রৌপ্য, পারদ, প্রভৃতি ধাতু দ্রবীভূত করিবার জন্য মহাদ্রাবক (sulphuric acid), শঙ্খদ্রাবক বা সোরকদ্রাবক (nitric acid), প্রভৃতি দ্রাবকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ ধাতু সকল কেন দ্রবীভূত হয় বা কি অন্তর্নিবিষ্ট গূঢ় কারণে দ্রবীভূত হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। অধ্যাপক রায়ের গবেষণা দ্বারা এই তমসাচ্ছন্ন ও জটিল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোক পাতিত হইয়াছে। ডাক্তার ডাইভার্স এই সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তিনি ১৯০৪ খৃঃ অঃ Journal of the Society of Chemical Industry নামক পত্রে "Theory of the action of metals upon nitric acid" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে ডাঃ রায়ের গবেষণা ব্যতীত তিনি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না।*

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অম্ল ও ক্ষারজ পদার্থের সংযোগ হইলে লবণ জাতীয় এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অম্ল বা ক্ষার কাহারও গুণ থাকে না। ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত মার্কিউরস্ নাইট্রাইট্ এই প্রকার জাতীয় লবণ (Salt) পদার্থ। অম্লের ভাগ্ ইহা নাইট্রস্ এসিড (Nitrous acid) হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং

* "The occasion for presenting the theory in a more developed form to the Society has been given by the reading last month to the Chemical Society, of an important paper on mercurous nitrites by Prof. Ray of the Presidency College, Calcutta."

ক্ষারের অংশ পারদ হইতে সংগ্রহ করে। উক্ত নাইট্রস এসিডকে সোরকাম্লের সহিত তুলনা করিলে তাহাতে অম্লজানের একটি পরমাণু কম দেখা যায়। ইহাই উভয় দ্রাবকের একমাত্র পার্থক্য। নাইট্রস এসিডকে HO—NO বা H—NO_2 এই দুই প্রকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। একটিতে হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন সংযুক্ত আছে, অপরটিতে সে প্রকার সংযোগ নাই। যৌগিক পদার্থের পরমাণু সকল কিরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, তাহা এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা বুঝা যায়, এবং এই আণবিক গঠন দ্বারা দ্রব্যের রূপ ক্রিয়া ও গুণ নিরূপিত হয়। এই সকল কারণে পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নব্যরসায়ন শাস্ত্রের একটি আবশ্যক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নাইট্রস্ এসিডের আণবিক গঠন কিরূপ তাহার মীমাংসার জন্য নানা ধাতুর * সহিত মিশিয়া উহা যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে সেগুলিতে উত্তাপাদি প্রয়োগ করিয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অপ্রত্যাশিত ফললাভ করিয়াছেন,—আনুসঙ্গিক রূপে Ethyl Nitrite এবং Nitroethane নামক দুইটি অঙ্গারমূলক পদার্থ নূতন প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় ইহার পরে হাইপোনাইট্রস্ এসিড (Hyponitrous Acid) নামক আর একটি নাইট্রোজেন-ঘটিত দ্রাবকের আণবিক গঠন স্থির করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টোকিয়ো এন্‌জিনিয়ারিং কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব এই দ্রাবক হইতে উৎপন্ন যৌগিক হাইপোনাইট্রাইটের (Hyponitrite) আবিষ্কার করেন। তৎপরে অনেক বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ব্যাপারটিতে হাত দিয়া নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূল দ্রাবকটিকে যদি হঠাৎ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তাহা হইতে নাইট্রস্ অক্‌সাইড্ (Nitrous oxide) বা হাস্যোদ্দীপক বায়ু উৎপন্ন হয় জানা গিয়াছিল। এই ব্যাপারটির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এখন স্বীকার করা যাইতেছে না। ডাক্তার রায় মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, দ্রাবকটিকে যদি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তবে উহা হইতে সোরকাম্লও (Nitric acid) উৎপন্ন হইতে পারে। এই আবিষ্কারটি দ্বারা হাইপোনাইট্রস্ এসিডের আণবিকসংস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা গিয়াছে।

ডাক্তার ডাইভার্স হাইপোনাইট্রাইট্ লইয়া বহুকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। এইজন্য আধুনিক রসায়নবিদ্ মাত্রেই উক্ত পণ্ডিতের মীমাংসাকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মহাশয়ের হাইপোনাইট্রাইট্ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান রাসায়নিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, ডাইভার্স সাহেব ঐ গবেষণা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ডাক্তার ডাইভার্স লিখিয়াছিলেন,—

"This interesting observation throws much light on the nature of the decomposition of silver and mercury hyponitrites by heat. Through Ray and Ganguli's observations, we are at length in possession of much knowledge of what the products are, when hyponitrous acid decomposes, without explosion by the heat generated by liberating it from its salts."

আমরা এই প্রবন্ধে যখন ডাক্তার রায়ের মৌলিকত্ব ও গবেষণার উল্লেখ করিতেছি, তখন বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সংস্থাপন বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিয়া ইহা শেষ করিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী ও বিদেশী ঔষধ এদেশে আমদানী হয়। ডাঃ রায় ভাবিলেন যে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ব্রতী না হইলে আমাদের আর উদ্ধার নাই। এই উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সামান্যভাবে উক্ত কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮৯২ সালে যে সূত্রপাত হয়, তাহা এখন কলিকাতার উপকণ্ঠে মাণিকতলায় বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইতেছে। দেশ কাল ও অবস্থাভেদে অল্প মূলধনে যে প্রকার যন্ত্রের দ্বারা যে প্রণালীতে এদেশে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার অনুকরণ দ্বারা এ কাজ

* Mercury, Barium, Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium, Silver, Copper, Cobalt এই কয়েকটি ধাতু লইয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

হয় নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি ও যন্ত্র-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য ব্যতিরেকে এই কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাতা বিজ্ঞান-মন্দিরের শিক্ষাপরিচালক ডাঃ ট্রেভার্স রাসায়নিক জগতে প্রথিত-নামা। তিনি এই কারখানা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল :—

"I wish to make special mention of a piece of research work for which Prof. P. C. Ray and Mr. C. Bhaduri are responsible, for the reason that no account of it will be published. The construction and management of the Works of the Bengal Chemical and Pharmacutical Co., is the work of the passed students of the Chemistry Department of the Presidency College acting under the advice of these gentlemen. The design and construction of the Sulphuric Acid plant, and of the plant required for the preparation of drugs and other products involved a large amount of research of the kind which is likely to be of the greatest service to this country, and does the greatest credit to those concerned."

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ডাক্তার রায় মহাশয়ের এই আবিষ্কারের মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকটির স্থূল বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ডাক্তার রায় মহাশয় সকল কার্য্যে জয়যুক্ত হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হুকার জন্ম।

মর্ত্ত্য হইতে পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে ধূম্রলোক;— সেখানকার সবই বাষ্পময়,—বায়ু বাষ্পপূর্ণ, সাগর সরিৎ সরোবর বাষ্পে ভরা, পর্ব্বত কেবল বাষ্পস্তূপ মাত্র, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলে বাষ্পাকারে বিরাজ করিতেছে। সেই ধূম্রলোকে একদিন মহা কোলাহল শোনা গেল।

তখন স্বর্গের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন এক রকম শেষ হইয়াছে—মাথার ভিতর যা' যা' প্ল্যান ছিল, জল মাটি ইট কাট চূণ সুর্কী পাথর প্রভৃতির সমষ্টিতে তা সবই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এইবার ব্রহ্মা নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া বহু অনিদ্র রজনীর শোধ তুলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

ধূম্রলোকবাসী ধূমপায়িগণ সেদিন ধুমধামের সহিত এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন;—সর্ব্বত্র তাম্রকূটপত্রে ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া ধূমপায়ীর দল একত্র করা হইয়াছে;— নানা তাম্রকূটাগারসমন্বিত ধূমকেতুধ্বজমণ্ডিত সভাস্থল জনসমাগমে গম্ গম্ করিতেছে, গঞ্জিকা-ধূপে ও চরস-রসে সভাগৃহ আমোদিত; সে দিন সভার আলোচ্য বিষয় ছিল— "ধূমপায়ীর কষ্ট নিবারণ।"

যথানিয়মে হাত তালির চট্‌পট্-পটাপট্ শব্দে মনোনীত হইয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন। সভার সম্পাদক শ্রোতাদিগের হাতে হাতে তাম্রকূটপত্রে ছাপা রেজোল্যুশনের অনুলিপি বাঁটিয়া দিলেন,—হাততালির শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে চতুর্দ্দিকে তাম্রকূটপত্র নাড়ার একটা খস্ খস্ শব্দ উঠিল।

প্রথম বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখের সম্মুখে রেজোল্যুশন পত্রখানি ধরিয়া ছাপার হরপে লেখা সভার প্রস্তাবটী পাঠ করিলেন;—"ধূমপানের নিমিত্ত কোন যন্ত্র সৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত ধূমসেবিগণ বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, এবং এই অসুবিধা দূরীভূত না হইলে ধূমপায়ীর সংখ্যা স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া শীঘ্রই একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য আমরা সমস্ত ধূমগ্রাহী একত্র হইয়া এককণ্ঠে ব্রহ্মার সদনে আবেদন করিতেছি যে, তিনি ইহার কোন উপায় বিধান করুন; এই সঙ্গে তাঁহাকে জানান হউক যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইতিমধ্যে ১৯৯ জন ধূম্রলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

প্রস্তাবপাঠ শেষ হইলে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"ধূম্রলোচন সভাপতি মহাশয় ও ধূম্র-লোকবাসী ভাই সকল! কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন যে ইন্দ্রাদি দেব যেমন জ্যোতিতে পরিপুষ্ট, মানবজাতি যেমন অন্নে পরিবর্দ্ধিত, তেমনি ধূম্রলোকবাসী যে আমরা, আমাদের এই বাষ্পদেহ প্রচুর ধূম-ধূমায়িত না হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হবিষানল যেমন দেবতাদিগের, শাকান্ন যেমন মানবদিগের, তেমনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী

ধূম্রলোকবাসী আমাদিগের এই যে না-মানব-না-দেব দেহ ইহার সংগঠনে ধূম যে নিতান্ত আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ধূমজ্যোতি সংমিশ্রণে আমাদের এই বিপুল দেহ গঠিত হইয়াছে; এই বাষ্পময় দেহ লইয়া একদিন আমরা রামগিরি হইতে অলকা, অলকা হইতে রামগিরি, চক্ষের নিমেষে গতায়াত করিয়াছি; সে কিসের বলে? একমাত্র ধূমপানই কি তাহার কারণ নয়?"

"ভাই সব! ধূমপানের কষ্টের কথা আপনারা সকলেই জানেন। প্রথমত ধূমপত্র যে পরিমাণে খরচ করা হয় সে পরিমাণে নেশা হয় না। স্তূপীকৃত পত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া বসিয়া ধূম গ্রহণ করিতে হইলে, সে ধূমের অধিকাংশ কেন সবই প্রায় নষ্ট হইয়া যায়,—অতি অল্প পরিমাণ নাক ও মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ভরপুর নেশায় পরিপূর্ণ ধূমকুণ্ডলী মেঘাকারে, আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক, হেলিতে দুলিতে বাতাসে ভর দিয়া স্বর্গ লোকে চম্পট প্রদান করে, আর আমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি, না পারি ধরিয়া মুখে পুরিতে, না পারি আর কিছু করিতে। হায় হায় একি কম আপশোষ্—কম ক্ষতির কথা! (করতালি ধ্বনি) শুধু কি তাই? হাঁ করিয়া ধূমগ্রহণ করিতে করিতে মুখের চোয়াল ধরিয়া আসে, কবিরাজ ডাকিয়া ঔষধ মালিস করিতে হয় তবে সে বেদনা যায়। (হাস্যধ্বনি) তাহাতে একে শারীরিক কষ্ট আবার অর্থব্যয়! আবার শুনুন, একেলা বসিয়া আরামে যখন-খুসী তখন ধূমপান করিতে পাইনা; একেলার জন্য এত করিয়া ধূমপত্র কখন পোড়ান যায়?—যে ধূমে পঁচিশজন ধূম্রলোচন হইতে পারেন, তাহা কি একটি প্রাণীর জন্য খরচ করা যায়? ধোঁয়ার আড্ডার সকলকে একত্র করিবার জন্য প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা কহতব্য নয়। অনেকে হয়ত যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন না, বেচারাদের আর সেদিন ধূমগ্রহণ করা হয় না; তাহাদের সে কষ্ট দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে,—মনে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে বল নাই, কাজে মন নাই, আহারে অরুচি, কেবল অবসাদ, জড়তা, অসুস্থতা—সে দিনটা তাহাদের কাছে যেন বিধাতার অভিসম্পাত! (করতালি) হায় হায়! এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রীতিমত নেশা জমে কই! ইহার উপায় বিধান করিতে না পারিলে আর চলে না। ভ্রাতৃগণ, আপনারা একত্র হউন, উঠিয়া-পড়িয়া লাগুন, শীঘ্রই যদি কোন ধূমপান যন্ত্র আবিষ্কৃত না হয় তবে জানিবেন ধূমপানের ব্যাপার ধূমেই শেষ হইবে।"

বক্তা তাম্রকুটপত্র দ্বারা মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িলেন। প্রস্তাবটি যথাক্রমে অন্যান্য সভ্যের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপোষিত হইয়া শেষে সমগ্র সভার অনুমোদিত হইল।

ঠায় বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতৃগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, সকলেরই শরীরে অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছিল। কেহ কেহ গাত্র প্রসারণ হস্তোত্তোলন ও মুখব্যাদান পূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে অবসাদ ঘুচাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সভাস্থল হাই-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—সেই হাইয়ের অস্ফুট শব্দ ও তৎসংলগ্ন তুড়ির তুড়্ তুড়্ ধ্বনি মিলিয়া এক অপরূপ কলরবের সৃষ্টি হইল।

কক্ষান্তরে ধূমপত্র সজ্জিত ছিল, তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইল, বর্ষার মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হইয়া গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার মধ্যে আসন পাতিয়া সভ্যমণ্ডলী উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মুখের হাই মুখে মিলাইয়া গেল, হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; শরীরের অবসাদ ঘুচিয়া গেল, উৎসাহ আসিল, মন প্রফুল্ল হইল। ধূমগ্রহণ শেষ করিয়া যে যেথানকার সেখানে চলিয়া গেলেন।

২

ধূমপায়িসভার রেজোল্যুশন সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত হইয়া যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইল। ব্রহ্মা তাহা পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদ্দিনে তাঁহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই যে ধূমসেবন যন্ত্রের কোন আবশ্যকতা আছে। সৃজন-কার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া এবং অনেকটা খরচ বাঁচাইবার জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেণ্টটা তুলিয়া দিবার সংকল্প করিতেছিলেন; এই মর্ম্মে একটা খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছিল, দেবসভার আগামী অধিবেশনে তাহা পেশ্ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; এমন সময় এই কাণ্ড! ব্রহ্মার ভাবনার আরো একটু কারণ ছিল। এবারকার বজেটে তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেণ্টের

খরচটা ধরেন নাই; মনে করিয়াছিলেন সেটা ত উঠিয়াই যাইবে।. এখন তাহা বজায় রাখিতে গেলে অর্থ যোগাইবেন কেমন করিয়া? এইরূপ নানা চিন্তায় ব্রহ্মা মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

স্থপতিকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, ও যন্ত্রনির্ম্মাণ সংক্রান্ত দরখাস্ত-সমূহের সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করিবার ভার বিশ্বকর্ম্মার উপর ছিল। ধূমপায়িসভার দরখাস্তখানা বিশ্বকর্ম্মার দপ্তরে চালান করিয়া দিয়া ব্রহ্মা তখনকার মত কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

অনেক দিন হইতে বিশ্বকর্ম্মার হাতে কোন কাজ-কর্ম্ম নাই; কি করেন, কি করেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি-রকম-একটা যন্ত্র আবশ্যক তাহা চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি নিজে ধূমপান করিতেন না, কাযেই একটা পরিষ্কার ধারণা তাঁহার কিছুতেই হইতেছিল না। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, ধূমপায়িসভার সম্পাদকের সহিত এবিষয়ে বাচনিক পরামর্শ করিয়া ব্যাপারটা খোলসা করিয়া লইবেন।

যথাসময়ে বিশ্বকর্ম্মার আপিসের শিলমোহরাঙ্কিত এক-খানা সরকারি চিঠি সম্পাদকের নিকট পৌঁছিল। সম্পাদক আপিসে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী তর্ক বিতর্ক করিলেন। তর্কে তাঁহার মাথাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল;—সহসা তাঁহার মাথায় একটা 'আইডিয়া' প্রবেশ করিল। তিনি সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া খুব দম্ভের সহিত কহিলেন,—"যন্ত্র আমি সৃজন করিবই। কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের একটু সাহায্য চাই।"

সম্পাদক আগ্রহসহকারে কানটা খাড়া করিয়া বলি-লেন—"নিশ্চয়ই; আমরা আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী আছি; কি করিতে হইবে বলুন।"

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—"আর কিছু না, কেবল স্বর্গের তিন প্রধান দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট হইতে যন্ত্র নির্ম্মাণের উপকরণ আপনা-দিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে; উপকরণ আমার সন্ধানে নাই।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্পাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

৩

ধূমপায়িসভার জনকতক বাছা বাছা লোক মিলিয়া একটা প্রতিনিধিদল গঠিত হইল। তাঁহারা এক শুভদিনে বাষ্পযানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন। সহস্র যোজন দূর হইতে এক বহুবিস্তীর্ণ সমুজ্জ্বল জ্যোতি-মণ্ডল তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র একত্রে সমুদিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল প্রভায় ব্রহ্মলোক মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, অব্ ও ন্য নামক দুইটি সুধা-হ্রদ ব্রহ্মলোককে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়াইয়া ব্রহ্ম-লোকবাসিগণ আকণ্ঠ সুধাপান করিতেছেন। সেখানকার ভূমি বিচিত্ররত্নময়ী; স্থানে স্থানে হেম অট্টালিকা ও অপূর্ব্ব রত্নময় অসংখ্য দিব্য মন্দির শোভা পাইতেছে; সেই শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্য-নিনাদিত মন্দির মধ্য হইতে ব্রহ্মর্ষিদিগের সমকণ্ঠে গীত সাম গান উত্থিত হইয়া জলস্থল আকাশ মুখরিত করিতেছে, সেই গানের সহিত একতানে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া গান গাহিতেছে; ধূপধুনা চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম ও পুষ্পের সৌরভে দিক্ আমোদিত। বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী মহানুভব ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্ষর ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। বিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে হোমানল প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে বারম্বার আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—আজ্যধূমে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ। ব্রহ্মর্ষি-দিগের সুরলয়সংযোগে বেদাধ্যয়ন শব্দে ব্রহ্মলোক শব্দায়-মান। ধূমপায়িগণ সেই সকল সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একস্থানে মহা জনতা—দেবাঙ্গনাগণ অমৃতবর্ষী অশ্বত্থতলে দাঁড়াইয়া কলসে কলসে অমৃত আহরণ করিতেছেন; অরময় ও মদকর সরোবর তীরে দক্ষপ্রমুখ প্রজাপতিগণ দ্বারা অতিথিগণ সৎকৃত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সদনে আসিয়া পৌঁছিলেন; প্রকাণ্ড রত্নময় হেম অট্টালিকা; পদ্মরাগ, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত,

বৈদুর্য্যমণি ও হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি নানা রত্নখচিত অট্টালিকাপ্রাচীরের ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল; দ্বারে অসংখ্য চতুর্ভুজ প্রহরী পাহারা দিতেছে, তাহাদের চারি হস্তে চারি প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে।

ব্রহ্মা তখন পূজায় বসিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল;—একজন প্রহরী তাঁহাদিগকে বিশ্রামঘর দেখাইয়া দিয়া গেল।

নামাবলী গায়ে কমণ্ডলু হাতে চার কপালে চারিটি ফোঁটা কাটিয়া ব্রহ্মা বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ নীরবে তুলিয়া সকলকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সদাপ্রশান্ত চতুর্মুখ আজ কেমন বিষাদ ভারাক্রান্ত, বিরক্তির চিহ্নবিজড়িত। তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর সকলে উপবেশন করিলেন।

তখন ব্রহ্মার বাক্যস্ফুরণ হইল, তাঁহার চারি কণ্ঠের গম্ভীর স্বর একত্রে বাহির হইয়া সকলকার ভীতি উৎপাদন করিল। দলের মধ্যে একজন ছোকরা ছিল, ব্রহ্মার চার জোড়া ওষ্ঠ এক সঙ্গে কম্পিত হইয়া যে একটা হাস্যোদ্দীপক শব্দ করিতেছিল তাহাতে সে হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, তাহার আকর্ণ গণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল।

ব্রহ্মা বিরক্তিবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার সময় বড় অল্প, হাতে বিস্তর কাজ, যাহা বলিবার আছে চট্‌পট্‌ সারিয়া লও।"

প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমরা আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না; কেবল ধূমপানযন্ত্রসংক্রান্ত দুই চারিটী কথা বলিব। আপনি আমাদের দরখাস্ত—"

ব্রহ্মা বাধা দিয়া বলিলেন—"অত বিশদ বর্ণনার আবশ্যক নাই, মোট কথাটা বল।"

যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন বাধা পাইয়া তিনি থতমত খাইয়া গেলেন, কি বলিবেন গোলমাল হইয়া গেল, কিন্তু তাহা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন,—"একদিন বিশ্বকর্ম্মা আমাদের সভায় সম্পাদক—"

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সমস্ত কথা শুনিবার আমার সময় নাই, এখুনি স্নানাহার শেষ করিয়া আমাকে দেবসভায় যাইতে হইবে, সেখানে অনেক কাজ আছে। তোমাদের আসল কথাটা কি শীঘ্র বল, নয় ত সময়ান্তরে আসিও।"

প্রধান ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'না, না, আমি এখুনি সারিয়া লইতেছি। শুনুন্ না, এ—ই বিশ্বকর্ম্মা আ-শ্বা-স দিয়াছেন ধূমপানযন্ত্র তিনি নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু—"

ব্রহ্মা আরো চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বিশ্বকর্ম্মা আশ্বাস দিয়াছেন তা' আমার কি?"

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"না, না, তা নয় কিন্তু—"

"কিন্তু কিন্তু করিয়াই তুমি আমাকে বিরক্ত করিলে, এত চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা এখনও শুনিতে পাইলাম না, আমি এমন করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে পারি না।" এই বলিয়া ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিলেন।

সেই প্রধান ব্যক্তি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জোড়করে ব্রহ্মার স্তবগান করিয়া কহিলেন—"হে দেব-শ্রেষ্ঠ! হে সৃষ্টিকর্ত্তা! হে পদ্মযোনি! আপনারই অনুগ্রহে আমরা দেহে প্রাণ, নয়নে আলোক, নাসিকায় বাতাস পাইতেছি, আপনারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছি, আপনার কৃপায় সর্ব্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি, আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, সর্ব্বে-সর্ব্বা, আমরা আপনার শ্রীচরণের দাস মাত্র; আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। হে দেব! অধমদিগের প্রতি করুণা-কটাক্ষ করুন।"

ব্রহ্মা স্তবে গলিয়া গেলেন, নিজের উপর একটু গর্ব্ব বোধ করিয়া কহিলেন—"অবশ্য, অবশ্য; তোমাদের দুঃখ আমার কাছে নয় ত আর কাহার কাছে জানাইবে? আমি তোমাদের সমস্ত অভাব দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় উপবেশন করিলেন।

তখন ধূমপানযন্ত্রের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার সম্মুখে বিবৃত করা হইল; কথার মত্ত হইয়া তিনি দেব-সভার কথা ভুলিয়া গেলেন। বক্তা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া তাঁহার শ্রবণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"আমার বাপু, যা' সম্বল

ছিল; তা ব্রহ্মাণ্ডদহনে সব গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই কমণ্ডলুটী। তাহা তোমাদিগকে দিতে পারি, যদি কোনো কাযে লাগে,—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মাকে বলিও যদি উহা ব্যবহারে না লাগে ত আমায় যেন ফিরাইয়া দেন; ওটী আমার বড় সখের, বড় আদরের, বড় দরকারের।"

৪

ধূমপায়িসভার বাষ্পযান একদিন কৈলাস অভিমুখে উড়িয়া চলিল। অসংখ্য জনপদ, নদ, নদী, অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, এক রজতশুভ্র পর্ব্বত, দূর হইতে তাহাকে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়; মন্দোদ-নামক স্বচ্ছতোয় শীতলবারিপূর্ণ সরোবর তাহার পদচুম্বন করিতেছে, তাহারই তীরে নানা বিচিত্রসুগন্ধিপুষ্প-ভারাবনতবৃক্ষাবলি-শোভিত এক পবিত্র মনোরম নন্দন কানন, তাহার মধ্যে যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্যগীতবাদ্যে ও ক্রীড়াকলাপে মত্ত রহিয়াছে।

কৈলাস মধ্যে পরম শান্তি মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—কোথাও চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই; বিশ্বেশ্বর সিদ্ধগণ সংযতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, সংযত। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হিংসাদ্বেষাদি ভুলিয়া মৃগযূথের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। বলাকামালায় নভস্তল যেমন সুশোভিত হয়, অতিসুন্দর কামধেনু সকল শ্রেণীনিবদ্ধ থাকায় ঐ স্থান সেইরূপ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, দীর্ঘরোমা, শতগ্রীব, উরুবক্ত্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ত্রাসের উদয় হয়।

রুদ্রাক্ষমালাশোভিতকণ্ঠ জটাভারাক্রান্ত দেবাদিদেব মহাদেব বসিয়া বসিয়া স্তিমিতনেত্রে নতমস্তকে ঝিমাইতেছেন, সতীদেবী সম্মুখে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঘরের চারিদিকে অনেক জিনিস ছড়ান; গোটাকতক শুষ্ক বিল্বপত্র ও ধুতুরাফুল বাতাসে ইতস্তত করিতেছে, একদিকে একছড়া ছেঁড়ামালা ও একখানা বাঘছাল পড়িয়া আছে; তাহারই পাশে মহাদেবের ডমরুটী বর্ত্তমান। এককোণে স্তূপীকৃত ছাই, মধ্যে মধ্যে পবনতাড়িত হইয়া সতী ও মহাদেবের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। অদূরে ভৃঙ্গী একটা প্রকাণ্ড নিমকাঠী লইয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে এবং গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে। মহাদেবের বাহন বলদটা গোয়ালে শুইয়া রোমন্থ করিতেছে, সাপগুলা একটা গর্ত্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। নন্দী লগুড়হস্তে বহির্দ্বার রক্ষা করিতেছে, গঞ্জিকাসেবনে তাহার চক্ষুদুটা জবাফুলের মত রক্তবর্ণ!

প্রত্যহ বৈকালে সিদ্ধিসেবন করা মহাদেবের অভ্যাস। এখনও সিদ্ধি না পাইয়া তাঁহার ক্রমাগত হাই উঠিতেছে, মনটা কেমন ফস্ ফস্ করিতেছে,—তিনি একবার ভৃঙ্গীকে হাঁক দিলেন। এমন সময় নন্দী বহির্দ্বার ছাড়িয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল যে, দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ভক্তবৃন্দ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিবার হুকুম দিলেন। সতীদেবী স্বামীর পা ছাড়িয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে ধূমসেবিসভার প্রতিনিধিদল সেথানে দেখা দিলেন। ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘোঁটা ফেলিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে বাঘছালখানা পাতিয়া দিল। মহাদেব ভক্তগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, কুশলাদি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ধূম্রলোকবাসিগণ! ধূমসেবনে তোমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছেনা ত, মর্ত্ত্যের যজ্ঞধূম তোমাদের দিকে নিয়ত পৌঁছিতেছে ত, কেহ কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটায় না ত?"

দলের প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"হে দেবাদিদেব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য্য বন্ধ বটে কিন্তু কল কারখানা, কলের গাড়ী প্রভৃতি হইতে যে ধূমোদ্গিরণ হয় তাহা বড় কম নয়। উক্ত দ্বীপে বৈদ্যুতিক ব্যাপারের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে মনোমধ্যে আশঙ্কার উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আজ পর্য্যন্ত ধূম সেবনে কেহ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকাখানা আমাদের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না প্রতিবাদও করি না, আমরা বাক্যের দ্বারা নয়, কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাই যে ধূম সেবন ও ধূমপায়ী সভা হইতে ত্রিলোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।"

মহাদেব সাধু সাধু শব্দে এই উক্তির সমর্থন করিলেন

তখন সেই দলের প্রধান ব্যক্তি কহিলেন—"কিন্তু ধূমসেবনের জন্য কোন যন্ত্র না থাকায় আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাদেব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"তোমাদের চেষ্টায় যদি একটা যন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমিও বাঁচি, গঞ্জিকা সেবনে আমারও তেমন সুবিধা হইতেছে না,—ইচ্ছা হয় সমস্ত ধূমটাই গলাধঃকরণ করি, কিন্তু তাহা পারি না।"

দলের প্রধান ব্যক্তি তখন বলিলেন—"হে দেবোত্তম! যন্ত্র-নির্ম্মাণ অসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে না, বিশ্বকর্ম্মা আমাদিগকে ভরসা দিয়াছেন, ব্রহ্মার কাছ হইতে কমণ্ডলুটা পাইয়াছি। এখন আপনি কোন উপকরণ দিলেই হয়।"

মহাদেব উত্তর করিলেন—"দেখ ভক্তগণ, প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার ডমরুটীর দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে; যখন বাজাই তখন তাহার গম্ভীর রব হইতে যেন অস্ফুট আভাস পাই—যেন সে আপনি গুমরি গুমরি বলে—"হে দেব, আমার কার্য্যের প্রসাব বৃদ্ধি করিয়া দাও, শুধু শব্দ সৃজন আমার চরম লক্ষ্য নয়; আমার অন্য যা গুণ আছে তাহা প্রকাশিত হইতে দাও, কেবল তালমানলয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিও না।" তাই বলিতেছি হে ধূমপায়িগণ! দেখদেখি পরীক্ষা করিয়া আমার অনুমান সত্য কি না। আমার বিশ্বাস ডমরুটী ধূমসেবন যন্ত্রের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান হইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি ভৃঙ্গীকে ডমরু আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃঙ্গী তাহা উঠাইয়া আনিল। কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া মহাদেবের হাতে দিল। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের পাশে রাখিয়া দিলেন।

তারপর অন্য কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল; ইতিমধ্যে ভৃঙ্গী সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল, মহাদেব খানিকটা পান করিয়া ভক্তদিগকে প্রসাদ দিলেন। ধূমপান যন্ত্রের কথাটা আর উঠিল না। ধূমপায়ীর দল প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ডমরুটী হস্তগত না হইলে যাইতে পারেন না, মহাদেবের কোলের কাছে সেটা পড়িয়া আছে, তিনি তাহা দিবার নামও করেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। অনেকক্ষণের পর একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"হে দেব! তাহা হইলে ডমরুটী লইবার জন্য কবে আসিব?"

মহাদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"না, না, ওটা আজই নিয়ে যাও। আমি ওটার কথা একদম ভুলেই গিয়াছিলাম।" তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—"এই জন্যেই ত নূতন উপাধি পেয়েছি,—ভোলানাথ।"

(৫)

বিষ্ণু ধূমপায়ীদের উপর বড় চটা ছিলেন। ধূমপায়ী সভা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বর্গের কৌশুলি সভায় অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের জন্য তাহা পারেন নাই, তিনি বরাবর বিষ্ণুর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণু তথাপি ছাড়েন নাই; উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া বিষয়টাকে সজীব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল হয় নাই;—এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ধূমপায়ী সভা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছিল।

যে দিন প্রতিনিধিদল উপকরণ আহরণের চেষ্টায় তাঁহার প্রাসাদে আসিল, তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন—"যা বোলগে আমার সঙ্গে দেখা হইবে না।"

প্রহরীর মুখে এ কথা শুনিয়া ধূমপায়ীর দল পশ্চাৎপদ হইল না, "তোমার মনিবকে বলগে যে, আমরা অতি অল্প সময়ের জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

প্রহরী প্রভুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল, সে অবস্থায় তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহস করিল না, বলিল—"বৃথা চেষ্টা, দেখা হ'বে না।"

অমনি করিয়া তিন তিন দিন ধূমপায়ী সভার প্রতিনিধিদল বিষ্ণুর বহির্দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন তাঁহারা এক মতলব আঁটিলেন।

মর্ত্ত্য সৃজন হইবার পর হইতে সেখানে লীলা খেলা করিবার জন্য স্বর্গের অনেক দেবতা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর উপর ভার পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে মর্ত্ত্যধামে বংশী-বাদন করিয়া গোপিনীকুলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে।

বাঁশী বাজান তাঁহার কখন অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য আজ কাল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একটা কন্সার্টের আড্ডায় বাঁশী বাজান শিখিতে যান। ধূমপায়ীরা সে সন্ধান পাইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধূমপায়িদলের একটা ছোকরা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বিষ্ণুর বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতেছিল। সে দিন বিষ্ণু বাঁশীটী হাতে করিয়া যেমনি বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই ছোকরা চিলের মত ছোঁ মারিয়া বিষ্ণুর হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া ছুট দিল — তাহার বাষ্পময় সূক্ষ্মদেহ নিমেষের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বিষ্ণু দেখিতে পাইলেন না; বিরস বদনে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহার কন্সার্টের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ হইল।

বিষ্ণু অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে, ধূমপায়ী-দিগের চাতুরীতে তাঁহার বাঁশীটী গিয়াছে। বাঁশীটা যে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে, সে কথা লজ্জায় দেবসভায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না; ধূমপায়ীরাও কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন অপ্রকাশ রাখিলেন। আসল ব্যাপারটা কেহ জানিল না; সকলে বুঝিল, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের ন্যায় তিনিও দান করিয়াছেন। কিন্তু বাঁশীটী হস্তান্তর হওয়ায় বিষ্ণুর মর্ত্ত্যে আসিবার দিন পিছাইয়া গেল।

(৬)

ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর বাঁশী ও মহেশ্বরের ডমরু পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্র নির্ম্মাণে লাগিয়া গেলেন। এই তিনটি সামগ্রী দর্শনমাত্রেই তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কে ধূমপান যন্ত্রের একটি ছায়া পড়িল; তাহারই অনুকরণ করিয়া তিনি একটি কায়া রচনা করিলেন। কমণ্ডলুর মুখের ফাঁদ কমাইয়া ফেলিলেন, বাঁশীর ছিদ্রগুলি বুজাইয়া দিলেন, ডমরুর দুই মুখের চর্ম্ম ফাঁসিয়া গেল। তখন কমণ্ডলুর উপর বাঁশী, বাঁশীর উপর চর্ম্মবিহীন ডমরুটী স্থাপন করিয়া দেখিলেন, ঠিক হইয়াছে।

সকলিকা হুকার সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু ক্ষুব্ধ হইলেন, ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন, মহেশ্বর মহা খুসী। তাঁহার ডমরুটীকে তিনি যে বাক্জন্ম হইতে মুক্তি দিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার বেশী আনন্দ। প্রিয় ডমরুটীকে তিনি এক ভাবে দান করিয়া আর একভাবে গ্রহণ করিলেন; গঞ্জিকা সেবনের জন্য কেবলমাত্র কলিকাটি লইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব দান করিলেন। সেই অবধি গঞ্জিকা সেবনে কলিকাই প্রশস্ত।

হুকা সৃষ্টি হওয়ার কথা ইন্দ্রের কানে পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—"করিয়াছেন কি দেব! সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি করিয়া?"

ব্রহ্মা ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কেন, কেন?"

ইন্দ্র—"মর্ত্ত্যলোকবাসীরাও যজ্ঞকার্য্য বন্ধ করিয়াছে, তাহার উপর আমার বজ্রটী চুরি করিয়া লওয়া অবধি তাহাকে তাহারা সকল কাযে লাগাইতেছে, অগ্নিদেবকে আর বড় 'কেয়ার' করে না; ধূম্রঅভাবে বরুণ কোথাও রীতিমত জলবর্ষণ করিতে পারিতেছেন না; তামাকু ব্যবহারের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার হওয়ায় একটু আশার উদয় হইতেছিল। তাহার ধূমও যদি যন্ত্র সাহায্যে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আর উপায় কি? বারি অভাবে পৃথিবী প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িবে—আপনার সৃষ্টি রসাতলে যাইবে।"

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"তাই ত, তাই ত, ধূম্রলোকবাসীরা ত আমায় এ কথা বলে নাই, তাহারা আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকাইয়াছে।"

ইন্দ্র বলিলেন,—"ইহার উপায় বিধান করুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"নিশ্চয়ই, ধূমপায়ীরা আমার সঙ্গে যেমন জুয়াচুরি করিয়াছে, আমি তাহাদের তেমনি অভি-সম্পাত দিব। ইন্দ্র! তুমি জল আন।"

জলগণ্ডুষ লইয়া ব্রহ্মা তখন শাপ দিলেন—"কোন ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপানযন্ত্রনিঃসৃত সমস্ত ধূম গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না,—ধূমের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে ফুঁ দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে ধূমপানে কোন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না, তাহাকে যক্ষ্মাকাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে।"*

* যাঁহারা তামাকু সেবন করেন তাঁহারা জানেন যে, ধোঁয়া টানিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তামাকু খাইয়া কোন তৃপ্তি হয় না। তাহার কারণ আমার মনে হয় ব্রহ্মার এই অভিশাপ।—লেখক।

তাহার পর একদিন ধূমপায়িসভায় হুকার প্রতিষ্ঠা হইল। চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া হুকার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া হুকা-শাস্ত্র খুলিয়া সকল সভ্য হুকাস্তোত্র পাঠ করিলেন—"হে হুক্কে! হে ধূমপায়িসভা-সভ্যজনদুঃখহারিণি! হে কুণ্ডলীকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, তুমি আমাদিগের প্রতি সদা প্রসন্ন থাক। হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎর্সিতচিত্তবিকারবিনাশিনী; মূঢ় আমরা তোমার মহিমা কেমনে বর্ণিব? তুমি শোক-প্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি আমাদের ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর, তোমার যশঃসৌরভ সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ুক, তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক, তোমার মুখ ছিদ্রের সহিত আমাদের অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি!"

ইতি হুকার জন্ম-কথা সমাপ্ত।*

ফল-কথা।

এই হুকার জন্মকথা যিনি নিত্য সাগ্রহে ও অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন তাঁহার অক্ষয় ধূম্রলোকবাস হয়। যিনি একবার মাত্র শ্রবণ করেন তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা থাকে না।

যিনি ধূমপান করেন দেবী ধূমাবতী ও অসুরশ্রেষ্ঠ ধূম্র-লোচন সকল বিপদে তাঁহার সহায় হন; তাঁহার বুদ্ধির জড়তা থাকে না, মাথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে, কল্পনা অতীব প্রতিভাশালী হয়, তিনি সম্ভব অসম্ভব গুলিখোরোচিত নানা গল্প গুজবের সৃষ্টি করিতে পারেন, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন, দেহান্তে তাঁহার কৈলাসবাস হয়। যিনি হুকার নিন্দা করেন তাঁহাকে জন্মান্তরে শৃগাল-দেহধারণ করিয়া কেবল 'হুক্কা হুয়া' রব করিতে হয়।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

* হুকার সৃষ্টি হওয়ায় ধূম্রলোকে ধূমপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তামাক সাজিবার নিমিত্ত, একদল ভৃত্যের প্রয়োজন হওয়ায় ধূম্রলোকবাসীরা মর্ত্ত্যলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন;—বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ধূম্রলোকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই উদ্দেশ্য।

শিল্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী।

তূলা।

প্রাচীন ভারতে তূলার চাষ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহা গত বৎসর ঢাকার মসলিন প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আমরা দেখাইয়াছি। তথাপি আমরা বর্ত্তমানে যে সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ সঙ্কলন করিতেছি, তাহাদের অন্যতম প্রবন্ধের লেখক গ্যামি সাহেবের মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া ভারতে তূলার প্রাচীনত্ব দেখাইব।

মনুসংহিতায় তূলার প্রথম উল্লেখ দেখা গেলেও তৎ-পূর্ব্বেও যে তূলা ভারতে ছিল না তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। হেরোডোটস ও থিয়োফ্রেষ্টাস ভারতে তূলার গাছ দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত এরিয়ানের সময়ে তূলা বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। আরবেরা ইহা আমদানি করিত। ভারত হইতে তূলার চাষ দক্ষিণ য়ুরোপে বিস্তৃত হয়। চীনদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর খুব সম্ভব ভারত হইতেই তূলার চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমশ বস্ত্রবয়ন-প্রণালীও ভারত হইতে বিস্তৃত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে পরিজ্ঞাত হয়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিক তূলা মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় তূলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ভড়োচ অঞ্চলের ভালো তূলা প্রায় আমেরিকার তূলার সমান। কিন্তু ভারতের পরিবর্ত্তনশীল আবহ-অবস্থায় তূলা বেশ পরিষ্কার করিয়া তুলা যায় না; তূলা তুলিতে ভারতে শতকরা ২½ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত খারাপ হয়; আর আমেরিকায় মাত্র ২ ভাগ নষ্ট যায়।

ভারতীয় তূলার আঁশ বীজে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে; এজন্য মিশরী বা মার্কিনী তূলা অপেক্ষা ভারতীয় তূলা ধুনিবার সময় অধিক নষ্ট হয়।

ভারত-উৎপন্ন তূলা গুণানুক্রমে নিম্নে লিখিত হইল:—

হিঙ্গনঘাট (মধ্যপ্রদেশ,) ভড়োচ (গুজরাট,) ধুলিয়া, ভাওনগর (গুজরাট,) অমরাবতী, কামতা, ধারওয়ার, সিন্ধু, বাঙ্গাল (মধ্যভারত, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ,) পশ্চিম বাঙ্গাল

(শোলাপুর ও উত্তর মাদ্রাজ,) সালেম, কোকনাদা, তিনেভিল্লী প্রভৃতি।

ভারতোৎপন্ন তূলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ মিশরী ও মার্কিনী তূলা এ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে নাই। সযত্ন নির্বাচন দ্বারা উত্তম তূলার বংশবৃদ্ধি এদেশে অসম্ভব নহে, তবে তৎপক্ষে চাষী ও ব্যাপারী উভয়েরই সতর্কতা ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক। চাষীরা ক্রমশ ভালো বীজের পক্ষপাতী হইয়া তল্লাভে সচেষ্ট হইতেছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন তূলা চাষের যন্ত্রাদি যাহা এখন ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নিতান্তই অনুপযোগী নহে, কেবল দূষিত প্রক্রিয়াই উত্তম তূলা উৎপাদনের অন্তরায়।

তূলা উৎপাদনের পক্ষে কালো মাটি খুব উপযোগী। লালমাটি কদাচ ব্যবহৃত হয়। কালো মাটির স্তর গভীর ও খুব আঁঠালো হয়, এজন্য তাহা অনেকক্ষণ ভিজা থাকিতে পারে।

গুজরাট, খান্দেশ, বেরার ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে আমেরিক ধরণে সারি বাঁধিয়া সমান্তরে তূলার গাছ লাগানো হয়। মাদ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে বীজ যথেচ্ছ ছড়াইয়া ফেলা হয়। প্রথমোক্ত প্রথায় জমি নিড়ানো যথেষ্ট সুবিধায় ও সস্তায় হয়, চারাগুলিও বেশ ভালো হয়।

তূলা ফসলের শেষ অবস্থায় ক্ষেত্রে জল সেচন ফসলের ক্ষতিজনক এবং তূলার আঁশ তাহাতে কম মজবুত হয়।

জমির উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য কাহার পর কি ফসল উৎপন্ন করা উচিত তাহা ভারতীয় চাষা খুব ভালোই জানে। এক্ষণে শ্রেষ্ঠতা নির্বাচন ও শাঙ্কর্য্য সাধন দ্বারা তূলার উৎকর্ষবিধান করিতে হইবে।

বেরারের প্রাচীন নাম বিদর্ভ। ইহা চিরদিনই তূলার চাষের জন্য বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১৯০৭ সালে ৪৮২১০৪১° একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছিল। চালের চাষ অপেক্ষাও তূলার চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্ষার অল্পতা হেতু অন্যান্য ফসল অপেক্ষা তূলা অধিক উৎপন্ন হয়; এই জন্য চাষারা সকল ফসল ছাড়িয়া তূলাকে আশ্রয় করিয়া সচ্ছল হইতেছে।

এই প্রদেশের কালো মাটির স্তর ২ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। বর্ষার অল্পতা তূলার পক্ষে উপকারী। কিন্তু নবেম্বর মাস হইতেই জমি ফাটিতে আরম্ভ করে এবং বর্ষার জল সেই ফাটায় ঢুকিয়া অনেক চারার শিকড় আলগা করিয়া দেয়। ইহা নিবারণের জন্য চারাতে ফুল হওয়া পর্য্যন্ত জমিতে ঘন ঘন পাইট করিতে হয়। ইহাতে জমির উপরিতল সমান হইয়া আন্তররস রক্ষা করে, জমি আর ফাটে না। তূলা প্রায় পাঁচ মাসে পাকে। মধ্যপ্রদেশের প্রধান তূলা জরি (কাটি বিলায়তী) ও বানী (হিন্দনঘাট বা ঘাটকাপাস)। জরি তূলার আদর ইংলণ্ডে নাই। ইহার আঁশ মোটা ও ছোট। ইহা জাপান ও জর্ম্মানীতে রপ্তানি হয়, এবং মোটা পশমী বস্ত্র তৈয়ারী করিতে পশমের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়। ইহার আঁশ শক্ত বলিয়া আবহ পরিবর্ত্তনে ইহার কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু গত শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে তূলা পাইত না, তখন এই তূলাই ইংলণ্ডকে রক্ষা করিত।

বানী তূলার আঁশ লম্বা ও রেশম চিক্কণ। জরির আঁশ ¾ ইঞ্চি, বানীর আঁশ ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। বানী তূলায় বীচিও কম থাকে। জরি হইতে ১০ নম্বর সূতা ও বানী হইতে ৪০ নম্বর সূতা হয়। কিন্তু তথাপি জরি ক্রমশঃ বানীকে বিতাড়িত করিতেছে। বানার দাম জরি অপেক্ষা দুই তিন টাকা বেশি হইলেও জরি অধিক উৎপন্ন হয়; এই জন্য বানীর আদর ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন একজাতীয় মার্কিনী তূলা উৎপন্ন হয়। তাহাও প্রায় বানীর মত। তাহা হইতে ৪০ নম্বর সূতা তৈয়ারি হয়। অন্যান্য বিদেশীয় তূলার ফসল এ দেশে ভালো হয় না।

বুড়ি নামক একপ্রকার বিদেশী তূলা সাঁওতাল পরগণা হইতে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহা মধ্যপ্রদেশের উপযোগী। যে ওজনের জরির দাম ৯০৲, বানীর দাম ১৩০৲, সেই ওজনের বুড়ির দাম ১৫০৲ টাকা। বুড়ি হইতে চল্লিশের সূতা হইতে পারে।

তূলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় অনুসৃত হইতে পারে:—(১) বীজ নির্বাচন, ইহার জন্য নীরোগ সুস্থ সবল শ্রেষ্ঠ চারার বীজ সংগ্রহ। (২) শাঙ্কর্য্যবিধান, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য গত বৎসরের প্রবাসী দ্রষ্টব্য। (৩) সার নির্বাচন। বর্ত্তমানে গোবর

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা প্রচুর পাওয়া যায় না। চোনাও উত্তম সার; তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা হইতেছে। নাইট্রোজেনীয় সার (যথা সোডা নাইট্রেট ও সলফেট এমোনিয়া) সস্তায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই প্রদেশের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। তাহা পূরণের পক্ষে সোডা নাইট্রেট চমৎকার সস্তা সার। পটাশ প্রয়োগে তূলার কিছু সুবিধা হয় না। তাতা কোম্পানির লোহার কারখানায় আনুষঙ্গিকভাবে সোডা নাইট্রেট প্রস্তুত হইতেছে; যদি তাহা সস্তায় তৈয়ারি হয় তবে ঐ প্রদেশে তূলার চাষের খুব সুবিধা হইবে।

কৃষিবিভাগ হইতেও বীজসংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

জমির পাট।

কালো মাটিতে তূলার ফসলের জন্য প্রতি বৎসর লাঙল দিতে হয় না। তিন বৎসর অন্তর একবার চাষ দিলেই যথেষ্ট হয়। লাঙল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম-সাধ্য ও ব্যয়সঙ্কুল ব্যাপার। এক একরে লাঙল দিতে ৪৲ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু প্রতি বৎসর জমিতে বিধে দেওয়ার দরকার হয়। তূলার একটা ফসল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঙল দিলে খরচ ও কষ্ট কম হয়। নববর্ষারম্ভে বিধে দেওয়া সুরু করিয়া বর্ষাপর্য্যন্ত চালানো হয়। যত অধিকবার বিধে দেওয়া যায়, চাষ তত ভালো হয়। বিধে দিবার খরচ ৪ একর জমিতে ৫৲ টাকা। ৪ একর জমিতে একযোড়া বলদ ও একজন মানুষে তিন দিনে বিধে দিতে পারে।

সাধারণত পচানো গোবর ও চোনার সার জমিতে দেওয়া হয়। কেহ বা গরু মহিষ, ছাগ মেষ প্রভৃতির পাল কিছু দিন ধরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে রাখিয়া দেয় এবং তাহাদের মূত্রবিষ্ঠা জমিকে সারালো করে। মানুষের বিষ্ঠাও বাদ যায় না। এই সার খুব তেজালো। গ্রামসন্নিহিত যে সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা প্রাত্যহিক শৌচক্রিয়া করে, সে সব জমির উৎপাদন শক্তি অপরাপর জমির দ্বিগুণ ত' বটেই। অধুনা সার দিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে:— লাঙলে তিনটা ফলা থাকে, একটা ফলা চষে, দ্বিতীয় ফলার মধ্য দিয়া গুঁড়া গোবর সার পড়িতে পড়িতে যায় ও তৃতীয় ফলা হইতে বীজ পড়ে। ইহাতে ঠিক সারের উপর বীজ পড়িয়া ফসল ভালো হয়, এবং সারের মিতব্যয় হয়। কিন্তু এই প্রথায় প্রদত্ত সারের জোর এক বৎসরের বেশি থাকে না। এ সম্বন্ধে এখনো পরীক্ষা চলিতেছে। আর একটা নিখরচা সারের উপায়—বিভিন্ন প্রকারের ফসল পর পর উৎপাদন করা। এক জমিতে ক্রমান্বয়ে তূলা না বুনিয়া অন্য কোনো ফসলের সহিত অদল-বদল করিলে জমি বেশ উর্ব্বরা থাকে।

বীজ-নির্ব্বাচন ও বীজ প্রস্তুত।

বীজ সংগ্রহ করিয়া একটা চারপাই-এর উপর বীজ ছড়াইয়া ঘসিয়া ঘসিয়া চালুনিতে ছাঁকার মত করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। তৎপরে কালো মাটি ও গোবর মিশ্রিত জলে সেই বীজ ধুইয়া লওয়া হয়। বীজগুলি পাছে গায়ে গায়ে তূলার আঁশে লাগিয়া আটকাইয়া থাকে এবং লাঙলের ফাঁপা ফলার মধ্য দিয়া অক্লেশে না পড়ে এই জন্য ঐরূপে ঘসা ও ধোয়া হয়। জুন মাসের প্রথমেই বর্ষণ হইলেই বীজ বুনিতে আরম্ভ করা হয়। কখনো কখনো কেহবা বৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়া ধূলার মধ্যেই বীজ বপন করে; পরে বৃষ্টি পাইয়া অঙ্কুরোদ্গম খুব ভালোই হয়; কিন্তু এ প্রথায় বীজ পাখী দ্বারা ও অন্যান্য কারণে অধিক নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

উৎপন্ন।

চারি দিনেই অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সপ্তাহ মধ্যে প্রথম দুটি পাতা দেখা দেয়। পনর দিন পরে চারার ধারে নূতন মাটি দেওয়া হয়। এক ফসলের সময়ের মধ্যে দুই হইতে চারি বার নূতন মাটি দেওয়া হয়; যত বেশিবার দেওয়া যায় ততই অধিক পরিপুষ্ট হয়। আশ্বিন মাসে গাছে ফুল হয়।

তূলার কোষ না হওয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে জমি নিড়াইতে হয়। তূলার চারা, ফাঁক ফাঁক হইলে চারা সবল হয়, বেশি ঘেঁসা ঘেঁসি হইলে মাঝে মাঝে চারা উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার হয়।

চারি একর জমিতে গড়ে ৩০০ সের তূলা হয়, তাহার মূল্য ১০০৲ টাকা আন্দাজ। প্রতি একারের আয় ২৫৲ এবং গবর্ণমেণ্টের খাজনা ২৲ ও চাষের খরচ ৬৲। নেট আয় ১৭৲ টাকা। সাধারণ চাষেই এই হয়; ভালো সার ও উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিলে দ্বিগুণ লাভ হওয়া সম্ভব।

দীপালির পর স্ত্রীলোক ও শিশুরা তূলা তুলিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকের সংগৃহীত তূলার কুড়িভাগের এক ভাগ তাহাকে মজুরী স্বরূপে দেওয়া হয়, ক্রমশ নগদ মজুরীর প্রচলন হইতেছে। নগদ মজুরী মণকরা তিন আনা। একদিনে একজন মজুর দুই তিন মণ তূলা সংগ্রহ করিতে পারে।

পীড়া।

ফুলের সময় বৃষ্টি হইলে ফুল ঝরিয়া যায়। বেশি শীত পড়িলেও গাছ পীড়িত হয়। শীতের সময় জল হইলে গাছে পোকা হয়; ইহা ধ্বংসের কোনো কৃত্রিম উপায় জানা নাই। গরম পড়িলে পোকা আপনি মরিয়া যায়। পাতার নীচের

পিঠে একপ্রকার দানা দানা হলদে কালো ক্ষুদ্র কীট জন্মে। প্রত্যূষে পাতা শিশিরে ভিজা থাকিতেই গুঁড়া ছাই গাছে ছড়াইয়া দিলে পোকা মরে। গরম পড়িলে কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যক হয় না। গাছের গোড়ার কাছে একরকম লম্বা শাদা পোকা হয়, তাহা গাছ মারিয়া ফেলে, গাছ হলদে হইয়া শুকাইয়া যায়। এই পোকা ধ্বংস করিবার উপায় নাই। পীড়িত গাছগুলি উপড়াইয়া জ্বালাইয়া কীট নষ্ট করিয়া অপর গাছগুলিকে রক্ষা করা উচিত। গাছের ডগাতেও একরকম সবুজ পোকা হয় এবং সে সব পাতাগুলো জড়ো করিয়া গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাকেও ধ্বংস করিতে গাছ পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। গাছে তূলার কোষ ধরিলেই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত তাহাতে কীট লাগিয়াছে কি না। পোকা লাগিতে দেখিলেই সেই কোষ তুলিয়া দগ্ধ করা উচিত, কারণ ইহাদের অসম্ভব বংশবৃদ্ধিপটুতা আছে। দুটি কীট হইতে দুইশত কীট উৎপন্ন হয়। প্রথমেই সাবধান হইলে সামান্য ক্ষতিতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

উন্নতির উপায়।

বীজ নির্ব্বাচনের উপর তূলার পরিমাণ ও গুণ নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকারের শাঙ্কর্য্য বিধান ও বিদেশী তূলা এ দেশের ধাতসহা করিয়া ভালো তূলা উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

কালো মাটিতে নাইট্রোজেন বড় কম থাকে। উহা সার দিয়া বাড়ানো দরকার। সোরার সার ভালো। তার পর গোবর। তার পর ঘুঁটের ছাই। গোবর সার সস্তা। সোডার নাইট্রেট ও এমোনিয়ার সালফেট সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তূলার আঁশ ভালো করিতে পটাশ সার ভালো। গোবরের সহিত চোনাও সঞ্চয় করিয়া পচাইয়া ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত।

চাষের লাঙল প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও সস্তা সুদে চাষাদের মূলধনের সংস্থান করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কৃষি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে।*

নির্ব্বাণ।

জিজ্ঞাসু। কপিলঋষি-উষিত পুরী
ভূষিত করি কিরণে—
দেবতা ও কে আসিল লোকে সঞ্চরি’?
অমরবালা জ্যোতির মালা
দোলায়ে নভ-তোরণে
নমিছে রাজা আঙুলে বাঁধি অঞ্জলি।

জাগ্রত। কুমার আজি রাজাধিরাজ-
বেশে প্রবেশে ভবনে;
দেব ও দেবী, এসগো অভিনন্দিতে!
তরিবে যদি ভবজলধি
হেরি সুগতে নয়নে,—
জগতজন, এস চরণ বন্দিতে।

(কথা)। শুদ্ধোদন, দেবী গোতমী,
লভি অমনি বার্ত্তা—
আকুল আঁখি জুড়াল, দেখি নন্দনে।
মরণ-গত- অমৃতপথ
হেরিল যেন আত্মা!
সুধার ধারা ঝরে অধীর ক্রন্দনে।
সজল আঁখিযুগল মুছি’—
অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা,—
হেরি’ পাতর জগদতীত দীপ্তি,
চরণমূলে রাহুল কোলে
রহিল ধূলি-লুণ্ঠিতা।
শাক্যকুল, লভিল নবতৃপ্তি।
উদ্বোধিয়া মুগ্ধপ্রাণী—
বুদ্ধবাণী ক্ষরিল;
ধ্বনিল ভবে “শান্তি, চিরশান্তি!”
বিরহ-শোক- বিগত লোক,
জীর্ণ জরা মরিল;
নাহি রে দেহে শ্রান্তি, মনে ভ্রান্তি।

* * * *

শুদ্ধোদন। আমি জনক,—পালক তুমি
কুল-পাবন পুত্র!
শুষ্ক মরু করুণাধারে ভরিলে!
মুছিয়া বাধা, আঁধার, ধাঁধা,
অন্ধে দিলে নেত্র!
জীবন-তরু তরুণ করি গড়িলে!
গোতমী(১)। এস, নয়নপুতলি সুত
উতলা চিত-মাঝারে!
স্তন্যপানে করিয়াছিলে ধন্যা!
আজি যে তব ধর্ম্মে, নব
জন্মলভি, বাছারে,
হইনু,—লোকজনক, তব কন্যা!

* ১৯০৭ সালের কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট শিল্পসমিতির অধিবেশনে পঠিত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের সার সঙ্কলন।

(১) সম্পূর্ণ ভাবটি—অপ্রাদানের গোতমীগাথা হইতে গৃহীত। অপদানে—৩৪—৩৬।

(কথা)। শ্রীপদ সেবা করিতে যেবা
ছিল রে অধিকারিণী—
যার চিত্তভরা ভক্তি ;—
চাহি শ্রীমুখ- পানে সে, মূক-
ভাষায় যেন কামিনী,
যাচিল প্রাণে প্রাণেশ-সেবা-শক্তি।
যাচিল প্রিয় রাহুল তরে
বহুল প্রীতি-বিত্ত,
বিনয়ে শীলে ভূষিবে শিশু-সন্তান।
যেন রে সুত, সাধনা-পূত
দৃষ্টি লভি নিত্য,
পতির মত লভে অমৃত নির্ব্বাণ।

* * * * *

(গাথা)

গাহে কাশ্যপ মুনি(২) শাশ্বতবাণী
বিস্মিত শুনি বিশ্ব।
রাজা অধিরাজ ভিখারী সমাজ
হইল সুগত শিষ্য।
ভণে পুণ্যে বিনয় বর্ণন করি (৩)
অগ্রগণ্য উপালি ;
কি গৃহী, শ্রমণ, কিবা ব্রাহ্মণ,
ধন্য, শুনি সে গাথালী।
কহে আনন্দ, দেব-বন্দিত-কথা ;
স্তম্ভিত নর, মন্ত্রে।
অতীব শুদ্ধ বিবিধসুত্ত (৪)
ধ্বনিত হৃদয়-যন্ত্রে।
গাহে থের থেরী, (৫) পূত গাথা অগণন।
বাধা কোথা ব্যথা ভয়ে ?
জীবনে বর্ম্ম শ্রী অভিধম্ম (৬)
জন্ম-মরণ-জয়ে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

(২) কাশ্যপ, আনন্দ এবং উপালি, ভগবান বুদ্ধের শিষ্য। উঁহারাই ত্রিপিটক আবৃত্তি করিয়া উহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বিনয় পিটক।

(৪) সুত্ত-পিটক ;

(৫) অভিধম্ম নামক পিটক।

(৬) জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষ ও রমণীগণ—যাঁহাদের গাথা ক্ষুদ্দক নিকায়ে অমর হইয়া আছে।

প্রতিবাদ।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার শ্রাবণের ৪র্থ সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক লিখিত "ব্রিটিস মিউজিয়ম ও মিশরের পুরাতত্ত্ব"-শীর্ষক প্রবন্ধে এলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরী মুসলমানেরা মিশর জয় করিলে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়ার বিষয় যে উল্লেখ করিয়াছেন ইহা প্রকৃত ইতিহাস নহে। এই কলঙ্কারোপিত ইতিহাসের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা আলীগড় কলেজের আরবী প্রফেসার মওলানা শিবলী তাঁহার সংগৃহীত "আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয়" নামক উর্দ্দু ইতিহাস পুস্তকে বিশেষ প্রমাণের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় ধ্বংসের জন্য মুসলমানগণের প্রতি দোষারোপ অযথা। উক্ত উর্দ্দু ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ "ইসলাম প্রচারক" পত্রিকায় প্রায় তিন বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি

বিনীত
আনওয়ার আলী।

প্রাপ্ত পুস্তক পরীক্ষা।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। কলিকাতা, সিটি বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত চারিশতাধিক পৃষ্ঠা, মূল্য সাধারণ বাঁধাই ১৸৹, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲। রবীন্দ্রনাথের গান সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহাই যথেষ্ট হইবে না। যে গান আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করে, তাহার পরিচয়ও অনাবশ্যক। ভগবদ্ভক্ত রবিবাবুর গানে মুগ্ধ, প্রেমিক মোহিত; জাতীয়ভাব উদ্দীপনে তাঁহার গান অদ্ভুত কাজ করিয়াছে। নানা বয়সের লোকের হৃদয়ের নানা অবস্থার উপযোগী এমন সংগীত-সংগ্রহ আর নাই। পুস্তকে কবিবরের নিতান্ত আধুনিক বহুসংখ্যক গানও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে মায়ার খেলা ও বাল্মীকি-প্রতিভা নামক গীতিনাট্য দুটিও সমগ্র দেওয়া হইয়াছে। এণ্টিক কাগজে সুন্দর, নির্ভুল মুদ্রাঙ্কন এই বহিখানিকে প্রিয়জনের উপহারের যোগ্য করিয়াছে। একত্রে এত গান এমন সুন্দরভাবে আর কেহ কখন প্রকাশিত করেন নাই। বর্ত্তমান সংস্করণের জন্য সিটিবুক সোসাইটি সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

ছেলেদের মহাভারত—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, কর্ত্তৃক বিবৃত। শিশুসাহিত্য রচনায় উপেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব অসাধারণ। সুন্দর সরল সরস ভাষায় মহাভারতের মূল আখ্যান শিশুদের উপযোগী করিয়া বিবৃত হইয়াছে। শুধু ছেলে নয়, বয়স্কগণও ইহা পড়িয়া সুখী হইবেন। উপেন্দ্রবাবু কলাকুশল; তাঁহার রচনায় বর্ণনার পারিপাট্যে এক একটি চিত্র আলেখ্যবৎ স্পষ্ট ও মনোরম হইয়াছে। রচনার ভিতর দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন অমল হাস্যরস প্রবাহিত আছে, পড়িতে পড়িতে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মহাভারতবর্ণিত চরিত্রগুলির বিশেষত্বও বর্ণনপ্রসঙ্গে দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। উপেন্দ্রবাবু নিজে সুনিপুণ চিত্রকর। তাঁহার অঙ্কিত সুন্দর চিত্রগুলি এই বহিখানির মূল্য ও মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছে। এবার ছেলেমেয়েদের বড় সুযোগ, কেন না অনেকগুলি ভাল বহি বাহির হইয়াছে। কিন্তু পিতামাতার ব্যয়বৃদ্ধির জন্য আমরা দুঃখিত হইব কি না, বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ, এই সকল পুস্তক পূজার সময় গৃহে গৃহে

প্রতি শিশুর হাতে বিরাজ করিবে, ইহা আমরা আশা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে সিটিবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড। ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা। সাধু-মহাত্মার জীবনাখ্যানের এমনি মাহাত্ম্য যে যেমন করিয়াই বিবৃত হৌক তাহা চিত্ত মুগ্ধ করে। আলোচ্য পুস্তকে বিশুদ্ধ সরস সরল ভাষায় অল্প পরিসরের মধ্যে মহর্ষির বিরাট চরিত্রের অভিব্যক্তি ও মাধুর্য্য সুন্দর দেখানো হইয়াছে। বৃদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত, নর ও নারী ইহা পাঠে রস ও আনন্দ পাইবেন। মহর্ষির একটী সুন্দর ছবিও ইহাতে আছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা—শঙ্কর-সেবক ভারতী শতানন্দ বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, উহারা ব্রহ্মলাভের তিনটি প্রস্থান বা প্রণালী মাত্র। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কাহাকে বলে তাহা পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তিনের সমন্বয় করা হইয়াছে। এই দুরূহ মীমাংসা সংক্ষেপ করিতে গিয়া অনেক স্থান জটিলই রহিয়া গিয়াছে, সাধারণ পাঠকের মোটেই উপযোগী হয় নাই, পণ্ডিতদের জন্য এরূপ পুস্তকের আবশ্যকই নাই। অধিকন্তু এই অল্পপরিসরের মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া উদ্ধৃত সংস্কৃত বিভীষিকার মত হইয়াছে। কিন্তু কোন চিন্তাশীল পাঠক ধৈর্য্য ধরিয়া ইহা পাঠ করিলে চিন্তার স্বাস্থ্যপ্রদ খোরাক পাইতে পারিবেন। ছাপা ও কাগজ ভাল।

সটীক মার্কলিখিত সুসমাচার—আচার্য্য আর্থার জুসন কর্ত্তৃক লিখিত। বঙ্গীয় সণ্ডে-স্কুল সম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৪৮৩ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ে বাঁধান ১৲ টাকা; মোটা কাগজে বাঁধান ৸০ আনা। সাধু মার্ক মহাত্মা যিশু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহারই বাংলা অনুবাদ। ইহা বাইবেলের এক অংশ। যাঁহারা বাংলা ভাষায় বাইবেলের মর্ম্ম জানিতে অভিলাষী তাঁহারা ও দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। কিন্তু পুস্তকের ভাষা বাংলা রচনাভঙ্গী (idiom) অনুসারে শুদ্ধ হয় নাই। পাঠ করিতে বহুস্থলে হাস্যোদ্রেক হয়। আমি সে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া এমন পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থকে হাস্যাস্পদ করিতে চাহি না। পুস্তকের মুখপত্রে লেখা আছে যে "কতিপয় বঙ্গীয় বন্ধুর সাহায্যে লিখিত।" তাঁহারা একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া পুস্তকের সাহেবী বাংলাটাকে বাংলা করিয়া দিলে ভাল হইত।

কবিতাকুঞ্জ—আবুল-মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী প্রণীত। ডিমাই ষোদশাংশিত ৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। বাঙালী সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষেই বাঙালী। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন যিনি যে ধর্ম্মই স্বীকার করুন না বাংলায় যাঁহার বাস তিনি বাঙালী, তাঁর ভাষা বাংলা, তাঁহার স্বার্থ দেশের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ তাঁহার স্বার্থ। এই সাধারণ সহজ সত্যটি আজ কাল অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত মহাম্মদ হামিদ আলী এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কবিতাকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বালবিধবার দুঃখে গলদশ্রু, জষ্টিস মুখার্জ্জির বিধবা কন্যার বিবাহকে বাঙালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত জানিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। লেখকের সহধর্ম্মিণীর দুটি কবিতা এই পুস্তক মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তাহাও এই ভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি লেডি কার্জ্জনের হিন্দু মুসলমানের প্রতি উপেক্ষা ও খ্রীষ্টানদিগের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়া ক্ষুব্ধ এবং বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে স্বদেশী ভাবের প্রস্ফুরণে তিনি উল্লসিতা। হৃদয়ের দিক দিয়া দেখিলে এই কবিতাকুঞ্জ বড় সুন্দর ছায়াশীতল। কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষত্ববর্জ্জিত।

ওলাউঠা চিকিৎসা—বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম সেবকসম্প্রদায়ের জনৈক সেবক প্রণীত। ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য।৶০ আনা। ইহাতে সংক্ষেপে রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য, প্রতিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ঔষধ-নির্ব্বাচনপ্রদর্শিকা বেশ উপযোগী ও হিতকর হইয়াছে। ঔষধের ক্রম পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতে প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধা হওয়া সম্ভব।

বেণু ও বীণা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। ইহা অনেকগুলি খণ্ড গীতিকবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব-নামা কবিটি এত ভাবসম্পদ, এত রস-ঐশ্বর্য্য ও এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। নবীন কবিদের লেখার মধ্যে এমন স্বাধীন কবিত্বরস খুব অল্পই উপভোগ করিয়াছি। নবীন কবি প্রধানতঃ প্রেমের কবি, প্রেমকে তিনি সকলের উপর রাখিয়া বিজয়মুকুট পরাইয়াছেন, "কুহুনাদপি" প্রেমকে পবিত্র মঙ্গল জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন, শুষ্ক "মমি" ও জড় "ডাকটিকিট" তাঁহার কাছে প্রেমের সংবাদ, বিশ্বের নাড়ীস্পন্দন বহন করিয়া আনিয়াছে। সহমরণের চিতা হইতে পলায়িতা বালবিধবার আশ্রয়দাতা মাঝির প্রতি প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাও কবিকে মুগ্ধ সম্ভ্রমশীল করিয়া তুলিয়াছে। জড়ের মধ্যেও কবি প্রেম-চেতনা অনুভব করিয়া "কিশলয়ের জন্মকথা" ও "স্খলিত পল্লব" প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছেন। রেশমকীটের বিনাশে কবির ব্যথা "কুলাচার" কবিতায় সুন্দর হইয়াছে। দেশের প্রতি কবির প্রেম কখন সরস কখন গম্ভীর। এইরূপে প্রতি কবিতায় প্রেম সুধাক্ষরণ করিয়াছে। ছন্দের লীলা-প্রবাহ, ধ্বনি—তাহাও সুন্দর। কেবল লঘু ছন্দগুলি কবির হাতে যেন প্রাণহীন বোধ হয়। কবি যেখানে গম্ভীর সেখানে লালিত্য মনোরম হইয়াছে। এই পুস্তক কবির প্রথম রচনা। এখন কবি আপনার ক্ষেত্র আপনি চিনিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল, বাহ্যদৃশ্যও সুন্দর পরিপাটি।

হোমশিখা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৫৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানিও নবীন কবির কাব্যগ্রন্থ, ইহাতে ৮টি দীর্ঘ কবিতা গম্ভীর ছন্দে, একটা বিরাট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার তেজস্বিতা হোমশিখার মতই, ব্যাপ্তি হোমশিখারই মত লকলকে, বিশ্ববিস্তারী। সর্ব্বদেশের সাম্য-সাম কবিতাটিতে কবির নির্ভীক স্বাধীনতা, উদার প্রেম ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে যে যেখানে অত্যাচরিত, কবি তাহাকে ডাকিয়া, সাম্য-সামের গান শুনাইয়াছেন। শূদ্র, নারী তাঁহার নিকট মহিমামণ্ডিত মনুষ্যত্বে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। আমরা সকল কাব্যরসগ্রাহী পাঠকপাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

মুদ্রারাক্ষস।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রচলিত ইতিহাস, কিংবদন্তী, কুলগ্রন্থ এবং অন্যান্য উপকরণ হইতে, এই ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার গ্রন্থেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কীর্ত্তিই সমধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। গ্রন্থকারের সম্ভবতঃ ইঁহাদিগের বিবরণ সংগ্রহেরই অধিক সুযোগ ঘটিয়াছে। গ্রন্থলিখিত বিবরণ অধিকাংশই সাধারণ ঐতিহাসিকের অপরিজ্ঞাত, অনেক স্থলে প্রচলিত ইতিহাসবিরুদ্ধ। আমরা পুস্তকখানি

উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলের সহিত পাঠ করিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার বিবরণগুলি ঐতিহাসিকের ন্যায় আলোচনা না করায় গ্রন্থের মূল্যও অনেকটা উপন্যাসের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। ছাপার অক্ষরে যাহা ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, ইতিহাস তাহাকেই নির্ব্বিবাদে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কোথা হইতে কোন্ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, অবলম্বিত উপকরণের প্রকৃত মূল্য কি, সাধারণকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার সুযোগ দেওয়া ঐতিহাসিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ গ্রন্থে সে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের জন্য যুক্তি তর্কেরও অবতারণা নাই। গ্রন্থকার এখন কারাগারে, সুতরাং এই মারাত্মক অভাব দূরীকৃত হইবার আশা কম। তবে তিনি যে ফুলের সাজি সাধারণকে উপহার দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে যদি তাঁহার উদ্যানের সন্ধান ও পরীক্ষা ঘটিয়া উঠে, তবে বঙ্গীয় ইতিহাস নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে।

সমালোচক।

৪। দত্তপরিবার অর্থাৎ হালিসহর-কুমারহট্ট নিবাসী দত্ত বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শ্রীমহিমচন্দ্র দত্ত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিমাই ১২ পেজি ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানি একটি বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কুলজিগ্রন্থ। ইহার সহিত সাধারণের কোনো সম্পর্ক নাই। লেখক নিজের জীবনী লিখিতে গিয়া নিজের বিপত্নীক হওয়া প্রসঙ্গে নিজেই লিখিতেছেন "আমরা এ বিষয়ে মহিম বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। এরূপ ললনাকে হারাইয়া মহিমবাবুর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সমীচীন হইয়াছে কি না, সে আলোচনার সময় এখনও আসে নাই, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কোনও মতামত এক্ষণে প্রকাশ করিব না।" অদ্ভুত!

৫। প্রমোদ।—মজুমদার লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন ১৬ পেজি ১০২ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি চুটকী রসিকতার পুস্তক। নির্দ্দোষ শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও উপস্থিত সরস উত্তর প্রত্যুত্তরে পুস্তকস্থ গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বন্ধুবান্ধবের মজলিসে ইহার দুই একটা সময় মত বলিতে পারিলে মজলিস আনন্দময় হইবে নিঃসন্দেহ।

মুদ্রা-রাক্ষস।

৬। ভীষ্মমহাদর্শন বা মহাশক্তি আর্য্যদর্শন—উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল অষ্টাংশিত ৪৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা। লেখকের নাম নাই—তিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভালই করিয়াছেন। পুস্তকখানি 'হিং টিং ছট্' বিরাট হেঁয়ালি, তাহা নামেই মালুম। মানব পরমায়ু এত অল্প যে এরকম বই লিখিয়া বা পড়িয়া সময় অপব্যয় করা কোনো বুদ্ধিমানের কাম্য নহে। কর্ত্তব্যের খাতিরে কুইনিনের বিরাট পিলের মত এই অতিকায় গ্রন্থখানিও আমাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। বুদ্ধির অল্পতা বশতঃই বোধ হয় এ মহাদর্শন আমাদের অদৃষ্টে অদর্শনই রহিয়া গেল। যতটুকু বুঝিয়াছি ইহাতে ভীষ্মচরিত্রকে বাস্তবে রূপকে, দর্শনে বিজ্ঞানে, গদ্যে পদ্যে, বাংলা সংস্কৃতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা অবান্তর পাণ্ডিত্যের ভাণ বা আড়ম্বর মহা বিড়ম্বনার সূত্রপাত করিয়াছে। ইহাতে ভীষ্মের চরিত্র উজ্জ্বল বা প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। রবি বাবু এই জাতীয় লেখককেই লক্ষ্য করিয়া 'হিং টিং ছট্' নামক কবিতা ও 'জয় পরাজয়' নামক গল্প লিখিয়াছিলেন। ইঁহারা পৃথিবীর উপর হইতে বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিতেই ভাল বাসেন। তবে সুখের বিষয় মাদাগাস্কারে ডোডো পক্ষীর মত এ জাতীয় লেখক দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছেন।

৭। স্বরাজ—ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি ৪৩ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা। ইহাতে স্বরাজলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক বলেন যে "আদর্শ (রাষ্ট্রীয়) স্বরাজ যেরূপ ভিন্নপথাবলম্বী জাতীয় জীবনীশক্তির সমবায় মাত্র, সেইরূপ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বরাজও প্রত্যেক মনুষ্যের বিপরীত মার্গগামী মনোবৃত্তি নিচয়ের একটি উদার সমন্বয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।" এই আধ্যাত্মিক স্বরাজকেই ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কথা খুব খাঁটি। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; (১) স্বধর্ম্মে আস্থা স্থাপন; (২) মিতব্যয়িতা শিক্ষা; (৩) কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি। পন্থা কয়টিই অবশ্য অনুসর্ত্তব্য; কিন্তু পন্থা অনুসরণের প্রণালী লেখক যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ত নহেই, তিনি স্বয়ংই সকল স্থলে স্বকীয় মতপরম্পরার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। লেখকের মতে মৌখিক বক্তৃতা, দরখাস্ত, নিবেদন, সভাসমিতিতে স্বরাজলাভ ঘটিবে না। কথাটা আংশিক সত্য; সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও রাজশক্তির নিকট আবেদন একেবারে নিরর্থক নহে; প্রজাশক্তিকে বলিষ্ঠ করিয়া রাজশক্তিকেও যথেচ্ছাচার হইতে বিরত রাখিবার জন্য সভা সমিতি ও বক্তৃতার এখনো যথেষ্ট আবশ্যক আছে। লেখকের এই সমালোচ্য পুস্তকই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। স্বধর্ম্মে আস্থাস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত উৎকেন্দ্রিকতা আছে, তাহাও কি পালন করিতে হইবে? হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক প্রভৃতির ফলাফল চিন্তা করিতে করিতে কি এই বিরাট হিন্দু জাতিটা অকর্ম্মা হইয়া পড়ে নাই? খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ্য, অস্পর্শ্য বিচার করিতে করিতে কি হিন্দু কূপ-মণ্ডূকের মত সঙ্কীর্ণ ঔদার্য্য হইয়া পড়ে নাই? বৈদেশিক পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে অনুরাগই কি তাহাদিগকে আপনার দেশে বিদেশীর মত করিয়া রাখে নাই? এখন কি আবার হিন্দু নূতন করিয়া টিকি রাখিয়া ম্লেচ্ছসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিবে, না মুসলমান কাফেরকে জাহান্নামে পাঠাইবার অতন্দ্র প্রযত্নে মন দিবে? লেখকের মতটা অনেকটা এইরূপই। তিনি সুরেন্দ্র বাবুকে সটিকি হইবার উপদেশ দিয়াছেন, হোটেলে বা হিন্দুমুসলমানের একত্র আহারকে তিনি কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়াছেন। ইহারই নাম কি "উদার সমন্বয়?" লেখকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলিও প্রণিধানযোগ্য! দেশ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে, তাহার কারণ স্বধর্ম্মে অনাস্থা। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা সমস্তই বিজ্ঞানসম্মত, কেন না "বাগান হইতে বাগানান্তরে পুষ্পচয়নাদিতে" প্রাতর্ভ্রমণ নিষ্পন্ন হয়। হায় আর্য্য ঋষিগণ, তোমাদিগকে বৈজ্ঞানিক হইতেই হইবে, নতুবা এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের মান থাকে না। পুষ্পচয়নের মধ্যে আধ্যাত্মিক যে মধুর ভাব আছে তাহাও খর্ব্ব করিয়া আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা চাই। ইহাই স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা! লেখকের অভিপ্রায় জাতিভেদ সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে, কারণ তিনি নূতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে "জাতিভেদ প্রথার দিনে এই ভারত উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন"। ইঁহার মতে প্রাচীন বিধিব্যবস্থা অবিচারে অবনত মস্তকে পালন করা উচিত। আমাদের দেশের লোক এইরূপ জড়ধর্ম্মী হইয়া, আপনাদের স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্ববিষয়ে এমন পরাধীন হইয়াছে, যে স্বরাজ লাভের উপায় বলিতে গিয়াও সে শৃঙ্খল ছাড়াইয়া চলিতে পারে না। লেখক বলেন "জাপানের বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল অনুরাগের জন্যই জাপান ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সম্মুখে বীরদর্পে দণ্ডায়মান।" উপদেষ্টা সাজিয়া যিনি পরকে নিজের কথা বা মত পরিপাক করাইতে চান, তাঁহার এত বড় একটা ভ্রান্তি অমার্জ্জনীয়। জাপানের অভ্যুদয়কারণ এখনো রহস্যাবৃত। বিশেষ কোন ধর্ম্মানুরাগ ত নহেই। জাপান ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কত জল্পনা কল্পনা করিতেছে, বাণিজ্যের বিনাশের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "প্রতীচ্য শিক্ষা ও

তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই জানে। আমাদের কৃষি শিল্প সর্ববিষয়ে প্রতীচ্য আদর্শের "অনুকরণ বা অনুগমন"। ঠিক কি তাই? বিদেশী রাজশক্তি আইন কানুন, জোর জবরদস্তিতে কি করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে, তাহা Modern Review নামক ইংরাজি মাসিকের পাঠক অবগত আছেন। দেশের শিল্প রক্ষা দেশের কল্যাণের জন্যই উচিত; তাহার প্রতি অনুরাগের জন্য বৈজ্ঞানিক দোহাই যেমন ব্যর্থ তেমনি হাস্যোদ্দীপক। আমাদের দেশনির্ম্মিত কার্পাস ও উর্ণাজাত বস্ত্রে ইলেকট্রিসিটি থাকুক বা না থাকুক তাহাই আমাদের পরিধেয়, বিলাতী পাটের কাঁপড় নহে। পাটের কাপড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া লেখক বলিয়াছেন "পাটের কলের মজুর ও কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রায়ই হাঁপকাশ হইতে দেখা যায়, সুতরাং পাট নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধানে শারীরিক মঙ্গলের আশা কোথায়?" আপনার সুবিধার অনুযায়ী এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ বিরল। লেখক চিকিৎসাশাস্ত্র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন হাঁপকাশ উৎপন্ন করিতে আঁশালো সব জিনিষই সমান পটু, তাহার ইলেকট্রিসিটিওলা কার্পাস রেশমও রেয়াত করিয়া চলে না। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন নিঃস্বার্থতা ও সমদর্শিতা স্বরাজ লাভের প্রধান উপায়। এই দুইগুণ আছে বলিয়া ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের পুত্র কোচম্যান-পুত্রের সহিত একসঙ্গে খেলা করে, এক গাড়ীতে বেড়ায় এবং একই দ্রব্য একসঙ্গে বসিয়া আহার করে। এই সমদর্শিতাই যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতার ভিত্তি। লেখক যদি এতটাই স্বীকার করিয়াছেন তবে যাঁহারা "ন্যাশান্যাল ডিনার নামক যজ্ঞে" জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "হিন্দু ও মুসলমান কুলাঙ্গার" বলিয়া গালি দিয়া নিজেকে উপহাস্য করিলেন কেন? নিজে সাম্যবাদ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তবে উপদেশ দিতে আসিতে হয়। যে সব কথা ইংরাজিতে প্রকাশ না করিলে প্রকাশের উপায়ান্তর নাই, যাহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইতে লেখকের মহা বিজ্ঞতার ভাণ ধরা পড়িত, সেই সব কথা ইংরাজিতে দিয়া থামোখা ফুটনোটে মিষ্টার বা বাবুসম্প্রদায়কে "পশ্চাচারপ্রিয়" বলিয়া গালি দিয়া আপনার ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশের হাজার বিড়ম্বনার মধ্যে এই এক বিড়ম্বনা অপরিণতচিন্তা হামবড়া বিজ্ঞের দল। এইরূপ লেখককে ইসপের ভাষায় বলি "Physician, first heal thyself;" এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি "হে ভগবান, আমাদিগকে বন্ধুর কবল হইতে রক্ষা কর!"

বেণু—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বিরচিত। পুঠিয়া রাজসাহী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি ১২৫ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এখানি পদ্য পুস্তক। কবিতা ও পদ্য এই দুয়ে প্রভেদ বিস্তর। ছন্দোবদ্ধ কথা যেমনি হোক সে পদ্য, কিন্তু তাহা কবিতা হইতে হইলে তাহার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য, রস ও সৌন্দর্য্য আবশ্যক যাহা মনকে বিচিত্র ভাবে স্পর্শ করে। এ গ্রন্থে সে ...

স কৃত্তিবাস—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, সুপার রয়াল অষ্টাংশিত ২৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৵ আনা। এই অল্পদিনের মধ্যে বাংলা দেশে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহার যে বিশেষ আদর হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এমন সুদৃশ্য সুন্দর গার্হস্থ্য সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনোহরণ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। গ্রন্থারম্ভে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পরিচয় ও গ্রন্থশেষে কঠিন পুরাতন শব্দ সকলের অর্থনির্ঘণ্ট গ্রন্থ বুঝিবার বিশেষ সহায় হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি রামায়ণবর্ণিত স্থান ও ঘটনার সুন্দর কলাসঙ্গত চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে দুখানি নূতন চিত্র অধিক দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ... রাবণকে সীতাদেবীর ভিক্ষাদান চিত্রখানি পরবর্ত্তী সংস্করণে স্থান না পাইলেই ভালো হয়। এই চিত্রখানিতে রামায়ণের উচ্চভাব মোটে ফুটে নাই, অধিকন্তু সুকুমারশিল্প হিসাবে এ চিত্রখানি অকিঞ্চিৎকর। শেষখানি দ্বিতীয় সংস্করণেও শুদ্ধিপত্র কলঙ্কধ্বজার মত বহন করিতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এমন একখানি মনোহর সুদৃশ্য সংস্করণ বিশুদ্ধ করা কি একেবারেই অসম্ভব? এই সংস্করণে একখানি রঙীন মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা আখ্যান বুঝিতে বিশেষ সহায়তা করিবে।

সরল কাশীরামদাস শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ,—সম্পাদিত। সিটিবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুপাররয়াল অষ্টাংশিত ৫৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। শুনিয়াছি নাকি সাধারণ বাঁধাই ২৷৹ ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৩৲ টাকা মাত্র। এই অষ্টাদশ পর্ব্বের বিরাট পুস্তক এমন সুন্দর ছাপা, বাঁধা ও অনেকগুলি কলাসঙ্গত সুন্দর চিত্র ও মানচিত্র সহিত ২৷৹ বা তিন টাকায় খুব সস্তা বলিতে হইবে। নূনকল্পে চারি টাকা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু বোধ হয় সাধারণ পাঠকবর্গের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যোগীন্দ্রবাবু মূল্য কম রাখিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। অশ্লীল ও বাহুল্য অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে অথচ আখ্যানের মূলগত কোথাও নষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বাপর সংযোগ রাখিবার জন্য বর্জ্জিতাংশের স্থানে সম্পাদককে মাঝে মাঝে যে দুই চারি পংক্তি রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহা কোথাও অসমঞ্জস হয় নাই। খুব যোগ্যতার সহিতই সম্পাদন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে কাশীরাম দাসের পরিচয় ও পরিশিষ্টে দুরূহ শব্দের অর্থ নির্ঘণ্ট পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সুন্দর পুস্তক গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায় হইবে, আমাদের জাতীয়তা সংগঠনে সাহায্য করিবে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি ছাপার ভুল পরিহার করিতে পারে নাই। নয়নমনের যাহা আনন্দকর, তাহা নিখুঁত পাইতে ইচ্ছা করে, সেই জন্যই একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলাম।

শারদোৎসব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রয়াল ষোড়শাংশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ইহা রবীন্দ্রবাবুর সদ্যসমাপ্ত নাটিকা, ঋতুসমাগমে প্রকৃতির যে আনন্দোচ্ছ্বাস, তাহা কবিহৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া এই নাটিকার আকারে সাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে। হাস্য ও করুণ রস, মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব অপরূপ কৌশলে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি মধুর গান ইহাতে আছে। এই শরতে সকলেরই উৎসব, এই শারদোৎসব পাঠ করিয়া সেই উৎসবের আনন্দ পবিত্রতর ও পরিস্ফুট হইবে। ইহা ছাত্র ও বালকদিগের অভিনয়ের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতে স্ত্রীলোকের পাঠ নাই। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি সমস্ত, গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনবরূপে নয়নাভিরাম করা হইয়াছে। কবির রচনার সৌন্দর্য্যকে প্রকাশকদিগের চেষ্টা, বহিঃ-সৌষ্ঠবে অধিকতর ব্যক্ত করিয়াছে। এই সাময়িক সরস মহদ্ভাবপূর্ণ নাটিকাখানি সকলেই এক একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, আশা করি। মুদ্রারাক্ষস।

একটী বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা পুষ্প (সত্যমূলক জাপানী গল্প) —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং

তাহারই সুখপাঠ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যে স্থানে অত্যাচারী রাজা নিরীহ প্রজার কাতরক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া আপনার ব্যভিচারী বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়, সেস্থানে সাধারণের নিঃস্বার্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থত্যাগ ও আত্মদান কতদূর ফলপ্রদ হইতে পারে—দেশের জন্য যে মহাপুরুষ জীবনদান করিতে প্রস্তুত, তাঁহার সহধর্মিণীর প্রশস্ত হৃদয়ে কতখানি তেজ, কতখানি শক্তি থাকা আবশ্যক—যে রাজা ন্যায়ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিচারকে বরণ করিয়া লয়, কোন্ নরকের উত্তপ্ত লৌহশলাকা তাহার ভবিতব্যকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া আসে—লোগোবোরার বীরোচিত আত্মদান, চুতাঠাকুরাণীর আদর্শ পত্নীত্ব ও অত্যাচারী হোট্টো-রাজের শোচনীয় পরিণাম-কাহিনীপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তাহা জীবন্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থবর্ণিত এই উপাদেয় বিষয়টী সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থের মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। সম্পূর্ণ বিদেশীয় গল্পকে অবিকৃত রাখিয়া লিপি কৌশলের চমৎকারিত্বে ও স্নিগ্ধ-মধুর ভাষের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে সরস করিয়া তোলা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। কৃতী লেখক সুরেন্দ্রবাবুর সুপকহস্ত একার্য্যে বংশোচিত গৌরব রক্ষা করিয়াছে।

আমার জীবন—শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক লিখিত; শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা-সম্বলিত; শ্রীসরসীলাল সরকার দ্বারা প্রকাশিত; তৃতীয় সংস্করণ; ডবল ক্রাউন্ ষোড়শাংশিত ১৫০ পৃষ্ঠা; মূল্য ৷৵০ মাত্র; প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্, ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থরচয়িত্রী ৯৯ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-মহিলা, ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। যে সময়ে সন্তানসন্ততিপরিবেষ্টিতা প্রৌঢ়া হিন্দুমহিলাকেও আপনার দেড়হস্ত পরিমিত ঘোমটার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হইত—"স্বামীর পালিত ঘোড়াটী" কে দেখিলেও স-সঙ্কোচে লজ্জার আবরণ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত—মসীলিপ্ত কাগজের খণ্ডটুকু পর্য্যন্ত অতর্কিতে হস্তস্পৃষ্ট হইলে শাশুড়ী-ননদিনীর গঞ্জনা ও প্রতিবাসিনীর তীব্র সমালোচনার কষাঘাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত—গ্রন্থকর্ত্রী সেই সময়ের মহিলা। ইনি ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'চৈতন্য ভাগবতা'দি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার লালসায় পরিণত যৌবন বয়সে অপরের সাহায্য ব্যতীত আত্মচেষ্টাবলে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এবিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বক্ষ্যমান গ্রন্থখানিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। একজন 'সেকেলে' হিন্দুমহিলার দ্বারা যে এমন একখানি চমৎকার গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। এই আত্মজীবনচরিত পাঠে একদিকে যেমন আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর নিপুণ গৃহিণীপণা, ধর্ম্মপ্রাণতা, বিদ্যানুরাগ, অধ্যবসায় প্রভৃতি প্রকৃত মনুষ্যোচিত সদ্গুণরাশির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, অপরদিকে গ্রন্থের সরল, সরস ভাষা ও ভাবমাধুর্য্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ চিত্তকে অতর্কিতভাবে টানিয়া লইয়া যায়। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে কৌতূহল ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। এরূপ একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

& Co.) তাঁহারে আসিবেন, কারণ এই কোম্পানীর ভাড়া সর্ব্বাপেক্ষা কম।" ইউরোপে শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বর্ত্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ আদর পাইবার যোগ্য। সমালোচক।

কুন্তলীন পুরস্কার (দ্বাদশ বৎসরের, ১৩১৫ সাল)—শ্রীএইচ বসু কর্ত্তৃক দেলখোস হাউস হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজি ১৬২ পৃষ্ঠা। ইহাতে ১০টি গল্প, ৬ খানি পূজার চিঠি ও ৫টি কবিতা আছে সবগুলিই সুলিখিত, সরস, সুপাঠ্য; স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য এক যুগ ধরিয়া বসু মহাশয় নিজ ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কস্তুরী মৃগের মত প্রচ্ছন্ন-গুণসম্পন্ন কত লেখকলেখিকাকে যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। পুস্তকের আকার, ছাপা বাঁধাই সমস্তই সুন্দর সুদৃশ্য। কেবল ছাপার ভুল অনেক। এ বিষয়ে কুন্তলীন প্রেসের অধ্যক্ষের মনোযোগ বার বার করিয়া আকর্ষণ করিবার প্রয়াস আমার ব্যর্থ হইয়াছে মনে হয়। বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ ছাপাখানা নিষ্কলঙ্ক দেখিতে আমাদের বাসনা; তাই পুনঃ পুনঃ একই ত্রুটির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। পুস্তকের কুত্রাপি মূল্যের উল্লেখ নাই আগামী বর্ষ হইতে স্বকল্পিত গল্পের পরিবর্ত্তে লেখকলেখিকাগণকে প্রাচীন উপকথা [illegible]
সাধু। অনেক [illegible]

চিত্র-পরিচয়।

মহাত্মা রাজা [illegible]
নগরে দেহত্যাগ [illegible]
ভারতবর্ষের না[illegible]
করিলাম, তাহা [illegible]
অনুলিপি। [illegible]

বাবা কবীর [illegible]
লমীরা কবীরপ[illegible]
হিন্দু ও মুসল[illegible]
ছিলেন। তিনি [illegible]
সংখ্যায় প্রকাশি[illegible]
রক্ষিত একটি [illegible]
ভগবৎপ্রেমসুধা [illegible]
জন্ত খঞ্জনী বা[illegible]
কিন্তু কোন মু[illegible]
পুত্রের বাজনথ [illegible]
হইতেছে। [illegible]
করের অভিপ্রেত ছিল। [illegible]
ময়ূরের সহিত বিড়ালের ক্রীড়ার অভিনয় অঙ্কিত হইতেছে। কবীর তাঁতের সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন। তিনি পরোপজীবী অকর্ম্মা তথাকথি[illegible]